# সাহিত্য-সঙ্গ

আব দুল আজীজ আল-আমান

প্রকাশক :
এস, মল্লিক
৩৭-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-১২
প্রাপ্তিস্থান :
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭-ডি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ :
স্বাধীনতা-দিবস
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৫
দ্বিতীয় সংস্করণ
১লা চৈত্র, ১৩৬৯
৩য় সংস্করণ
২০শে আশ্বিন, ১৩৭৬
মুদ্রক :
সাধনা সিংহ রায়
কালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ-শিল্পী :
ধ্রুব রায়
প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য : বার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

উদার-প্রাণ মনীষী, বাংলা সাহিত্যের 'কাজী' এবং সুপণ্ডিত

**কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব**

শ্রদ্ধাস্পদেষু

# ॥ নিবেদন ॥

অসঙ্কোচে স্বীকার করছি "সাহিত্য-সঙ্গ" পাণ্ডিত্য-গর্বী নয়, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন স্পর্ধা সে রাখে না। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বহু আলোচিত বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। "সাহিত্য-সঙ্গ" তা'দের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা—প্রান্তসীমা লগ্ন হ'তেও কুণ্ঠিত। স্নাতকোত্তর জীবনে অধ্যয়নকালে এই সকল অমূল্য গ্রন্থাবলীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। সে সময়েই আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলীর উপদেশ এবং অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-সঙ্গের সমস্ত প্রবন্ধের রচনা সমাপ্ত হয়। এবং বিভিন্ন মাসিক এবং সাময়িকীতে প্রবন্ধগুলি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। মুদ্রণকালে সেই বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধরাজীকে একত্রিত করেছি এবং অংশ-বিশেষ সংশোধন করে' নিয়েছি।

কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ে আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। শ্রদ্ধেয় সুধীর-কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিপুলায়তন গ্রন্থ "কাব্যালোক" বিশেষ যত্নসহকারে পড়েছি। পড়ে পাণ্ডিত্য এবং মনীষায় মুগ্ধ হয়েছি। এ গ্রন্থের যে অংশগুলি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে 'কাব্যালোক' অধ্যায়ে সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'চর্যার ধর্মমত বা দার্শনিকতা' এবং 'চর্যার যোগ-সাধন-তত্ত্ব' অংশ দুটি লেখার সময় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের গ্রন্থটিই ছিল আমার একমাত্র নির্ভর স্থল। 'চর্যার সাহিত্যিক মূল্য' এবং 'পরবর্তী বাংলা ভাষায় চর্যার প্রভাব' অংশ রচনায় শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের চর্যাপদ এবং বাংলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) হ'তে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। শনিবারের চিঠির

পাতায় যখন আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের "সনেটের আলোকে মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত হ'তে থাকে তখন সনেটের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের উৎস-নির্ণয়ে তিনি যে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন "সনেট এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর আঙ্গিক" রচনায় আমি যে উপকরণ নির্বিচারে গ্রহণ করেছি। সুবক্তা, সুলেখক এবং কৃতী অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের "সাহিত্য-বিচিত্র" গ্রন্থখানি আমার জীবনে এবং রচনায় যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে সে একমাত্র আমিই জানি। সমালোচনা পদ্ধতি, ভাব, ভাষা সকল দিক থেকেই আমি তাঁ'র কাছে ঋণী। এ ছাড়াও যে সকল গ্রন্থাদি হ'তে আমি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য নিয়েছি সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে—গ্রন্থের শেষে একটি তালিকাও সংযোজিত হ'লো।

বইয়ের ভূমিকা লেখায় মুদ্রণ-ত্রুটি স্বীকার করা একটা প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই ছিল আমার ইচ্ছা। কিন্তু-কার্য সমাপ্তির পর এত অজস্র মুদ্রণ-ত্রুটি আমার নজরে পড়ল যে রুখে দাঁড়াবার গর্ব নিজেকেই খর্ব করতে হয়েছে। ছাপার ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াও অজ্ঞতার জন্যে লেখায় দোষ-দুর্বলতা এবং তথ্যগত অসঙ্গতিও হয়ত রয়ে গেল—এ বিষয়ে আমি সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি কামনা করি।

গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন সুপণ্ডিত কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব। কয়েকটি প্রবন্ধ সংশোধন করে' দিয়েছেন অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় এঁর স্নেহানুকূল্য এবং ভৎর্সনা-তাড়না না পেলে হয়ত এ গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তো না। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করেছেন ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। এঁদের সবায়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত স্নেহের এমনি একটা সম্পর্ক আছে যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিছক বাহুল্য মাত্র। গভীর আনন্দে মুগ্ধচিত্তে আজ আমি এঁদের সবায়ের কথা স্মরণ করছি। ইতি—

| সোলেমানপুর, রাজীবপুর<br>২৪-পরগণা<br>২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৫ | আবদুল আজীজ আল্ আমান |
|---|---|

## ● দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শিশু-সাহিত্যে নজরুল, কবি নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কালান্তর ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি যোগ করা হ'লো। প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ ত্রুটি বর্তমান সংস্করণে যত্নসহকারে সংশোধন করে দিয়েছি।
১লা চৈত্র, ১৩৬৯।

## ● তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় দু'বছর হ'ল দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে। সময়ের অভাবে আগাগোড়া বইটি দেখে দিতে পারিনি। বর্তমান সংস্করণে বইটিকে যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪-পরগনা
২০শে আশ্বিন, ১৩৭৬

আবদুল আজীজ আল্-আমান

# সূচীপত্র

# চতুর্দশপদী কবিতাবলী

॥ এক ॥

বাংলা সাহিত্যে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র বিশিষ্ট স্থান-নির্মাণে দু'টি কারণ অন্তরাল হ'তে বেগ সঞ্চার করেছে : একটি হ'লো এ কবিতাবলীর অনন্যসাধারণ ভাবসম্পদ এবং অপরটি হ'লো এর নতুনতর আঙ্গিক-বৈচিত্র্য। একদিকে আছে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার অভিনব রূপায়ণ, অন্যদিকে আছে প্রকাশ-বৈচিত্র্যের নতুনতম স্পন্দন। ব্যক্তিগত ভাবসম্পদের অত্যুজ্জ্বল আলোকপাতে কবির অবরুদ্ধ অন্তর্লোকের সবটুকু যেমন একদিকে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হ'য়ে উঠেছে, তেমনি প্রকাশভংগীতে নতুন পথে পদচারণা করে' কবি বাংলা কাব্য-প্রকাশের এক নতুন বেগবান স্রোতধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ধ্যান-কল্পনা এবং মানস-প্রবণতার কিছু কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন কবির কাব্যে পেয়েছি, কিন্তু যে প্রকাশ-রীতিতে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কোমল বক্ষ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে বাংলা কাব্যে তা'র পদধ্বনি এই প্রথম শোনা গেল। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র প্রতিটি পৃষ্ঠা সনেটের দৃঢ়-কঠিন বাঁধুনিতে হীরকোজ্জ্বল।

সুপ্রাচীনকাল হ'তে নিছক বাঁধাধরা নিয়মেই বাঙালী কবি পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালী, লাচাড়ী ইত্যাদি দ্বারা গ্রথিত একটি এলায়িত বাকবিন্যাসযুক্ত কাহিনীকেই কলাকৃতি বা Art-form হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন কোন প্রকাশভংগীর জোয়ার-প্লাবন এসে পয়ার-ত্রিপদীর বেলাভূমিতে আপনার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। পয়ার ও ত্রিপদীদ্বারা শিথিল প্রকাশ-ম্লান কাহিনী-

কাব্যের দীর্ঘদিন একটানা নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বের পর অবশেষে গীতিকাব্যের ধারা এসে বাংলাকাব্যের প্রকাশ-মন্থরতাকে বেগবান করে' তুলেছে। এর পর বহুজনের বহুপ্রচেষ্টায় বহুভাবে বাংলা-কাব্যের স্রোতধারা চিরচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু সনেটের সাথে তখনো আমাদের কোন পরিচয় নেই। অবশেষে আমাদের এই অভাব দূর হ'লো উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে; মধুসূদনের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সনেটের অপূর্ব ঝংকারে বেজে উঠলো। জীবনকাব্যের মহাভাষ্যকার শ্রীমধুসূদন জীবনের সকল ধ্যানধারণা, সকল বাসনাকামনা তাঁ'র শেষতম গ্রন্থের মধ্যে বিলীন করে' দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়িয়েছেন। গ্রন্থখানি তাই নিখিল বাংলা-কাব্যকুঞ্জের মধ্যে একটি দোসরহীন অনন্যসুন্দর কোরক। কেবল ভাব-ভাষায় নয়, কেবল দিগন্তবিথারী কল্পনা-ঐশ্বর্যে নয়, কেবল মধুকবির স্বভাবজাত উপমা প্রয়োগের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কারুকরণের জন্যও নয়—এ গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য নিহিত আছে এর আঙ্গিক-প্রকরণ-মাধুর্যের মধ্যে, প্রকাশ-রীতির নতুন রেখাঙ্কনের মধ্যে। নতুন মঙ্গলতীর্থে পদচারণা করে' মধুকবি কাব্য-প্রকাশ-রীতির যে নতুন মধুকোষের উদ্ঘাটন করলেন, ভবিষ্যতে বহুতর কবি সেই পথে পদচারণা করে' আপন প্রতিভাকে বাঙালীর ভাব-চিত্তে সঞ্চারিত করে' দিয়ে গেছেন। এই পথেই পদচারণা করে' বর্তমানের বহু প্রতিভাবান কবি আপন ধ্যান-স্বপ্নকে শাশ্বত রসলোকের দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করছেন।

সনেট বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রকাশ রীতির কনিষ্ঠা কন্যা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বয়ঃকনিষ্ঠা হ'লেও পৃথিবীর ইতিহাসে সে বয়োজ্যেষ্ঠা। ইতালী-গ্রাসে তা'র জন্ম হয়েছিল অনেক আগেই।

সংগীতের তিনটি পৃথক্ পর্যায়কে বোঝাবার জন্যে প্রাচীন ইতালীতে তিনটি শব্দের প্রচলন ছিল: Canzone, Sonetto এবং Ballata। যন্ত্রসংগীতের সংযোগ ছাড়া যে গান কেবলমাত্র কণ্ঠের সুর-মাধুর্যে ভরিয়ে দেওয়া হ'তো তা'র পরিচয়বাহী শব্দ Canznoe,

কণ্ঠের স্বরবৈচিত্র্য ছাড়াও যে সংগীতের মর্মমূলে মিশে থাকতো বাদ্যযন্ত্রের সুরতরঙ্গ তা'র পরিচয় ছিল Sonetto শব্দের মধ্যে, আর কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীত ছাড়া নৃত্য বা অঙ্গভংগীর সহযোগে যে সংগীত পরিবেশিত হ'তো, তাকে বলা হ'তো Ballata। সংগীত-জগতের পরিভাষা Sonetto শব্দ হ'তেই Sonnet শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Sonetto শব্দটির আভিধানিক অর্থ হ'লো একটি ক্ষুদ্রধ্বনি বা a little sound। সনেটও একটি ক্ষুদ্র ভাবের বাঙ্ময়-প্রকাশ। সুবৃহৎ কোন কাব্য-কাহিনী রচনার অবকাশ সনেটে নেই। দিগন্ত-বিহারী সুবিপুল কোন ভাব-কল্পনার উদাত্ত অসীম সমুদ্র-কল্লোলও সনেটের ক্ষুদ্র বুকে ধ্বনিত হয় না। ছোট ছোট দুষ্প্রাপ্য-সুন্দর কল্পনা-ঐশ্বর্যের নিটোল প্রকাশে সনেট ভাস্বর। একটি গীতোচ্ছ্বাস-ময় সংযত ভাবই সনেটের প্রাণ। বিশিষ্ট সমালোচক সনেটের সূত্র সম্পর্কে বলেছেন, "সনেট গীতিকবিতার-ই একটি প্রকারভেদ। সুতরাং গীতিকবিতায় যেমন, সনেটেও তেমন একটি অনুভূতি, একটি হৃদয়াবেগ অখণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। একটি আবেগ বা কল্পনা চতুর্দশটি পংক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া উহাকে নিঃশেষ করিতে হইবে। আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ভাবের একটি সংহতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতা বজায় রাখিতে হইবে। কবির প্রাণের আবেগটি যদি চৌদ্দটি ছত্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমাপ্তিলাভ না করে, তবে শেষের কয়েকটি ছত্রে ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাঙিয়া বা দুমড়াইয়া চতুর্দশ পংক্তির মধ্যেই ভরিয়া দিতে হয়। আবার শেষ দুই পংক্তি লিখিবার পূর্বেই ভাব বা কল্পনাটি যদি নিঃশেষ হইয়া যায় তবে কবিকে বাধ্য হইয়া ভাবকে টানিয়া বুনিয়া, প্রকাশভংগীকে অসম্ভবরূপে স্ফীত করিয়া চৌদ্দছত্র পর্যন্ত লইয়া যাইতে হয়।" মোটকথা সনেটে কোন দুর্বল অংশের প্রবেশাধিকার নেই—এর সর্বাঙ্গ দৃঢ়-পিনদ্ধ, ব্যঞ্জনগর্ভ এবং ভাব-নিটোল। একটি বিরাট কল্পনার বাষ্পময় অংশকে পৃথক্ করে' কেবলমাত্র সারাংশকে অধিকতর সুদৃঢ় এবং সুসংহত

করে' ছন্দের দৃঢ়-কঠিন ভিত্তিতে উপস্থাপিত করতে পারলেই সনেটের সার্থকতম প্রকাশ। আত্মার স্ফূর্তি এবং প্রাণাবেগকে বাহ্যিক আবরণের কঠিন-পীড়নে দীপ্তোজ্জ্বল করে' তোলাই সনেটের মূল লক্ষ্য।

সনেটের আঙ্গিক-স্বরূপে বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয়ান সনেটকার পেত্রার্কের নাম বিশেষরূপে জড়িত আছে। অবশ্য এঁর পূর্বেই সনেটের আবিষ্কার হয়েছিল। এবং অনেকেই সনেট লিখে যশ অর্জন করেছিলেন—কিন্তু পেত্রার্কের হাতে সনেট যেন সঞ্জীবনী সুধা পান করে' চিরঞ্জীব হ'য়ে ওঠে। অসংখ্য সনেট রচনা করে' তিনি যে বিপুল সম্মানের অধিকারী হন, তা'তে পূর্ববর্তী সকল কবির যশ ম্লান হ'য়ে গেছে। সনেট রচনায় পেত্রার্ক যে আঙ্গিক-সুষমা রেখে যান তাঁ'র পরবর্তী অনেকেই সেই পথে পদচারণা করেছেন—কিন্তু ইংরেজ কবি সেক্সপীয়র পেত্রার্কীয় আঙ্গিকে সনেট রচনা না করে' এক নিজস্ব রীতির প্রবর্তনা করেন। তাই সনেটের আঙ্গিক নির্ণয়ে এই দু'জন সনেটকারের সনেটই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পেত্রার্ক তাঁর সকল সনেটকে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে সনেটের প্রথম অষ্ট চরণ নিয়ে গঠিত হয়েছে অষ্টক বা cctave এবং দ্বিতীয় ভাগে শেষের ছয়টি চরণের সম্মিলনে গঠিত হয়েছে ষট্ক বা sestet. অষ্টকটি আবার দু'টি সংবৃত-চতুষ্ক বা enclosed quatrain দ্বারা এবং ষট্কটি দুটি ত্রিপদিকা বা tercet-এর মিলনে সম্পূর্ণ। পেত্রার্কের সকল সনেটে এই অষ্টক এবং ষট্কের মাঝে কিছু বিরতির ভাব আছে। অষ্টকের মধ্যে প্রধানতঃ মূলভাবটি দানা বেঁধে ওঠে এবং ষট্‌কের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে তা'রই অনুরণন। সমগ্র সনেটটিকে সমুদ্রের একটি তরঙ্গের সাথে উপমিত করে' বলা হয়েছে, সমুদ্রের অসীম জলরাশির উপর একটি তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বড় হ'তে হ'তে যেমন একেবারে উচ্চতম রূপ পায়, সনেটের মূল ভাবটিও তেমনি অষ্টকের মধ্যে তরঙ্গ উত্থানের মত উত্থিত হ'তে হ'তে একেবারে উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায়; ক্ষণিক

স্থির থেকে পরমুহূর্তে তরঙ্গটি যেমন নিম্নাভিমুখী হ'য়ে ভেঙে যায়, সনেটের মূল ভাবটিও তেমনি অষ্টকের মধ্যে উচ্চতম রূপ পেয়ে ক্ষণিক বিরামের পরমুহূর্তে ষট্কের মধ্যে মুক্তি পায়। অষ্টকের মধ্যে অধিরোহণ, ষট্কের মধ্যে অবরোহণ। অষ্টক ষট্কের মধ্যে এই বন্ধন এবং মুক্তির লীলাই হ'লো সনেটের অষ্টক এবং ষট্ক বিভাগের মূল কথা।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র অসংখ্য সনেটের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সনেটে অষ্টক এবং ষট্কের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতে অষ্টক-ষট্কের এই বিভাগ প্রধান হ'য়ে ওঠে নি। একটি ভাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা চলে গেছে—তা'র মাঝে কোন উত্থান-পতন নেই ; কোন বিরাম নেই। অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তুও ভাব-জমাট নয়—শিথিল। দৃঢ়-পিনদ্ধ নয়—এলায়িত। কোন কোন সনেটে মহাকাব্যের মত অসংখ্য উপমা ইত্যাদিতে কাহিনী বলার ঝোঁক এসে গেছে। একটি অখণ্ডভাবের বজ্রদীপ্তি খুব কম কবিতাতে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে মধুসূদনের সনেট দুর্বল।

পেত্রার্কীয় সনেটের অষ্টকের মিল এই ভাবে সূচিত হয়েছে: চ ছ ছ চ, চ ছ ছ চ। কোথাও এ মিলের ব্যতিক্রম নেই। মধুসূদনের অনেকগুলি সনেটে এই মিল লক্ষ্য করা যায়: কাশীরাম দাস, বৌ-কথা-কও, আশ্বিন মাস ইত্যাদি সনেটগুলি এই পর্যায়ের। ষট্কের মধ্যে পেত্রার্ক অনেকগুলি মিলের প্রবর্তন করেন—মিলগুলি এই ভাবে দেখানো যেতে পারে: তথ তথ তথ, তথদ তথদ বা তথথ তথথ—কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে পেত্রার্কীয় সনেটে শেষের দুই চরণে কখনও পয়ারের মত মিল থাকে না। ষট্কের মধ্যে মিলের এই রীতি মধুসূদনের অনেকগুলি কবিতায় লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে।

আকৃতির দিক দিয়ে সেক্সপীয়রীয় সনেট সম্পূর্ণরূপে পেত্রার্কীয় সনেটের বিপরীত। সেক্সপীয়র সনেটের মধ্যে অষ্টক-ষট্কের কোন

বিভেদ রাখেন নি—ভাবের কোন উত্থান-পতনও তাঁ'র কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না; একটি সুরতরঙ্গ প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত একটানা অবিরল ধারায় বয়ে গেছে। অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগের বদলে তিনটি চৌপদী এবং শেষে একটি মিলযুক্ত পয়ার দিয়ে সেক্সপীয়র তাঁ'র সনেট রচনা করেছেন। সেক্সপীয়রীয় সনেটের মিলটি এইরূপে দেখানো যেতে পারে: কখ কখ, গঘ গঘ, চছ চছ, ঞঞ।

সেক্সপীয়রীয় সনেট-আঙ্গিক মধুসূদনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল—তাঁ'র অধিকাংশ সনেট তাই সেক্সপীয়রীয় আঙ্গিক-সুষমায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র বহুবিখ্যাত 'কাশীরাম দাস' নামক কবিতাটি সেক্সপীয়রীয় সনেটের সার্থক দৃষ্টান্ত। ভাববিন্যাসের দিক দিয়ে মধুসূদনের প্রায় সকল সনেট সেক্সপীয়রীয় সনেটের অনুগামী। প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত ভাবের একটা সংগতি এবং ক্রমবিকাশ তাঁ'র সনেটগুলিকে বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অবশ্য মধুসূদন কেবল খাঁটি পেত্রার্কীয় এবং খাঁটি সেক্সপীয়রীয় সনেট-ই রচনা করেন নি—এই দুইপ্রকার নিয়মানুগ সনেট ছাড়াও বহু নিয়মবিহীন irregular সনেটও তিনি রচনা করেছেন। এর কিছু ওর কিছু নিয়ে একটি মিশ্র-রীতির গঠন-বৈচিত্র্যও তাঁ'র কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এই মিশ্র-রীতিতে লেখা সনেটগুলি কলানিপুণতায় ভাস্কর্য-সুঠাম এবং দুষ্প্রাপ্যমনোহর হ'য়ে উঠেছে। মোটকথা বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কেবলমাত্র সনেটের অবতারণাই করেন নি—তার আগামী দিনের গৌরবোজ্জ্বল সম্ভাবনাকে দিগ্‌বিথার করে' দিয়েছেন।

মধুসূদনের সনেট একেবারে নিখুঁত নয়—বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁ'র মধ্যে স্থান পেয়েছে। সনেটের মধ্যে নিটোল স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাব অপেক্ষা বহুস্থলে যে কাহিনী বলার ঝোঁক এসে গেছে সে-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল গদ্যময়। একান্ত এলায়িত এবং শিথিল-বিন্যস্ত বাক্‌-সংযোজনা বহুস্থানে সনেটের মৌলিক লক্ষণকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কেবলমাত্র বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের দীপ্তিতে এবং উপমা-অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগে

কবিতাগুলি ঝলকিত হয়েছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সনেটের দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি। বিষয়বস্তু যেখানে কল্পনাবেগে কেবলমাত্র বাষ্পময় হ'য়ে উঠেছে সেখানে উৎকৃষ্ট সনেট-সৃষ্টির প্রত্যাশা করা অন্যায়। কিন্তু মধুসূদন কল্পনার পক্ষীরাজের লাগামে টেনে সংযত করতে জানতেন—এবং যেখানে তিনি লাগাম টেনে ভাবকে সংযত করেছেন, সেখানে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। 'বঙ্গভাষা', 'কাশীরাম দাস', 'বিজয়াদশমী,' 'কপোতাক্ষ নদ', 'নূতন বৎসর' ইত্যাদি কবিতাগুলি শাশ্বতকালীন সনেট-গৌরব।

প্রেমকে কবি সনেটের একমাত্র বিষয়বস্তু করেন নি—প্রেম ছাড়া বহুতর বিষয়কে তিনি সনেটের অঙ্গীভূত করেছেন। আপন হৃদয়ের ধ্যানধারণার কথা, স্বদেশের কথা, স্বজাতি এবং স্ব-সংস্কৃতির কথা এমন কি নীতিমূলক বহু বিষয়ের অবতারণাও তিনি সনেটের মধ্যে নিপুণ দক্ষতার সাথে করেছেন। বস্তুতঃ "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও এই বহু বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এর আঙ্গিক পাশ্চাত্ত্য—কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের অন্তরাগিণী কী সুন্দরভাবেই না বেজে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্য-লালিতা কঠিন নিপীড়নে সমুজ্জ্বল সনেটের মধ্যে যখন আমরা শ্যামাঙ্গ বাংলার পল্লবান্তরালের 'বৌ-কথা-কও' পাখীর কোমল-মধুর আহ্বান শ্রবণ করি তখন আমাদের সমগ্র চিত্ত দুর্নিবার আবেগে রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে ওঠে। বস্তুতঃ আঙ্গিকের দিক 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বহুস্থানে দুর্বল হলেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে সে' দুর্বলতা ক্ষীণ। পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকে এই গ্রন্থে কবি আপন গহনচারী হৃদয়ের এবং স্বাদেশিকতার যে বাণী বয়ন করেছেন তা'র মূল্য কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নিভৃত মনের গান, স্বাদেশিকতার বীজাঙ্কুর, ইলেকট্রিক গীটারের দীপ্তরাগিণীর অন্তরালে শ্যাম-মুরলীর অমিয় তান।

## ॥ দুই ॥

কবিমানস ও ব্যক্তি-মানসের যৌগিক মিশ্রণে আধুনিক কাব্য বঙ্কিমান। দুয়ের মিশ্রণে সে পূর্ণাঙ্গ, দুয়ের মিশ্রণে সে নিটোল মুক্তা। আধুনিক কাব্যে এই ব্যক্তি-মানসের সংযোজনায় প্রাচীন কাব্যের সাথে তা'র এক দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হয়েছে। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে ব্যক্তিবিলোপী বিষয়মুখীনতার উন্মাদ কোলাহল—বিষয়কে পৃথক্ করে ব্যক্তি-মানসের স্বাভাবিক লালন সে কাব্যে নেই। বিষয় কিংবা কাহিনীর প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তার অন্তরালে পড়ে কবির হৃদয়ের গোপন কথাটুকু অতল সলিলে সমাধি লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক কাব্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই বলিষ্ঠ ঘোষণায়। কবির নিভৃত মনের গহনচারী কথাগুলি এ কাব্যে দূরাগত কলগুঞ্জনের মত নিবিড় হ'য়ে এসেছে। আধুনিক কাব্য-সরোবরের সুনীল জলে কবির গোপন হৃদয়ের কথাগুলি যেন ফুটে ওঠা লাজ-নম্র ভীরু কোরক। এই কোরক যেন বিষয়বিলোপী ব্যক্তিমুখীনতার বিজয়-তিলক।

মধুসূদনকে নিয়েই আমাদের সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের যথার্থ প্রস্তাবনা। অবশ্য নান্দীপাঠের ভূমিকা পূর্বে অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু অসাফল্যের দিগন্তেই তাঁদের সে প্রচেষ্টা গুমরে মরেছে। মঙ্গলকাব্যের ঘটনামুখর বিষয়মুখীনতার সুবিশাল সীমাহীন ক্ষেত্রের মাঝে কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিঘোষিত হয় নি এবং তা' আশা করাও বোধ হয় আমাদের অন্যায়। বৈষ্ণব-পদাবলী ব্যক্তি-মানসের সুস্পষ্ট রেখাঙ্কনে সমুজ্জ্বল—এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন কিন্তু আমাদের মনে হয় এই উক্তির পিছনে যথার্থ বিচার নেই। রামী ধোপানীর প্রেমসুধা পান না করলে হয়তো

চণ্ডীদাসের পক্ষে এমন উচ্চস্তরের পদাবলী রচনা সম্ভব হ'ত না সত্য—কিন্তু এই পদাবলীতে আমরা চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-মনের কতটুকু পরিচয় পাই? রামী ধোপানী তাঁ'র পদাবলীর উৎসমূল হ'লেও রচনার কোথাও মানবীয় প্রেমের বিজয় ঘোষণা নেই। মানবীয় প্রেমের উপর এক স্বর্গীয় মোহাঞ্জন মিশে সকল প্রেমলীলাকে অলৌকিক করে' তুলেছে এবং এই অলৌকিক প্রেমাবেগেই পদাবলীর কবি বনান্তরালে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পদাবলীর প্রেমগাঁথা তাই অশ্রুসজল প্রেম শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাস। এই প্রেমে হৃদয়াতিরেক এক ভাব-নিবিড় স্বর্গীয় অনুভূতি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তিহৃদয়ের সকল বাসনা-কামনা সেই স্বর্গীয় প্রেমলীলার চরণপ্রান্তে আত্মোৎসর্গ করে' বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। পদাবলীর সর্বত্র তাই ঐশ্বরিক প্রেম অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে আভাসিত।

ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে ব্যক্তি-মানসের কিঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেও এ বিকাশ সীমিত। রচনার মধ্যে আপন হৃদয়ের কথা কোথাও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি। এমন কী মধুসূদনেরও প্রথম দিকের কাব্যে কোথাও ব্যক্তিহৃদয়ের গোপন কথাগুলি স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি। 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' কিংবা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মহাকাব্যসুলভ উদার গাম্ভীর্য ও অটল শৌর্যবীর্য আপন বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছে। সেখানে একটানা চলেছে বীর-হুঙ্কারের দীপ্ত ঘোষণা, বেজেছে রণোন্মত্ততার নর্তনশীল ভৈরব, ঝংকৃত হয়েছে বজ্র-অশনির ওঙ্কার-টঙ্কার। এই সব সৃষ্টির মর্মমূল হ'তে ভেসে এসেছে মহাকাব্যের উদাত্ত-গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল। কবির ব্যক্তিহৃদয়ের মৃদুকম্পমান কথাগুলি এই বিপুল কল্লোল-গানের অন্তরালে কখন কোন অলক্ষ্যে চাপা পড়ে গেছে। কবি এখানে মেতে উঠেছেন ইন্দ্রজিতের বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ ভয়াল-সুন্দর রূপ দেখাতে, রাবণের অমিতবিক্রমের বহ্নিমান প্রকাশে, অসীম সাগরের প্রলয়ঙ্কর রূপ বর্ণনায়। এ কাব্যে ব্যক্তিহৃদয়ের ছোট ছোট সুখ-

দুঃখের, ছোট ছোট ব্যথা-বেদনার কোমল কোরক কই? 'মেঘনাদ-বধ', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্যের ভাব এবং বিষয়বস্তু প্রাচীনতার অনুসারী—কেবলমাত্র প্রকাশভংগীর সৌকুমার্যে এরা আধুনিকতার দিগন্তে পদসঞ্চারের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রকৃতিতে এরা মহাকাব্য, গীতিকবিতার রসলোকে এদের যাতায়াত নেই। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভাব, বিষয়বস্তু এমন কি প্রকাশভংগীর দিক থেকেও গ্রন্থখানি পূর্বাপর সকল গ্রন্থের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করেছে। এই গ্রন্থে আমরা পাই কবিমানসের সহজ প্রকাশ। ব্যক্তি-মনের সকল সুখ-দুঃখের কথা, সকল ধ্যানধারণার স্পন্দন কী নিঃসীম সারল্যেই না ভাব-জমাট হ'য়ে উঠেছে। উত্তাল তরঙ্গায়িত কর্মধারার তীব্রবেগ হ'তে সরে এসে কবি এই কাব্যে রচনা করেছেন অচঞ্চল ধ্যান-কল্পনার পুলক-শিহরণ! গর্জনোন্মুখ উর্মিমুখর অসাম সমুদ্রের তীরভূমি পরিত্যাগ করে' কবি চলে এসেছেন বনান্তরালের কুসুম-কুঞ্জে। এই নীরব কাব্যকুঞ্জের সুরভিত ছায়াতলে বসে কবি কুসুম চয়ন করেছেন আপন মনে—মালা গেঁথেছেন আপন খেয়ালখুশীর রোমাঞ্চ-রঙীন রং মিশিয়ে রণকোলাহল ভয়াল-নিনাদ মুখর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের পার্শ্বে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাই নিভৃত মনের গান। আপন মনের গহনচারী চিন্তাভাবনার রূপাল্পনায় কবিতাগুলি মনোরম হ'য়ে উঠেছে। মহাকাব্যের সুবিপুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কবির কল্পনা পাগল হওয়া আরবী ঘোড়ার মত দাপট কেটে ছুটে বেড়িয়েছে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্তে— গতির উন্মাদনায় সে প্রচণ্ড। কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে কবির কল্পনা যেন ভোরের কোকিল। শান্ত শুভ্র পরিবেশে ছায়াঘন আলো-আঁধারের মিলন-লীলায় সে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সংগীতলহরীর অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে, দিবসের তীব্র আলোকে সে রুদ্ধবাক্। চরম নীরবতাই তা'র কাম্য। এই নীরবতার মর্মমূল হ'তে বেজে ওঠে গহনচারী কল্পনার সুমধুর অনুরণন।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে কবি আত্মস্থ। কল্পনার উচ্চগ্রামে সুর বেঁধে তিনি ভাবের ঘোরে উন্মাদ হ'য়ে উড়ে যান নি। কল্পনা-পক্ষীরাজের রাশ টেনে ধরে তিনি তা'কে সংযত করেছেন—কল্পনার আলোকে আপন আত্মার অন্তরালবর্তী অসীম সমুদ্রে অবগাহন করে' তুলে এনেছেন অযুত মুক্তা। তাই এ কাব্যে ফুটে উঠেছে তিমিরাভিসারের স্বপ্নঘন চিত্র, ঘটেছে তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের সুপ্ত বাসনা-কামনার ছন্দিত রূপায়ণ।

কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের বাসনা-কামনার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পাঠক-মনে এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান। 'কাব্যরস' ছাড়া 'ব্যক্তিগত রস' পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পাঠক-মনে সদা জাগ্রত। বলা-বাহুল্য "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" অন্তরাত্মা এই উভয়বিধ রসতরঙ্গে স্পন্দমান। একদিকে কাব্যরসের হয়েছে অনবদ্য প্রকাশ, অন্যদিকে ব্যক্তিহৃদয়ের হাসিকান্নার ঘটেছে সুমহান্ অভিব্যক্তি।

ব্যক্তিগত জীবনে অদম্য যশ-লিপ্সা এবং উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির জন্যে কবিকে বহু আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। যশ-লিপ্সার তীব্র আবেগে তিনি বাংলা ভাষার দ্বার পরিত্যাগ করে' বলিষ্ঠতর ভাষার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু যশ মেলে নি; লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কণ্টক-বন মাড়িয়ে কাঙালপনা পরিত্যাগ করে' অবশেষে তিনি এলেন ছায়া-ঢাকা শ্যামশ্রী বাংলার বুকে। নিবিড় আকর্ষণে জড়িয়ে ধরলেন পরিত্যক্ত জননীর চরণপ্রান্ত। 'বঙ্গভাষা'য় ব্যক্তি-জীবনের এই বেদনাকুল অস্থিরতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

যশ-লিপ্সার যে অদম্য স্পৃহা কবির হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল, বড় হওয়ার যে সুমহান্ স্বপ্ন তিনি আপন অন্তর-মূলে সযত্নে লালন করেছিলেন অনেকগুলি কবিতায় দেখি সেই ব্যক্তিগত ধ্যান-স্বপ্নেরই বাঙ্ময়-প্রকাশ। 'সরস্বতী' কবিতায় তিনি দেবীর পাদ-পদ্মেরই স্মরণ করেছেন। 'নন্দন-কানন' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কাব্যরচনার মূলশক্তিরূপী সরস্বতী দেবীর বন্দনা-গাঁথা:

লও দাসে, হে ভারতী নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত, যথায় উর্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণশশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বনে ;

সুবৃহৎ কোন ধ্যান-কল্পনা নয়, মহৎ কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নয়—কেবল দেবীর পদপ্রান্তে একটু আশ্রয়-ভিক্ষা !

'সাংসারিক জ্ঞান' কবিতায় কবি অধিকতর ব্যক্তিগত। এখানে ব্যক্তিগত ভাব-মূর্ছনায় কবিতাটি দোসরহীন অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। কাব্যরচনাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করলে সংসারের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করা কখনো সম্ভব নয়। কাব্য-নিকুঞ্জে ছন্দ-পূরবীর তান অন্তরকে ব্যাকুল করে' তোলে, পথভোলা উদাস পথিকের মত ঘরছাড়া করে' পথের প্রেমে মাতিয়ে দেয়। তাই সংসারাসক্ত মানুষ যখন বিলাসকক্ষে চরম প্রমোদে কালযাপন করে তখন ঝড়-বাদলের ঝঞ্ঝা-দোলা উপেক্ষা করে' বেদনাবিধুর পথে কবিকে করতে হয় পদচারণা। তাই কবি সংশয়াকুল চিত্তে প্রশ্ন করেছেন : "কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে—সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?"

কিন্তু তবুও কবি এই বেদনার, এই চিরদুঃখের পথকেই সানন্দে গ্রহণ করেছেন। বেদনার চিরকণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়েই আসে আনন্দ-প্লাবন, তিমিরাভিসারের ক্লান্তিঘন শিথিল চরণপ্রান্তেই নত হয় উষার আলোক-বন্যা। সুতরাং শত আঘাত, শত ব্যথা-বিক্ষুব্ধতা ঝঞ্ঝার মত আলোড়ন তুলুক কবির বুকে—সহন-শীতলার লৌহ-কঠিন বক্ষপিঞ্জর প্রস্তুত রেখেছেন তা'র জন্যে।

আত্মবিলাপ জাতীয় অনেকগুলি কবিতায় কবি-হৃদয়ের ধ্যান-কল্পনা যেন একত্রিত হয়েছে শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে। এই কবিতাগুলি যথার্থই নিভৃত মনের সঙ্গীতমুখর ব্যঞ্জনা। আমরা জানি বাহ্যজীবনে কবিকে বহুবার বহু পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এই অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা সময় সময় এত অধিক হ'য়ে

উঠেছে যে, কবির কাব্যজীবনেও তা'র ঢেউ এসে বেলাভূমিকে উদ্বেল করে' দিয়েছে। বিশেষ করে' শেষ বয়সে কবির দিনগুলি যেন বেদনা ম্লানছায়াচ্ছন্ন সায়াহ্ন-মুহূর্ত। সমগ্র জীবন জুড়ে বেদনার কী তীব্র আলোড়ন! কিন্তু এই সুতীব্র বেদনাবোধ, এই তীক্ষ্ণাগ্র আলোড়ন কবি সহ্য করেছেন আপন প্রাণ-প্রাচুর্যের বিশালতা দিয়ে। নিঃসঙ্গ বেদনাতুর দিনগুলিকে তিনি আপন প্রাণের উচ্ছল সজীবতায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এই হতাশা, এই অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতাকে তিনি জীবনে স্থায়ী হ'তে দেন নি—তবু সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে', সকল সজীবতাকে ম্লান করে' জীবন-সমুদ্রের তীরে তীরে এই ব্যথাবেদনার, এই গহনচারী দুঃখ-দারিদ্র্যের ম্লান ছায়াপাত ঘটেছে। যে সংঘর্ষ তাঁ'র জীবনকে বিধ্বস্ত করার উপক্রম করেছে, যে করালমূর্তি তাঁ'র জীবনীশক্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত—বহু দুর্বল মুহূর্তে কাব্যের মধ্যে তাদের প্রকাশ নিয়তির মত অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। 'নূতন বৎসর' তাই কবির চিত্তে কোন নতুন ভাবাবেগের সঞ্চার করতে পারে নি, কোন বিরল রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয় নি বরং অতীত দিনের সমুদয় ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত গ্লানিকে বয়ে এনে কবিচিত্তকে মুহ্যমান করে' তুলেছে:

হৃদয়-কাননে,
কত শত আশালতা শুকায়ে মরিল,
হায়রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!

'নূতন বৎসরে'র পাদপ্রান্তে কোন নতুন উৎসাহ বা প্রাণ-চেতনা নেই—আছে বেদনাবিহ্বল স্পন্দন। আর একটি আবর্তন কাল-চক্রের নির্মম পেষণে সংযুক্ত হ'য়ে কবির জীবনকে অন্তিম পরিণতির দিকে এগিয়ে দিল—এই বেদনাবোধ আলোকোজ্জ্বল নতুন বছরকে ম্লানতায় আচ্ছন্ন করে' দিয়েছে। তাই 'নূতন বৎসরে'র

আলো-ঝলমল নবোন্মেষে কবির চিত্তে নিঃশব্দে ঘটেছে ঘনান্ধকার নিশীথের পদসঞ্চার :

বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপে স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারারূপ মণি ;
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

'সমাপ্ত' কবিতায় দেখি আত্মবিলাপের আর এক রূপ। এ যেন আত্মবিলাপ নয়—আত্মোদ্‌ঘাটন। মহাকাব্য রচনার তীব্র স্পৃহা শেষ জীবন পর্যন্ত কবির চিত্তে ভাসমান ছিল, কিন্তু অন্তিম জীবনে তিনি মহাকাব্য রচনায় নিযুক্ত হ'তে পারেন নি। আজ জীবন-সায়াহ্নে সেই বহুবিচিত্র নিষ্ফল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেই ম্লান হতাশা ও ক্ষোভ একত্র হ'য়ে 'সমাপ্ত' কবিতায় জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। জীবনের রূঢ় আঘাত, কুটিল ঘূর্ণাবর্ত অন্তরের সমুদয় অনুরাগকে নিশ্চিহ্ন করে' দিয়েছে। জীবনের উৎস শেষ হ'য়ে আসছে অথচ কবির নিখিল বাসনা-কামনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কবিচিত্ত তাই নৈরাশ্যের সুস্পষ্ট ছায়াপাতে ম্লান হ'য়ে গেছে :

বিসর্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
( হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি ! )
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !

ব্যক্তি-জীবনের কান্না-হাসির কী অনবদ্য প্রকাশ !

'যশঃ' কবিতাও কবির অপরাহ্নিক জীবনের ম্লানতায় আবিল হ'য়ে উঠেছে। এখানেও কবির চিত্ত সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে বিচলিত। আজীবনের এই যে সাধনা, এই যে গান গাওয়া—এসব কী বৃথা ? কবিতাটির মর্মমূল হ'তে ব্যক্তি-হৃদয়ের এই ব্যাকুল প্রশ্ন উদ্বেল হ'য়ে ভেঙে পড়েছে :

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল তোর সাগরের তীরে?
ফেনচূড় জলরাশি আসি ফিরে ফিরে
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

মোটকথা "চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে "মেঘনাদবধ"-এর সেই প্রলয়ঙ্কর নিনাদ নেই, সেই উদাত্ত-গম্ভীর ভাব বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। "মেঘনাদবধ" কাব্য যেন অসংখ্য তার-সংযোগে গড়া অপূর্ব বীণাযন্ত্র, প্রতিটি তারে অপূর্ব ধ্বনির সুরময় স্পন্দন। সবার মিলনে যে ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে তা' অপূর্ব নিঃসন্দেহে—কিন্তু প্রতিটি তারের স্বতন্ত্র ধ্বনি সেখানে নেই। তাই এই সম্মিলিত তান আমাদিগকে আবেগ-উদ্বেল করে' তুললেও মনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" যেন একতারা—একটিমাত্র তার কাব্যের প্রাণ-স্পন্দনকে সুনিবিড় মায়াঞ্জন-স্পর্শে জীবন্ত করে' তুলেছে। তাই সরল সহজ সুরের সংগীত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" আমাদের সমগ্র চিত্তকে সুধাসিক্ত করে' তোলে। বিচিত্র সুর-ঝংকারের সমাবেশের জন্যে মহাকাব্যে কবিকে ছুটতে হয়েছে স্বর্গে-মর্তে, আকাশে-পাতালে—কিন্তু চতুর্দশপদীতে তা'র প্রয়োজন হয় নি। 'বৌ-কথা-কও', 'দেবদোল', 'সায়ংকাল,' 'সায়ংকালের তারা', 'নিশা', 'ছায়াপথ', 'তারা' ইত্যাদি অতি পরিচিত বিষয়গুলিই কবিতাবলীতে প্রাণস্পর্শে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। বাইরের ধ্যান-চিন্তা নয়—অন্তরের নিঃসীম কল্পনাই এ কাব্যের প্রাণসত্তা। মহাকাব্য তাই বাইরের উন্মাদ নর্তন, চতুর্দশপদী অন্তরের সুমহান্ সংগীত। মহাকাব্যে হয়েছে বহির্লোকের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের সুতীব্র আলোড়ন, চতুর্দশপদীতে ঘটেছে অন্ত-র্লোকের সুপ্ত ধ্যানধারণার ছন্দিত আন্দোলন। রণং দেহি "মেঘনাদবধে"র পাশে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাই নিভৃত মনের গান।

॥ তিন ॥

স্মৃতির রোমাঞ্চ-রঙীন স্বর্ণ-গোধূলির সাথে অবচেতন মানব-মনের এক সুনিবিড় রহস্যময় যোগ আছে। সুদূর অতীত দিনের ঘনায়মান স্মৃতিই কবির কল্পনায় বেগ দেয়। সাহিত্যজগৎ তাই স্মৃতিরই জগৎ। সাহিত্যের দিগন্তলীন সাম্রাজ্যে আমরা প্রধানতঃ স্মৃতি-প্রাসাদেরই অধিবাসী। তাই নিভৃত গৃহাঙ্গনে যখন আমাদের মন একান্ত শূন্য হ'য়ে পড়ে তখন স্মৃতি তা'র সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে, তা'র সমুদয় বর্ণ-গরিমা নিয়ে আমাদের চিত্তের ধূসর শূন্য প্রান্তরকে ব্যঞ্জনালোকে পরিপূর্ণ করে' তোলে। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" স্মৃতির এই বিরল সৌন্দর্যে দুষ্প্রাপ্য সুন্দর। সমগ্র গ্রন্থখানি স্মৃতির লীলা-বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্যের দিগন্ত স্পর্শ করেছে। পাঠকালে স্মৃতির মৃদু মৃদু স্পন্দনে আমাদের সমগ্র সত্তা কম্পমান হ'য়ে ওঠে। স্মৃতিই যেন পাঠকের মানসলোকে এক আশ্চর্য মনোহর বিপুল জগতের রূপে উজ্জ্বল, সে জগৎ মনোহর।

কবির নিভৃত মনের গহনচারী স্মৃতিগুলি আপন খেয়াল খুশীর আমেজে মেতে উঠেছে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ইত্যাদি স্ব-প্রীতিমূলক কবিতাগুলির মাঝে। স্বদেশ এবং স্ব-সংস্কৃতির প্রতি কবির যে একটি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র বহুতর কবিতার প্রাণস্পন্দনে তা'র নিগূঢ় বার্তা ধ্বনিত হয়েছে। সুদূর ফরাসী দেশের ভর্‌সেলস্ শহরে বসে লেখা কবিতাবলীতে তাই ফরাসীদেশের বরফপাতের কোন সৌন্দর্য বর্ণনা নেই, উইলো বৃক্ষের পত্রপল্লবের সকল নৃত্য বৃথা, কবিপ্রিয়া ডেফোডিলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কী চরম নিষ্ফলতা! এমন কী স্কাইলার্ক কিংবা শোয়ালো পাখীও তাদের অমৃতনিষ্যন্দী সংগীত-সুষমায়

কবিচিত্তকে জয় করতে পারে নি। প্রকৃতির এই অপরিসীম বর্ণবেগ-মনোহারিত্বের সকল গরিমা ভেদ করে' কবির চিত্তে ভেসে উঠেছে গহনচারী স্মৃতিসত্তার অনবদ্য আন্দোলন; শ্যামলিমার আচ্ছাদনে শ্যামাঙ্গ-উজ্জ্বল বঙ্গভূমির অপরূপ ধ্যানমূর্তি। তাই ফ্রান্সজাত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে দেখি বরফপাতের বদলে নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার নীরব পদসঞ্চার, উইলো বৃক্ষের চঞ্চল ছায়ানৃত্যের স্থলে বিশাল বটবৃক্ষের বিপুল পত্রপল্লবের সঘন আলোড়ন, ডেফোডিলের সকল সৌন্দর্যকে ম্লান করে' ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে কেতকী-শেফালীর চিরস্নিগ্ধ হাসি। এমন কি বাঙালী গৃহপ্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ছায়া-ঢাকা বৃক্ষান্তরাল হ'তে ছোট্ট হলুদ পাখীর 'বৌ-কথা-কও' সুরেলা মধুর আহ্বানটি স্কাইলার্কের সকল মহিমাকে ম্লান করে' দিয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুমেরু-শিখর কিংবা পৃথিবীর যে কোন দূরতম প্রান্তে বসে যখনই আমরা ছায়া-সুনিবিড় বৃক্ষান্তরালবর্তী এই ছোট্ট পাখীটির ডাক শুনতে পাই, তখনই আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ দুরতিক্রমী সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে শ্যামল বাংলার চরণপ্রান্তে সসম্ভ্রমে নত হ'য়ে পড়ে। দূরত্বের কোন ব্যবধান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন আবরণ, কবির ধ্যান-স্বপ্নকে ম্লান করে' দিতে পারে নি। তাঁ'র গহন মনের অন্তরাল দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত স্বদেশপ্রেমের যে অখণ্ডধারা দুরন্ত আবেগে প্রবহমান ছিল—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সেই নিঃসীম প্রাণাবেগেরই বাঙ্ময় রূপায়ণ। "ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি"র যে সুমহান্ ছবি কবির অন্তঃপ্রকৃতির মাঝে আশৈশব ছায়াপাত করেছে, কপোতাক্ষের প্রভাত-সন্ধ্যার যে বিশাল রূপৈশ্বর্য চিত্তের গহনতম প্রান্তে স্বর্ণরেখার মত ছড়িয়ে পড়েছে—কেবল ফ্রান্সে কেন স্বর্গের অমৃতবাহী নিকুঞ্জের মাঝে অবস্থান করেও এই স্বপ্নমন্থর সোনালী দিনকে ভোলবার দুঃসাহস কবির নেই। এই চিত্র যে সাগরমন্থন নিটোল মুক্তা। তাই যশোলিপ্সার উন্মাদ স্পৃহায় কবি স্বদেশ ত্যাগ করে' যখন বিদেশে ছুটে গেছেন—

স্মৃতি-অবগাহী এই চিত্রগুলিও তাঁ'র সঙ্গ ছাড়ে নি। এবং এই চিত্রগুলি বিদেশে কবির নিঃসঙ্গ জীবনে অপূর্ব আলোড়ন এনেছে। প্রিয়জন দূর প্রবাসে চলে গেলে তা'র স্মৃতি, তা'র প্রেম আমাদের চিত্তকে অধিকতর নিবিড়তায় আকর্ষণ করে। নিত্য দিনের সঙ্গসুখে মিলনের পরিপূর্ণতায় যে অমৃত-স্পর্শ অনুভব করা যায় না, দূরত্বের ব্যবধানে, বিরহের মাঝে তাই শত ভাব-ব্যঞ্জনায় বিমূর্তরূপ পরিগ্রহ করে। দূর-প্রবাসে প্রিয়জন স্মৃতি-আশ্রয়ী। স্মৃতির পটভূমিতে সে অধিকতর মনোহর। দিবসের তীব্রোজ্জ্বল সূর্যালোকে যা'র কোন বিশেষ রসমূর্তি আমাদের চোখে পড়ে না রাত্রির অস্পষ্ট কুহেলীতে তাই বিস্ময়-রঙীন দোসরহীন অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠে। ব্যবধান এই অস্পষ্ট আবরণের সৃষ্টিকারী। ফ্রান্সের দূর-প্রবাসে বিসর্জিত হ'য়ে কবিচিত্তেও এমনি এক আবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। বন-সবুজ বাংলাকে দীর্ঘদিন ছেড়ে থাকায় কবির চিত্ত কপোতাক্ষের তীরভূমি দেখার জন্যে ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল—তার উপর প্রবাসের নানা অসহনীয় অভাব-অভিযোগ তাঁ'র এই আকর্ষণকে তীব্রতর করে' তুলেছিল। অর্থাভাবের তীব্র কশাঘাতে ক্লান্ত দেহ বাংলার শ্যামল মৃত্তিকা-স্পর্শের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। ঐ ছায়াচ্ছন্ন ছোট্ট গৃহগুলিতেই যেন অঢেল প্রেমের সুমধুর প্রলেপ। তাইতো বাংলার জন্য কবির স্মৃতিচারী মন ব্যাকুল। ক্লান্তদেহে সজল নয়নে তাই কবি ব্যাকুল হ'য়ে গেয়ে ওঠেন :

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

বহুদেশের বহু নদ-নদীতে কবি পাড়ি জমিয়েছেন, ভ্রমণের ব্যাকুল নেশায় ঊর্মিমুখর দিগন্তলীন সমুদ্রের অন্য তীরেও পদসঞ্চার করেছেন কিন্তু কুলকুলনাদী সেই যে ছোট্ট কপোতাক্ষ নদ—কী অমোঘ তার আকর্ষণ, কী বিপুল শান্তি তার উভয় তীরে! সে শান্তির অমিয় স্পর্শ দেবে কে ?

বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।

এই যে আবেগবাহী বর্ণনা এ তো কেবল কাব্যের খাতিরে ঘটে নি, এ যে কবির অন্তরবাণী, বিরহী অন্তরের করুণ ক্রন্দন, স্বদেশপ্রীতির বাঙ্ময়-প্রকাশ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে, সুনীল নভে তারকারাজির বিচিত্র সঞ্চারণ—ভর্‌সেলস্ শহরের এই দৃশ্যে কবির চিত্তে ভেসে উঠেছে নদীর তীরভূমে ভগ্ন শিবমন্দিরের ঘনায়মান অন্ধকার আর 'নূতন গগনে যেন নব তারাবলী'র অভিনব স্পন্দন। স্বদেশের তৃণলতা, পক্ষী প্রভৃতি সকলের সাথে কবির যে আত্মিক প্রেমঘন যোগ ছিল 'বটবৃক্ষ', 'বৌ-কথা-কও' প্রভৃতি কবিতা সেই স্বীকৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

স্বজাতিপ্রীতির অভিনব প্রকাশ "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আর একটি মূল্যবান সম্পদ। এই অত্যাশ্চর্য সনেটগুচ্ছের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সনেট স্বজাতিপ্রীতির বার্তা বহন করে' চলেছে। বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি কবির কী নিবিড় আকর্ষণ! বাংলার মনীষী, বাংলার কবির প্রতি তাঁ'র কী গভীর শ্রদ্ধা! এর পালা-পার্বণের প্রতিই বা তাঁ'র কী নিঃসীম নিষ্ঠা! এই সকল আকর্ষণ, এই সকল শ্রদ্ধা, সকল নিষ্ঠা, অস্ফুট কলগুঞ্জনে কবির স্বদেশপ্রীতির সুগভীর আন্তরিকতাকেই মহিমান্বিত করে' তুলেছে। বাংলাভাষাকে ত্যাগ করে' "পরধন লোভে মত্ত" হওয়ার সুতীব্র বেদনাবোধ আমরণ কবির বুকে বজ্রশেল হ'য়ে বিঁধেছে। এই পরিতাপের কথা তিনি অসংখ্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন। 'কাশীরাম দাস', 'কৃত্তিবাস', 'জয়দেব', 'কালিদাস', 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি কবিতায় মধুসূদন বাংলার কবি মনীষীদের প্রতি যে ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা' কবির স্বজাতি-প্রীতির চরম আলেক্ষ্য। এই কবিতাগুলির অদৃশ্য যোগসূত্রের পথ বেয়ে কবির অন্তরের নিঃসীম শ্রদ্ধা ও আকূতি স্বজাতিপ্রীতির চরণ-

প্রান্তে উজাড় হ'য়ে পড়েছে। এছাড়াও বাংলার ছোট ছোট পালা-পার্বণকে কেন্দ্র করে' সুদূর ফরাসীর বুকে বসেও কবির চিত্তে যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে তা'কে কোনক্রমেই স্বদেশপ্রীতির দিগন্ত হ'তে বহিষ্কার করে' দেওয়া চলে না। এই ছোট ছোট ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে কষ্টিপাথরের বুকে মনোরম স্বর্ণালিম্পনের মত কবিচিত্তের স্বজাতিমুখীনতা অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করলেও স্বধর্মের প্রতি কবির যে একটি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র অনেকগুলি কবিতায় তা'র পরিচয় পাই। 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিজয়াদশমী', 'আশ্বিন মাস', 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যে এই পরিচয় বিমূর্ত হ'য়ে উঠেছে। নিভৃত মনের ধ্যান-কল্পনার কী ব্যঞ্জনগর্ভ প্রকাশ! দূর-প্রবাসের বেদনাবিধুর দিনগুলিতে সুদূর বাংলাদেশের প্রতিটি মাসের মনোরম মাধুর্য কবির অন্তর্লোক স্পর্শ করে' গেছে। পূজাপার্বণের দিনগুলিতে তাই কবির চিত্ত অভিনব ভাবাবেগে আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। তাঁ'র ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে শান্ত বাংলার সেই উৎসমুখর পূজাপার্বণের মধ্যে যোগ দিতে—কিন্তু কোথায় সেই তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল বাংলার কোমল অঙ্গ? আশ্বিন মাসের আগমনে কবিচিত্তে নিঃশব্দে নেমে আসে কী অপরিসীম বেদনা-বোধ! দুর্গাপূজার অসীম আনন্দ-গীতি, প্রতিমার বিচিত্র সৌন্দর্য-কল্পনা কবির চিত্তকে নেপথ্যালোক হ'তে দুর্নিবার আকর্ষণে ক্রন্দন-ফেনিল করে' তোলে। সুদীর্ঘ একটি বছরের দুঃসহ বিরহের পর আজ আবার বাঙালীর ঘরে ঘরে হয়েছে স্নেহদুলালী উমার পদ-সঞ্চার। তাই: "সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।" "বিজয়া-দশমী" তিথিতে নিখিল বাংলায় যে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয় এই কবিতার অল্প পরিসরে সেই অতলস্পর্শী বিরহ সুতীব্র নিপুণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। উমাকে হারাবার আশঙ্কায় কবিচিত্ত বেদনা-বিহ্বল। তাই নবমীনিশার প্রতি তাঁ'র অন্তিম আকূতি:

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যাবে!"

এ কবিতায় নিখিল বাঙালী-মানসের সাথে কবিমানস শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে মিলিত হয়েছে। 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'শ্রীপঞ্চমী' ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যেও হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার অবিরল বারিধারার মত নিঃশব্দে প্রপতিত হয়েছে। মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েছিলেন—কিন্তু 'এহ বাহ্য'। আসলে তাঁ'র অন্তরে আবাল্য-লালিত যে ধর্ম ও সংস্কৃতির বীজ রোপিত হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে বিশাল বিটপীতে পরিণত হয়েছিল—পত্রপল্লব-ঘেরা ছায়াঘন সেই বিটপীর শান্তছায়ায় কবির আত্মা শান্তির স্পর্শ পেয়েছে। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন লিখেছেন: "My real feeling is Hindoo." এই Real Hindoo feeling কবিকে বার বার বাংলার সরস মৃত্তিকার মাধুর্যরস সঞ্চিত শান্ত জীবনযাত্রার দিকে আকর্ষণ করেছে। এবং সেজন্যেই নিয়তির মত অনিবার্য কারণে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র মাঝে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্মের প্রতি গভীর আন্তরিক প্রীতি বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডাঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কবিতাগুলিকে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক বিচার বিশ্লেষণ করে এগুলিকে স্বদেশ-স্বধর্ম-স্বজাতি ভাবধারা প্রকাশের পটভূমিকায় না দেখে কাব্যরসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁ'র মতে স্বধর্ম-স্বজাতি অপেক্ষা কাব্যরসই হ'লো এ কাব্যের প্রাণসম্পদ। কবিদৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই কবির কাছে 'নিশাকালে নদীর তীরে 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' পরম রহস্যের আবরণে মোড়া, 'আশ্বিন মাস' তাই হৃদয়াবেগে রোমাঞ্চিত। আপন শিশুকন্যার প্রতি কবির যে বাৎসল্য প্রেম স্নেহদুলালী উমাকে সেই প্রেমের মাধুর্যালোকে দেখেছিলেন বলেই 'বিজয়াদশমী' অনন্যসাধারণ। উদার কবিদৃষ্টির অন্তরালে যে আর এক মধুর স্মৃতির কথা

ডক্টর দাসগুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন তা' উদার কবিজনোচিত মহৎ চিন্তাধারার প্রতীক। অন্ততঃ এইভাবে দেখলে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কবিতাগুলি স্বজাতি ও স্বধর্মের সীমিত গণ্ডি হ'তে মুক্তি পেয়ে উদার সংস্কারমুক্ত দিগন্তলীন মুক্তপ্রান্তে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু তবুও কবিতাগুলি যে কেবলমাত্র কবিদৃষ্টিজাত ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই ভাবসম্পদের অন্তরালে যে স্বজাতি-স্বদেশ-স্বধর্মের কোন ভাব-প্রেরণাবেগ সঞ্চার করে নি এমন কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে হয় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র সনেটগুলির কোমল বক্ষ কবিদৃষ্টি এবং সংস্কার এই উভয়ের সংমিশ্রণে চিরসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। কেবলমাত্র কবিদৃষ্টি দিয়ে "বিজয়াদশমী"র মত অশ্রুসিক্ত কবিতা লেখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস যদি পরম বৈষ্ণব না হতেন তা' হ'লে তাঁ'র কবিতার মধ্যে কখনো শাশ্বতকালীন করুণ ক্রন্দন শোনা যেত না। বৈষ্ণবের পরম হৃদয়াবেগের সাথে বিরল কবি বৈশিষ্ট্যের মহান সম্মিলন ঘটেছিল বলেই চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেমপাগল পথিকের অশ্রুসজল ইতিহাস। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তেও হৃদয়াবেগের সাথে কবি বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠতম মণিকাঞ্চন সংযোগ সাধিত হয়েছে। সাধারণ বিষয় নিয়ে কবি যে-সকল কবিতা লিখেছেন সেগুলির মধ্যে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি।—কিন্তু যে কবিতাতে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্ম এবং স্ব-সংস্কৃতির স্পর্শ আছে সেখানেই কবি সরব, উচ্চকণ্ঠ এবং আবেগোন্মত্ত। এই অন্তরবাহী আবেগোন্মত্ততায় কবিতাগুলি এক বিশেষ রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে। তাই "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আঙ্গিক বৈচিত্র্যে কবিদৃষ্টির সকল কিছু স্বীকার করে' নিয়েও স্বদেশ-স্বজাতির প্রভাবকে কোন-ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কবিতাবলীর মর্মমূল ভেদ করে' স্বদেশপ্রেমের ফল্গুধারা দুরন্ত আবেগে প্রবহমান। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্মের প্রেম-প্রীতি আলোচনার এক বিরলদৃষ্ট মূল্যবান সংযোজনা।

॥ *চার* ॥

মধুসূদনের পদ্যরীতি সুকর্ষিত। বাক্‌বিন্যাসের সুতীক্ষ্ণ আলাপ-চারণায় তাঁ'র কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। সুসামঞ্জস্য শব্দ-প্রয়োগে এবং উপমা ও অলংকারের বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল বিন্যাসে তাঁ'র কবিতা দুর্লভ রমণীয় অনন্যসাধারণের কোঠায় পদার্পণ করেছে। উপমা প্রয়োগে মধুসূদন যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির কাব্যে তা'র আভাস লক্ষ্য করা যায়। কবির অন্যান্য কাব্যের মত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"-ও উপমা অলংকারের যথাযথ বিন্যাসে অভিনব হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই উপমা অলংকারগুলি দূরতিক্রমী পর্বতশৃঙ্গের মত মস্তক উত্তোলন করে' যে কাব্যের সাবলীল গতিতে বাধাদান করে নি তা' নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমাগুলি হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত তীব্রোজ্জ্বল হ'য়ে কাব্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করেছে।

প্রকৃতির দিক থেকে উপমাগুলি পুরাণানুগ—রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি বহু পুরাণ গ্রন্থ থেকে কবি উপমাগুলি সংগ্রহ করেছেন। প্রাকৃতিক কিংবা অন্যান্য বিষয়ের উপমা যে কবির কাব্যে নেই তা' নয়—কিন্তু সে-সকল ছাপিয়ে পুরাণানুগ উপমার দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কী মেঘনাদবধ, কী তিলোত্তমাসম্ভব, কী চতুর্দশপদী কবিতাবলী সর্বত্রই এই জাতীয় উপমা অলংকার আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তো পুরাণেরই খণ্ডচিত্র। বহুবিখ্যাত "কাশীরাম দাস" কবিতার প্রথমেই কবির উক্তি এই :

> চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিল যেমতি
> জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,···

বলাবাহুল্য এ উপমা মহাভারত হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে। "কৃত্তিবাস" কবিতায় রামায়ণ হ'তে যে উপমা নেওয়া হয়েছে তা' এই :

…ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীতলহরী ;

"নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির" কবিতার প্রথম লাইন :

রাজসূয় যজ্ঞে যথা রাজদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; ··

এমনি করে' অসংখ্য পুরাণ গ্রন্থের ঘটনাকে কবি উপমা হিসেবে গ্রহণ করেছেন 'চতুর্দশপদী'র সর্বত্র। প্রায় প্রতিটি কবিতায় পুরাণ গ্রন্থের কোন না কোন খণ্ডচিত্রের আভাস পাওয়া যায়। পুরাণ গ্রন্থগুলি কবিমানসে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এই উপমাগুলি তা'র সফলতম দৃষ্টান্ত। কেবল উপমাই নয় চণ্ডীমঙ্গল-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদির বহু ঘটনাকে কবি মূল-কাব্যের বিষয়ীভূত করেছেন। 'কমলে-কামিনী', 'ঈশ্বর পাটনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'গদাযুদ্ধ', 'সীতা-বনবাসে.' 'সুভদ্রা-হরণ', 'উর্বশী', 'পুরুরবা', 'হিড়িম্বা', 'সুভদ্রা' ইত্যাদি কবিতাগুলি পৌরাণিক চিত্র-গরিমায় অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

'চতুর্দশপদী'তে আরো অনেকগুলি কবিতা আছে যেগুলি জাতকুলের অতীত। এর মধ্যে কতকগুলি নীতিমূলক জাতীয় কবিতা বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বটবৃক্ষ', 'দ্বেষ', 'কুসুম-কীট', 'শ্মশান' ইত্যাদি কবিতাগুলি বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। 'শ্মশান' কবিতায় বাঙালী-মানসের চিরবৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে :

কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীরবাসী
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।

ঈশ্বরের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যে কবি কয়েকটি সনেট লিখেছেন— তন্মধ্যে 'সৃষ্টিকর্তা' এবং 'সূর্য' কবিতা বিশেষ আকর্ষণীয়। 'সৃষ্টিকর্তা' কবিতায় বিশ্বসৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানার জন্যে কবি ব্যাকুল :

কে সৃজিল এ সুবিশ্ব, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" অসংখ্য ধ্যানধারণার চিত্রে সমুজ্জ্বল। কিন্তু প্রত্যেক ধ্যানধারণাই কবিতার গণ্ডিতে যথার্থভাবে রূপায়িত হ'তে পারে নি। কোন কোন ধ্যানধারণা শিথিল বাক্‌বিন্যাসে ম্লান। কোন কোন ধ্যানধারণা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ঢক্কানিনাদে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। তবুও যে-সব কবিতায় কবির অন্তরাবেগ সরল সহজ হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে, সার্থক কবিতা হিসেবে সেগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রজ্ঞাদীপ্তিতে এবং কলানিপুণতায় গহনচারী স্মৃতিকল্পনাবাহী কবিতাগুলি তীব্রোজ্জ্বল দীপালোকের মত জ্বলেছে অনির্বাণ। আঙ্গিক বৈচিত্র্যে এবং হৃদয়াবেগসিক্ত নিভৃত মনের সংগীত-সুষমায় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" সার্থক এবং সফলতম। এই শ্রেণীর কবিতাবলীতে কবির জীবন-সায়াহ্নের পূরবীর ধ্বনি করুণ হ'য়ে বেজেছে।

# কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবিধ প্রবন্ধ

## ॥ এক ॥

সর্বশ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়-বিলয়ের সুবিস্তৃত কালপরিধিটুকু উনিশ-শতকী রেনাশার সুবিপুল উন্মাদনা এবং নব জাতীয় জাগরণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল স্বর্ণরেখার মত সম্প্রসারিত। একদিকে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক গোঁড়ামী ও ভণ্ডামির কারাপ্রাচীর ভেদ করে' ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে উদ্যত, অন্যদিকে কুসংস্কার ও অন্ধতা সংহারিণী মূর্তিতে তার পথরোধ করতে উদ্ধত-ফণা—এই উভয়বিধ আপাতঃ বিরোধ ও বিরূপতার মাঝে বঙ্কিম-মানস লালিত হয়েছে। কিন্তু এই উভয়বিধ বিরোধের কোনটাই বঙ্কিমচন্দ্রকে উগ্রতার তীব্রঝাঁজে অন্ধ করে' দিতে পারে নি—উনিশ শতকের প্রশ্নচঞ্চল সংঘাতসংকুল বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের সদর্প কণ্ঠ ও প্রত্যয়নিষ্ঠ পদক্ষেপ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। "কমলাকান্তের দপ্তর" এবং "বিবিধ প্রবন্ধ" এই দুই খ্যাত গ্রন্থ সেই সুস্পষ্ট পদচিহ্নের বাণী-বন্দনা।

স্তরবিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধশ্রেণী বহু বিভক্ত—সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বহু বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে এই সমুদয় সৃষ্টি দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন বহির্জীবনের কথা অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁ'র অন্তর্জীবনের ধ্যানচিত্র। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য প্রশ্ন, তর্ক করেছেন তার্কিকের মত, বিচার করেছেন নৈয়ায়িকের উচ্চাসনে বসে এবং সর্বোপরি এই সকল তার্কিকতাত্ত্বিকতার সার নিষ্কাশন করে' আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ও মনের উপরে দিয়েছেন জটিল

প্রশ্ন সমাধানের অভ্রান্ত ইশারা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আপন ধ্যান-কল্পনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল বিশ্বের বুকে, প্রশ্নসংকুল জিজ্ঞাসায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহির্লোকের এই বিক্ষিপ্ত ধ্যানচিন্তাকে সংযত করে' নিয়ে গিয়েছেন অন্তর্লোকের রোমাঞ্চ-রঙীন মায়াভূমিতে—কল্পনার রামধনু হ'তেই তিনি সংগ্রহ করেছেন এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বর্ণসম্ভার এবং রূপৈশ্বর্য। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ, অতি ক্ষীণ এবং তুচ্ছ—তবুও সেই নগণ্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে' আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি বঙ্কিমচন্দ্র উর্ণনাভের মত কল্পনার জাল বয়ন করেছেন। তুচ্ছ বিষয়বস্তু একেবারেই তুচ্ছতায় পরিণত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার অন্তরাল হ'তে প্রধান হ'য়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস। তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের গোপনতম কথা ও অনুভূতিগুলি যেন এই শ্রেণীর প্রবন্ধাবলীতে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। পঙ্কে জন্মগ্রহণ করেও সকলের অলক্ষ্যে পঙ্কজ তা'র দেহ হ'তে সমুদয় মালিন্য ঝেড়ে ফেলে দলগুলিকে মেলে ধরে নীল আকাশের উদার বিপুল অসীমতায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এমনি করেই তাঁ'র কল্পনার শতবর্ণ-দীপ্ত দলগুলিকে মেলে ধরেছেন পাঠকের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে।

"বিবিধ প্রবন্ধ" এই প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের অন্তর্গত আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের মর্মনির্যাস নিয়ে গড়ে উঠেছে "কমলাকান্তের দপ্তর"। এই দুই মহাসৃষ্টি তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বিশেষ দিকের সীমাদর্শী হ'য়ে আছে।

"বিবিধ প্রবন্ধে" বঙ্কিমচন্দ্র গবেষক, চিন্তাশীল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে গভীর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে পরিশীলিত হ'য়ে প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আবেগ-বিরল তথ্যদর্শী হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তিহৃদয়ের গোপন কথা নয়—একটা সমগ্র দেশ এবং জাতির উত্থান-পতনের চিন্তাভাবনাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সূতিকাগার। একটি স্থিরপ্রজ্ঞ বিচারক সত্তাই এই

সকল প্রবন্ধে প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি আদর্শ দেশ এবং জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব যেন বঙ্কিমচন্দ্র "বিবিধ প্রবন্ধে" সম্পন্ন করেছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র গুরু, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তানায়ক। ব্যক্তিত্ব নয়—নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকাশেই "বিবিধ প্রবন্ধ" বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু "কমলাকান্তের দপ্তরে" প্রধান হ'য়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব। লিরিকের লাবণ্যলহরীতে "কমলাকান্তের দপ্তর" অনন্যসুন্দর। রূপদ্রষ্টা এবং রূপস্রষ্টা এখানে এক হ'য়ে মিশেছে। প্রত্যেকটি রচনা মন্ময়ধর্মী, আত্মকেন্দ্রিক—Subjective। এ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মাধীন বিচারক নন—বন্ধনহীন শিল্পী, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নন—রূপমুগ্ধ কবি। আপন মনের চিন্তাভাবনা তাই লিরিকের সুকোমল সুরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। এখানেই "বিবিধ প্রবন্ধের" সাথে "কমলাকান্তের দপ্তরে" পার্থক্য-কৌণিকতা রচিত হয়েছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' যেখানে কেবলমাত্র প্রবন্ধই 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেখানে নিরস প্রবন্ধের দিগন্ত অতিক্রম করে' সাহিত্যের রসলোকে করেছে পদসঞ্চার।

॥ দুই ॥

"কমলাকান্তের দপ্তর" কবি এবং শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যের দিক ছাড়াও "কমলাকান্তের দপ্তরে"র আর একটি বিশেষ দিক হ'লো এর হাস্যরস। হাস্যরস অফুরন্ত ধারায় এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ঋষি এবং নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ওষ্ঠাধরের অন্তরালে যে হাস্যরসের অফুরন্ত আবেগ ও লঘু চাপল্য লুকিয়ে ছিল "কমলাকান্তের দপ্তর" না পেলে আমরা হয়তো তা' কোন দিনই বিশ্বাস করতাম না। হাসির অনাবিল স্রোতে দোল খেয়ে প্রত্যেকটি কথা ও মন্তব্য একান্ত সজীব এবং প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ হাস্যরসকে চার স্তরে ভাগ করেছেন—Satire, Pun, Wit এবং Humour। এই চার স্তরের হাস্যরসের

মধ্যে প্রধান হাস্যরস হ'লো হিউমার বা করুণ হাস্যরস। "কমলাকান্তের দপ্তরে"র অধিকাংশ সৃষ্টি করুণ হাস্যরসের অনবদ্য সংযোজনায় ভাস্বর। সকল আপাতঃ বিরূপ মন্তব্য ও আঘাত হাস্যরসের স্নিগ্ধধারায় সিক্ত হ'য়ে কোমল এবং মধুর হ'য়ে উঠেছে। আঘাত এবং আনন্দ, হাসি এবং বেদনা এই পরস্পর-বিরোধী ভাবরসের একত্র সংযোজনায় "কমলাকান্তের দপ্তর" দুষ্প্রাপ্য মনোহরের কোঠায় পদার্পণ করেছে।

হাস্যরস "কমলাকান্তের দপ্তরে"র একটি বিশেষ দিক হ'লেও হাস্যরসের তরল প্রবাহেই দপ্তরের মূল বক্তব্যটি পরিসমাপ্ত হয় নি—এই তরল হাস্যপ্রবাহ সুকঠিন তটরেখায় আবদ্ধ হ'য়ে দার্শনিক তত্ত্ব-সাগরের মোহনায় দিক হারিয়েছে। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর তত্ত্বকথা পরিবেশন করাই আপাতঃ মূঢ় কমলাকান্ত শর্মার মূল লক্ষ্য এবং এখানেই ছন্নছাড়া কমলাকান্ত শর্মার সাথে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট ভেদরেখা গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য—"কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিরূপের মধ্যে একটা বিরোধিতা যে লক্ষ্য করা যায় তাহা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল ব্যক্তিত্ববান, প্রখর মর্যাদাসম্পন্ন সদাসক্রিয় এবং কথায় ও আচরণে কঠোর সংযমনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, নেশাখোর কমলাকান্তের সংগতি কোথায়? কিন্তু সংগতি না থাকিলেও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য জীবনের অভিনব রস সন্ধানী হইয়া তাঁহার ভদ্র মার্জিত নিয়ম ও সংযম-বর্দ্ধিত আত্মস্বাতন্ত্র্যের নির্মোক খুলিয়া ফেলিয়া জীবনে উপেক্ষিত, অসংলগ্ন ও ধূলিলিপ্ত স্তরে নামিয়া আসিলেন। বিচারক কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। শাসনের দণ্ডটি কৌতুকের যাদুদণ্ড হইয়া পড়িল; সেই তীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল এবং চাপা অধরোষ্ঠের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ হাসির প্রসন্ন দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল।"

কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের আপাতঃ বিরোধ ও বিরূপতার মাঝেও যে একটি একাত্মতা ছিল উপরের আলোচনা হ'তে তার আভাস আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলাকান্ত উভয়েই জীবন সম্পর্কে গভীর তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন—কিন্তু এই তত্ত্বকথার পরিবেশন-স্তর পৃথক্। বঙ্কিমচন্দ্র গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্ববান, কমলাকান্ত ব্যক্তিত্বহীন এবং উদাসীন। যুক্তিতর্কের নিশ্ছিদ্রজাল বিস্তার করে' যে তত্ত্বকথা বঙ্কিমচন্দ্র গাম্ভীর্যদীপ্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন তদপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বপূর্ণ কথা কমলাকান্ত ছন্নছাড়া নির্বোধের সাজে আমাদের গহন চিত্তদ্বারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

সদাজাগ্রত বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে অবলোকন করলে বুঝি অনেক গভীরতর সত্যই সে দৃষ্টির বাইরে রয়ে যায়। জীবনের প্রকৃত সত্য ও রহস্যজাল ভেদ করার জন্যে যে দৃষ্টির প্রয়োজন তা' অনেকখানি অসতর্ক ও উদাসীন মনের দান। কমলাকান্ত তাই নেশাখোর—আফিম আর একটু দুধ তাঁর প্রধান সম্বল। জগতে আফিম ও দুধ ছাড়া তিনি আর কিছুরই সন্ধান রাখেন না। দুধের জন্য তিনি আরো দুটি জীবের সন্ধান রাখেন—প্রসন্ন গোয়ালিনী আর মঙ্গলা গাভী। দুধ চুরির ব্যাপারে তিনি আরো একটি জীবের সাথে পরিচিত—সে বিড়াল। এই তিনটি জীব ছাড়া সজ্ঞানে পৃথিবীর আর কোন কিছুর সাথে তিনি পরিচিত নন। আফিম খেয়ে ঝিমানোর সময় যত সব উদ্ভট এবং অসংলগ্ন উক্তি তাঁ'র মুখ দিয়ে বা'র হয়। এই ছন্নছাড়া, সংসারবিমুখ, আপাতঃ মূঢ় কমলাকান্ত সাধারণ সমাজ-জীবনের ব্যতিক্রম। এখানে সাধারণভাবে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—কমলাকান্তকে এভাবে নির্বোধ ও নেশাখোরের মত চিত্রিত করার সার্থকতা কোথায়? আমরা পূর্বেই বলেছি সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখলে সে দৃষ্টিতে অখণ্ড সত্য-স্বরূপ ধরা পড়ে না—অনেক কিছুই প্রচ্ছন্ন রয়ে যায়। সংসারের গণ্ডিচক্রে আবদ্ধ থাকলে বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে চলার গতিই প্রধান হ'য়ে ওঠে—

জীবনের সত্য-স্বরূপ নয়। এই অভ্রান্ত সত্যের উপলব্ধির জন্যে নিজেকে চলার বেগ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে' গতিহীন পথপ্রান্তে রাখতে হয়। কমলাকান্ত তাই চলমান জীবনপ্রবাহ হ'তে বিচ্ছিন্ন। জীবন হ'তে আপাতঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তিনি লাভ করেছেন জীবনের অভ্রান্ত মর্ম, নিগূঢ় বার্তা-নির্যাস। সংসারবিমুখতা ছাড়াও কমলাকান্তকে অর্ধোন্মাদ করে' সৃষ্টির পিছনে মিশে আছে সুকৌশলী শিল্পীর অতি সাবধানী মন। জীবনের যে অভ্রান্ত উপলব্ধির কথা ঋষি ও নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না—সেই মর্মবাণী প্রকাশের জন্যে তাঁকে বাধ্য হ'য়ে নেশাখোর অর্ধোন্মাদ কমলাকান্তের স্মরণ নিতে হয়েছে। সোজাসুজি, সজ্ঞানে এবং স্পষ্টভাবে বিচারক বঙ্কিম যে কথা বলতে সংকোচবোধ করতেন সেই কথাই তিনি রহস্যময় পাগলের মুখ দিয়ে তরল হাসির প্রবাহে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিয়েছেন। প্রথম দর্শনে কমলাকান্তের প্রতি আমাদের মনে 'আহা বেচারা' জাতীয় এক উপহাস-লাঞ্ছিত করুণার উদ্রেক হয়। যত তুচ্ছ ও উদ্ভট জীবের সাথে তাঁর সম্বন্ধ—প্রসন্ন গোয়ালিনী এলে তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েন, বিড়ালের ডাক তাঁর পৃষ্ঠে তীব্র আঘাত হানে এবং এই সময় একটু আফিম পেলে তো আর কথাই নেই। কর্মমুখর জনপ্রবাহ যখন চার পাশের অসংখ্য কর্মের চাপে বিভ্রান্ত সেই কর্মক্লান্ত মুহূর্তে কমলাকান্তের নেশা চরমে ওঠে—আরাম-কেদারায় উপবেশন করে' তিনি নিশ্চিন্তে ঝিমান। এ ছাড়াও অফিসে বড় সাহেবের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত না থেকে যখন তাঁ'কে হিসাবের দামী কাগজপত্রে কবিতা লিখতে ও ছবি আঁকতে দেখা যায় তখন সংসারাসক্ত ও আত্মসুখান্বেষী লোকের কাছে তিনি নিছক হাস্যাস্পদ হ'য়ে পড়েন। এইসব আপাতঃ ঔদাসীন্যের উপরেও তাঁ'র কথাবার্তায় এমন সব স্থূলতা প্রকাশ পায় যে সাধারণের নিকট হ'তে উপহাস ছাড়া তিনি আর কিছুই আশা করতে পারেন না। সকল বক্তব্যের প্রথমে এই স্থূলতার আবরণে হাস্যরসের অবতারণা

করাই কমলাকান্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—কিন্তু এই স্থূল হাস্যরসের অবতারণাই সব নয়—এই স্থূলতাকে অতিক্রম করে' অতি সূক্ষ্ম জীবন-জিজ্ঞাসার মর্মতটে পাঠকের চিত্তকে সঞ্চারমান করে' দেওয়াই কমলাকান্তের মূল লক্ষ্য। প্রথম দিকে তাঁর আপাতঃ স্থূল কথাবার্তায় আমরা হেসে উঠি সত্য—কিন্তু এই স্থূল কথাবার্তা গভীর জীবন-দর্শনে পরিণত হ'য়ে যখন আমাদের চিত্তকে চিরে-ফেড়ে বিমোথিত করে' মর্মলোকে পৌঁছায় তখন আমরা অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক্ ও নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়ি। কমলাকান্তের প্রতি আমাদের যাবতীয় অবজ্ঞা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়, তাঁ'র প্রতি নিক্ষিপ্ত উপহাস-বাণ জীবন-দর্শনের সুকঠিন তটে প্রতিহত হ'য়ে পুনরায় আমাদেরই বক্ষে এসে আঘাত হানে। আমরা তখনই স্পষ্ট বুঝি কমলাকান্তের স্বরূপ, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তখনই আমাদের শ্রদ্ধানত দৃষ্টির সম্মুখে তাঁ'র জ্ঞানবুদ্ধির অপরিসীম দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। তখনই আমরা বুঝি লোকটি নির্বোধ নন—নির্বোধের আবরণে আমাদের নির্বোধ করেন, পাগলের ভান করে' পাগল বানান, মূঢ়তার ছদ্মবেশে আমাদের মত জ্ঞানগর্বীর দর্প-অহংকার চূর্ণ করেন। 'বিড়াল' প্রবন্ধের সূচনায় যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা' একান্ত হাস্যকর এবং যে-কোন অর্ধোন্মাদ নেশাখোরের উপযোগী কিন্তু এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে চির-জটিল সাম্যবাদের বিপুল সমাধানের মধ্যে। সাম্যবাদের স্বরূপ নিয়ে এত অল্প কথায় এমন অপূর্ব প্রবন্ধ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জীবন-বিমুখ কমলাকান্ত একজন একান্ত জীবন-রসিক ব্যক্তি। কথাটি অন্যভাবে বলা চলে—জীবনের প্রতি একান্ত অনুরাগই তাঁকে জীবন-বিমুখ করে' তুলেছে। বাঙালীর জীবনযাত্রার ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল কিছুই তিনি দূর হ'তে অবলোকন করেছেন, এবং আফিম সেবন ক'রে অর্ধমাতাল অবস্থায় অসংলগ্ন কথার

সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁ'র মনে হয়েছে বাঙালীর বর্তমান অবস্থা আজ অজ যুদ্ধের মত—বাহ্যিক আড়ম্বরই তার সব, অন্তরে শূন্য। সেখানে বাসা বেঁধেছে কপটতা আর ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা আর আত্মাভিমান। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন মনুষ্যত্বহীন বাঙালী জাতি আজ ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করেছে—মধু লোটাই তাদের অভ্যাস, কর্মমুখর সংগ্রামশীল সংসার-প্রবাহে যেতে তা'রা নারাজ। আত্মবিশ্বাসহীন এ জাতি তাই 'পুকুর' এবং 'বৃষ' পলিটিকস্-এ মেতে উঠেছে—সত্যিকারের সম্মুখ সংগ্রামক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং বিদ্যার পলিটিকস্ করার শক্তি ও সামর্থ্য এদের কোথায়? মানুষ সম্পর্কে কমলাকান্তের একটি নিজস্ব দর্শন আছে এবং সে দর্শন অনুযায়ী মানুষ বৃক্ষের ফলের মত, তারা বিভিন্ন ঋতু এবং সময়ে বিভিন্ন রূপ এবং রসে পরিণত—নিজস্ব কোন আকৃতি-প্রকৃতি নেই। কোন কোন মানুষ কোকিলের মত—বসন্তের সুরভিস্নিগ্ধ ভোরের ছায়ালোকে তাদের কণ্ঠে সুর-সপ্তম জেগে ওঠে কিন্তু শীতের নিদারুণ তুহিনকাতর পরিবেশে তাদের সংগীত-সুষমা তো দূরের কথা দর্শনটিও পাওয়া যায় না। কোন কোন মানুষ আবার পতঙ্গের মত—বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েই মুছে যায়।

এ সমস্ত মতবাদ তিনি প্রচার করেছেন হাস্যরসের ভিতর দিয়েই—কিন্তু এ হাসি উচ্ছ্বসিত এবং উদ্দাম নয়—স্নিগ্ধ এবং মর্মস্পর্শী, বিজাতীয় এবং বিধর্মী নয়—স্বজাতীয় এবং সমমর্মী।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কমলাকান্তের দপ্তরে যে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে তা' humour বা করুণ হাস্যরস। তাই এ গ্রন্থে কোথাও তো উদ্দাম হাস্যপ্রবাহ নেই-ই বরং অনেকগুলি প্রবন্ধে ক্রন্দনের বেদনাতুর গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছে। একা, একটি গীত, বুড়ো বয়সের কথা, কমলাকান্তের বিদায় ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যমণি। জীবনরসিক কমলাকান্ত জীবন-প্রবাহে অসংখ্য অনাচার দেখে জীবনের প্রতি বেদনা-ম্লান দৃষ্টিতে

তাকিয়েছেন। তাঁ'র কাছে জীবনের উদয়-বিলয়ের সুদীর্ঘ কালটুকু বিচ্ছেদের অন্তহীন কান্নার সুরে গাঁথা। তাই তিনি ঘোষণা করেন "...কাঁদি; জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।" জীবনের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ এখানে শত আভায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। প্রীতি এবং একাত্মতার জন্যেই তাঁ'র কণ্ঠে শোনা গিয়েছে ক্রন্দনের এই সকরুণ রেশ। প্রীতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার-সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীতের সহিত মানুষের হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।" এখানে কমলাকান্তের মানবপ্রীতি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে স্বাক্ষরিত।

কমলাকান্ত তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে' টুকরো টুকরো কথায় অভিনব জীবন-দর্শনের স্বর্ণ মসলিন বয়ন করেছেন বলে যে কথা আমরা পূর্বে ঘোষণা করেছি "কমলাকান্তের দপ্তরে"র প্রায় সকল রচনাতেই তার পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। একা—"কে গায় ওই", আমার মন চন্দ্রালোক, বসন্তের কোকিল, একটি গীত, বিড়াল ইত্যাদি রচনার বিষয়বস্তু একেবারেই তুচ্ছ, তবুও এই তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করে লেখক যেন এক একটি মহাসত্যের অরূপ দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। লিরিকের সুকোমল অভিব্যক্তিতে এই সকল রচনা উচ্ছ্বসিত ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। ভাষার অলংকার-সুষম কারুকরণের সাথে কোন কোন প্রবন্ধে সংযোজিত হয়েছে স্বদেশপ্রেমের অভিনব উল্লাস আবার কোন কোন প্রবন্ধে দুর্লভ জীবন-দর্শনের হয়েছে অনবদ্য প্রকাশ। এই সকল দিকেই লক্ষ্য রেখে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় ঘোষণা করেছেন "কি ভাষার মাধুর্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র-সংযত-সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ-প্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর,

সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশ-প্রেমিকের গোঁড়ামী নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে ?"

এর পর কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা। এক সময় এ গ্রন্থের মৌলিকতা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক হয়েছিল। অনেকেই একে মৌলিক সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মতে De Quincey-এর Confessions of an Opium Eater-এর সাথে কমলাকান্তের দপ্তরের বহু বিষয়ে বহু মিল আছে। এ ছাড়াও দপ্তরের তৃতীয়াংশ 'কমলাকান্তের জবানবন্দি'র সাথে Pickwick Papers-এর Sam-এর মিল এত বেশি যে, এই জবানবন্দিকে Sam-এর অনুকরণ ছাড়া আর কিছু বলে স্বীকার করতে আমাদের মন সায় দেয় না। এই দলের আলোচনায় সত্য-সার নিষ্কাশিত হয়নি—এঁদের সকল মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডিত্য এবং আত্মাভি-মানের প্রকাশই এঁদের আলোচনার বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পেরেই যেন এঁরা সন্তুষ্ট। কমলাকান্তের দপ্তরের আলোচনায় আমরা আর একদল সমালোচকের সাথে পরিচিত হয়েছি—এঁরা বঙ্কিমের অন্ধ ভক্ত। অন্ধ-অনুরাগের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল সৃষ্টিই এঁদের কাছে অভিনব, অপূর্ব এবং মৌলিক হ'য়ে ধরা দিয়েছে। কমলাকান্তের দপ্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে এঁরা বিপক্ষের সকল যুক্তিতর্ক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গ্রন্থখানিকে একান্ত ভাবেই মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলেছেন। আমাদের মনে হয় এই উভয় দলের মতবাদই একদেশদর্শী হ'য়ে উঠেছে—আংশিক সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আসলে কমলাকান্তের দপ্তরের মত সৃষ্টি যে ইতিপূর্বে হয়নি তা' নয়—ইতিপূর্বে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এই শ্রেণীর সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়েছি। সুতরাং শ্রেণী

হিসেবে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা নেই—এর মৌলিকতা নিহিত রয়েছে স্তরের তর-তমের মধ্যে। একই শ্রেণীতে কমলাকান্তের দপ্তর যে স্তরের অধিকারী—Confessions of an Opium Eater সে স্তরের উপযোগী নয়। তুচ্ছ, অতি নগণ্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে' কমলাকান্ত শর্মা যেরূপ ঊর্ণনাভের মত কল্পনার জাল বয়ন করেছেন সেরূপ উদার অসীম কল্পনা Opium Eater-এ কোথায়?

বিশ্ব-সাহিত্যে মৌলিকতার দাবি করতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তর যে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত একটি নতুন সৃষ্টিধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন। তিনি এই ধারার আদিপুরুষ এবং তাঁ'র উত্তরপুরুষের মধ্যে আমরা পেয়েছি করিম চাচা, দিলদার, ভজহরি এবং গোলাম হোসেন ইত্যাদির মত চিরস্মরণীয় চরিত্রাবলী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা চিরকালীন আসনের হকদার।

কমলাকান্তের দপ্তর সমকালীন পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে বিশেষরূপে যে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল তা'র পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ কমলাকান্তের বর্ণনাবিন্যাসের অভিনব রীতি, দ্বিতীয়তঃ হাস্যরসের শুভ্র-স্নিগ্ধ ধারা, তৃতীয়তঃ সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্যাবলীর অবতারণা। দপ্তরের কতকগুলি রচনায় ইংরাজী Familiar Essay-এর গুণ বর্তমান থাকায় রচনাগুলি অধিকতর উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে যে কোথাও দোষ-দুর্বলতা নেই এমন কথা বলার স্পর্ধা আমাদের নেই। অনেক স্থলে বহুভাষণের তিক্ততা সমগ্র রচনার সম্ভ্রমকে নষ্ট করেছে। শুভ্র-স্নিগ্ধ হাস্যরস—যা কমলাকান্তের দপ্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাও সর্বত্র পবিত্র নেই—স্থূলতার পরিবেশনে তাও অনেকখানি কলুষিত হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু শত দোষ-ত্রুটি থাকলেও "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা-সাহিত্যের

অভিনব সৃষ্টি। যদি স্পর্ধা না হয় তা হ'লে বলা চলে আজো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দোসর সৃষ্ট হয়নি। এ ছাড়াও সহজ-ভাবে কথোপকথনের রীতিমত বঙ্কিমের সমগ্র ব্যক্তিমানস এই দপ্তরের মধ্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে অন্য কোন রচনায় তা' প্রকাশিত হয় নি—বিবিধ প্রবন্ধে তো নয়-ই।

॥ *তিন* ॥

জ্যোৎস্নালোকে মুক্ত সন্ন্যাসীর কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে অপূর্ব আবেগ-উন্মাদনায় যে জাতীয় জাগরণ-অভ্যুত্থানের বুনিয়াদ রচিত হয়েছিল, দেশ ও জাতির আদর্শ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে সেই বুনিয়াদের ওপর চির-অম্লান জাতীয় অজন্তা গঠনের গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। আনন্দমঠে যা' ছিল কল্পনার বিলাসলীলায় সমাচ্ছন্ন—বিবিধ প্রবন্ধে তাই ব্যাখ্যানিপুণ মনের সচেতন প্রয়াসে যুক্তিতর্কে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আর কেবল কল্পনাবিলাসী নন—গবেষক এবং চিন্তাশীল। ভাবাবেগে ও উন্মাদনায় একটি বিষয়ের অবতারণা ও ইশারা করেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে গমন করেন নি—বরং তথ্য ও তত্ত্বের সাথে মল্লযুদ্ধ করে' সত্য-সার নিষ্কাশন করেছেন। প্রবন্ধ লেখা বা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেই তিনি বিবিধ প্রবন্ধ লেখেন নি, জাতীয় জীবনের সমকালীন ধ্বংসমুখীনতা তাঁ'কে এরূপ প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। 'জাতি যায়'—এই আশঙ্কায় কবি বেদনা-বিহ্বল এবং সেই বেদনার গরল নির্যাস পান করেই তিনি মরণমুখী জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন সঞ্জীবন সুধা। বিবিধ প্রবন্ধের প্রতিটি প্রবন্ধই তাই তথ্য ও তত্ত্বের ভারে গুরুগম্ভীর, বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে পরিশীলিত, চিন্তাভাবনার উত্তাপে বিগলিত—খাদশূন্য। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নগ্নালোকে যখন বাঙালী জাতি দিশেহারা ও বিভ্রান্ত সে সময়

বিবিধ প্রবন্ধ জাতীয় জীবনের বিক্ষুব্ধ ও বিপদসংকুল পথে অভ্রান্ত দিশারীর পটভূমিকা গ্রহণ করেছে।

জীবনের বিলয়প্রান্তে উপন্যাস রচনা হ'তে সরে এসে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেন শিক্ষামূলক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় মনোনিয়োগ করেছিলেন— বাঙালী পাঠকের নিকট এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। সমালোচক মোহিতলালের ভাষায় এ জিজ্ঞাসার আংশিক সমাধান পাওয়া যাবে: "বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্বমাত্র, যে-ধর্ম শুষ্ক তর্কমাত্র, এবং যে-কাব্য নিছক আর্ট মাত্র, বঙ্কিম তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছিল। যে ধর্ম মানুষের জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে-ধর্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনের উপায় বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। আবার যে-দেশ, যে-জাতি ও যে-সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে উদ্ধার করাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" জাতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি হ'তে কলুষতা ও অন্ধতা দূর করে' সেগুলিকে আদর্শ মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযোগী করাই ছিল মানব-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের প্রয়াস এবং এই প্রচেষ্টা বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, দেহতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থাবলীতে বাক্‌বদ্ধ হয়েছে।

আমরা প্রথমেই মন্তব্য করেছি বিবিধ প্রবন্ধের লেখক, বিচারক, চিন্তাশীল, তত্ত্বদর্শী এবং গবেষক। দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির প্রবন্ধাবলীর শ্রেণীবিভাগের দিকে লক্ষ্য করলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষৎ সংস্করণের জন্য উভয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা' এই: সাহিত্য—সাতটি প্রবন্ধ, প্রত্নতত্ত্ব—চারটি, ইতিহাস ও অর্থনীতি—

দশটি, দর্শন ও ধর্ম—দশটি এবং বিবিধ সাতটি। নিম্নে আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর প্রবন্ধের একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর আলোচনা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধই "বিবিধ প্রবন্ধের" কোহিনূর। চিন্তাভাবনার অতলস্পর্শী গভীরতায়, প্রকাশভংগীর মাধুর্যময় আবেদনশীলতায় এই শ্রেণীর আলোচনা বঙ্কিমের প্রবন্ধ-সৃষ্টিশক্তির সর্বোচ্চ গ্রাম স্পর্শ করেছে। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ক॥ এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেগুলি সমালোচনা-মূলক—Criticism, খ॥ আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেগুলিতে স্থান পেয়েছে সাহিত্যরূপের—Form—আলোচনা। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো 'উত্তর-চরিত', 'দ্রৌপদী', 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' এবং 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনা' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে 'গীতিকাব্য' এবং 'প্রকৃত ও অতি প্রাকৃত' বিখ্যাত। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন এবং এই ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদসঞ্চার বিশেষরূপে লক্ষণীয়। মনে হয় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ শিল্পী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নি। এ শ্রেণীর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা উন্নতশীর্ষ হ'লেও একটি বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে হার মেনেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও বহুভাষণে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেখানে বিশেষরূপে এলায়িত হ'য়ে পড়েছে বাক্‌ভংগীর সংযত প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সেখানে দৃঢ়-পিনদ্ধ। এ ছাড়াও বহু সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মদনমোহন কুমারের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য: "রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্যে" 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে পঞ্চতপা পার্বতীর সহিত শকুন্তলার তুলনা, এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে "শকুন্তলা" নাটকের সহিত "টেম্পেষ্ট" নাটকের

তুলনা বঙ্কিমের 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেস্‌দিমোনা' ও 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধ স্মরণ করাইয়া দিবেই। রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক সাহিত্যে" 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যে তুলনা করিয়াছেন তাহার সহিত বঙ্কিমের 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি'র মূল বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।" সাহিত্য-স্বরূপের আলোচনা-গুলিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ও গভীর মননশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই শ্রেণীর আলোচনা কেহ করেন নি—সাহিত্য-স্বরূপ আলোচিত প্রবন্ধগুলি তাই বাংলার সমালোচনা সাহিত্যে নতুন বলিষ্ঠ সংযোজনা।

প্রত্নতত্ত্ব এবং নৃ-তত্ত্ব প্রবন্ধগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক মনের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। 'বাংলাভাষা', 'বাঙালীর উৎপত্তি', 'বাংলার ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রবন্ধগুলিতে মাতৃভাষা এবং স্বজাতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেমনিবিড় অনুরাগ শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির সাথে সাথে বাংলা ভাষাতত্ত্বের এমন সুগভীর আলোচনা বঙ্কিমের পূর্বে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অনার্য, আদিম জাতিগুলি হ'তে কেমন ভাবে ধীরে ধীরে ক্রমপরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে' নব্য বাঙালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে তা'র একটি মর্মস্পর্শী ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই গবেষক। প্রবন্ধটি নৃ-তত্ত্ব ( anthropology ) সম্বন্ধীয় আলোচনার আদর্শ-স্থানীয়।

ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মূল লক্ষ্য ধ্বংসমুখী জাতির অধোগতিতে ছেদ টেনে নতুন বলদীপ্ত জাগরণ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায়। অন্ধকারের বুকেই আলোকের উজ্জ্বল প্রকাশ। জড়গ্রস্ত জাতির বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন দুরবস্থা বোঝাবার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তা'র সম্মুখে

তুলে ধরেছেন আলোকোজ্জ্বল অতীতের কোলাহলমুখর দিনগুলি। শক্তি-সামর্থ্যে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, ধর্মে-দর্শনে বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাস দীপ্তিময়। তাই অতীত ইতিহাসের গোপন কন্দর হ'তে শক্তি সংগ্রহের আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দূর অতীতের নিস্তব্ধ শ্মশানভূমিতেই সুপ্ত রয়েছে শক্তি ও সামর্থের ফল্গুপ্রবাহ। জাতির সংগঠনযজ্ঞের অগ্নিহোত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট তাই অতীত ইতিহাসের আলোচনা অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে প্রধান হ'লো 'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা,' 'প্রাচীনা ও নবীনা,' 'বাংলার ইতিহাস', 'বাংলার কলঙ্ক,' 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাংলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী। এই সকল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে গবেষক এবং চিন্তাশীল, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক। জাতির অতীত ইতিহাসের উদ্‌ঘাটন এবং শক্তিসামর্থ্যের উৎসভূমি আবিষ্কার করা ছাড়াও এই সকল প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ মূল্য হ'লো কুহেলীমণ্ডিত রূপকথা-কাহিনী পৃথক্ করে' খাঁটি তথ্যের সাহায্যে অভ্রান্ত ইতিহাস রচনা করা। কেবল অতীতমুখী রোমাঞ্চ-পিপাসাই নয়—বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্যেই এই সকল প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অমর হ'য়ে আছেন।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিশিষ্ট সম্পদ। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি', 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প', 'সাংখ্যদর্শন এবং জ্ঞান' ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী বিশেষরূপে খ্যাত। 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি' প্রবন্ধে অতীত ভারতের সুন্দর সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রনীতির একটি বিরাট অধ্যায় আমাদের বিস্মিত-দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সূক্ষ্ম শিল্প সম্পর্কে আর্যজাতির জ্ঞানগরিমা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আমাদের দ্বিতীয় আশ্চর্যের বিষয়। সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধটি যেন সমগ্র সংস্কৃতদর্শন-সাগরমন্থন নিটোল

মুক্তা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে সংস্কৃতের গিরিশিখর হইতে বাংলার সমতলভূমিতে সর্বজনপ্রাপ্য করিয়া দিবার চেষ্টা" করেছেন।

এ ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা "বিবিধ প্রবন্ধে" আছে। 'বঙ্গ দেশের কৃষক' এবং 'অনুকরণ' প্রবন্ধ দু'টি বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রথম সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে কৃষকদের বর্তমান দুরবস্থা, পতনের কারণ এবং উন্নতির পথ বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশক্তির যে সুবিপুল পরিচয় রেখাঙ্কিত হয়েছে তা' অভিনব এবং বিস্ময়কর। এই প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৃষকদের সমমর্মী। 'অনুকরণ' প্রবন্ধটি সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। বঙ্কিমের যুগে বাঙালী অন্ধের মত ইংরাজদের অনুকারী হ'য়ে উঠেছিল—প্রবন্ধের প্রথমেই এই অন্ধ অনুকরণকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের কণ্ঠ বহ্নিমান হ'য়ে উঠেছে: "জগদীশ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত। হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক "বাইমেনা" জাতির সাদৃশ্য বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও নাই।"

এখানে অনুকরণপ্রিয় বাঙালীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রকারান্তরে অনুকরণের বিরুদ্ধেই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠের তীব্রতা উৎসারিত হয়েছে বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে তা' নয়। দুর্বল জাতির নবজীবন জাগৃতির উষালগ্নে যে সকল জাতির অনুকরণের প্রয়োজন তা' তিনি বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। তাঁ'র নিজের কথাতেই "অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই।" কিন্তু অনুকরণ যখন অন্ধ এবং প্রতিভাশূন্য হ'য়ে পড়ে তখন তা' হ'য়ে ওঠে দূষণীয় এবং কদর্য। এই প্রতিভাশূন্য অনুচিকীর্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোর আপত্তি। এক গ্লাস মদ পান করে' যে নব্য বাঙালী মনে করেন

যে তিনি মস্ত আধুনিক হ'য়ে উঠেছেন তঁ'ার মত ভাগ্যহীন আর কে? নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই বিচারক হ'য়ে উঠেছেন। নিয়তির মত অনিবার্য কারণেই এখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের অর্ধোন্মাদ দশা হ'তে সরে এসে বিচারকের সুকঠোর দণ্ড হাতে নিতে হয়েছে।

# যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি-মানস

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী কবিপ্রতিভার উদয়বিলয়ের কালপরিধির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যে ক'জন আপন কলানিপুণতার জন্যে বিশেষ স্মরণীয় হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুল প্রধান। এঁদের তিনজনেরই কবি-মানসে হয়েছিল তীর্যক দৃষ্টিভংগীর ছায়াপাত। কাব্যরচনার প্রারম্ভিক উষালগ্নেই এক অভিনব বীর্যদীপ্ত জীবনজিজ্ঞাসা কবিত্রয়ীকে করে' তুলেছিল প্রশ্ন-চঞ্চল, দিয়েছিল সত্যভাষণের ঐন্দ্রিলা স্পর্ধা। তবে এই স্পর্ধায় তর-তমের পার্থক্য আছে। যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের মধ্যে এই স্পর্ধা ক্রমবর্ধমান হ'য়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিপক্ষের শঙ্কিত বুকে হাতুড়ি ঠোকার দুঃসাহসে বীর্যবান হ'য়ে ওঠে নি—'বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে' বিদ্রোহী ভৃগুর ভীষণতায় ভগবানবুকে দীপ্ত পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার দুরন্ত শক্তি অর্জন করেছিলেন একমাত্র নজরুল-ই।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাণী অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ কাব্যাকাশে অধ্যাত্মবাদের নবারুণ মদিরবিহ্বলতার ফাগ ছড়াতে ব্যস্ত—তখন সবেমাত্র আধ্যাত্মিকতার পূর্ব-পর্ব রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে উঠেছে। শিল্পক্ষেত্রে যখন চলেছে এমনি রোম্যান্টিকানুগ স্বপ্নালু বাষ্পাচ্ছন্ন কল্পনাবিলাস তখন সমাজে চলেছে অত্যাচার-নির্যাতনের পাশবিক সমারোহ। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি তখনও বেজে ওঠেনি তবুও রাজনৈতিক বিলাস-মত্ততায় সমাজজীবনের সর্বত্রই একটা বিক্ষোভ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে, জীবনপথের নানাদিকেই দেখা দিয়েছে প্রশ্নসংকুল ফাটলরেখা। একদিকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার

এই ভাঙনমুখী অবক্ষয় অন্যদিকে শিল্পসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মমুখী কল্পনাবিলাস। সমাজসাহিত্যের মধ্যেকার এই গরমিল যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি সহজেই বুঝেছিলেন সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্য কেবল রূপমুগ্ধ তন্ময়মনের বিলাসকেলী নয়—সম্মুখে যে কষ্টের সংসার তা'র আবেদনকে কবিসাহিত্যিক এড়িয়ে যাবেন কোন্ সাহসে। কাব্যরচনার প্রারম্ভিক লগ্নে এই প্রশ্নই যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসে জিজ্ঞাসার জীবন্ত আলোড়ন এনেছিল। তৎকালীন বাংলার ভাঙনমুখী গ্রামীণ সমাজের সাথে অন্তরঙ্গ যোগ থাকায় এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা তীব্রতম হ'য়ে উঠেছিল। কবির নিজের কথায় এই প্রশ্নচঞ্চল মনের সুন্দর রূপ ধরা পড়েছে। চাকরির খাতিরে কবিকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হ'তো এবং "এই চলতে গিয়েই তো প্রত্যক্ষ করলাম বাংলা দেশকে। বাংলা দেশের গ্রামকে। কি আশ্চর্য। এই বাংলার পল্লী সম্বন্ধে কতো কবিতা পড়েছি। ...নদীমাতৃক শস্য-শ্যামলা কৃষকের উল্লাস-মুখরিত বাংলা দেশ। এখানে রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা সারা হয়। বাংলার বধূর বুকভরা মধু ইত্যাদি আরো কতো ঐশ্বর্য নাকি বর্তমান। হায়! আমার ভাগ্য মন্দ। এর একটিও কী চোখে পড়লো? আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরীত। নদীমাতৃক বাংলা দেশের নদী আজ মজে গেছে। খানা-ডোবা যেদিকে তাকাই পানায় ভর্তি। শস্যক্ষেত্র খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা সর্বহারা, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়। আর বাংলার বধূ—তাদের দেখলাম জেলাবোর্ডের দেওয়া ইঁদারার পাশে জমায়েত হ'তে। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এই নদীমাতৃক বাংলার বধূদের দেখলাম এক কলসী জলের জন্য পরস্পর বাক্যগরল বর্ষণ করতে। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। উনুনে বার্লি ফুটে যাচ্ছে। ...চোখে পড়ে নি শুধু বাংলার সে কাব্যরূপ।"

যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বরূপ এবং জন্মলগ্নের বলিষ্ঠ চিন্তার উন্মেষ

এ স্বীকৃতিতে সুন্দরতম মহিমায় বাক্‌বদ্ধ হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে আর একটি গভীরতর উপাদান আমরা এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে পাই—সেটি হ'লো রবীন্দ্রনাথের বাষ্পাকুল স্বপ্নবিলাসের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের সচেতন আত্মার বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। তিনি নিভৃত হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাহিত্য যদি কোন বাস্তব ভিত্তিভূমিতে সুদৃঢ় না হ'তে পারে তা' হ'লে তা'র পতন অনিবার্য। এবং এই ধূমায়িত কেলিবিলাস ও কোমল কল্পনায় জাতীয় জীবনের অন্তরাত্মা স্বপ্নলালনের নরম সূত্র ধরে নির্বীর্যের অতল গহ্বরে আত্মাহুতি দেবে। তাই তিনি নটরাজের ভাঙনমুখী পদপাতনের দীপ্তঘোষণায় বাংলা সাহিত্যের মদিরবিহ্বল কোমল বক্ষকে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল করে' তুলতে চাইলেন। দেখা দিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তরুণ কবিকুলের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের হাতে সম্পন্ন হ'লো আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাতঃকৃত্য, ভোগবাদী মোহিতলালের আত্মনির্ভর পদচারণায় উজ্জ্বলতর হ'লো এ কাব্যের জয়যাত্রা, বিদ্রোহী দুলাল কাজী সাহেবের আগ্নেয়-শপথ ও বহ্নিমান আত্মঘোষণায় এ কাব্য আপন স্বরূপে পরিপূর্ণ বিকশিত হ'য়ে উঠলো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক বাঙালীর পক্ষে জীবনজিজ্ঞাসার যুগ। এই যুগে সব কিছুই চঞ্চল এবং প্রশ্নব্যাকুল। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নানান অভাব-অভিযোগে, ব্যথা-বেদনায় অসুস্থ ও অশান্ত হ'য়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস লালিত হয়েছে এই অসুস্থ প্রশ্নসংকুল অবেষ্টনীতে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস-লালনের পরিধিটুকু সুন্দর রূপে বিধৃত হয়েছে: "নতুন জিজ্ঞাসা পুরাতন ভাবধারার হাতিয়ার সংগ্রহে যখন অতি ব্যগ্র, সেই সময় বিশ্বযুদ্ধের করালসংকেত সমাজ ও সাহিত্যের গতিরেখাকে পটপরিবর্তনের অভ্রান্ত নিশানা দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'লো উনিশ শতকী ভাব-জীবনের গতিরেখায়, "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর" রূপান্তরিত হ'লো

"মরুমায়া"র "মরীচিকা"য়। যতীন্দ্রনাথের কবি-মানসের জন্মলগ্নে নবজিজ্ঞাসার সেই প্রাথমিক অঙ্গীকার নতুন প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষরিত।"

বিশ্বযুদ্ধের করাল সংকেত সমাজ ও সাহিত্যজীবনে পটপরিবর্তনের সূচনা এনেছিল সত্য কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যতীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রধান হ'য়ে ওঠে নি, এমন কী মোহিতলালের মধ্যেও নয়। বিশ্বযুদ্ধের গরলনির্যাস গ্রহণে যিনি সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

যতীন্দ্রনাথের কবি-মানস গঠনে বিশ্বমহাযুদ্ধ তো বিশেষ কোন ছায়াপাত করতে পারেই নি—এমন কি মার্ক্সীয় মতবাদও নয়। কেননা যে সময় যতীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা করেন সে সময় বাংলায় মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রসার ঘটেনি। ব্যক্তিগত আলাপ-আচরণ-অভিজ্ঞতায় এবং বিভিন্ন প্রমাণপরিচয় উদ্ধৃত করে' ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যতীন্দ্রনাথকে গান্ধীবাদী বলেই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মার্ক্সীয় মতবাদ নয় যতীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মায় সুপ্ত আদিমতম শয়তানটি জাগ্রত হয়েছিল শোষণশূন্য সমাজের মেরুদণ্ডহীন মানুষের অসহায় আর্তনাদে, বেদনাম্লান কৃষাণের তপ্ত-নিশ্বাসে, অন্নহীন গৃহবধূর মর্মভেদী হাহাকারে। একটি সচেতন পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিই তাঁ'কে করে' তুলেছিল দুঃখবাদী, বিদ্রোহী।

॥ দুই ॥

ম্যাক্সীম গোর্কীর "মাদার"-এর তের বৎসর বয়স্ক কিশোর নায়ক বাঁধাধরা পিতৃভক্তির পদ পরিত্যাগ করে' যেমন একদিন সবল কচি বাহু দু'টি দিয়ে পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতুড়ি তুলে ধরেছিল তেমনি 'অলস রসে আবেশ বশে'-এর চির-পুরাতন সম্ভোগ ও স্বপ্নবিলাসের পথ পরিত্যাগ করে' আকস্মিকভাবে যতীন্দ্রনাথ দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদচারণা করে' সকলকে চমকিত করে' দিয়েছিলেন।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাই একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁ'র বাণীতে কোন আবরণ ছিল না, তাঁ'র চিত্তেও এতটুকু সংশয়ের স্থান ছিল না—তাঁ'র যা' বলার তা' দ্বিধাহীন অসংকোচ চিত্তে প্রকাশ করতেন। কল্পনার মায়ালোকে তিনি অযথা ঘুরে বেড়ান নি—ঋজু ভাষণেই তাঁ'র বক্তব্য মর্মভেদী হয়েছে। তা'র কাব্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হ'লো সুস্থ, সবল মানবিকতার প্রকাশ। কোন তত্ত্ব বা আদর্শের চাপে এ মানবিকতা-বোধ রবীন্দ্রসুলভ অমর্ত-চেতনায় পর্যবসিত হয় নি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হ'য়ে পাঠকের গহনমন স্পষ্ট করেছে। সচেতন মনের এই শিল্পকর্ম, বজ্রকঠোর দুঃখবাদের এই ছন্দিত রূপায়ণ—বাংলা কাব্য, সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের এক বিরল মর্যাদা দান করেছে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এই যে দুর্লভ দুঃখবাদের প্রবর্তনা দেখি এ দুঃখবাদের স্বরূপ কী? যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ প্রচলিত দুঃখবাদের বিপরীত। প্রচলিত দুঃখবাদ হ'লো জীবন ও জগতে বিতৃষ্ণ হ'য়ে পলায়নী মনোবৃত্তিরই নামান্তর। মায়াবাদীদের মত দুঃখবাদিগণও জগৎ ও জীবনকে বেদনাব্যথার উৎসভূমি জেনে অনন্যসুন্দর সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' মৃত্যুর করাল-সংকেতের অপেক্ষায় দিন গোনে। এ দুঃখবাদ একদিকে যেমন পলায়নবাদের পরিপোষক অন্যদিকে তেমন নেতিবাচক। 'না'-ই প্রচলিত দুঃখবাদের মূলমন্ত্র, 'কিছু নেই' এই সার মর্মই এ দুঃখবাদের মর্মমূল হ'তে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ পলায়নী মনোবৃত্তির পরিপোষক নয়—এ দুঃখবাদ পার্থিব সৌন্দর্য ও জীবনরসকে গভীরভাবে উপলব্ধি এবং আকণ্ঠ পান করার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুঃখবাদ বন্ধনপীড়িত জগৎ ও জীবনের মর্মবেদনায় নৈরাশ্য-ক্রন্দন নয়—জগৎ ও জীবনকে করালগ্রাস হ'তে বন্ধনমুক্ত করার আগ্নেয়-শপথ। তাই এ দুঃখবাদের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে জীবনরসের সঞ্জীবনী

ধারা। কবিপ্রাণের একটি গভীর ঐকান্তিকতা ও প্রখর অনুভূতি এ দুঃখবাদের অন্তর্মূলে বেগ সঞ্চার করে' তাকে মহান্ ও ভয়াল-মাধুর্যদীপ্ত করে' তুলেছে।
চলমান জীবনে দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে যা' সুখের বিপরীত দুঃখ বলেই প্রতীয়মান হয়—শিল্পের মহান্ পটভূমিতে তাই হ'য়ে ওঠে রস এবং রসসৃষ্টিই কবিতার প্রাণ। সুতরাং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ নতুনতর রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এই রসই আনন্দরূপে পাঠকচিত্তকে দুর্নিবার আবেগে দুলিয়েছে। এ প্রসংগে মোহিতলালের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য: "সাধারণ জীবচেতনায় বা অধ্যাত্ম-দর্শনে দুঃখ যে বস্তুই হোক, কাব্যে দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, তাহা একটা রসও বটে। যদি তাহাই না হয়, তবে দুঃখের কবি বলিলে কোন অর্থই হয় না; যেমন দুঃখ কাব্য হ'য়ে ওঠে না। অতএব যতীন্দ্রনাথের এ দুঃখ একটি অনুভূতি রসেরই প্রকারভেদ মাত্র।"
ধর্মশাস্ত্রে আধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পন্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে—বন্ধু কিংবা সখা ভাবেও যেমন ভগবানকে উপাসনা করা যায় তেমনি শত্রু বা বিদ্রোহী হ'য়েও আধ্যাত্মিকতার সীমা-সর্গে উন্নীত হওয়া সম্ভব। একদিকে আছে প্রেমমাধুর্য, ভক্তি-ভালবাসার সুন্দরতর রূপ অন্যদিকে আছে ভয়াল ভীষণতার মাঝে শৈবোন্মত্ততা। যতীন্দ্রনাথের কাব্য এই শৈবোন্মত্ততার মধ্যেই সজীব ও রসোত্তীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। শত্রুভাবে ভজনা করে' কবি হরণ করেছেন কবিতা-কুমারীর লাবণ্যদীপ্ত তনুমন। দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের কবিতার সুন্দরতম সার্থকতা এখানে। যতীন্দ্রনাথের এই দুঃখের পথে পদচারণার, এই দুঃখবাদী হওয়ার মূলে যে কারণগুলি অন্তরাল হ'তে বেগ সঞ্চার করেছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কারণগুলির একটি হ'লো প্রাক্ মহাযুদ্ধের পটভূমিতে প্রশ্নসংকুল ধ্বংসমুখী সমাজ জীবনের বিপর্যয় এবং অপরটি হ'লো তৎকালীন বিপর্যস্ত বেদনাপীড়িত সমাজ চিত্রকে এড়িয়ে সমকালীন সাহিত্যের রোম্যান্টিকতার প্রতি প্রবণতা। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত

হয়েছে "হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ"-এর উচ্ছ্বসিত অপূর্ব চিত্র কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করে' কবি দেখেছেন মধুর মূরতির "বিধুর রূপ", শেফালী মাল্যের স্থলে "কণ্টক মালা" আর "রোগে-বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে" মলিন অঙ্গের ব্যর্থ হাহাকার। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এত বড় ফাঁকি কবি যতীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেন নি—তাই তিনি নিদারুণ ভাবে হ'য়ে উঠেছিলেন দুঃখবাদী। দুঃখের মধ্য দিয়ে "জীবনের যথার্থ অনুরাগী এই কবি তাই জীবনের শতদীপ্ত বহ্নিজ্বালায় জ্বলেছেন—বক্রকটাক্ষের কুটিল-ভ্রূভংগীতে তারই অর্ঘ্যডালা সাজিয়েছেন।"

কবির দুঃখবাদের কারণটি ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। কবির প্রথম কাব্য "মরীচিকা"র সূচনাকাল ১৩১৭—তখন তিনি ভরা যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু ঠিক ভরা যৌবনে দেখা গিয়েছে "তাঁহার তীব্র বিষয়-বিরক্তি এবং ভস্ম-ভূষণ রুক্ষ জটাধারী বিদ্রোহী মূর্তি। জীবন-জিজ্ঞাসার কঠোর তাপের তাপে ইন্দ্রিয়গুলিকে তিনি যৌবনেই যেন শুষ্ক করিয়া আত্মসংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, একটি সহজাততীক্ষ্ণ ধ্যানবৃত্তির মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। একদিকে অন্তবিহীন জীবন-জিজ্ঞাসার উদগ্রতা— অন্যদিকে সত্যকার সমাধান লাভের ব্যর্থতা এবং তাহারই সঙ্গে চারিদিক হইতে শুধু সত্য শিব ও সুন্দরের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার আয়োজন ও প্রলোভন যৌবনেই কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। ফলে বিশ্ব-সংসারের 'রূপ'টাই তিনি কোথাও উপভোগ করিতে পারিলেন না,— 'বিরূপ'টাই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিল।" রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' বলে যখন রবীন্দ্রনাথ মুক্তি আস্বাদনে ব্যস্ত তখন যতীন্দ্রনাথ উদার অসীম নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তি অনুভব করতে পারেন নি। অনুভব করতে তো পারেন নি বরং অসীম বন্ধনহারা আকাশের মাঝেও দেখেছেন অসংখ্য বন্ধন :

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া
আলো আঁধারের গরাদে বন্দী অপার বিশ্ব-কারা।

নিখিল বিশ্বে কবি কোথাও মুক্তি দেখতে পান নি, সর্বত্রই দেখেছেন অত্যাচার নির্যাতনের মর্মভেদী দুঃখদাহন। কল্পনায় বুঁদ হ'য়ে সংকীর্ণ মশারির মধ্যে শয়ন করে' মশারির আদিঅন্ত নেই বলতে তিনি রাজী নন:

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলী প্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

এমন মিথ্যাভাষণ কবির পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয় নি। যা'কে তিনি স্পষ্ট মিথ্যে বলে উপলব্ধি করেছেন, যা'কে তিনি অসত্য বলে জেনেছেন—চোখ বন্ধ করে' তা'কে তিনি সত্য-সুন্দরের প্রতীক বলেন কী করে? তাই তো অন্তর হ'তে বচন আহরণ করে' 'অলস রসে আবেশ বশে' চিরাচরিত পথে পদচারণা করা তাঁ'র পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তো তিনি বাংলার অলস-লালন কোমল বক্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বহ্নিদীপ্ত 'মরুশিখা'য়।

কবির দুঃখবাদের সুর যেমন সমকালীন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছিল তেমনি এই দুঃখবাদ-বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুষের বিরুদ্ধেও। পূর্বেই বলেছি কবি ছিলেন অপরাজেয় মানবতাবাদী। সৃষ্টিকর্তার হাতে সেই মানুষের নির্মম লাঞ্ছনা হ'তে দেখে কবির বুকেও জ্বলে উঠলো অনির্বাণ দীপশিখা। কবি লক্ষ্য করেছেন মানুষ আপন দুঃখ-দারিদ্র্য, আপন ব্যথাবেদনার চার পাশে একটা কল্পিত সৃষ্টি-কর্তাকে খাড়া করে' তাঁ'র পদপ্রান্তেই পরাভব স্বীকার করছে। এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার জন্যেই মানুষ আপনস্বরূপে, আপন বীর্যগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না। এই অলীক স্রষ্টাই

যেন মানুষকে করছে মেরুদণ্ডহীন, করছে প্রবঞ্চনা। বিধির বিধানকে তাই তো কবি আকুল আবেগে আহ্বান জানাতে পারেন নি—বিধির বিধান-মাঝে যে মহাবন্ধন আছে তাতেই কবি পীড়িত ব্যথিত ঃ

কবি নাহি আমি, কবি নি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহা বন্ধনে ব্যথিত।

এই যে তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাস—এ তো কেবল বিধির বিধানের জন্যে কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়—এ যে বিধির বিরুদ্ধে কবির সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা। কবি বলেছেন এই সৃষ্টির পিছনে যদি কোন সৃষ্টিকর্তা থাকেন তিনি অন্ধ এবং বধির; এবং তিনি কর্মকার জাতীয়। ব্যথাবেদনার মাঝে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন গভীর মুক্তি, বেদনাকেই তিনি জীবনের সম্বল জেনেছিলেন, 'যেথায় ব্যথা সেথায় তোমায় নিবিড় করে ধরিব হে' এই ছিলো তাঁ'র ঘোষণা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বেদনাবহ্নির মাঝে কোন গভীরতর মুক্তি খুঁজে পান নি। দুঃখের দাবদাহের মাঝে তিনি দেখেছেন সৃষ্টিকর্তার নির্মম পেষণ। 'লোহার ব্যথা' কবিতায় কর্মকারের (সৃষ্টিকর্তা) নিকট লোহার (সৃষ্টজীব) অন্তরভেদী ক্রন্দন অনলাক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়েছে ঃ

ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার,—
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ ভাই হাতুড়ির মারফতি।

এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন ঃ "বিধাতার আত্মরতির তাগিদে তাঁহার এই বিশ্বলীলা,—যে বিশ্বলীলা সম্ভব হইয়াছে 'আমা'কে দিয়া; কিন্তু সে আত্মরতির লীলা পরিপূর্ণ

হইবার সম্ভাবনা নাই এই 'আমি'টি যদি লৌহখণ্ডের ন্যায় নিরন্তর সংসারের হাপরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া হাতুড়ির পিটানি দ্বারা কেবলই 'হইয়া' উঠিতে না থাকে। লীলাময়ের অনাদিলীলার শরিক হইয়া উঠিবার ইহাই পুরস্কার!"

কবির এই দুঃখবাদী বিদ্রোহের সুর প্রকৃতির বুকেও সঞ্চারিত হয়েছে। কবি মাত্রই প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্যলীলা, বিমল রূপৈশ্বর্য প্রত্যেক কবির কল্পনায় বেগসঞ্চার করেছে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। প্রকৃতির অবিমিশ্র সৌন্দর্যময়ী ও মাধুর্যময়ী মূর্তি কবির জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—তিনি প্রকৃতির কোমল রূপ না দেখে দেখেছেন তা'র ভয়াল-ভীষণ মূর্তি। প্রকৃতির এই উদ্দাম বন্যরূপ তা'র 'রক্তাক্ত-দন্ত-নখর' বিশিষ্ট জান্তব প্রেরণা কবিকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। তবে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ যে আদৌ ছিল না তা' নয়, কিন্তু "যতখানি ছিল অচেতনে আকর্ষণ ঠিক ততখানি ছিল সংসারের সচেতনে বিকর্ষণ।" তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির মধ্যে তা'র নিয়মবিধান অপেক্ষা অনিয়ম-অবিচারের প্রাবল্য, শোভা সৌন্দর্য অপেক্ষা রুক্ষতা ভীষণতার তীব্রতা। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির পেলবমসৃণ সায়াহ্নকোমলতা অপেক্ষা গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের খরদীপ্ত নির্মমতাই কবির দৃষ্টিতে সত্য হ'য়ে উঠেছিল। "মরুশিখা"'র 'দুঃখবাদী' কবিতায় তাই তো তিনি ঘোষণা করেছেন:

> মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
> সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

শ্রাবণ-নিশীথের বাদলধারা, শ্রাবণ-সন্ধ্যার মায়াঘন ঝিলিমিলিতে রবীন্দ্রনাথের মানস কল্পনায় কতবার, কত ভংগীতে, কত বিচিত্র ভাবেরই না উদয় হয়েছে। শ্রাবণের অবিরল বাদলধারায় কখনো তিনি শুনেছেন মানুষের চিরন্তন বাণী, কখনো শুনেছেন পূরবীর সুর, কখনো পেয়েছেন সুধার ধারা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কাছে শ্রাবণের ধারা 'অন্ধ অন্তরের ক্রন্দন ছন্দের সান্ত্বনা গান' হ'য়ে ধরা দিয়েছে।

শ্রাবণ-নিশীথের বজ্রগর্জনের রূপটি কবির নিকট ধরা পড়েছে বনান্তরালের শাবকহারা বাঘিনীর বিদ্রোহ-গর্জন রূপে :

কান পেতে শোনো দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবকহারা বাঘিনী ?

বিদ্যুৎ-ঝলকও তাঁ'র কাছে কোন তরুণীর লাবণ্য-শ্রী অঙ্গঘেরা নীল শাড়ীর জরিণ পাড় নয়—তা' বেদেনী মেয়ের বিদ্যুৎ-নাগিনীরই চঞ্চল ফণা :

ও কোন বেদেনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী।

প্রকৃতির ছয় ঋতুর মধ্যে 'মধুর মূরতি' শরৎ এবং 'কুঞ্জ-কুসুমিত' বসন্ত যতীন্দ্র-কবি-মানসের রুদ্ধ দ্বারপ্রান্ত হ'তে নিষ্ফলে ফিরে গেছে—দ্বার ভেদ করে' অন্তর্লোকে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেয়েছে একমাত্র গ্রীষ্ম এবং শীত। প্রথমেই বলেছি কবি রুদ্রের উপাসক, নির্মমতার পূজারী। গ্রীষ্ম ও শীত এই দুই কালেই প্রকৃতির নির্মমতা ও ভীষণতা উলঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। গ্রীষ্ম আসে তা'র খরদীপ্ত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে করতে আর শীত আসে তা'র নির্মমতম পিঙ্গল জটাজাল নিয়ে। এই দুই চরমকাল তাই কবির আনন্দ-সহচর হ'তে পেরেছে।

সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রকৃতির দু'টি রূপের সন্ধান পাই—একটি রূপের মধ্যে প্রকৃতি প্রকৃতিই থেকে আপন সৌন্দর্য-সম্ভার ও মহিমাকে বহির্বিশ্বে ব্যঞ্জিত করে' দেয় অপর রূপে সে আর প্রকৃতি থাকে না—মানুষের দোসর হ'য়ে তা'র জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের কথা বাদ দিয়ে তিনি কোনদিন প্রকৃতিকে চিন্তা করতে পারেন নি। মানুষের ভালমন্দের পটভূমিতে প্রকৃতিকে বসিয়ে তিনি তা'র রূপ আস্বাদন করেছেন। বলাবাহুল্য এখানেও তিনি দেখেছেন মানুষের ওপর প্রকৃতির জান্তব হিংস্রতার নির্মমোন্মুখ রূপ। প্রকৃতি ছলে বলে কৌশলে সর্বদা মানুষের ওপর অত্যাচারের কাজেই লিপ্ত। প্রকৃতি মানুষের আরাধ্যা, প্রকৃতি মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং তা'র

চরিত্র গঠন করে এ সব ভুয়ো কথা যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। তাঁ'র মতে মানব সৃষ্টির সেরা, প্রকৃতি তা'র অনেক নিম্নে। সুতরাং :

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথ-যাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

অলীক স্রষ্টা যেমন মানুষের পরাভবের জন্য দায়ী, তেমন প্রকৃতিও মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও বীর্যবান হওয়ার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। আপন প্রভাব দিয়ে প্রকৃতি সর্বদা নানা ভাবব্যঞ্জনায়, মানবসমাজকে সেই অলীক স্রষ্টার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই কবি বলেন, নিখিল বিশ্বটা যেন সেই অলীক স্রষ্টার ব্যবসাক্ষেত্র এবং প্রকৃতি তা'র বিজ্ঞাপন। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যদি কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে তা' হ'লো জীবনসংগ্রামে 'ছলে বলে কলে' দুর্বলকে ধ্বংস করে' সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর সবলের আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাইতো কবির বাণী-বহ্নির প্রকাশ :

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়াও চমৎকার !

যতীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ মানবপ্রেমিক কবি। এই নির্ভেজাল অটুট মানবপ্রীতির জন্যেই তিনি হয়েছেন দুঃখবাদী এবং ঠিক এই একই কারণে তিনি অবিশ্বাসী কবি। কোন ধর্মেই তাঁ'র আস্থা ছিল না, কেননা তাঁ'র মতে 'ধর্ম হ'লো মানুষের দুর্বলতা, পরম পরাজয়। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা মানুষ যদি তা'র মানুষরূপে সোজা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবেই সে ধার্মিক হ'য়ে ওঠে— তখন সে চায় আত্মসমর্পণ।' এই আত্মসমর্পণের নিগূঢ় অর্থ হ'লো জীবনের সমুদয় কঠোর দায়িত্ব ও কর্মভারকে এড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং দুর্বল এবং ভীরু চিত্তই হ'লো ধর্মের স্মরণস্থল। সৃষ্টি এবং ধর্মকে যাঁ'রা নিখাদ সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক বলে গ্রহণ করতে না পারলো তা'রাই হ'য়ে গেল অধার্মিক এবং অবিশ্বাসী। কিন্তু এই অধার্মিক ও অবিশ্বাসীর অপবাদে কবির দুঃখ নেই, কেননা কবি জানেন 'শতকরা নিরানব্বই জন' তাঁ'রই দলে। নিয়ম-

নীতিতে, প্রেমধর্মে সর্বত্র একটি গোঁজামিল ও জোড়াতালি প্রধান হ'য়ে উঠেছে এবং এ ফাঁকি ধরা পড়লে সৃষ্ট জীব নিরুপায় হ'য়ে তা' প্রেম দিয়ে ঢাকতে চায়:

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হ'য়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।

সুতরাং অবিশ্বাসী কবির বজ্রদীপ্ত ঘোষণা:

প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

যাঁ'রা বলেন জগতের নিয়মনীতি অলংঘনীয়, বিধাতার রাজ্যে অবিচার নেই—সেই অলীক স্রষ্টার বিজ্ঞাপনজীবীদের নিকট কবি প্রশ্ন করেছেন 'চেরাপুঞ্জিতে এত অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নেই তবুও সেখানে অবিশ্রান্ত বাদলধারা অবিরাম ঝরছে কিন্তু গোবী সাহারায় যেখানে বৃষ্টিপাতের সব থেকে বেশি প্রয়োজন সেখানে বৃষ্টিপাত নেই—কেন? 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'ই কী এই বিধাতার লক্ষ্য নয়? বিধাতার রাজ্যে নিয়মনীতি কোথায়? বিধিবিধান কোথায়? মানবদরদী কবি যতীন্দ্রনাথের কাছে তাই এই অনিয়ম এবং অত্যাচার অসহ্য। কাল্পনিক বিধি নয়—বাস্তবের সংগ্রামশীল মানুষই তাঁ'র কাছে সত্য:

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।

জড়বাদী অবিশ্বাসী কবির এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সরব অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণতম ঘোষণা।

সুতরাং প্রচলিত গোঁজামিল এবং জোড়াতালি দেওয়া ধর্মকে উড়িয়ে আর এক নতুন ধর্মের প্রবর্তনা আবশ্যক। কবি নতুন গীতা রচনার জন্যে তাই ডাক দিলেন নব আগন্তুকদের:

কে গ'বে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নি-বাণী
জালিয়া সত্য, দেখাবে দুঃখের নগ্ন মূর্তিখানি?

## ।। তিন ।।

শাসন শোষণের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের অরুগ্ন ও বলিষ্ঠ বিক্ষোভ আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস তাঁ'কে এক বিরল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাঙনমুখী সমাজ জীবনের মধ্যে প্রচলিত ব্যাপক অবিচার, শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নির্যাতিত মানুষের জন্যে কবি-মানসের সহজাত বেদনাবোধ প্রত্যেক কাব্যের অসংখ্য কবিতায় বিচিত্র এবং লক্ষ্যভেদী উপমা-রূপকের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উপমা-রূপকগুলি যেমন তীক্ষ্ণাগ্র তেমনি অব্যর্থ। এখানেও কবি-মানসের 'কবি ব্যক্তিত্ব' বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয় হ'য়ে উঠেছে। নির্যাতিত মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি বার বার ধনিক সমাজের কথা টেনে আনেন নি বরং নির্যাতিত মানুষেরা তদপেক্ষা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিম্নতর বস্তুর উপর যেমন অত্যাচার করে' সেই অত্যাচারিত বস্তুর হৃদয়-যন্ত্রণা দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার নির্মম সম্পর্ককে। তাঁতীর দারিদ্র্য এবং অসহায়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি মিল-মালিককে টেনে আনেন নি—তাঁতীর নিত্য ব্যবহার্য মাকুর সাহায্যে তিনি দারিদ্র্যের ওপর ধনীর নির্মম পরিহাসকে অনবদ্য করে' তুলেছেন :

> দেখিনু তন্দ্রাভরে—
> তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।

একদল লোক মাকুর মত মূক হ'য়ে খেটে চলেছে অবিরাম—তা'রা অসহায় নির্যাতিত। তাদের হৃদয়-বেদনা ও ক্লান্ত দেহের সকরুণ আর্তনাদ তো নিষ্ঠুর তাঁতীর কর্ণে পৌঁছায় না। ধনীর ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণের জন্যে এ হ'লো নিষ্পেষিতের অসহায় আত্মবলিদান। এই বলিদান যত মর্মান্তিক ও নির্মম হ'য়ে উঠছে ততই ধর্মের প্রগাঢ়

প্রলেপে শোষণকে সমর্থন করার চেষ্টা চলছে। জননীর কোমল বক্ষে অসহায় রূপে মৃত্যু ঘটে স্নেহদুলালীর কিন্তু 'দেঁতো'র দল বলে লীলাময় মঙ্গলময়ী :

ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

শ্রীমায়ের চরণতলে পাঁঠার বলিদানও আর কিছুই নয়—তা' হ'লো আত্মভোগলিপ্সু দানবরূপী শক্তিমান নির্মম মানুষের হাতে পশুরূপী দরিদ্র মানবের নিঃসহায় আত্মসমর্পণ। অথচ এই নির্মম হত্যাটিকেও আমরা ধর্মের আড়ালে ঢেকে নতুনতর অর্থ দান করেছি :

অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি ?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এক কোপে বলিদান—
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি আহা কত না ভাগ্যবান !

"মরুশিখা"র 'খেজুর-বাগান,' 'বাঁশির গল্প' ; "মরুমায়া"র 'পাষাণ-পথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতায় নির্দয় শোষণের উলঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। খেজুর গাছের কণ্ঠে নলি বসিয়ে তা'র যে হৃদয়-শোণিত 'রস' বার হয় তাই পান করে' রসখোর, তাড়িখোরের বাড়ে উল্লাস :

মোদের এখানে খেজুর বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর ;
না জানি সেখানে হেসে খুন কোন্ রসখোর তাড়িখোর !

॥ খেজুর-বাগান : মরুশিখা ॥

'কবির এই যে রসখোর এবং তাড়িখোর সম্বন্ধে বক্রোক্তির ব্যঞ্জনা এ শুধু স্বৈরাচারী শোষক মানুষ সম্বন্ধেই নয়—সেই রসখোর এবং তাড়িখোরের পূর্ণ-পরিণতি যে বিধাতায় তাঁ'র সম্বন্ধেও।'

'পাষাণ-পথে' এবং 'কেতকী' কবিতা দু'টি রূপকধর্মী কবিতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। 'ইঁট-পাথরের বিরাট নগর'-পথে কোন এক খরদীপ্ত গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে কবির দৃষ্টি আবদ্ধ হয় লোহার খাঁচায় আবদ্ধ মানুষের সেবারত ছিন্নবৃন্ত 'বকুল' ফুলের প্রতি। বকুলকে

বৃন্তচ্যুত করে' তা'র মর্মভেদী ক্রন্দনকে মানুষ ঢাকতে চায় সেবা-ধর্ম-মাহাত্ম্যের রঙীন আল্পনা দিয়ে :

> কত না বকুল দিল তা'র ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ !
> দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।
> ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেই ত চরম সুখ,
> ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক।

অসংখ্য কবিতায় কবির এই শোষণবিরোধী দীপ্তঘোষণার রক্তাক্ত স্বাক্ষর স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভাঙনমুখী সমাজ জীবনেও যে নতুন চেতনা এসেছিল কবিতাগুলি সে চেতনারই অনবদ্য রূপায়ণ। বস্তুতঃ এই কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে কাব্যহৃদয়ের যে উত্তপ্ত নিঃসীম অন্তরাবেগ এবং ঐকান্তিক মর্মপীড়ন বজ্রদীপ্তঘোষণায় আত্মপ্রকাশ করেছে তা' নয়া দুনিয়ার বুনিয়াদ পত্তনের প্রারম্ভিক বিপ্লবী বাণী। এ সব কবিতা দুঃখবাদী কবির হৃদয়জ্বালার বহ্নিদীপ্ত অভিজ্ঞান।

॥ *চার* ॥

শ্যামাঙ্গ বাংলার কোমল বুকের রোমান্টিক আবহাওয়ার এক বিশেষ গুণ আছে—সে আপনার জারক রসে জরিয়ে সবাইকে ঠিক আপনার মত করে' ফেলে। কতজনই উত্তপ্ত দেহমনে অনির্বাণ বিদ্রোহবহ্নি আপন ললাট পরে জ্বালিয়ে গর্জন আস্ফালনে তা'র কোমল বুকে পদার্পণ করেছে কিন্তু সে বজ্রবহ্নি শেষ পর্যন্ত দীপালোকের মত নির্মল হ'য়ে উঠেছে। তৃণাচ্ছাদিত বাংলার মৃত্তিকার কোমল স্পর্শে শেষ পর্যন্ত সকলেই আপন দেহোত্তাপ হারিয়ে হিমশীতল হ'য়ে পড়েছে। এজন্যেই শৌর্য-বীর্যের আদিম প্রতীক চাঁদ সওদাগরের ধীরোদ্ধত মস্তক লুটিয়ে পড়েছে মনসা দেবীর চরণতলে, বিদ্রোহী দুলাল নজরুলও শেষ পর্যন্ত আপন বিদ্রোহ সত্তার ভেরী-ঘোষক 'ইস্‌রাফিলের সিঙ্গা' ভুলে 'মুরজ

মুরলী'তে তুলেছেন অমিয় তান, দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথও যৌবনোত্তর যুগে দুঃখের দাবদাহ হারিয়ে "মরুমায়া"র মরীচিকার বক্ষ বিদীর্ণ করে' অবশেষে ফিরে এসেছেন গঙ্গাতীরে, জীবন জুড়ানো বাংলার বুকে। তাঁ'র হৃদয়োত্তাপের শিথিলতা লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে 'সায়াম' কাব্যগ্রন্থ হ'তে—অবশ্য "মরুমায়া" কাব্যগ্রন্থেই খর-তীক্ষ্ণ আপাতঃ রূঢ়তার অন্তরাল হ'তে আর একটি কোমল সুর অস্পষ্ট রাগিণীতে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। "মরীচিকা"র 'বেহালা' কবিতায় এই সুরপরিবর্তনের আভাসটি ধরা পড়েছে :

আমি বোধ হয় কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা ;
অকারণের কান্না-হাসি
মুখে যে মোর উঠছে ভাসি'—
এ বু'ঝ সেই পুব জনমের দেয়ালা।

এ কবিতাকে রোমান্সরাজ্যের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের বলতে অস্বীকার করবে কে ?

'শৈব' যতীন্দ্রনাথের এই সুরপরিবর্তনকে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় কবির স্বধর্মচ্যুতি না বলে বলেছেন এই পরিবর্তন কবি-মানসের ক্রমপরিণতি। এই পরিবর্তন যদি যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে লক্ষণীয় হ'য়ে না উঠতো তা' হ'লে শিল্পী হিসেবে তাঁ'র মৃত্যু হ'তো প্রথম তিনখানা কাব্যগ্রন্থ রচনার পরই। কেননা এই সুরপরিবর্তন না হ'লে প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, ছন্দ পরবর্তী কাব্যগুলিতে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠতো ফলে তা' চর্বিতচর্বন ছাড়া আর কিছুই হ'তো না। তাই এই সুরপরিবর্তন কবির পক্ষে মঙ্গলের। এই পরিবর্তনই কবির মনঃদিগন্তে নতুন সৃষ্টির উৎসমূল খুলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই সুরপরিবর্তন বার বার বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছে। বার বার ঋতু পরিবর্তনের মাঝেই রবীন্দ্রকাব্য বিরল সৌন্দর্যের লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। 'মেঘনাদ-

বধ' কাব্য রচনায় অত্যাশ্চর্য সাফল্যের পর কবির বন্ধুবান্ধব তাঁ'কে আর একটি বীর রসাশ্রিত কাব্য রচনার জন্যে বার বার অনুরোধ করেন কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবাইকে জানালেন 'A fresh attempt would be some thing like a repetition'—সুতরাং সবাইকে চমকিত করে' তিনি লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। মধুসূদনের কবিধর্মের বিকাশের জন্যে এই সুরপরিবর্তনের অত্যাবশ্যক ছিল। সুতরাং এই সুরপরিবর্তন দুঃখের দাবদাহে বহ্নিমান কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয়েছে।

এখন এই সুরপরিবর্তন কী এবং কিসের তা' যতীন্দ্রনাথের যৌবনোত্তর কাব্যগুলি হ'তে আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। মোটামুটিভাবে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তিন দিক থেকে—প্রকৃতি সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে এবং রোম্যান্টিকতা সম্পর্কে।

প্রথম যৌবনের কবিতাগুলিতে আমরা দেখে এসেছি প্রকৃতিকে অলীক স্রষ্টার বিজ্ঞাপন বলে কবি যতীন্দ্রনাথ বার বার তা'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানব শিশুর সমস্ত শৌর্যবীর্য প্রকৃতি হরণ করে' মানবের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে প্রকৃতি যেন মস্ত বড় বাধা। সুতরাং এ প্রকৃতি কখনো মানুষের বন্ধু হ'তে পারে না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে এই দৃষ্টিভংগীর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। যৌবনোত্তর কাব্যগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কোমল ও করুণ সুন্দর অভিব্যক্তি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'আষাঢ়-মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাই কবির একটি আস্বাদন-মন্থর রূপমুগ্ধ মনের পরিচয়—যে অসীম নীল আকাশ একদিন কবির কাছে কারাগার হ'য়ে উঠেছিল আজ সেই অসীমের উদারতায় কবি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। প্রকৃতি এখানে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু :

> ভগ্নদেহ, রুগ্নমন, নিবিড় নীল গগন, বাতায়নে লৌহদণ্ড সারি,
>
> মাঠ পরে মাঠ শুধু আষাঢ়েও করে ধূ ধূ! হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!
>
> ॥ আষাঢ়-মধ্যাহ্ন : সায়ম্ ॥

এখানে নির্জন আষাঢ়-মাধ্যাহ্নের বিরল সৌন্দর্য কবির রূপদৃষ্টিতে

অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। এ প্রকৃতি সুন্দর, এ প্রকৃতি মনোহর, এ প্রকৃতি কবির চির-আরাধ্য।

প্রথম জীবনে কবির অবচেতন মনে প্রকৃতির ওপর যতটা আকর্ষণ ছিল সচেতন মনে ছিল তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি বিকর্ষণ। কাব্য-জীবনের উষালগ্নে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভংগী অবিশ্বাস ও বিরূপতায় পর্যবসিত। জীবনকে তির্যক দৃষ্টিভংগীতে দেখায় কবির প্রথম জীবনে সমগ্র অন্তর্লোকব্যাপী অভিমান-বিস্ফার বেদনা ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল এবং সেই ঘনীভূত বেদনাবোধই প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাই অসীম প্রকৃতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্লভ রোম্যান্টিকতার সুর এবং মঙ্গলের বাণী উচ্চারিত তা' কবির শ্রুতিপথে বিধৃত হয় নি; কিন্তু কবির উত্তর-কাব্যে এই সুর সুন্দর হ'য়ে ধরা পড়েছে। তাই প্রথম জীবনে যিনি 'শাওন-রাতি'তে মেঘের গুরু গুরু ডাকে শুনেছিলেন শাবকহারা বাঘিনীর গর্জন, বিদ্যুৎ-ঝিলিকে দেখেছিলেন নাগিনীর নৃত্য, "সায়ম্"-এ সেই কবিই শ্রাবণের অবিরল ধারাপাতনে শুনেছেন পথহারা বৈরাগীর একতারার গান, বিদ্যুৎ-ঝিলিকে দেখেছেন মোহিনীর ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে একটুকরো হাসি:

শাওন এল ওই
থৈ থৈ শাওন এল ওই!
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!......
শাওন গাঙের ভাঙন বেয়ে
ঘট ভরি কাঁখে
কোন্ বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে!
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

প্রকৃতির ষড়ঋতুচক্রের মধ্যে কেবলমাত্র দুই চরম ভাবাপন্ন ঋতু—গ্রীষ্ম ও শীত—প্রথম যৌবনে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত বার বার ধিকৃত হ'য়ে ফিরে এসেছে কবির কল্পনালোক হ'তে। বসন্তকে তো তিনি বার বার উপেক্ষা করেছেন, তাঁ'র ভয় ছিল পাছে এই বসন্ত রূপ তত্ত্বের বাঁধনে তাঁ'কে বেঁধে ফেলে কিন্তু উত্তর-কাব্যে বসন্তের জন্যে ব্যাকুলতা তীব্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। রূপপাগল পথিকের মত বসন্তের স্বপ্নমন্থর সোনালী দিনের রূপসুধা আকণ্ঠ পানের জন্য কবির অন্তরাবেগ শত ব্যঞ্জনায় মূর্ছিত হ'য়ে উঠেছে। ফাল্গুনের রোমাঞ্চ-রঙীন দিনের কিশোরসুন্দর দেবতার জন্যে তাইতো কবির উৎকণ্ঠার অবধি নেই :

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর ?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি উঠিছে কোন্
বেদনা বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রাশ্রয়ী দীপান্তের বন !

॥ হিম-ভূমি : ত্রিযামা ॥

যে শীত একদিন রিক্ত সন্ন্যাসীর মত পিঙ্গল জটাজাল নিয়ে দুঃখবাদী কবির দুঃখের দাবদাহে বেগসঞ্চার করেছিল—সেই শীতকে উপেক্ষার জন্য আজ কবির মন ব্যাকুল। যৌবনের রক্তোত্তাপ চলে গেছে—কবি আজ তুহিন-কাতর :

এত শীত—
আমার অন্তরে এত শীত !
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজক প্রমাণ।

যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নসূর্যের হোমানল একদিন যৌবনদীপ্ত কবির

বলিষ্ঠ প্রতিবাদের তীক্ষ্ণাগ্র হাতিয়ার হ'য়ে উঠেছিলো সেই বহ্নিজ্বালা আজ কবির কাছে সুদুঃসহ :

নিদাঘ হ'ল যে সুদুঃসহ
হে মোর-ভ্রমর হেথায় রহ
বন্ধ এ বুকে পাখা ভরি আনো
পদ্মবনের গন্ধবহ।
॥ ভ্রমর : সায়ম্ ॥

আজ আর নিদাঘের হোমানল নয়, শীতের তুহিন-কাতর নিস্তব্ধ পরিবেশও নয়—কবির আজ একান্ত প্রয়োজন পদ্মবনের গন্ধবহ। কবিমন আজ রূপপিপাসার তীব্রতম আকর্ষণে আলোড়ন বিক্ষুব্ধ। বসন্তের রূপ-উছল পুষ্প-প্রণয়কে উপেক্ষার জন্যে আজ কবিমন বেদনাম্লান, বর্ষার সজল মেঘমালার আহ্বানকে এড়িয়ে আসার জন্যে আজ কবি-মানস বেদনাবিধুর হ'য়ে উঠেছে। যৌবনোত্তীর্ণ জীবনের প্রৌঢ়সন্ধ্যায় কবিমনের উপলখণ্ডে আজ অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতার মধুরকোমল আমেজ সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। গ্রীষ্ম নয়, শীত নয়—হেমন্ত-সন্ধ্যার স্বপ্নঘন পেলবমসৃণ ঝিলিমিলিতে কবি এক সুদূর সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন :

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন সুন্দরে করি সন্ধান!
হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু!
॥ হেমন্ত-সন্ধ্যায় : ত্রিযামা ॥

এখানে কেবল একটি রূপপাগল পথিকের রূপমুগ্ধতা নয়—একটি অনন্যসুন্দর দুর্লভ চিত্র আপন গরিমায় নম্রমনোহর হ'য়ে উঠেছে। এখানে কবি-মানস সম্পূর্ণ রোম্যান্টিকতার অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আজীবন এই সুন্দরের ধ্যানই করেছেন। যে কবি একদিন প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন সহস্র বন্ধন, অনুভব

করেছেন অমঙ্গলের লক্ষ চিহ্ন, যে অমঙ্গল-সংকেত এবং বন্ধন-ব্যূহ বিদীর্ণ করার জন্য ছিল কবির অতন্দ্র প্রয়াস—আশ্চর্য, আজ সেই কবিই প্রকৃতির লক্ষ-কোটি বন্ধনকে নম্রমস্তকে বহন করার জন্যে আবেগ ব্যাকুল। প্রকৃতির মাঝেই আজ তিনি দেখেছেন সুন্দরের রূপমূর্তি, মঙ্গলের ফল্গুপ্রবাহ। প্রথম জীবনে বসন্তে, বর্ষায় সুন্দরের মধুরতম আহ্বান নির্মম কর্কশতায় ও পৌরুষদীপ্তির রুক্ষতায় প্রত্যাখানের পর আজ হেমন্ত-সন্ধ্যার কোমল বক্ষের রূপাল্পনায় মাঝে মহান্ সুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার একী দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস পরিবর্তন এখানে সুন্দর হ'য়ে ধরা পড়েছে।

হেমন্ত-সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে কবি অস্পষ্ট ভাবে যে সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন সে সুন্দরের সবটুকু আপন হৃদয়-দেউলে গ্রহণ করার জন্যে কবি ব্যাকুল। শেষের দিকে প্রথম যৌবনের নিষ্ঠুরতার জন্যে তীব্র অনুশোচনা ও অপরিসীম বেদনাবোধ কবিকণ্ঠে আকুল আবেগে ভেঙে পড়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম যৌবনের এই নির্মম ব্যবহার কবির নিকটেও বেদনাবহ হ'য়ে উঠেছে। তাইতো তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন :

> শস্য-শ্যামল সজল বনের হরিণী তুমি,
> কবে কি কারণে করিলে বরণ ধূসর ঊষর এ মরুভূমি ?

আজ আর খরদীপ্ত মরুভূমির বহ্নিদাহন নয়—শস্য-শ্যামল সজল বনের স্নিগ্ধ হাওয়াই কবির কাম্য। প্রথম জীবনে কবির নিকট প্রকৃতি উদ্ধত, অমঙ্গল-প্রতীক, অসুন্দর আর আজ শান্ত, মঙ্গলময়ী, মধুর। এই চঞ্চল হ'তে অচঞ্চলে ; অমঙ্গল হ'তে মঙ্গলে, অসুন্দর হ'তে সুন্দরে উন্নীত হওয়ার মর্মমূলেই নিহিত রয়েছে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মানস পরিবর্তনের সুস্পষ্ট পরিণতি।

॥ *পাঁচ* ॥

জীবনের উষালগ্নে কবির কাছে প্রধান হ'য়ে উঠেছিল জড়ের আবেদন। চেতনা ও জড়ের মধ্যে তিনি জড়কেই প্রধান করে' দেখেছিলেন। তাই প্রথম জীবনে তিনি যেমন দুঃখবাদী তেমনি জড়বাদীও। বস্তুতঃ তাঁর দুঃখবাদ এই জড়বাদ হ'তেই উৎপন্ন। দুঃখবাদ জড়বাদেরই রকমফের মাত্র। চেতনার ধ্বংস-শ্মশানে জড়ের নৃত্যস্পন্দন কবির কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলেই কবির কাছে প্রেমের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। প্রেমের সূতিকাগার চেতনায়। প্রথম জীবনে এই চেতনা কবির নিকট মিথ্যে হ'য়ে ওঠায় প্রেমের আবেদনও মিথ্যে হ'য়ে উঠেছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রেম বলে কিছু নাই।' কিন্তু 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থ হ'তে কবির এই জড়বাদী দৃষ্টিভংগীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম জীবনে তাঁ'র মনে হয়েছিল জড় হ'তেই চেতনের উদ্ভব এবং জড়ের বুকেই চেতনের লয় কিন্তু যৌবনোত্তর যুগে তাঁ'র মনে হয়েছে জড় চেতনের ভগ্নাংশ মাত্র, চেতনের বুকেই রচিত হয় জড়ের শ্মশান-চিতা। সুতরাং উত্তরকালে কবির কাছে এই প্রেমের স্বরূপ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠায় নিয়তির মত অনিবার্য কারণে শত বর্ণরাগে প্রেমও বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থ হ'তে তাইতো তিনি আর প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং প্রেম তা'র সুকোমল অনুভূতির সাথে সমুদয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবীর আল্পনায় কবির চিত্তকে প্রেমব্যাকুল করে' তুলেছে। তাই আপাতঃ রুক্ষতার অন্তরালে যে রূপপিপাসা চাপা ছিল প্রৌঢ় জীবনে সেই রূপ-পিপাসা প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। এই রূপ-পিপাসার অভ্যন্তরলোকে তিনি অবলোকন করলেন সুন্দরের জ্যোতির্ময় মূর্তি। যতীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা এই সুন্দরের মহান্ প্রতিষ্ঠায় বর্ণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

প্রেমের কবিতায় এই সুন্দরের মহান্ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হ'লো এই কবিতাগুলির স্মৃতিধর্মিতা। যৌবনে প্রেমকে অস্বীকার করায় যৌবনরাগে রঙীন হ'য়ে সজীব ও জীবন্ত-রূপে প্রেম কবির কাছে ধরা দেয় নি—ধরা দিয়েছে স্মৃতিরূপে। স্মৃতিধূপের সুরভিতেই কবি উপলব্ধি করেছেন প্রেমমৃগনাভির স্বর্গীয় বৈভব। সুতরাং কবির প্রেমের কবিতার একপ্রান্তে আছে স্মৃতির স্পর্শ অন্য কোটিতে আছে প্রৌঢ়ত্বের ম্লানতা। কবিতাগুলিতে প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ আছে বলেই যৌবনধর্মী প্রেম-কবিতার অসাধারণ উচ্ছ্বাস এবং সীমাতিক্রমী আতিশয্য হ'তে এসব কবিতা মুক্ত। কবিতাগুলি একদিকে যেমন আতিশয্যহীন সহজ সুন্দর অন্যদিকে তেমনি সংহত সুকুমার। এবং স্মৃতির ভিতর দিয়ে কবি প্রেমকে আস্বাদন করেছেন বলেই বোধ হয় একটি করুণ বেদনার সুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোন কোন কবিতায় যৌবনের নির্মম আচরণের জন্যে তীব্র অনুশোচনাও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের প্রেমধর্মী কবিতাগুলিও স্মৃতি আশ্রয়ী কিন্তু সেখানে অনুশোচনার এমন তীব্র দাহন নেই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় এই তীব্র বেদনাবোধ ও অনুশোচনাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে :

> নিবানো দীপের ব্যথা হ'য়ে জমা
> যা'র দু'টি আঁখি হ'ল নিরুপমা,
> ঝরা পাপড়ির নিতি নিবেদন
> যাহার ওষ্ঠাধরে।

কিংবা :

> দাঁড়াইয়া আজি জীবন-সীমায়
> তনয় তনয়া তনু সুষমায়
> হেরি নব বেশে
> তব কল্যাণ রূপ,
> ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
> আরতি গন্ধ ধূপ।

॥ প্রত্যাবর্তন : ত্রিযামা ॥

'ত্রিযামা' কবির জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি লগ্নের কবিতাগ্রন্থ। স্মৃতি-মন্থর কল্পনা-রঙীন দিনগুলির সাথে কবির হৃদয়ভেদী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস সংযুক্ত হ'য়ে অধিকাংশ কবিতাকে বেদনা বিধুর করে' তুলেছে। যে বলিষ্ঠ প্রেম-সুষমাকে তিনি যৌবনে করেছেন অস্বীকার আজ বার্ধক্যের দীর্ঘ নিশ্বাসে কবি তা'কেই অর্চনা করেছেন মনে প্রাণে :

তোমার যৌবন গেছে
তুমি আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনু মন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।
।। শপথ ভঙ্গ : ত্রিযামা ।।

বহু অস্বীকৃত প্রেমকে কবি নতুনতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন যৌবনোত্তর যুগে। প্রেমে আজ কবি গভীর বিশ্বাসী। জীবন-ব্যাপী আজ কেবল প্রেমেরই মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রতন্ত্র কিংবা ধর্মাচরণ কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাঁ'র মুক্তি প্রেমের ভিতর দিয়ে এবং সে প্রেমের দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন প্রিয়ার নিকটে :

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতী,
গৃহিণী-সচিব সখী হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।

প্রেমাসক্তি জীবনাসক্তিতে এবং জীবনাসক্তি শেষ পর্যন্ত দেহাসক্তিতেও পর্যবসিত হয়েছিল,—কবির কতকগুলি কবিতায় এই দেহাসক্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থে "জংশন ষ্টেশন" কবিতাটির মর্মমূলে স্পন্দিত হয়েছে এই দেহাসক্তির কথা :

তবু ছু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি
এই যে জীবন-রাতি
ক্ষীণ দীপ জ্বালি'

কাটাই দু'জনে—
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
এ রজনী হবে ভোর।

॥ অংশন স্টেশন : সায়ম্ ॥

কয়েকটি প্রেম-কবিতায় লঘুচাপল্য এবং হাস্যরসিকতা স্থান পেয়েছে—প্রৌঢ়া গৃহিণীর সঙ্গে প্রৌঢ় গৃহীর কথাবার্তায় হাস্য-কৌতুকের সুন্দর ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে "ত্রিযামা"র "প্রেম ও কবিতা"র মধ্যে :

ঝামেলা এড়াতে সতী তুমি নাকি সম্মতি
দিয়েছ করিতে বাসা ভিন্ন,
কিছু কিছু খোরাকীর আশা পেলে সে নাকি
এখনি বাঁধন করে ছিন্ন।

॥ প্রেম ও কবিতা : ত্রিযামা ॥

কিন্তু এই তরল পরিহাস-সুরে যতীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার মর্মমূল ঝংকৃত হয় নি, এখানে প্রেম-কবিতার সার্থকতা নয়—এই তরল পরিহাসের খণ্ডভূমি অতিক্রম করে' কবির প্রেম-কবিতার অনুরণন দূর দিগন্তে বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। বিরহের মাঝেই কবি প্রেমের গভীরতর রূপ দেখেছেন। কালিদাস যে নির্বাসিত প্রেমের গান গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ আজীবন ব্যাপী যে বিরহবিধুর যুগল প্রেমের বন্দনায় সরব, কবি যতীন্দ্রনাথও সেই প্রেমের দুর্লভ স্পর্শে মহিমান্বিত হ'তে চেয়েছেন :

দুর্লভ কর বন্ধু আমার
দুর্লভ কর হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
কর অতি বরভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

এখানেই যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিমন্থর প্রৌঢ় প্রেম-নিবেদনের সামগ্রিক সার্থকতা।

॥ ছয় ॥

যে কারণে যতীন্দ্রনাথ প্রেম ও প্রকৃতিকে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি—সেই কারণেই তিনি রোম্যান্টিকতাকেও আপন গহন হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন নি। তাঁ'র বিশ্বাস ছিল কবিতায় রোম্যান্টিকতার আতিশয্য মানবকুলের বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনের সহায়ক নয়—অযথা শূন্যগর্ভ বাষ্পাকুলতা আত্মবঞ্চনারই নামান্তর। এই আত্মপ্রবঞ্চনার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন 'সায়ম'-এর 'রবি-প্রণাম' কবিতায় :

> শূন্যমুখে বাষ্পস্বরা,
> বারংবার ঘুরে ধরা
> বিধিবদ্ধ আহ্নিকে বার্ষিকে
> এই পূজারতি মাঝে
> এ দীপ লাগে যে কাজে
> তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
> যত জলি মনে হয়
> জলায় এ অপব্যয়
> কেবলই ত' আপনা বঞ্চনা।
>
> ॥ রবি-প্রণাম : সায়ম্ ॥

দূর অসীমলোক থেকে যে অজানা বার বার রবীন্দ্রনাথকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছে—এমন অজানা রহস্যের পিছনে যতীন্দ্রনাথ কোনদিনই ঘোরেন নি। যতীন্দ্রনাথের মতে এই অজানা রহস্য অলীক স্বপ্নমাত্র—এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অজানার উন্মাদনা নয় 'সম্মুখেতে যে কষ্টের সংসার' সেটাই আসল সত্য। তাই যাঁরা অজানা রহস্যের পিছনে উন্মাদ হ'য়ে ফেরেন—ওড়ার আবেগে তাঁদের দেহটা পিছনে পড়ে যাবে কিনা কবি শ্লেষ-পূর্ণ কণ্ঠে সেটা দেখে নিতে বলেছেন। আসলে প্রথম জীবনে কবি

বক্র-কটাক্ষ দিয়ে সকল কিছুই দেখেছিলেন বলেই জীবনের গভীরতর সত্য অপেক্ষা দুঃখের দিকটাই তাঁ'র দৃষ্টিতে প্রধান হ'য়ে উঠেছিল—জীবনের এই 'কালো' রূপের অন্তরালেই সকল সৌন্দর্য সুষমার সমাধি রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-জীবনে বার বার বিভিন্ন সংগীতে যে অসীম রহস্যময়ীর নীরব পদসঞ্চার হয়েছে, যে অসীম লীলা-খেলায় কবির জীবন-বেলা বার বার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—সেই চিরমধুর অচেনাকে চেনার জন্যে, সেই লীলামাধুরীর কথা বলার জন্যে সহস্র সহস্র কবিতা লেখার পরও কবি বলেন :

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,......
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।...
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারই প্রকাশ।

॥ বলাকা : ৪১ নং কবিতা ॥

রোম্যাণ্টিক-বিরোধী কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্লেষ প্রয়োগ করার এই তো সুযোগ। অমনি তাঁ'র কণ্ঠে শোনা যায় :

প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছে নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা !
কেন এ প্রয়াস ভাই ?
যে কথা তোমার হ'ল নাকো বলা, নেই সেই কথাটাই।

॥ ঘুমের ঘোরে : ৪র্থ শ্লোক : মরীচিকা ॥

এখানে যতীন্দ্রনাথ কেবল রবীন্দ্র-বিরোধীই নয় রোম্যাণ্টিক-বিরোধীও। আসলে প্রথম জীবনে বাস্তব দিকটা কবির দৃষ্টিতে প্রকট হ'য়ে ওঠায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কয়েকটি 'হক' কথা সবাইকে শুনিয়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল—তাই সকল রূপরসের বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে সরব হ'য়ে উঠেছে কবির আপাত রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ। তিনি বহুবার বলেছেন কবিতা ভোগ-

বিলাসের সামগ্রী নয়—তাই লোকমুখে তিনি কাঞ্চীপুরের কবি-প্রিয়াকে রাজসভার নটী বলে রটিয়ে দিয়েছেন :

লোকের মুখে দেশ-বিদেশে বার্তা গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবিপ্রিয়া কাঞ্চীরাজের নটী।

॥ কবি জাতক কথা : ত্রিযামা ॥

তাই তিনি শেষ পর্যন্ত কবিপ্রিয়া ছন্দায়তীর বীণাযন্ত্রে বিষ মিশিয়ে ভোগবিলাসিনী কবিপ্রিয়াকে দাহন যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছেন—এখানে ধ্বংস হয়েছে ভোগবিলাসিনীর বিষাক্ত মূর্তি। এই কবিতার ভিতর দিয়ে কবি প্রকারান্তরে রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু রোম্যান্টিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত কবি রক্ষা করতে পারেন নি। 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থ হ'তে যে সমন্বয়ের সুর কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল তার পূর্ণ পরিণতি দেখি 'ত্রিযামা'য়। প্রকৃতি সম্পর্কে সুরপরিবর্তনের কবিতায় আমরা দেখেছি কবির বীণাযন্ত্রে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে অজানা রহস্যেরই সুরমূর্ছনা—কিন্তু এই অজানার বিরুদ্ধেই তো কবির আজীবন বিদ্রোহ! অবশ্য 'সায়ম'-এর পূর্বেই কবির কণ্ঠে এই সুর বিশেষ-রূপে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলও তাঁ'র 'সায়ম'-এর পূর্বে সংঘঠিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন চেতনাশ্রয়ী, যতীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ছিলেন জড়বাদী—এখানে রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁ'র বিরোধ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি চেতনাশ্রয়ী—এখানেই তিনি রোম্যান্টিকানুগ এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁ'র বিরোধের অবসান এখানে। 'ত্রিযামা'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি রোম্যান্টিক-রবীন্দ্র উভয়বিধ বিরোধাবসানের সুস্পষ্ট ঘোষণাপত্র :

নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা দখিন সমীর

সহসা আসিয়া স্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা যৌবনের রাগে
সেথানে উতন প্রাণে হৃদয় মগন গানে কবি এক জাগে।......
উঠিছে ঝিল্লির গান তরুর মর্মর তান নদী কলস্বর।
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় গোনা আকাশের 'পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে সংগীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লও মনে জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র পর্ণে প্রস্ফুট আলোকে,
পরিচয় লহ তা'র মহামৌণ তমিস্রায় নক্ষত্র পুলকে।

॥ পঁচিশে বৈশাখ : ত্রিযামা ॥

কবিতাটি তো রবীন্দ্র-প্রশস্তি বটেই তা' ছাড়া যেন রোম্যান্টিক তুলির বিরল দৃষ্ট বর্ণ-বিন্যাসে আঁকা একখানি বিচিত্র মনোরম চিত্র-এ্যালবাম্।

প্রথম জীবনে কবি ছিলেন নাস্তিক—ঈশ্বরের বিশ্বাস তো দূরের কথা সেই শয়তান 'কর্মকারের' বিরুদ্ধেই তো তাঁ'র যত বিদ্রোহ। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি আস্তিক—ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীল। 'সায়ম্' ও 'ত্রিযামা'র অনেকগুলি কবিতায় এই নির্ভরতার বার্তা ঘোষিত হয়েছে। আস্তিক মনের পরিচয় 'গান্ধীবাণী' কবিতায় সুন্দররূপে ধরা পড়েছে :

প্রত্যয়ের মত প্রত্যয় জন্মেছে অন্তরে,
তাঁর ইচ্ছার দোলা না লাগিলে
পাতাটিও নাহি নড়ে।
প্রতি নিশ্বাস সহ
বুক ভরে মোরা করি যে গ্রহণ
তাঁহারই অনুগ্রহ।

এ 'গান্ধীবাণী' নয়—যতীন্দ্রবাণী। নাস্তিকের বাণীতে ঈশ্বরের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় কখনো সম্ভব নয়। এই আন্তরিকতাও তাঁ'র রবীন্দ্র-বিরোধ মীমাংসার আর একটি দিক। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম জীবনে কবির বিরোধ থাকলেও শেষ জীবনে ঐকান্তিক মিলনই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় এ প্রসঙ্গে

দুঃসাহসিকতার প্রকাশ করেছেন। তাঁ'র মূল্যবান মন্তব্যটি এই: "যতীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধিতা করেছেন, তাঁ'র মূলে কোথাও যথার্থ বিরোধ ছিল না—রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ অনুরাগই তাঁ'কে রবীন্দ্র-অভিমানী করে' তুলেছিল। সেই অভিমান কবির পরিণত কবিতার পরম অনুরাগেই পরিণত হয়েছে, কবি তাঁ'র স্বরূপে ফিরে এসেছেন।"

প্রথম যৌবনে রোম্যান্টিকতার সাথে বিরোধ থাকলে শেষ জীবনে সে বিরোধ যে বিদূরিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আর একপ্রকার রোম্যান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে—শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় যাকে বলেছেন 'নব রোম্যান্টিকতা' এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় 'রোম্যান্টিকতার রকমফের'।

যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এমন কতকগুলি কবিতা পাই যেগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন রোম্যান্সের আমেজ নেই বলে মনে হয়—কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে সেই সব কবিতার মধ্যেও 'নব রোম্যান্টিকতার' অপূর্ব দীপ্তি চোখে পড়ে। বহুখ্যাত 'বেদিনী' কবিতাটি এই ধরনের কবিতার একটি:

> ফাল্গুন হাওয়া নয়রে বেদিনী, দখিন হাওয়া এ নয়
> ঈশান কোণের ফণীর ফণায় বিষের নিশ্বাস বয়।...
> অকালের এই কালবৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
> সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে বেদেনীর হাত ধর।...
> হাওয়ার উজানে দিক ঠিক রেখে আঁধারে আঁধারে চল,
> আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ পারের সাপুড়ে দল।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে কবিতাটি একটি বাস্তব চিত্রবাহী রোম্যান্টিকতাশূন্য বাস্তব কবিতা। বাস্তববোধের জন্যে 'ফণীর ফণায় বিষের নিশ্বাস', 'তাঁবুর খোঁটা,' 'ভাঙা ফাটাফুটো তৈজস,' 'ছাগলের দড়ি,' 'সাপের ঝাঁপি,' 'লম্বা লম্বা সাপ' সবই আছে কিন্তু বিদ্যুতের ঝিলিক যে কবির কাছে লম্বা লম্বা সাপ হ'য়ে ওঠে

তাঁ'র মত রোম্যান্টিক কবি আর কে? অনির্দেশ্য রহস্যের পিছনে ঘুরে রোমান্সের সৃষ্টি নয় বরং অতি স্থূল একান্ত বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে উজ্জ্বল রোমাঞ্চের সঞ্চারণই হ'লো 'নব রোম্যান্টিকতার' প্রধান লক্ষণ। 'বানপ্রস্থ' কবিতাটিও এই শ্রেণীর কবিতা—সেখানে পাহাড়ী নদী, বাঘা বাইসনে জল খাওয়া, গারোণীর ডাক, পথহারা গাভীর হাম্বারব সবই আছে তবুও কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবুকতার সীমা-সর্গ স্পর্শ করেছে। একান্ত বাস্তব জীবনের ওপর কবি এনেছেন রোম্যান্টিকতার সুরমূর্ছনা। 'নব রোম্যান্টিকতার' আমেজে কবিতাটি দুষ্প্রাপ্য মনোহর হ'য়ে উঠেছে।

॥ সাত ॥

এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে গঠন রীতির দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কবিতা খাদশূন্য। কোন দুর্বল অংশ তাঁ'র কবিতায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সংঘর্ষ-সচেতন নিষ্ঠাবান শিল্পী। এই সচেতন মনের প্রমাণ পরিচয় তাঁ'র কবিতার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তাঁ'র কবিতার গঠন রীতি ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনিতে অটুট। তিনি 'কর্দম' দিয়ে ঘর গাঁথেন নি, গেঁথেছেন 'ইষ্টক' দিয়ে। "কবিতার ক্ষেত্রে মাটির ঘরের প্রতি কোন আসক্তি ছিল না যতীন্দ্রনাথের; কাদা মাটিকে বাছিয়া ছানিয়া প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ছাঁচে ঢালিয়া—তাহাকে ভাবনার তাপে তাপে শক্ত করিয়া পোড়াইয়া লইয়া তবে সেই উপাদানেই তিনি বিশেষ কবিতার আকার-প্রকার গড়িয়া তুলিতেন।" এই 'ইষ্টক' গঠনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। 'ঘুম ঘোর' কবিতাটি রচনার জন্যে তাই সুদীর্ঘ চার পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। একটি কবিতার পিছনে (কাব্য নয়) চার পাঁচ বছর সময় বাংলার অন্য কোন কবি ব্যয় করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু ছন্দ ও গঠন রীতি সম্পর্কে হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম

তিনখানি কাব্যগ্রন্থে কেবল মাত্র মাত্রিক ধ্বনি প্রধান ছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠকের নিকট বিরক্তিকর ও একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে। দু' একটি কবিতায় ছন্দের অদল বদল থাকলেও তা' পাঠকমনে নতুনতর কোন আস্বাদন-বৈচিত্র্য এনে দিতে সক্ষম হয় নি, তবে 'সায়ম্' কাব্যগ্রন্থ হ'তে কেবল মাত্র বিষয়বস্তুতে নয় গঠন রীতিতেও বিচিত্র ভংগীর পদসঞ্চার ঘটেছে। 'সায়ম্' এবং 'ত্রিযামা'য় 'বলাকা'য় ব্যবহৃত ছন্দের মত কিছু মুক্তবন্ধ ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। তিনি নতুন ধরনের অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করেন। ভাষার সাংকেতিকতা সম্পর্কে কবি ছিলেন একান্ত সচেতন এবং ভাষাকে দিয়ে তিনি অপূর্ব শক্তিসম্পন্ন সংকেত-ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। কবিতার মধ্যে তিনি প্রচুর উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন—কিন্তু উপমা-প্রয়োগের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের 'কবি ব্যক্তিত্ব' সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। উপমাগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন একান্ত জানা চেনা বাস্তব জীবন হ'তে—অথচ প্রয়োগ নিপুণতায় তাদের লক্ষ্য অব্যর্থ হ'য়ে উঠেছে। তিনি অনেক আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে কেউ-ই অভিজাত শব্দগুলির পাশে এমন আটপৌরে শব্দের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ সাধন করতে পারেন নি। কবি যতীন্দ্রনাথের পক্ষে বাংলা কবিতার ছন্দে শব্দ-প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবণতার জন্যে তাঁ'র কবিতায় বলিষ্ঠ বক্রোক্তি এবং শাণিত স্পষ্টোক্তির লক্ষ্যভেদী প্রয়োগ অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। বিদ্রূপাত্মক কবিতায় পরিহাস-নৈপুণ্য, বক্র বিদ্রূপ এবং শ্লেষসমৃদ্ধ বাক্‌বৈদগ্ধ বিশেষ রূপে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। তবুও বাঁধুনি এবং সংযমের অভাব হয় নি কোথাও। যতীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি সম্পর্কে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "তাঁ'র কবিতায় বিভিন্ন জাতীয় শব্দের শ্রীক্ষেত্র রচিত হয়েছে। তৎসম শব্দ থেকে আরম্ভ করে' দৈনন্দিন জীবনের অনভিজাত শব্দ পর্যন্তও তাঁ'র কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু কবি আশ্চর্য কৌশলে সরু-মোটা সব মিলিয়ে সুকুমার ও

সুগঠিত কাব্যরূপ রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় শিথিলতার স্থান নেই বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথের পর কাব্যরূপে এমন আতিশয্যহীন সংযত গাঢ় ক্ল্যাসিক্যাল গুণ বিরল দর্শন। কবিতার শব্দবৈচিত্র্য যতই থাক না কেন ইঞ্জিনীয়ার কবি তা'কে অনায়াসে কংক্রিট করে' তুলতে পারেন।"

যতীন্দ্রনাথ কিছু গদ্য কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু সার্থক গদ্য কবিতা তাঁ'র কাব্যে বড় নেই, অধিকাংশ মিলহীন ভগ্ন পয়ার মাত্র। সর্বশেষে স্মরণ কবি, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ। কিন্তু দুঃখবাদ পরবর্তী জীবনে ভেঙে চুরে নতুন রূপে, যদি ধৃষ্টতা না হয় তা' হ'লে বলি—সুখমুখী রোম্যাণ্টিক-বাদে পরিণত হয়েছে—তবুও যতীন্দ্রনাথের বড় পরিচয় তিনি দুঃখবাদী এবং এই পরিচয়ই তাঁ'র সর্বপ্রথম, সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত পরিচয়। কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে যদি যতীন্দ্রনাথের এই বিরল ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হ'তো তা' হ'লে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামটির সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য অনেক বাঙালী পাঠকের হ'তো না। হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাঁ'র নামটিও কালান্তর-লীলায় অস্পষ্টতার স্তর অতিক্রম করে' অবলুপ্ত হ'তো।

## ॥ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ॥

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই জাতের যা' কেবল উন্নত-শীর্ষ হ'য়ে নিজেকেই প্রকাশ করে না সাথে সাথে আড়াল করে অন্য সকলকে। তবুও এই সর্বগ্রাসী কবি প্রতিভার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে' যে ক'জন আপন স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে এভারেষ্টের পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরির মত আপন মহিমায় উর্ধ্বোন্মুখ হ'য়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রধান। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে উদার অসীমব্যাপ্ত কল্পনা-গরিমার অভিব্যক্তি দেখেছি সেই সীমালীন ধ্যানস্বপ্নের প্রমাণ-পরিচয় এঁদের কারো সৃষ্ট শিল্পকর্মে নেই—তবুও এঁরা বাঙালীর অতি পরিচিত এবং প্রিয় কবি। মহৎ কল্পনা ঐশ্বর্যে এঁরা দৈন্য হ'লেও এঁদের দৃষ্টিভংগীতে ছিল তীর্যকতার ছায়াপাত। এক একজন পৃথকানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ফলে রচনায় বিভিন্নতা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর রচনা তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে বুদ্ধিদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধির মহলে এ সব রচনার গতিবিধি নির্দিষ্ট। সূক্ষ্মতার ঔজ্জ্বল্যে, ইস্পাত-কঠিন গদ্যরীতিতে, এবং সর্বোপরি হৃদয়াবেগবিরল মননিষ্ঠ আলাপচারণায় এসব রচনা তীক্ষ্ণধার হ'য়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রহস্যময়তার ঘোর বিরোধী। কল্পনার চূড়ান্ত মহিমায় রবীন্দ্রনাথের রচনা যেখানে অতীন্দ্রিয়লোকের রহস্যময় আবরণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে' অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে আপন মানস-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে তীব্রভাবে আক্রমণ করে' বলেছেন: "যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা, তাহাকে

লইয়া গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না, কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট; স্বচ্ছ হইলেই Shallow বা অগভীর হয় না, কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাতুরী করিয়া "Miraculous" দাবি করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।" এ উক্তি হ'তেই দ্বিজেন্দ্রলালের শৈল্পিক-মানসের স্বরূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হ'য়ে ওঠে। তিনি কখনো অস্পষ্টতার আবরণে স্বীয় সৃষ্টিকে ধূমায়িত করে' তোলেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য: "রবীন্দ্র-কাব্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের এই তিক্ত মন্তব্যের মূল কারণ তাঁ'র মানসিক স্বাতন্ত্র্য—এই কারণেই তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের রহস্য-গভীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন নি। আধ্যাত্মিকতা বিসর্জিত সদা-জাগ্রত সচেতন কবিদৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যে স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতাকেই বড় করে' দেখেছেন।"

মোহিতলালের রচনা সারগর্ভ। কাব্যে কল্পনার প্রাচুর্য আছে। সে কল্পনার বহিঃপ্রকাশ আপন স্বভাবস্ফূর্ত নয়—সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হ'য়ে তা' অনেকখানি সংযত ও আবেগ বিরল হ'য়ে পড়েছে। বাস্তবধর্মীতা মোহিতলালের রচনার আর একটি বিশেষ গুণ। শাণ-বাঁধানো পাকা-সাহিত্যিক রাস্তায় তাঁ'র কবিতার যাতায়াত—সর্বত্র একটি সচেতন মনের স্পর্শ আছে। তাঁ'র রচনায় তুর্বল অংশ বড় কম। স্মৃতিচারী সংঘর্ষ-সচেতন মনের ব্যাকুল বীণায় কেমন যেন একটি বেদনার সুর বেজে উঠেছে—মোহিতলালের কাব্যের অনেক স্থানে এই আত্মিক বেদনার ম্লান ছায়াপাত হয়েছে। একটি বিদ্রোহাত্মক সুরধ্বনিও মোহিতলালের কাব্যে শোনা যায়—কিন্তু তা' ম্লান সন্ধ্যার পূরবীর তান—ভৈরবীর নর্তনশীল প্রচণ্ডতায় তা' আবর্তিত হ'তে পারে নি। যা' হোক—মনননিষ্ঠা এবং সংযত আত্মসচেতনতার ছায়াপাতে মোহিতলাল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ আসনের অধিকারী। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এবং মননপ্রধান

হওয়ায় এঁর রচনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন উপর তলার মানুষদের জন্যে সীমিত হ'য়ে আছে—আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র এঁর কবিতার ভাগ্যে জোটে নি।

নজরুল এবং সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ের রচনাই আমাদের বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। কবিতার ক্ষেত্রে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধ হয় এমন ব্যাপক প্রচার আর কোন কবির ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি। এই যুগল কবিদ্বয়ের মধ্যে আবার নজরুল-কাব্যের প্রচার এবং প্রসার সর্বাধিক। বাংলা কাব্যের কোমল বুকে নজরুলের আকস্মিক পদসঞ্চার—তা'র ধমনীর মন্থর-শিথিল প্রবাহকে বিদ্যুৎদীপ্তির চকিত স্পর্শে হঠাৎ তীব্রভাবে আন্দোলিত করে' গেল। একটি কালবোশেখী ঝড় অথবা প্রচণ্ড লু বাঙালী মনের কোমল বেলাভূমির ওপর উর্মিমুখর সমুদ্রকল্লোলের প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেল। কাব্য রাধাশ্যামের কুঞ্জবনের ছায়ালোকের খেলা ছেড়ে ইরাণী রোমাঞ্চের রৌদ্রভারে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। সহজ মসৃণ কাব্যধারার মধ্যে একটি সরব উচ্চকণ্ঠের ক্ষুরধার আহ্বান সকলকেই সচকিত করে' দিল। এমন কি মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বিস্মিত হ'য়ে ঘোষণা করলেন: "আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতালা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতালা হইতে নামেন নাই।...নজরুল ইস্‌লাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নতুন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর তাই। তাহাতে পালিশ বেশি নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।...কাজী নজরুল ইস্‌লাম নতুন যুগের কবি।" নিখিল মানবের জন্যে সুতীব্র বেদনাবোধ, অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভৈরবীর মীড় রচনা করা ছাড়াও প্রেমকোমলতার চিরমধুর সুরের নবীন উদ্‌ঘাটন নজরুল-কাব্যের আর একটি দিক। কঠিন-কোমলের সংমিশ্রণে নজরুল-কাব্যের আস্বাদনবৈচিত্র্য অনবদ্য। নজরুল-কাব্যে সুকর্ষিত কোন নিখুঁত কাব্যরীতি অনুসৃত হয় নি—ভাব-প্রাবল্যে ছন্দ আবর্তিত হয়েছে।

ফলে অনেক স্থানে ছন্দের দৌর্বল্য পীড়াদায়ক। তীক্ষাগ্র বাণীবিন্যাস কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত আলাপচারণা—এদের কোনটিও নজরুল-কাব্যে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। অনুভূতি এবং সহজ বেদনাবোধের আবেগেই তা'র কবিতা অভিনব। অনেকগুলি কবিতায় প্রকৃতি-তন্ময় মনের পরিচয় পাই। কোন কোন কবিতায় কল্পনার অসীমতা মনকে আকর্ষণ করে। সিন্ধু-হিন্দোল, পূজারিণী ইত্যাদি কবিতাগুলি তা'র প্রমাণ। ছন্দ মাঝে মাঝে দুর্বল হ'লেও বাংলা কাব্যে নজরুল দীপ্ত এবং চটুল ছন্দের বিচিত্র গতিপথ আবিষ্কার করেন—ফলে ছন্দ-বৈচিত্র্যও তাঁ'র কাব্যের আর একটি দিক। ভাব এবং প্রকাশ-ভংগীর এই সরব বৈচিত্র্য-বলিষ্ঠতাই বাংলা কাব্যে নজরুলের আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ এলেন ভিন্ন স্রোতে গা ভাসিয়ে। তাঁ'র কল্পনা সুদূরাভিসারী নয়। অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তার ঘোমটা টেনে তাঁ'র কবিতা-বধূ বনান্তরালের কুঞ্জবন অধিবাসী হয় নি। অতি স্পষ্টতা তাঁ'র কাব্যধারার উৎসমূল হ'তে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। এদিক দিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুসারী। মনে হয় বঙ্গ এবং ভারতভূমির প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতির দীক্ষাও তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিকট হ'তে গ্রহণ করেছিলেন। মোহিতলালের কাব্যে যে সচেতন মনের স্পর্শ পাওয়া যায় সত্যেন্দ্র-কাব্যধারায়ও তা' আভাসিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মননপ্রধান বুদ্ধিদীপ্ত রচনারও ছোঁয়াচ সত্যেন্দ্রনাথে বর্তমান। অনেক স্থানেই সত্যেন্দ্র-নাথের কাব্য আঙ্গিক সচেতনায় বুদ্ধিপ্রাখর্যের দিগন্তে পদার্পণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন হ'য়েও তিনি স্পষ্টতার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের এবং মননপ্রবণতার দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর পদানুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় যে সুদুর্লভ কল্পনা এবং ব্যঞ্জনগর্ভ ভাবের প্রবর্তনা দেখি তা' সত্যেন্দ্রনাথে নেই—এবং তা' না থাকার জন্যে নিজের অক্ষমতাও বেশ কিছু পরিমাণে দায়ী। রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেকার কবি-মানসের

সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় একটি সুন্দর কথা বলেছেন: "সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানস বহু বিচিত্র আপাত-বিরোধী মানসিকতার আশ্রয়ভূমি। রবীন্দ্রযুগের প্রখর আলোয় বাস করেও তাঁ'র একটি স্বতন্ত্র জগৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছে এসেও তিনি সবচেয়ে বড় অ-রাবীন্দ্রিক—এইখানেই তাঁ'র কাব্যের স্বতন্ত্র আস্বাদনবৈচিত্র্য।"

বিভিন্ন কবির ভাবপ্রেরণা এবং প্রকাশভংগীর ভগ্নাংশ দিয়ে সত্যেন্দ্র কবি-মানস লালিত হ'লেও তাঁ'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের লাবণ্য চমৎকারিত্ব আমাদিগকে মুগ্ধ করে। সত্যেন্দ্রনাথ তৈলচিত্রাঙ্কনের কবি নন—রেখাঙ্কনের কবি। এক বিচিত্র কৌতূহল তাঁ'র কাব্যকে দুষ্প্রাপ্য মনোহর করে' তুলেছে। এবং এই বিচিত্র কৌতূহল বাক্‌বিন্যাসচাতুর্যে এবং সুনিপুণ ছন্দের আন্দোলনে অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তা' এখানেই—এই বিচিত্র কৌতূহল জিজ্ঞাসার মধ্যে, এই সুনিপুণ ছন্দের অনবদ্য সংযোজনায়।

## ॥ দুই ॥

রোম্যান্টিক কবি-চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য হ'লো সীমাকে অসীমের মাঝে, সংকীর্ণকে মনোহরের মাঝে, নিকটকে সুদূরের বুকে লীন করে' দেওয়া। বস্তুর উপর তাঁ'রা কল্পনার রং-তুলি দিয়ে এমনই একটি রোমাঞ্চ-রঙীন রেখাঙ্কন করেন যা' সহজেই বস্তুকে রহস্যময় করে' তোলে। সুদূরপ্রসারী কল্পনার গভীরতায় রোম্যান্টিক কবিগণ যে জগতের সৃষ্টি করেন সে জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—তা' অতীন্দ্রিয় লোকের সামগ্রী। বুদ্ধি দিয়ে তা'কে বোঝা যায় না—হৃদয় দিয়ে তা'কে অনুভব করতে হয়। রোম্যান্টিকানুগ রবীন্দ্রনাথ তাই হৃদয়ের কবি। মনোহরের সুবিপুল স্বপ্নরাজ্যে তাঁ'র পদসঞ্চার

তাই অনন্যসুন্দর। অসাধারণ কল্পনা-স্পর্শে বস্তুকে লীন বিগলিত করে' তিনি যে সুদুর্লভ মনোরমাকে সৃষ্টি করেছেন তা'তে 'আপন মনের মাধুরী'র অংশই বেশি। এই মাধুরীতেই বস্তু সমুদয় বাস্তবতাকে ভেদ করে', সমুদয় নৈকট্যকে ছেদন করে' অপরূপ সুন্দরের দিগন্তবেলায় উদ্বেল হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র দেখি একটি কৌতুক 'মন'—'মাধুরী'র সেখানে বড় অভাব। এই 'মাধুরী'র অভাবেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তথ্য-পুঞ্জের বুকে এবং বস্তুর ব্যঞ্জনার মাঝেই গুমরে মরেছে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার মধ্যেই সে তা'র প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে দেউলিয়া হ'য়ে পড়েছে, এই নিঃসম্বল অবস্থায় সে আর রসলোকের অরূপ দিগন্তে পদচারণা করতে সাহসী হয় নি। দিগন্তবিহারী কল্পনার নব কোমল উত্তাপে বস্তুকে বিগলিত করে' রবীন্দ্রনাথ যখন লাবণ্যক্ষরা অরূপ রতন সৃজনে ব্যস্ত সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেই বস্তুকে বস্তু রেখেই কয়েকটি রেখাঙ্কনের অপরিসীম কৌতূহলে মত্ত। বস্তুকে বিগলিত করে' রসমূর্তি গঠন করার দুর্লভ শক্তি তাঁ'র ছিল না। বস্তুকে বস্তু রেখে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবদৃষ্টিতে তিনি তা'র কয়েকটি আঙ্গিক-সুষম রেখাঙ্কন করেছেন মাত্র।

বর্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ উভয় কবিই অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সম্বন্ধীয় কবিতায় বাদল-ঝরা ধ্বনির অন্তরালে পূরবীর মোহন তানের মত আর একটি ঝংকার শোনা গিয়েছে—যে ঝংকার আমাদের সমগ্র সত্তাকে ভাবোদ্বেল করে' এই বস্তুম্লান জগতের দিগন্ত বিদীর্ণ করে' এক মহান্ অরূপ জগতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করে। 'কি জানি পরাণ কী যে চায়' কিংবা

> 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গেলরে দিন বয়ে,
> বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
> একলা বসে ঘরের কোণে কি ভাবি যে আপন মনে
> সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে।'

ইত্যাদি কবিতায় বর্ষা আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আর এক সুধা বর্ষণের অবিরল ধারার সাথে বেজে উঠেছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'বর্ষা' কবিতায় আছে উল্লাস। বাদল বরিষণে কবি যেন পেখম তুলে বনান্তরালের কুঞ্জবনে ময়ূরের মত নৃত্য শুরু করেছেন, পরম উল্লাসে তাঁ'র চিত্ত আবেগবিহ্বল হ'য়ে উঠেছে :

> ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলী জেগেছে,
> ছাইমাখা তা'র মাথার জটা আকাশ ঢেকেছে।

প্রথম হ'তেই কবির কণ্ঠে এই যে একটি উল্লাসের সুর সংযোজিত হয়েছে এই সুরই কেবল পর্দা পরিবর্তন করে' করে' বয়ে চলেছে একটানা। শেষের দিকে অবশ্য তিনি বলেছেন :

> কোন মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
> পুবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমায় অঙ্গে হেনেছে ;

বলাবাহুল্য এই মোহিনী রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা-বিচিত্রা' সম্ভূতা নন—ইনি একান্তভাবেই বাস্তবের। 'ওড়না'ই এ মোহিনীর একমাত্র সাজ—'ওড়না' ছাড়া রহস্যলোকের কোন অস্পষ্ট আবরণ এঁর অঙ্গে তুলে দিলে ইনি লাজে ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েন।

শরৎ এবং বসন্ত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতেও উভয় কবির দৃষ্টিভংগীর এই মৌলিক পার্থক্য স্পষ্টালোকে উদ্ভাসিত। মর্তের অযুতসম্ভাবনা-যুক্ত ম্লান ধূলিকণাকে সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্গের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে পারেন নি। রোম্যান্টিক কবি প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁ'র অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—নেমে গিয়েছেন তা'র অন্তর্মূলে, গভীরতম প্রদেশে ; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন কেবল মাত্র কৌতূহলী সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে—উপরটা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, গভীরতম প্রদেশে নেমে যাওয়ার সাহস হয় নি। তাই যে দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির সাথে তন্ময় হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বসন্তকেও বলতে পেরেছেন 'রোদন ভরা এ বসন্ত'—সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসন্তের একটি ছোট্ট ফুলকে নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছেন। বসন্তের এই চির-উজ্জ্বল মুহূর্তেও যে নিখিল বিশ্বব্যাপী এক করুণ

বেদনার ম্লান ছায়াপাত হয়েছে তা' সত্যেন্দ্রনাথের অনুভবেরও বাইরে। শরতের উজ্জ্বল আলোয় আর পত্রপল্লবের শ্যামলিমায় রবীন্দ্রনাথ যখন 'মধুর মূরতি' দেখে পরম বিস্ময়ে নির্বাক্ হন তখন সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে 'তাল-বাকল', 'শোল-পোনা' :

> তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
> সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
> দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
> শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে!

এখানে প্রকৃতির তন্ময়তা নেই—আছে চিত্রগরিমার উছল আবেগ, আছে শ্রবণ-সুখকর শব্দের আল্পনা-বিন্যাস। প্রকৃতি-সমুদ্রের উপরের ঢেউগুলিই সত্যেন্দ্রনাথের সম্বল—ডুবরীর মত গহন তলে অবগাহন করে' মুক্তা তোলার অধিকারী তিনি নন।

ফুল সম্পর্কে বিশ্বের সকল দেশের সকল কবিই কিছু না কিছু সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। ডেফোডিলকে নিয়ে পাশ্চাত্ত্য কবির দল মাতোয়ারা, গোলাপ নিয়ে পারস্যের, আর বাঙালী কবিগণ বাসা বেঁধেছেন কেতকী কিংবা কদম্বের ডালে। ফুল সম্পর্কে কবিতা রচনায় প্রায় সকল কবিই ভাবের উচ্চগ্রামে আপন সুরটি বেঁধেছেন। গোলাপ নিয়ে পারস্যের কবির দল প্রিয়ার রঙীন ঠোঁট অতিক্রম করে' চলে গেছেন আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণ-পথে, ডেফোডিল নিয়ে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও তাই। কীটস্ ডেফোডিলের বর্ণ-সুষমায় লাগিয়েছেন আর এক 'ভাবের রং'—কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ওসব ভাবের ঘরে যাতায়াত করেন নি। ফুল পেয়ে ছোট্ট কিশোরীর মত তা'র রং নিয়ে পাগল, 'চাঁপার বরণ তপনের আলো, চামেলী চাঁদের হাসি'-ই কবিকে দিশেহারা করেছে। এই হাসির অন্তরালে আর এক মহান্ হাসির স্নিগ্ধরূপ তাই তাঁ'র কাছে ধরা পড়ে নি। 'একটি চামেলীর প্রতি' কবিতায় চামেলী ফুলের মধ্যে ইরাণী-রোমাঞ্চ এনেছেন। কিন্তু এই রোমাঞ্চ সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত। চামেলীকে তিনি 'সুন্দরী কোন্ বাদশাজাদীর কামনা', 'বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর

আঁখিজল' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। চামেলীকে সম্বোধন করে যখন তিনি বলেন :

> কোন্ সে পরীর গলার হারে, রেখেছিল কাল তোমারে,
> কোন্ প্রমোদার সুধার ভারে—টুপ্. টুপে তোর দল—

তখন আমরা একটি বিশেষ রোমাঞ্চ অনুভব করি। কিন্তু একটু গভীর করে' দেখলেই বোঝা যাবে এ রোমাঞ্চ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবানুগ। চামেলীকে ভাল লাগায় কবি আপন খেয়াল খুশীমত কল্পনার আমেজে মালা গেঁথে চলেছেন। এবং এ কল্পনা তথ্য জগতের—ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন কল্পজগতের স্থান এতে নেই। বলাবাহুল্য ফুল সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনার দৈন্য বিশেষরূপে ধরা পড়েছে।

মোগলগৌরব তাজমহলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'তাজ' কবিতা দু'টিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জ্যোৎস্নালোকিত অরূপ তাজের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছেন তা'র অন্তর্বেদনার গভীর ক্রন্দন : 'ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'। গতির বেগবান্ স্রোতধারায় তাজমহলকে ভাসিয়ে দিয়ে কবি কল্পনার সুউচ্চ শিখরে সুর বেঁধে যেন উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন। বাস্তব চেতনা, বাস্তব জগৎকে বিলীন করে' দিয়ে কবি যেন রূপস্বপ্নের সীমাহীন দেশে হারিয়ে গিয়েছেন। বস্তুকে ভেদ করে' কল্পনার কি ব্যঞ্জনাদীপ্ত মহান্ প্রকাশ! কিন্তু তাজমহলের মর্মমূল হ'তে সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ কোন নীরব বাণী শোনেন নি—তাঁ'র চোখে পড়েছে তাজের রকমারি পাথরের বিভিন্নতা, তাদের কোন্‌টি কোন্ দেশ থেকে আনিত হয়েছে তাদের কথাই কবির কল্পনায় ভিড় করে' এসেছে :

> সিংহলী নীলা রাঙা আরবী প্রবাল,
> তিব্বতী ফেরোজা পাথর,
> বুন্দেলী হীরা রাশি, আরাকানী লাল
> সুলেমানী মণি থরে থর ;

ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বুঁদি, গুল্‌নর।·· ···

এখানে 'তাজমহল' একটি জড়বস্তু মাত্র। . বস্তুভেদী কোন দূরাগত ভাবকল্পনার ব্যঞ্জনা এ কবিতার মধ্য হ'তে আত্মপ্রকাশ করে নি। বস্তু বস্তুর মধ্যে সীমিত হ'য়ে রং রেখায় কেবল একটু ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে মাত্র।

স্বদেশ এবং ঐতিহ্যপ্রীতি সম্পর্কে কতকগুলি কবিতাতেও কবির এই স্থূল দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে স্বদেশপ্রীতি এবং ঐতিহ্যপ্রীতি বাংলার প্রান্তসীমা অতিক্রম করে' বড় জোর সর্বভারতীয় হ'য়ে উঠেছে কিন্তু বিশ্বনিখিলের সম্পত্তি হ'য়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সংগঠন সম্পর্কীত প্রবন্ধগুলিও যেখানে কল্পনার বিশালতার জন্যে নিখিল বিশ্বের সর্বকালের সর্বদেশের সকল মানুষের প্রাণসম্পদ হ'য়ে উঠেছে, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার গান'-এর মন্ত্রে অহিংসার উদ্‌ঘাটন কিংবা 'আমরা'র মধ্যে বাঙালীত্বের ছায়াপাত একান্তভাবে সীমিত দেশের গণ্ডিতে গুমরে মরেছে। এখানেও কবির কল্পনা উদার অম্বরতলে সরব ঘোষণায় আপন মাধুরিমা বিস্তার করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ যে জ্ঞান এবং বুদ্ধিগোচর, সেখানে যে কোন রহস্য এবং সংশয় নেই, তা' যে বিশেষরূপে বস্তুনির্ভর এবং খণ্ডিত সে সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মূল্যবান উক্তি এই: "সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অদৃশ্য বা অ-ধরার জন্য কোনো সূক্ষ্মতর কামনা মর্মরিত হ'য়ে ওঠে না, কবিচিত্তের দূরায়মান অশরীরী বাসনা দূর নেপথ্যলোকের আভাসে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে না,—অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জগৎছন্দের আল্পনায় সুন্দর হ'য়ে ওঠে। এই কারণেই প্রত্যক্ষ জগতের অতীত কোন ভাবাত্মক অনুভূতি তাঁ'র কাব্যে রসরূপ লাভ করে নি। তাই সত্যেন্দ্রনাথের মানস-জীবনে বিচিত্ররূপিণী কল্পনার স্থান অধিকার করেছে কৌতুক ও কৌতূহল। কৌতূহলে অনুসন্ধানবৃত্তি তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই কৌতূহলে একটা বিরতির

চিহ্ন পড়ে। তা'ছাড়া কৌতূহল জ্ঞানের সীমাভুক্ত, রসের এলাকায় তা'র যাতায়াত নেই।"

## ॥ তিন ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে যে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে' আছেন সে তাঁ'র ভাববিচিত্রতার জন্যে নয়, সে গৌরব তাঁ'র প্রাপ্য হয়েছে ধ্বনি-গৌরবদীপ্ত বহু বিচিত্র ছন্দের প্রবর্তনায়। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি বহু খেলা খেলেছেন এবং আশ্চর্যরূপে সফলতা লাভ করেছেন। বহু বিচিত্র ছন্দের প্রবর্তনা এবং তাদের সফলতার মূলে রয়েছে কবি-মানসের এক বিশেষ জাগ্রত প্রবণতা। সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দকে কবিতার মধ্যে এমনভাবে গ্রথিত করেছেন যা'তে বন্ধনের বেড়া ডিঙিয়ে ছন্দের অভিনব ঝংকারে কবিতা এক বিশেষ রসমূর্তি ধারণ করেছে। ধ্বনি-গরিমাদীপ্ত নতুন শব্দের সৃষ্টি এবং প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ—সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ বৈচিত্র্যের আর একটি বিশেষ দিক। তিনি এমন কতকগুলি নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছেন যেগুলি পাঠকমনে এক অভিনব সুরঝংকার তোলে এবং এগুলির সম্মুখীন হ'য়ে পাঠকচিত্ত হঠাৎ যেন চমকিত হয়। 'ইল্‌শে গুঁড়ি' কবিতায় আমরা এমনি কতকগুলি শব্দের সাথে পরিচিত হই :

> ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
> দিনের বেলায় হিম।
> কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
> পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
> মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
> আল্‌তা-পাটি শিম।

এখানে 'হিম' শব্দটি ধ্বনি-গৌরব-লাবণ্যের অভিনব সংযোজনা। 'কেয়াফুলের ঘুণ' এবং 'আল্‌তা-পাটি শিম' শব্দগুলি কবির স্বকীয়

সৃষ্টি। বলাবাহুল্য এই সৃষ্টি-সংযোজনায় কবিতার লাবণ্য ও অঙ্গ-সুষমা শতগুণে বেড়ে গেছে। এখানেই শেষ নয়—ইল্‌শে গুঁড়িকে নিয়ে কবির কল্পনা নতুন শব্দ-সৃষ্টির উল্লাসে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে। ইল্‌শে গুঁড়িকে তিনি বলেছেন 'হিমের কুঁড়ি', 'ঘুম-বাগানের ফুল', 'পরীর ঘুড়ি', 'পরীর কানের দুল', 'জলের ফাঁকি', 'ঝুরো কদম ফুল'। বলাবাহুল্য শব্দগুলি এক একটি অপূর্ব রূপ-কল্পনা এবং ভাবের দ্যোতক। এই উজ্জ্বল টুকরো অলংকারে সজ্জিত হ'য়ে কবিতা-সুন্দরী কী অপূর্ব সম্ভ্রম আর লাবণ্য-শ্রীই না ধারণ করেছে। ইল্‌শে গুঁড়ির ঝুরো ধারার সাথে কবির মন স্বর্ণমসলিনের টুকরো দিয়ে এক একটি চিরসুন্দর চিত্রকণাকে ধরে রেখেছে।

'পালকির গান' এবং 'দূরের পাল্লা' কবিতা দু'টি ঘাত-প্রধান ছন্দের অপূর্ব চিত্ররূপ। উল্লাস মনের গোপনে যে অপূর্ব ধ্বনি জেগেছে তাই এই কবিতায় বিশেষরূপে ধরা পড়েছে। গ্রীষ্মের প্রখরদীপ্ত দাহন সহ্য করে' বেহারারা পালকি নিয়ে ছুটে চলেছে গ্রামের মাঝ দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে, নদীর কিনারা বেয়ে দূর গন্তব্য পথে। জোর কদমে ছুটে চলেছে বেহারাবৃন্দ। তাদের চলার তালটিও আমূর্ত হ'য়ে উঠেছে কবিতার ছন্দে:

পালকি চলে!
পালকি চলে।
গগন তলে
আগুন জ্বলে!…
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ক্লান্ত বেহারাদের ঝিমিয়ে পড়া স্তিমিত গতিচিত্রও ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। স্বরাঘাত ছন্দের অপূর্ব মুক্তি ঘটেছে দূরের পাল্লা কবিতায়। এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখি রবীন্দ্রনাথে—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' ছড়ার মধ্যে। পরবর্তীকালে এই ছন্দই অপূর্ব কৌলীন্য লাভ করেছে বিশ্বকবির হাতে—এমন

কী খেয়া এবং গীতাঞ্জলির সংগীতমুখর কবিতাগুলির মধ্যেও এই ছন্দের ছায়াপাত ঘটেছে। এই ক্রম-কৌলীন্যের অধিকারে শেষ পর্যন্ত এই ছন্দের মধ্য হ'তে স্বরাঘাত বিলুপ্ত হ'য়ে ক্রমান্বয়ে জেগে উঠলো এক অপূর্ব মন্থরবাহী কোমলতা। উৎসমূল হ'তে জন্মগ্রহণ করে' শালপিয়ালের বন চিরে বন্ধুর দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করার সময় ঝর্ণাধারায় যে নর্তনশীলতা জাগে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ তাই—কিন্তু মোহনার মিলন-তীর্থে স্রোতের যে মন্থর পদচারণা তা'তে আর কোন চাপল্য নেই—স্বরাঘাতের ধ্বনি সেখানে আশা করা বাতুলতা। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ সাগর-মিলনে নদীস্রোতের মত শান্ত সমাহিত হ'য়ে গেছে। তাই এই ছন্দের সূত্রপাত যদিও রবীন্দ্রনাথে, তিনি এর মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে পারেন নি—কেননা দিগন্ত বিস্তারী গম্ভীর ধ্যান-কল্পনার গুরুভার বহন করা এই ছন্দের সাধ্যাতীত। অগভীর উল্লাস এবং কৌতূহল প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ অনবদ্য। তাই উল্লাস এবং কৌতূহলের চারণ কবি সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই এই ছন্দের দিগন্ত সুপ্রসারিত হয়েছে। ধ্বনির আঘাতে, শব্দের দ্যোতনায় কৌতূহল আর উল্লাস যেন একসাথে জমাট বেঁধে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া' ইত্যাদি ঝিমিয়ে পড়া রাবীন্দ্রিক স্বরাঘাত ছন্দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কী তীব্র গতিবেগেরই না সঞ্চার করেছেন :

> ছিপখান তিন-দাঁড় তিনজন মাল্লা—
> চৌপর দিন-ভোর দেয় দূর-পাল্লা।…
> রূপশালি ধান বুঝি এই দেশে সৃষ্টি,
> ধূপছায়া যার শাড়ী তার হাসি মিষ্টি।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের পক্ষে এই স্বরাঘাত ছন্দ বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। উল্লাস এবং ছন্দ, ছন্দ এবং উল্লাস দুই যেন সমান তালে পাল্লা দিয়ে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে।

'দূরের পাল্লা'র মধ্যে নৌকো যাত্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে কৌতূহলী কবির জাগ্রত ইন্দ্রিয়-চেতনার প্রমাণ-পরিচয় প্রায় সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। পথযাত্রার দু' পাশের ছোটখাটো কোন দৃশ্যই তাঁ'র দৃষ্টি হ'তে আত্মগোপন করতে পারে নি। পান্নার টাঁকশাল, কঞ্চির ঘর, শ্যাওলার মাঝে বন-হাঁসের ডিম লুকানো, ঘোমটা দেওয়া বৌ, পানকৌড়ি, কলসীর বকবক শব্দ ইত্যাদি যত কিছু কৌতূহল জাগান ক্ষুদ্রের ভিড়ে 'দূরের পাল্লা' আমাদের মনে দূর-পল্লীর এক অপূর্ব চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে' দেয়। 'পিয়ানোর গান' কবিতায় দেখলাম লঘু স্বরাঘাত ছন্দের আর এক অপূর্ব উন্মত্ততা। ছন্দ এবং শব্দবিন্যাসে পিয়ানোর টুং টাং শব্দগুলিও পর্যন্ত যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে :

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন ফুল ?

'সবুজ-পরী' কবিতায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের দেখি আর এক রূপ। এই কবিতার কোথাও ভাবগম্ভীর কিংবা ধ্যান-সমাহিত কল্পনা নেই—কেবল উছল প্রাণের আবেগ শত ধারায় শব্দ-ঝংকারে প্রকাশমান :

সবুজ পরী ! সবুজ পরী ! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির 'পরে তোমার যুগল আঁখি তুলিয়ে চাও।

"নিপুণ কারুকরণ ভাষাতিরিক্ত রসধ্বনি ও সঙ্কেত-তির্যক চিত্রিত ভাষণ এই উল্লাস উছল রূপাভিলাসের যথার্থ কবিভাষা। সত্যেন্দ্রনাথ এই ভাষার সিদ্ধকাম শিল্পী। এই শ্রেণীর কবিতায় উপমা-উৎপেক্ষা-রূপকল্প প্রভৃতিতে এক খেয়াল-বিলাসের আমেজ বাদশাহী ঐশ্বর্যে বিলাসিত।"

'চরকার গান' কবিতাটি মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথের ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অপূর্ব সংযোজন। এখানে ধ্বনি-গৌরব কবিতাটির প্রাণসম্পদ। অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমুদয় তথ্যজালদীর্ণ করে', সমুদয় যমকানুপ্রাসের ফল উপেক্ষা করে' ধ্বনি-গৌরব তার আপন বৈচিত্র্যে ঝলকিত হয়ে উঠেছে :

> চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন,
> বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ!
> বাংলার মস্‌লিন বোগ্‌দাদ্ রোম চীন
> কাঞ্চন-তৌলেই কিনতেন একদিন!

সত্যেন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর কোন কবির কাব্যে ধ্বনির এমন মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ধ্বনির গৌরব প্রসারে সত্যেন্দ্রনাথ সার্থক এবং অপরাজেয় শিল্পী।

কিন্তু এই ধ্বনি প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁ'র কবিতার সৌন্দর্য ও সম্ভ্রমকে ম্লান করে' দিয়েছে। ধ্বনির স্রোতে কবি এমন গা ভাসিয়ে দিয়েছেন যে কোন কোন কবিতায় ধ্বনির ঠুং ঠাং ছাড়া আর অন্য কোন ভাবই প্রকাশিত হয় নি। ধ্বনির অবিবেকী প্রয়োগ-প্রাধান্য 'চরকার গান'-এও লক্ষিত হয়। 'সিংহল' এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ কবিতায় ধ্বনির ঝংকার ছাড়া সিংহলতত্ত্বের কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। ধ্বনির আড়ম্বর-বহুল সরব ঝংকারে বেচারা সিংহলকে দূর পথের প্রান্তে নিঃসম্বল ভিখারিণী সাজতে হয়েছে :

> ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্মল তার রূপ,
> তার কণ্ঠের হার নাগেশ্বর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;

Young Lochinvar-এর ছন্দ অনুকরণ করে' 'সিংহল' কবিতা রচনা করে' নতুনত্ব আনা সত্ত্বেও তিনি যেমন ব্যর্থ হয়েছেন—তেমনি সংস্কৃতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে 'যক্ষের নিবেদন' রচনা করেও বিশেষ সফলকাম হ'তে পারেন নি। দেশ-বিদেশের অনেক কবির ছন্দকে অনুকরণ করে' কবি বাংলা ছন্দে কিছু নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

স্বরপ্রধান কিংবা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ছাড়াও যাণ্মাত্রিক ছন্দেও সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি কবিতা, যতীন্দ্রনাথের বিরহ-গাঁথা, এবং নজরুলের সাম্যবাদীর বিনির্ভীক ঘোষণাতেও যাণ্মাত্রিক ছন্দের অপূর্ব ছায়াপাত দেখি। মনের কোন গহন চিন্তা যাণ্মাত্রিক ছন্দে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামোম্মত্ততায় লিপ্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার যেন এই যাণ্মাত্রিক ছন্দ। ধীর গম্ভীরনাদী বেগে মনের সব আকুতি যেন নিঃসীমভাবে প্রকাশিত হয়। অনাচারীর বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথের গণজাগরণের ঘোষণাপত্রও রচিত হয়েছে এই যাণ্মাত্রিক ছন্দের বঙ্কিমান দোলায় ঃ

> **কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?**
> **কে আছ ক্ষুণ্ণ, কে বা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?**
> **যুগ যুগ ধরি' কী করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?**
> **পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !**

যান্ত্রমাত্রিক ছন্দের মধ্যে বিদ্রোহী দুলাল যে বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ গতিবেগ এনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে তা'র কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়। 'গ্রীষ্মের সুর' এর ছন্দ কী জানি না—বোধ হয় পয়ার—কিন্তু ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বাংলা ভাষা সবেমাত্র যেদিন অপভ্রংশের গর্ভ হ'তে জন্মগ্রহণ করে' মুক্ত আলো-বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছিল—সেই সুদূর অতীতকাল হ'তে আজ পর্যন্ত কোন কবি এই ছন্দে একটিও কবিতা লিখেছেন বলে মনে পড়ে না। প্রতিটি স্তবকে বারটি লাইন আছে। প্রথম দু'টি লাইন কাব্যপাঠের দিক থেকে সুন্দর কিন্তু শেষের লাইন দু'টি পাঠের দিক থেকে বিঘ্ন জন্মায়। উপরের স্তবকে প্রতিটি প্রথম চরণে মাত্রা কম এবং শেষের চরণে মাত্রা বেশি—ফলে প্রথম দু'টি চরণ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে পরিণত হয়েছে। শ্বাসাঘাতের ফলে পাঠকালে এ ছন্দ মনোরম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি স্তবকের শেষের দু'টি চরণ নিয়ে মুশকিল। কেননা এর প্রতি প্রথম চরণে মাত্রা বেশি এবং শেষের

চরণে মাত্রা কম। ফলে পাঠের দিক দিয়ে সর্বত্র একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। যাই হোক, এ ছন্দের নতুনত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কবিতাটির মধ্যে গ্রীষ্মের একটি ভয়াল-সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছে। পিঙ্গল আকাশ, পিপাসাতুর চাতকের করুণ বিলাপ, চম্পা-কলির ক্লান্ত হাসি এবং সর্বোপরি রৌদ্রের দীপ্ত-দাহন সকলে মিলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতাকে নির্মম মনোহর করে' তুলেছে। চিত্র হিসেবেও কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ধ্যান-কল্পনা এবং ছন্দবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'মহাসরস্বতী' কবিতাটি সমগ্র সত্যেন্দ্র-কাব্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এমন কবিতা সত্যেন্দ্রনাথে বিরলদৃষ্ট। কবিতাটিকে কবির একটি ব্যতিক্রম রচনাও বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'উর্বশী' কবিতাটির সাথে 'মহাসরস্বতী' কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। শব্দ-নির্বাচন, ছন্দ এবং কিয়ৎ-পরিমাণে ভাবসম্পদেও কবিতা দু'টি কী নিবিড় আত্মিক-সম্পর্কে একীভূত! দু'টি কবিতা হ'তে দু'টি স্তবক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে' দিলাম:

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি ওঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥ [ উর্বশী ]

উদ্ভাসিছ সত্যলোকে নির্নিমেষ ও তব নয়ন;
তপলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র নূপুর চ্যুত জ্যোতির্ময় পদরেণু তব;
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব।

পুরাতনে নবীয়ান ;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত পরিবেশ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছাসুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে। [ মহাসরস্বতী ]

কবিতা দু'টির মধ্যে অপূর্ব শব্দচয়ন এবং গম্ভীরনাদী ছন্দের মধ্যে যে একটি গূঢ় সম্পর্ক আছে সে আর কোন প্রমাণ-পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। দু'টিতেই শব্দযোজনা এবং ছন্দ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব লালনা এবং রোমাঞ্চ-রস পাঠকচিত্তকে অনাবিল আনন্দে ভরপুর করে' দেয়। এই ছন্দে এবং ভাবৈশ্বর্যে সত্যেন্দ্রনাথ সারা জীবনে আর একটি কবিতাও লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ছন্দের ধ্বনিগৌরব এবং ভাবমহান্ কবিতা বিরল।

সংস্কৃত শব্দের মত বাংলা কবিতায় আরবী পার্শী শব্দ যোজনা করে' সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে এক অপূর্ব শ্রীগৌরব মণ্ডিত করেছেন। বিচিত্র শব্দের কলনাদী-স্পর্শে কবিতা যেন বার বার চমকিত হ'য়ে উঠেছে। 'লাল পরী', 'নীল পরী', 'সবুজ পরী', 'জর্দা পরী', 'কবর-ই-নূরজাহান' ইত্যাদি কবিতাগুলি আরবী পার্শী শব্দের রহস্যঘন লাজনম্র স্পর্শে ইরাণী রোমাঞ্চের নিটোল রসে কম্পমান। সুদূর ইরাণের দ্রাক্ষাক্ষেত্র, পারস্যের গোলাপকুঞ্জ সকলে যেন বহু দূর হ'তেও আপন রহস্যলোকের মধ্য দিয়ে আমাদের গহনমনে দূরাগত কলগুঞ্জনের মত ভিড় করে' জমে ওঠে। এই শব্দচয়ন সত্যেন্দ্র-নাথের কাব্য এবং ছন্দকে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

যে কৌতূহল এবং সদাজাগ্রত দৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম হ'তে দেখা গিয়েছে—তা' আমরণকাল তাঁ'র কাব্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যে সায়াহ্ন-কোমলতা এবং অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতার যে ম্লান ছায়াপাত হয়েছে, সত্যেন্দ্র-কাব্যে তা' হয় নি। তাঁ'র কাব্যের নৃত্যচপল কৌতূহলী ছন্দ সকল ধূসরতা এবং বিষণ্ণতাকে আপন বেগে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র একটি প্রাণবন্ত সজীবতা এবং

রঙীন রোমাঞ্চ আপন গৌরবে দেদীপ্যমান। সত্যেন্দ্রনাথ রূপোল্লাসের কবি—তাঁ'র ছন্দ তাই ভাস্কর সুঠাম এবং নৃত্যচপল। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যছন্দ সদাজাগ্রত মনের দান। ছন্দের দোলন এবং সৌকুমার্যের পিছনে কবির একটি 'বিশেষ অন্তর' পড়ে ছিল। সংস্কৃত অলংকারিকদের মতে ছন্দ বিনির্মাণে কবির কোন পৃথক্ যত্ন বা আর্তির প্রয়োজন নেই। কেননা ভাবের সাথে ছন্দের দ্রুততা এবং রসাভিব্যক্তির মধ্যেই ছন্দের প্রাণসম্পদ বিদ্যমান। ভাব এবং রসবিন্যাসের চাতুর্যের মধ্যেই ছন্দের হয় অপূর্ব পরিবেশন। কিন্তু ছন্দ গঠনে সত্যেন্দ্রনাথের পৃথক চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে তাঁ'র ছন্দ-সুষমাকে হরণ করেছে। অতি সতর্কতা অতি পতনের কারণ। বনান্তরে পত্রপল্লবের আড়ালে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কলি ফোটে তা'র যৌবন-মদিরা ও রূপ গৌরবের কাছে তিন তলার উপর কার্নিশের কিনারায় টবের ওপর ফুটে ওঠা পুষ্পের যাবতীয় সমারোহ অতি সহজেই পরাজিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-নির্মাণেও তাই হয়েছে। অতি সতর্কতা যেখানেই প্রকট হয়েছে কবিতার ব্যর্থতা সেখানে অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। শত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ অমর। স্বল্পায়ু জীবনে তিনি ছন্দের যে বিচিত্র বীণা বাজিয়ে গেছেন তার মোহতান আজও বাঙালীর অন্তরে পূরবীর মীড় রচনা করে' চলেছে।

## ॥ *চার* ॥

সত্যেন্দ্রনাথের কবি বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক তাঁ'র অনুবাদ-প্রিয়তা। বাংলার কোন কবি বোধ হয় এত অধিক সংখ্যক বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেন নি। আরব, মিশর, পারস্য, জার্মান, চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি বহুদেশের বহু কবির বহু কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও এই বিচিত্রতা সম্পাদন

সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কবি-মানসেরই পরিচয়বাহী। অনুবাদের পিছনেও তাঁ'র সেই বিচিত্র কৌতূহল মন সক্রিয় ছিল বলেই মনে হয়।

কিন্তু অনুবাদ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের বড় পরিচয় এই বিচিত্রতা সম্পাদনের মধ্যে নয়—মূলের রস অনূদিত কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করার মূলেই অনুবাদক হিসেবে কবির সার্থকতা নিহিত। ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় এমন মূলানুগ অনুবাদ হয়েছে বলে মনেই হয় না। স্বয়ং বিশ্বকবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতায় মুগ্ধ হ'য়ে যে বাণী পাঠান তা'র মধ্যেই রয়ে গেছে অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়: "মূলের রস কোন মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরব তাই— তাহা একই কালে অনুবাদ ও নতুন কাব্য।"

সম্প্রতি ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের "অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ" নামক একটি তথ্যপূর্ণ স্মরণযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছেন: "সত্যেন্দ্র-নাথের রচনা দু'টি ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি ধারাপ্রবাহ মৌলিক, অপরটি অনুবাদ। স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া ভূমিতে তিনি সিদ্ধসাধক ব'লে আমার বিশ্বাস।" মন্তব্যটি মূল্যবান কিন্তু 'ঝাঁজ'টি লক্ষিতব্য। লেখক মন্তব্য করেছেন যে পরকীয়া অর্থাৎ অনুবাদের ক্ষেত্রেই সত্যেন্দ্রনাথ অধিকতর সিদ্ধকাম শিল্পী। তা'ই যদি হয় তা' হ'লে সত্য-কবির অনূদিত কবিতাগুলি অধিকাংশ পাঠকের কাছে অপরিচিত ও অপঠিত রয়ে গেল কেন? উত্তর দেওয়া চলে যে পাঠক যত্নবান হ'লেই অনুবাদের যথার্থ সমাদর হবে। কিন্তু এ উত্তর ধোপে টেঁকে না—কেবল তর্কের খাতিরে। আমাদের মনে হয়েছে স্বকীয়া ভূমিতেই অর্থাৎ মৌলিক সৃষ্টিতেই সত্যেন্দ্রনাথ অপরাজেয় শিল্পী এবং পরকীয়া

ভূমিতে তিনি সুনামের অধিকারী। পরকীয়া ভূমিতে তিনি সার্থক এবং স্বকীয়ায় সার্থকতর।

পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই অনূদিত কবিতাগুলি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে একটা অবহেলার ভাব বিরাজমান। এই অবহেলার প্রথম কারণ এই যে অনূদিত কবিতাগুলিতে অনুবাদকের কোন স্বকীয় ভাবকল্পনা থাকে না—ভাবের ক্ষেত্রে তিনি পরমুখাপেক্ষী। দ্বিতীয়তঃ অনূদিত কবিতাগুলি অপেক্ষা মৌলিক ( original ) কবিতাগুলি যে ভাব-ভাষা-ছন্দ সকল দিক থেকেই সার্থকতর এমন একটা ভাব পাঠকচিত্তে থেকেই যায়। তৃতীয়তঃ স্বকীয় সৃষ্টিতে স্রষ্টা সম্রাট আর পরকীয়ায় দাস। অনুবাদে দাসত্ববৃত্তিই প্রধান। তাই অনুবাদককে সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত।

কিন্তু সার্থক অনুবাদকের সম্পর্কে এমন মত পোষণ করা সঙ্গত হবে না। এমন দেখা গেছে মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ উভয়েই 'বিপুলা পৃথ্বীর রসলোকে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা' লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে অমর কবি ফিট্‌জিরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম'-এর ইংরাজী অনুবাদ স্মরণযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বিরলদৃষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অনুবাদ-ক্ষেত্রে বাংলার আর কোন কবিই ঠিক এতখানি সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। ভাবসম্পদে কবি অপরের কাছে ঋণী স্বীকার করি কিন্তু রূপায়ণে? রূপায়ণ তাঁর নিজস্ব। অপরের নিকট থেকে তিনি কাব্যাত্মা সংগ্রহ করেছেন ঠিকই কিন্তু সেই কাঠামোর ওপর মাংস-ত্বক-রূপ-লাবণ্য দিয়ে মনোহর মনোরম করে' তোলার মূলে সত্য-কবির স্বকীয়তা আপন আভায় ঝলকিত। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই দুষ্প্রাপ্য আসনের অধিকারী হওয়ার মূলে যে কারণগুলি রয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটি সার্থক অনুবাদের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ বৈশিষ্ট্যগুলি এই : (ক) ঔচিত্যবোধ (খ) মূল ভাষা হ'তে অনুবাদ (গ) অনুবাদগুলি একাধারে মূলানুগ ও মৌলিক (ঘ) বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন কবিতার মূল ধ্বনি ও ছন্দকে অনুবাদে রক্ষা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধ না থাকলে সার্থক অনুবাদ হ'তে পারে না। আনন্দের বিষয় এ-বোধ সত্যেন দত্তের পুরামাত্রায় ছিল। Wordsworth-এর 'The Reverie of Poor Susan'-এর অনুবাদ 'দিবা-স্বপ্ন' দু'টি পাশাপাশি তুলে আমরা আমাদের মন্তব্যকে স্পষ্ট করে' দিতে চাই। প্রথমে Wordsworth-এর মূল কবিতা :

At the corner of Wood Street, when day-light appears,
Hangs a Thrush that sings loud, it has sung for three years :
Poor Susan has passed by the spot, and has heard
In the silence of morning the song of the bird
It is a note of enchantment : what ails her ? She sees
A mountain ascending, a vision of trees ;......
......Green pastures she views in the midst of the dale.
Down which she so often has tripped with her pail ;
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves,

এবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ 'দিবা-স্বপ্ন' :

সরু গলির মোড়ে, যখন দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধরে ;
সুশান যেতে পথে, হঠাৎ শুনতে পেলে গান,
শব্দ সাড়া নাইকো ভোরে শুধুই পাখীর তান।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখছে যেন, জাগে পাহাড় গাছের পরে গাছ…
…সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দু'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে ;
একটি ছোট ঘর, সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তুলনা ;…

"উল্লিখিত অংশের মধ্যে অনুবাদে উড্ ষ্ট্রীটের অনুল্লেখ, 'Thrush'-কে 'ময়না'য় রূপান্তর এবং 'Pail'-কে 'কলসী'তে পরিবর্তিত করে' তিনি অলংকারের ঔচিত্যবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন—অপরিচিত শব্দের দ্বারা সর্বজনবোধ্য ভাবকে অবোধ্য

করতে চান নি। উল্লিখিত অংশের 'সবুজ গোঠের ছবি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় নিশ্চয় অক্ষম অনুবাদের নিদর্শন নয়।" এই ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় তাঁ'র গ্রন্থে। হাফেজের একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন দু'জনে—ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথমে হাফেজের মূল কবিতা:

গুল্ দর্ বর্ ও মই দর্ কফ্ ও মাশুকা বকামস্ত্,
সুলতান্-এ জহানম্ বচুনিঁ রোজে গুলাম্ অস্ত্ *
গোশমা মি আ রিদ দর্ ইদ্ বজম্ কি ইমশাব
দর মজ্লিস্-'এ মা মাহ্ রুখ'-এ দোস্ত তমাম্ অস্ত *

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুবাদ:

প্রিয়া মোর মনের মত, ফুল বুকে মোর মদ হাতে,
দুনিয়ার সুলতানেরে গোলাম গণি এই রাতে।
আজিকে এ মজ্লিসে কাজ কি জেলে মোমবাতি?
সজনী চাঁদ-বদনী বেশ বিরাজে জল্সাতে।

এর পর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ:

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে;
কেবা সুল্তান্? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
ব'লে দাও বাতি না জালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা!

আর এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য: "ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁ'র অনুবাদকে মূলানুগ করতে গিয়ে যে-মূল্য দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথকে সামান্য নবরূপায়ণবশতঃ তা' দিতে হয় নি। বরঞ্চ আমরা একটি অমূল্য কবিতা লাভ করেছি যা'র মধ্যে হাফেজের মূল শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি-মাধুর্য আছে অথচ নিছক অনুবাদের অনুকৃতি-মালিন্য নেই।...

গুল্ শব্দের ফুল অর্থ রক্ষিত হয়েছে শহীদুল্লাহ্ সাহেবে। সত্যেন্দ্র-নাথের 'গোলাপে' গুলের প্রতিধ্বনি আর রসের ধ্বনির মিলন

ঘটেছে।···সত্যেন্দ্রনাথ 'দর্ বর' অর্থ বুকেতে করে' অনর্থ ঘটান নি। বুকেতে ফুল নিয়ে প্রিয়া পারস্যে সুন্দরী হ'লেও, সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিনিধি হ'য়ে গলায় মালা দিয়ে তা'কে আমাদের মানসসুন্দরীর সঙ্গে অভিন্ন করে' বরণ করে' নিয়েছেন।···শহীদুল্লাহ্ সাহেব মূলানুগ অনুবাদ করেছেন বলে প্রশংসার্হ, কিন্তু চতুর্থ পংক্তির 'দর-মজলিস' তৃতীয় পংক্তিতে নিয়ে গেছেন 'এ-মজলিস' রূপে। অর্থাৎ তাঁ'কেও সামান্য ক্রমান্তরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ক্রম-ও মানেন নি, রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাই এটিকে হাফেজের নবরূপায়ণ বলেছি। কিন্তু এটি কবিতা হয়েছে এবং মূলানুগ কবিতা, অর্থাৎ অনুবাদ। রূপান্তরে কবিতা রূপহীনা হয় নি। বরঞ্চ গজলের হাল্‌কা চাল অনভ্যস্ত কানে চাপল্যের আভাস আনে না। ঔচিত্যই কাব্যের রসসৃষ্টির প্রধান সহায়।"

উপরোক্ত আলোচনাটি মন দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে অনুবাদের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ হুবহু মূলের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন নি—কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। যেটিকে পরিবর্তন করা উচিত বলে মনে করেছেন কেবল সেটিকেই পরিবর্তন করেছেন—অন্যটি নয়। এই ঔচিত্যবোধের জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতা-গুলিতে নতুনতর রং ধরেছে। সে কবিতাগুলি তাই একাধারে অনুবাদ এবং নতুন সৃষ্টি।

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এইখানে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে অনুবাদগুলি এমন প্রাঞ্জল ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে লাবণ্য-শ্রী মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে যে কবিতাগুলি কোনক্রমেই অনুবাদ বলে মনে করা যায় না। কবিতার শেষাংশ হ'তে যদি মূল রচয়িতার নামটি উঠিয়ে দেওয়া যায়—তা' হ'লে কবিতাটিকে সত্যেন্দ্রনাথের মানস-সন্তান বলেই মনে হবে। কবির সেই ভাস্কর্য-সুঠাম কলানিপুণতা, ইরাণী রোমাঞ্চের প্রতি সেই আত্মিক প্রবণতা, কৌতূহল-রঙীন সেই রসোচ্ছল কৌতুক দৃষ্টি—সবই এই কবিতাগুলির অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে।

ফরাসী ভাষায় লেখা ভিক্তর হুগোর কাব্যানুবাদ :

প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহে কে ! অ'য়
কাঁদে কেবল !
॥ সংকেত-গীতিকা : ভিক্তর হুগো ॥

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ভিক্টর হুগোর একটি কবিতার মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়া হ'ল :

| মূল | অনুবাদ |
|---|---|
| Less Djinns : V. Hugo | জিন : হুগো : সত্যেন্দ্রনাথ |
| Murs, ville, | নিরজন |
| Et port, | নিদ্‌পুর |
| Asile | নিকেতন |
| De Mort, | মৃত্যুর |
| Mer grise, | বায়ু হায় |
| O'u brise | মুরছায় |
| La brise ; | ঢেউ নেই |
| Tout dort... | সিন্ধুর ।... |
| ...On doute | মনে হয় |
| La nuit | কু-স্বপন, |
| J'ecoute | কানে কয় |
| Tout fuit | অনুক্ষণ ! |
| Tout passe ; | কে কোথায় |
| L'espace | মিশে যায় |
| Efface | মূরছায় |
| Le bruit. | গরজন । |

অথবা মিস্ত্রাল্‌-এর কবিতার অনুবাদ :

মৌন-মন্দির চাঁদ
গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে !
॥ চাঁদনী রাতের চাষ : মিস্ত্রল্‌ ॥

ইত্যাদি কবিতাগুলি পড়লে অনুবাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ সাবলীল বিচরণ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সমগ্র সত্যেন্দ্র-পরিচয়বাহী

'পালকির গান' কিংবা 'দূরের পাল্লা'র সাথে এসব কবিতা একাসনে বসতে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না।

ইংরাজী কাব্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত সে কথা বলাই বাহুল্য। কয়েকটি কবিতার মূল এবং অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়া হ'ল:

| মূল | অনুবাদ |
|---|---|
| The Bridge of Sighs : T. Hood | আত্মঘাতিনী : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত |
| One more unfortunate | আরেক দুর্ভাগিনী |
| Weary of breath | গেছে সংসার থেকে, |
| Rashly importunate | জীবন যাতনা মানি' |
| Gone to her death ! | মৃত্যু নিয়েছে ডেকে। |
| Take her up tenderly | ধর্ গো আস্তে ধর |
| Lift her with care ; | সাবধানে তোল্ বাছা |
| Fashion'd so slenderly, | মুখখানি সুন্দর |
| Young and so fair ! | বয়েস নেহাৎ কাঁচা। |
| Dreadfully staring | ভীষণ চাহিয়া আছে |
| Thro' muddy impurity | মৃত্যু হতাশ আঁখি |
| As when with the daring | ভবিষ্যতের পানে |
| Last look of despairing | যেন সে দৃষ্টি হানে |
| Fix'd on futurity... | গ্লানির মাঝ'রে থাকি। |
| Cross her hands humbly, | দু'টি হাত ধীরে ধীরে |
| As if praying dumbly, | রাখ গো বুকের 'পরে |
| Over her breast ! | মরণ নদীর তীরে |
| | যেন ঈশ্বরে স্মরে। |

"Lines to an Indian Air" কবিতাটির অনুবাদ স্মরণযোগ্য। মূল কবিতাটি Shelley-র। সত্যেন দত্ত অনুবাদ করেছেন 'মিলন সঙ্কেত'। এই সার্থক অনুবাদটির মাত্র দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করা হ'ল:

শেলীর লেখা:

> The wandering airs, they faint
> On the dark, the silent stream...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ:

> নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
> চলিতে চলিতে বায়ু মূরছি পড়ে,...

হিন্দী অনুবাদ-ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সার্থকাম। সুরদাস, কবীর, তুকারাম ইত্যাদি কবির বহু কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। নিম্নে কবীরের একটি কবিতার মূল ও তাঁর অনুবাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল :

কবীরের "ঝুলন" কবিতার মূল :

> গ্রহ চন্দ্র তপন জোর বরত হৈ
> ঘুরত রাগ মিরত তার বাজৈ।
> নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন মেঁ
> কহৈঁ কবীর পিউ গগন গাজৈ ॥
> জনম মরণ জহাঁ তারী পরত হৈ
> হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
> উঠত ঝনকার তহঁ নাপ অনহদ ঘুরৈ
> তিরলোক মহলকে প্রেম বাজৈ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ :

> সূর্য, গ্রহ, চন্দ্র, তারা রশ্মি ধারা বর্ষিছে,
> পাহিছে গৃহী প্রেমের সুর, বাজায় তাল বৈরাগী ;
> শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐকতান নৌবতে,
> কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি
> গগন সেথা মগন সদা নবীন চির আনন্দে
> জন্ম আর মরণ ; তাঁর বাজিছে তালি দুই হাতে ;
> রাগিণী উঠে ঝংকারিয়া কি মূর্ছনা কি ছন্দে
> ত্রিলোক হ'তে রসের ধারা মিশিছে আসি দিন রাতে।
>
> ঝুলন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

কিন্তু সকল সময় সত্যেন্দ্রনাথ যে গুরুগম্ভীর কবিতার অনুবাদ করেছেন এমন নয়—কিছু কিছু হাল্‌কা এবং চটুল কবিতার অনুবাদও তিনি করেছিলেন। এ ধরনের একটি কবিতা 'লা ফঁতেন'-এর 'যুগ্ম পত্নীর প্রেম' :

> যুগ্ম পত্নী ছিল এক প্রাচীন জনের,
> প্রৌঢ়া এক বালা এক……এই দুজনের
> যখন বসিত বুড়া বালা স্ত্রীর ঘরে
> পাকা চুল তুলিত সে আগ্রহের ভরে ;

প্রৌঢ়া কিন্তু পাকা চুল তুলিবার ছলে
কাঁচা উপাড়িত !......নিজ মিশাতে কুন্তলে।
দিনে দিনে এইরূপে বেড়ে উঠে প্রেমের বিপাক,
দেখা দিল বৃদ্ধ শিরে মাথা-জোড়া বিপর্য্য় টাক !

॥ যুগ্ম পত্নীর প্রেম : লা ফঁতেন ॥

ফার্সী কাব্যের প্রতি কবির একটি সহজাত প্রীতি ও অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ-প্রীতি বিভিন্ন কারণেই গড়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত, কবিও উক্ত ভাষায় দক্ষ হ'য়ে ওঠেন অতি অল্প বয়সেই। তা' ছাড়া ইংরেজ-শাসিত সে যুগেও মোগল-স্বষ্ট সূক্ষ্ম শিল্পকলা-সৌন্দর্যের চর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল। পারস্ত কবি হাফেজের কবিতার অনুবাদের পিছনে ফার্সী জ্ঞান ছাড়া সম্ভবতঃ আরো একটি কারণ মিশেছিল। হাফেজের কাব্যের সাথে আমাদের বৈষ্ণবকাব্যের যে ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে তা' হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। যা' হোক সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে ফার্সী ভাষান্তর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে' আছে। কবি-কৃত সমগ্র অনুবাদের এক-তৃতীয়াংশ ধনসম্পদ বোধ হয় ফার্সী ভাষা থেকে এসেছে। মহাকবি হাফেজের প্রায় সমগ্র কাব্যের অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন কবি এবং বলাবাহুল্য অনুবাদ হিসেবে সেগুলি সার্থকতর। সম্রাট্ শাজাহানের কাব্যাবলম্বনে মূল ফার্সী ছন্দের দ্যোতনা বজায় রেখে কবি অনুবাদ করেন "তাজের প্রথম প্রশস্তি" :

জগৎ-সার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেষ
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তায় তেজ !

॥ তাজের প্রথম প্রশস্তি : শাজাহান ॥

এসব কবিতায় ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ নতুনতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। চীনা, জাপানী, ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার কবিতা অনুবাদ করে' সত্য-কবি তা'র অনুবাদভাণ্ডার প্রাচুর্যে ভরে তুলেছেন—কিন্তু এই বিভিন্ন ভাষা থেকে মণি আহরণের মধ্যে

তাঁ'র অনুবাদ শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত নেই। কবিতাকে ভাষান্তর করা চলে না—করলে তা'র সুকুমার লাবণ্য-শ্রী বিনষ্ট হ'তে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র কাব্যের অনুবাদ সম্পর্কে এ কথা আমাদের বার বার স্মরণ করিয়েছেন। "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ সম্পর্কেও তাঁ'র মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সক্রিয় ছিল। তবুও সে অনুবাদ নতুন সৃষ্টিরূপে সম্মানিত হয়েছে। সার্থক অনুবাদের স্বরূপই এই: সে অনুবাদ একাধারে হবে মূলানুগ এবং নতুন সৃষ্টির মহিমায় ভাস্বর। সার্থক অনুবাদের এ দু'টি বিশেষ গুণ সত্য-কবির অনুবাদ-সাহিত্যে বর্তমান ছিল বলেই বাংলা-সাহিত্যে তিনি 'অমর অনুবাদকে'র দুর্লভ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর কবি-প্রতিভার মোহাঞ্জন-স্পর্শে সমগ্র অনুবাদ-সাহিত্যে মূলানুগ হ'য়েও নতুনতর রূপায়নায় ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। নিম্নের উদ্ধৃতগুলি লক্ষ্য করলেই তা' বোঝা যাবে:

রাতের ফড়িং-পরী নাচে সুবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস্ পোষাকী
তরুণী ছাগীরে বুঝি ভাবে সে সাকী!

॥ চাঁদনী রাতের চাষ: মিস্ত্রাল্ ॥

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-তারার মালা!

॥ মহাদেব: আলফ্রেড লায়াল ॥

রুধিয়া নিঃশ্বাস
ফিরিছে হাহুতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি' ঝরি'
আঁখিজল।

॥ শিশিরের গান: পল্ ভার্লেন ॥

এ সকল কবিতা হ'তে বিদেশী কবিদের নাম তুলে দিলে ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথের স্বরূপ ধরা পড়বে। তাঁর স্বকীয় মৌলিক সৃষ্টির মাঝে যে চটুল ও স্বরাঘাত ছন্দের দ্যোতনা রয়েছে উপরোক্ত কবিতাগুলির অন্তরাত্মা তো সেই স্পন্দনে কম্পমান।

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ-যোগ্য। কবি বিদেশী কবিতাকে কেবল অনুবাদ করে' ছাড়েন নি—তা'র ছন্দকেও অনূদিত কবিতার মধ্যে আত্মসাৎ করে' নিয়েছেন। সম্রাট্ শাজাহানের কবিতার মূল ফরাসী ছন্দের অনুসরণে 'তাজের প্রথম প্রশস্তি' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে গর্বভরে স্মরণ করি: সত্য-কবি যতগুলি স্বদেশী বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন বর্তমানকাল পর্যন্ত বোধ হয় কোন অনুবাদক সে সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। স্বল্পায়ু সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে এটি কম গৌরবের কথা নয়।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ যে সর্বত্র সঙ্গত ও সুন্দর হয়েছে তা' নয়—বরং কিছু কিছু কবিতার অনুবাদে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। মূলানুগ অনুবাদ যা সত্য-কবির অনুবাদের মূল বৈশিষ্ট্য তা' সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। ভাষার লালিত্য-মাধুর্য, ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য অনেক স্থলে শ্রবণ সুখকর হয় নি। আমরা অনুবাদ-প্রসঙ্গে কবির ঔচিত্য-বোধের কথা বলেছি। এই ঔচিত্য-বোধের জন্যেই তিনি বহু কবিতার রূপান্তর ঘটিয়ে সজীবতা ও রূপশ্রী দান করেছেন। আবার এই ঔচিত্য-বোধের জন্যেই অনেক স্থলে রূপান্তর ঘটিয়ে মূলের অঙ্গহানি করেছেন, রূপান্তর-লীলায় কোন কোন স্থলে অর্থসঙ্গতিও রক্ষিত হয় নি, ফলে অনেক স্থলে কবিতা বিকৃত হয়েছে। 'And no birds sing'-এর অনুবাদ 'পাখী গাহে না গান' করলে অর্থের অসঙ্গতি প্রকট হ'য়ে ওঠে। কীট্‌স্-এর কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্র-নাথ তা'ই করেছেন ('নিষ্ঠুরা সুন্দরী' দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়াও সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ অক্ষম ও অসার্থক। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে' কালিদাস, কীট্‌স্ ও সেক্সপীয়রের অনুবাদের কথা মনে পড়ে। কালিদাসের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির অনুবাদ পড়লেই বোঝা যায় এ অনুবাদের ব্যর্থতা:

> লাবণ্যখনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার?
> কিবা সেই আদিরসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার?

কিবা সে পুষ্পপ্লাবিত চৈত্র? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয়।
॥ রূপসী: কালিদাস ॥

এ অনুবাদ পড়লেই মনে প্রশ্ন জাগে মিলযুক্ত পয়ারই কি কবিতা? সেক্সপীয়রের 'As You Like It'-এর 'Under the Greenwood Tree' একটি বিশ্ববিখ্যাত কবিতা। ছন্দ, ভাব-কল্পনা ও চিত্র-সম্পদে কবিতাটি বিশ্বকাব্যসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। অথচ সত্যেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে কবিতাটির দুর্গতি নিতান্ত করুণ হ'য়ে উঠেছে:

'সবুজ বনের সবুজ ছায়
আয় গো কে তোরা মেলিবি কায়,
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
গাহিবি মধুর মধুর গান,
আয় গো হেথা, আয় গো হেথা আয়।......
॥ বনচ্ছায়ায়: সেক্সপীয়র ॥

ব্রাউনিং-এর একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদের প্রথম পংক্তি এই:

ভুলেছিল অচিন পাখী এই ডালের এই কৈকড়িতে।
॥ স্বপ্নাতীত: ব্রাউনিং ॥

তুকারামের একটি কবিতার ব্যর্থ অনুবাদ:

কিরে মন তুই কৃপাময় নাথে রয়েছিস নাকি ভুলে
॥ ভোলা মনের প্রতি: তুকারাম ॥

মীরাবাঈয়ের একটি বিখ্যাত গজলের অনুবাদ এই:

নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জলজন্তু ত আছে,
ফল মূল খেলে হরি যদি মেলে
বানর রয়েছে গাছে।

এ সকল অনুবাদ 'অমর অনুবাদক' সত্যেন্দ্রনাথের অক্ষমতা ও গ্লানি বহন করে' নিয়ে চলেছে। কোন দিক দিয়ে এ অনুবাদ সার্থক নয়—না ছন্দে, না ভাবে। সার্থক অনুবাদের সঙ্গে এই দুর্বলতা

স্মরণ না করলে কবি সম্পর্কে Over estimation-এর দোষে আমাদের দোষী হ'তে হবে। এবং তা' মস্ত বড় অপরাধ।

**॥ পাঁচ ॥**

এখন সত্যেন্দ্রনাথের কবি-বৈশিষ্ট্যের সার সংকলন করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের গতি কৌতুক এবং কৌতূহলের মধ্যে নিবদ্ধ। কৌতুক এবং কৌতূহলের দিগন্ত ছিন্ন করে' তাঁ'র ধ্যান-কল্পনা বিচিত্রগামী হ'তে পারে নি। আদিগঞ্চল-বিথারী কবি-কল্পনা তাঁ'র নেই—অন্ততঃ কবিতার কোথাও তা'র পরিচয় মেলে না। সুতরাং ভাবসম্পদে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা দৈন্য। চিরস্থায়ী সম্পদ তা'র ভিতরে কিছুই নেই। কৌতুক এবং কৌতূহল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—অঙ্কের মত—অথবা প্রশ্নাকুল শিশুমনের একটি বিশেষ অবস্থা। প্রশ্নের সমাধানের সাথে সেই প্রশ্নের প্রতি যেমন শিশুমনের আর কোন গহন জিজ্ঞাসা থাকে না তেমনি কৌতূহল একবার ধরা পড়ে গেলেই তা'র রসসৃষ্টির সমুদয় গবাক্ষপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা স্পষ্ট চেতনা-সমৃদ্ধ—সুতরাং সে চেতনায় চিত্তকে রসবাহী করার কোন দ্যোতনা নেই। অনুবাদ কবি যতই করুন—আপামর বাঙালী তাঁ'র অনুবাদের খোঁজ খুবই কম রাখে। তাদের ব্যগ্র মন তাঁ'র মৌলিক কবিতার বিচিত্র স্পন্দমান ছন্দের দিকেই নিবদ্ধ। ছড়াছন্দের চটুল মূর্ছনা দিয়েই তিনি বাঙালীর কোমল মনকে জয় করেছেন। ছন্দের এমন সজাগ-লালন, 'সঙ্কেত-তির্যক চিত্রিত ভাষণ' এবং আঙ্গিক-প্রকরণের এমন মনোরম-ঐন্দ্রজালিক বৈচিত্র্য ইতিপূর্বে বাঙালী দেখে নি। ছন্দের এই ইন্দ্রজাল দিয়ে তিনি বাঙালীর হৃদয়ভাণ্ডার একবারে লুট করে' নিয়েছেন। বাংলার অসীম কাব্য-সমুদ্রের সুনীল জলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা যেন ছন্দের একটি লাজনম্র ভীরু কোরক—

এর পূজা বাঙালী চিরদিনই করবে। সত্যেন্দ্র-কবি-মানসের সমুদয় বৈশিষ্ট্য এই ছন্দ-মাধুর্যের মধ্যেই সীমিত—অন্য কিছুতে নয়। ছন্দের মূর্ছনায় তিনি আমাদের বিভোর করেছেন—গহনচারী ভাবকল্পনার দ্যুতি দিয়ে তিনি আমাদের মনোলোকের দিগন্তকে রোমাঞ্চ-রঙীন করে' তুলতে পারেন নি।

## ॥ বিহারীলাল ॥

### ॥ এক ॥

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন যেন বন্ধনমুক্ত প্রথম প্রমিথেউস। মধ্যযুগীয় বৈচিত্র্যহীন পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত বাংলা গাঁথা-সাহিত্যের কোমলবক্ষ বিদ্রোহী বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে যেন দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। কাব্য-রমণীর অঙ্গ হ'তে খসে গেল পয়ারের শিথিল বিন্যাস, লাচাড়ীর বৈচিত্র্যহীনতা। বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের মানস-লঙ্কায় যে গর্জনোন্মুখ জোয়ার-কল্লোল জেগে উঠেছিল তা'রই দুর্নিবার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোমল কাব্য-রমণীকে হ'তে হ'লো বীরাঙ্গনা, প্রমীলার অপরাজেয় প্রমত্ততা দিয়ে তা'কে অগ্রসর হ'তে হ'লো প্রমোদ কানন হ'তে স্বর্ণ-লঙ্কার পথে। শ্যামের বাঁশী তলোয়ারে পরিণত হ'লো। গাঁথা-কাব্যের বুকে সঞ্চারিত হ'লো ক্লাসিক্যাল এপিক কাব্যের নর্তনশীল বৈভব।

ক্লাসিক্যাল শিল্পকলার ন্যায় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যও ভাস্কর্য-সুঠাম। ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনিতে দৃঢ়-নিবদ্ধ। কোথাও কোন দুর্বল অংশের স্থান নেই—সর্বত্রই একটি সুকঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা বর্তমান। তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে তা'র নিটোল অঙ্গ দীপ্তোজ্জ্বল। এপিক কাব্যের প্রাণসম্পদ হ'লো বর্ণনাভংগীর স্পষ্টতা ( boldness ), চরিত্রাবলীর সুস্পষ্ট রূপায়ণ, দ্রুত নাটকীয়তা ( dramatic elements ), ভাবরাশির গাম্ভীর্যময় সমুন্নতি (sublimity) এবং বস্তুধর্মের প্রাচুর্য ( objectivity )। মহাকাব্যের যে লক্ষণগুলির সাথে আমরা পরিচিত এগুলি একান্তভাবে বহিরাগত, কবির গোপন হৃদয়ের নয়। বস্তুতঃপক্ষে মহাকাব্যে কল্পনা ও ব্যক্তিহৃদয়-প্রকাশের অবকাশ খুব কমই আছে। আত্মতন্ময়তা নয়—বস্তুবিভোরতাই হ'লো মহাকাব্যের

প্রাণৈশ্বর্য। এর চরিত্রাবলী, এমন কী ভাবরাশিও বহিরীন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এর সকল সৌন্দর্য-সুষমা সুস্পষ্ট রেখাঙ্কনের মাঝে বিধৃত হয়েছে। সুস্পষ্টতার প্রদীপ্ত চরণতলে অস্পষ্টতা এবং কল্পনার সকল কিছুই নতি স্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে লিরিক কাব্য অস্পষ্ট। এখানে কবির কল্পনাই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রোম্যান্টিকতার স্বর্ণ-গোধূলিতে লিরিক কাব্যের সকল কিছুই অস্পষ্ট মনোহর হ'য়ে ওঠে। এ কাব্যে কবির ব্যক্তি-স্বরূপ শতবর্ণরাগে বিকশিত। আত্মলীনতা এবং আত্মতন্ময়তাই লিরিক কাব্যের সূতিকাগার।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে ধারার সূত্রপাত করলেন, সেই দৃঢ় কঠিন ধারার মাঝে শিশির-কোমল লিরিকের স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ মধুসূদন-প্রতিষ্ঠিত সেই ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এঁদের কাব্যের কোথাও যে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার কথা লিপিবদ্ধ হয় নি—এমন কথা বলা চলে না। এঁদের কাব্যের নায়কগণ প্রচণ্ড বিক্রমে আকাশ-পাতাল বিমোথিত করে' সর্বদাই গদা ঘুরিয়ে ফেরেন নি—সেই রণোন্মত্ততা এবং বিপুল কর্মোন্মাদনার ফাঁকে ফাঁকে আপন ব্যক্তি-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও প্রকাশ করেছেন। সেখানে কবিচিত্তের স্বরূপ অনেকখানি ধরা পড়েছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহু স্থলেই লিরিকের সুকোমল সুরে এপিকের বস্তু-কেন্দ্রিকতা (objectivity) খণ্ডিত। তথাপি সামগ্রিকভাবে এই যুগের কাব্য এপিকধর্মী। বহির্জগৎ এবং বহির্জীবনকে নিয়েই এই যুগের কাব্য স্পন্দমান। বহির্বিশ্বের ঘটনাসঙ্কুল আবর্তের দিকেই এই যুগের কবিদের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে মহাকাব্যের কর্মোন্মাদনার পাশে নিভৃত মনের গান বলা হয় কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একমাত্র 'আত্মবিলাপ' জাতীয় কয়েকটি কবিতা ছাড়া আর কোথাও ব্যক্তি-হৃদয়ের আত্মমুখীনতা গভীরভাবে প্রকাশিত হয় নি। যথার্থ লিরিক কবিতার উচ্ছ্বাস একটি কবিতাতেও আছে কিনা সন্দেহ। মুকুন্দরাম

প্রমুখ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-কবিদের রচনায় ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেদনা-ব্যথার প্রকাশ আছে কিন্তু গীতি-কবিতার সায়াহ্ন-কোমল সুরটি সেখানে নেই। সাধারণতঃ বৈষ্ণব-পদাবলীই আমাদের কাব্যধারায় আদর্শ গীতি কবিতা বলে' সমাদৃত। কিন্তু সেখানেও কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার সুষ্ঠু প্রকাশ নেই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অন্তরালে কবির গহন মনের বাসনা অনেকখানি পঙ্গু ও মূক হ'য়ে পড়েছে—স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নেই। এখানে কবির ধ্যানধারণা অনেকখানি কৃষ্ণেন্দ্রিয়, আত্মেন্দ্রিয় নয়। বৈষ্ণব-পদাবলীর একপ্রান্তে আছে রাধাকৃষ্ণ অপর কোটিতে আছে কবি-মানস। এই দুই কোটির ছন্দিত আন্দোলনে বৈষ্ণব-পদাবলী সুন্দর—তবুও গীতি কবিতার অখণ্ড সুরপ্রবাহ এতে নেই। 'কবি ব্যক্তিত্ব' এখানে খণ্ডিত। বস্তুতঃ আধুনিক কাব্যের পূর্ব অধ্যায়ে ব্যক্তি-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সুরটি বিরলশ্রুত। এপিকের সাথে লিরিকের সংমিশ্রণ ঘটলেও কিংবা পদাবলী সাহিত্যে লিরিকের আমেজ এলেও কোথাও লিরিক কবিতার সুরটি একান্ত-ভাবে ঝংকৃত হয়ে ওঠে নি। একান্তভাবে লিরিক কবিতার সুরটি প্রথমে শুনতে পেলাম বিহারীলালের মধ্যে। বিহারীলালই সর্বপ্রথম দৃষ্টিকে বহির্বিশ্বের কর্মকোলাহল হ'তে সরিয়ে এনে নিবদ্ধ করেছেন অন্তর্লোকে। তাঁ'র দৃষ্টি অন্তর্মুখীন। আপন মনের ধ্যান-চিন্তা, মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিই বিহারীলালের কাব্যে রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে উঠেছে। কাব্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যে এই যুগের এপিক কবিগণ যখন উন্মত্তবেগে আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত, জল-স্থল একাকার করে' ফেলছেন তখন বিহারীলাল কল্পনা-পক্ষীরাজের বহির্মুখী বেগকে দমন করে' ছুটিয়ে দিয়েছেন অন্তর্লোকের রহস্যঘন মহাসাগরের তীরে তীরে। সেখান হ'তেই তিনি লাভ করেছেন তাঁ'র কাব্য-প্রেরণা, সৃষ্টির আবেগ। তাঁ'র কাব্য প্রচণ্ড-স্রোতা পদ্মা নয়—অন্তরবাহী ফল্গুধারার সুকোমল অভিব্যক্তি। আত্মমুগ্ধ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি, আত্মনিষ্ঠ রহস্যময় প্রেমচেতনা

তাঁ'র কাব্যকে অনন্যসুন্দর করে' তুলেছে। এপিক-কবিগণের কাব্য-দিগন্ত স্পষ্ট কিন্তু বিহারীলালের কাব্য-দিগন্ত রহস্য ঝিলিমিলিতে দূর-প্রসারী—অস্পষ্ট। তাঁ'র কাব্যের সকল সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে অজানা রহস্য শত বর্ণরাগে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনের হৃদয় বেদনায়, প্রকৃতি-প্রীতির অভিনব আন্দোলনে বিহারীলালের কবিতা সহজ-বলিষ্ঠ এবং অবক্ষিত। এই ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন এবং নিসর্গপ্রীতি রোম্যান্টিকতার সুরমূর্ছনায় একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। সুতরাং বিহারীলালই বাংলা কাব্যের সুবক্কিম ধারায় সর্বপ্রথম লিরিক কবি। সর্বপ্রথম তাঁ'র কাব্যের মধ্যেই লিরিক কবিতার সুর বৈচিত্র্য কাকলীমুখর হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র কবিতায় এপিককাব্যানুগ বিপুল ঐশ্বর্য নেই—আছে আত্মবিভোরতার রূপমুগ্ধ মন, আছে সরল মনোহর আত্মলীন অভিব্যক্তি। মঙ্গলকাব্যের গাথা বৈচিত্র্য নয়, এপিকের ছন্দহিল্লোল নয়, পদাবলীর কৃষ্ণহারা ব্যাকুলতাও নয়—ব্যক্তিহৃদয়ের বিপুল বাসনা-কামনার বিচিত্রানুভূতির রূপায়নায় বিহারীলালের কাব্য চিরমধুর। সুতরাং সৌন্দর্য-পিয়াসী বিহারীলালের হাতেই আধুনিক লিরিক কবিতার যথার্থ প্রবর্তনা। বাংলা কাব্যপ্রবাহ এখান হ'তেই ভিন্নমুখী হ'য়ে নবসৃষ্টির উন্মাদনায় স্বতন্ত্র খাতে বইতে শুরু করেছে। বিদ্রোহী মধুসূদনের হাতে গাথা কাব্যের যে ধারা মহাকাব্যের ঊর্মিমুখর মহাসাগরের বুকে দিক হারিয়েছিল বিহারীলালের হাতে সেই ধারাই গীতি-কবিতার বিপুল বিস্তারী রহস্যময় রাজ্যে দিক হারালো।

*॥ দুই ॥*

নিষ্ঠাবান সমালোচক কালিদাস রায় কবির প্রতি তাঁ'র মুগ্ধ মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন : "উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যলোকে বিহারীলাল একেবারে দল ছাড়া, Like a star that dwelt apart. স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উন্নতশীর্ষ কবি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।"

বিহারীলাল সম্পর্কে এ কথা পূর্ণ সত্য। তাঁ'র কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম সায়াহ্ন-গোধূলির এক স্বপ্নাচ্ছন্ন আমেজ পেলাম। যে স্বপ্নাচ্ছন্ন ধ্যানদৃষ্টিতে কবি নিখিল বিশ্বের সর্বত্রই অবলোকন করেছেন এক বিমোহন মূর্তি। সজল মেঘমালার বুকে বুকে, বিকশিত পুষ্পের দল-পাপড়িতে, পল্লবঘন কাননশ্রেণীতে, নীড়মুখী বিহঙ্গের কাকলিতে, বিশ্বনিখিলের অণুপরমাণুর সর্বত্রই কবি অনুভব করেছেন তাঁ'র মানস-প্রিয়ার নীরব পদসঞ্চার। বলাবাহুল্য এই মানস-প্রিয়াই কবির বহুখ্যাত 'সারদা'। এই সারদাকে কোন নির্দিষ্ট রূপগণ্ডির মধ্যে ধরা যায় না, স্পষ্ট রেখাঙ্কনের মধ্যে এই সারদাকে আবদ্ধ করা অসাধ্য। কবি শেলী যেমন বিশ্বের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করেছিলেন সৌন্দর্যের শাশ্বত বেগ—Spirit of Beauty—তেমনি কবির সারদাও নিখিল-ব্যাপ্ত। এই মানস-প্রিয়া সীমার মাঝে থেকেই অসীমকে প্রকাশ করে অথচ স্বয়ং সীমাতীত। এই সারদা অতি নিকট হ'তে দূর-দূরান্ত দেশের, অসীমলোকের ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে, আভাসে ইংগিতে কবির নিকট চির-অজ্ঞাত অসীম রহস্যলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে' দেয়, অথচ কবির কাছে তিনি পরম রহস্যময়ী। দূর-দূরান্ত হ'তে কবি একটুখানি রূপ-স্বপ্নের আভাস পান মাত্র—তাঁ'র নিবিড় সাহচর্যের ও সঙ্গলাভের জন্য কবির দেহমন লালসা-মদির হ'য়ে ওঠে অথচ তাকে একান্ত করে' পাওয়া যায় না। এই মানস-প্রিয়া সুরধনী-তীরে বাস করে, কমলে-কামিনীর মত অসীম রূপসম্ভার ও পরম লাবণ্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই মরীচিকাময়ী। এই অসীম রহস্য লীলাশ্রয়ী দিগন্তের কোল হ'তে বারে বারে ইশারা ইংগিতে কবিকে পাগল করে' দিয়েছে—তাই তো কবি আজীবন আচরণের সকল সুখ-দুঃখের মাঝে, সকল আশা-নিরাশার মাঝে সেই রহস্যময়ীর সন্ধানেই ফিরেছেন, জীবনের সকল ছন্দে গানে তা'কেই পূজা করেছেন।

কবির অতন্দ্র সাধনা বার বার আশা-নিরাশার মাঝে দোলায়িত

হয়েছে—রহস্যময়ীর ইংগিতধর্মী রূপাল্পনায় কবিচিত্ত বার বার প্রশ্ন-চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলছেন :

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে,
কে তুমি লাবণ্য লতা মূর্তি মাধুরিমা!

নন্দন নিকুঞ্জের মিলন-লীলায় এই জ্যোতির্ময়ী মেয়ে বার বার কবিকে আকর্ষণ করেছে, বার বার চিত্ত-চাতককে পিপাসা-কাতর করেছে কিন্তু তবুও কবি তা'কে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করেছেন :—

তবে কি সকলই ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল?
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা-লতায়?

এই চেনা-অচেনা, এই পাওয়া না পাওয়ার আল্পনায় গড়া মায়া-মৃগীর মরীচিকাময়ী স্বরূপটি "সারদামঙ্গল"-এ অভিনব চিত্রগরিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথও তাই সারদা-মঙ্গল পাঠ করে' বলতে বাধ্য হয়েছেন: "সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাঁহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য-স্বর্গ হইতেও একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" 'সারদামঙ্গল' কবির মানস-প্রিয়া সারদারই রূপ-চিত্র। এই মানস-প্রিয়ার স্বরূপটি কবি নিজেও ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে কোন 'সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী'র জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—"ধেয়াই কাঁহারে, দেবী! নিজে আমি জানি নে।"

এই না জানার বেদনায় কবিচিত্ত বেদনা-বিধুর হ'য়ে উঠেছে। হৃদয়বীণায় বিরামহীন ললিত রাগিণী বেজে চলেছে অথচ তা'র স্বরূপ জানা যায় না; সুর শোনা যায়, মন মোহিত হয় অথচ তা'কে পাওয়া যায় না—এখানে কবিচিত্তে হয়েছে নীরব দাহন-জ্বালার বেদনা-ম্লান ছায়াপাত। বিহারীলালের কাব্যে যে একটি অপূর্ব রূপতন্ময় Romantic melancholy-র সুর ধ্বনিত হয়েছে—তা'রও উৎসমূল এখানে। এ প্রসঙ্গে বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের একটি বহুখ্যাত উক্তি স্মরণীয়: "যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয়, এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

কবির সমগ্র জীবনব্যাপী যেন একটি করুণ নিঃসঙ্গতার বেদনা রয়ে রয়ে পরম আবেগে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। "বঙ্গসুন্দরী"র উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি-পরিবেশে মিলন আগ্রহে যে বেদনার জন্ম, "সারদামঙ্গলে" মানস-সুন্দরীকে না পাওয়ার অন্তর্দাহে তা'রই পূর্ণ পরিণতি। এখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে অধিকাংশ রোম্যান্টিক কবিগণের মনে এই যে বেদনাদাহ—এ বেদনাদাহের কারণ কী? 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। রোম্যান্টিক কবিগণের অন্তর্লোকে বাস করে তাঁদের মানস সুন্দরী, কবিপ্রিয়া—সে প্রিয়া কল্পনায় গড়া, চিরযৌবনা উর্বশী। কবিরা বাস্তবের বুকে তাঁদের সেই মানস-প্রিয়ার অন্বেষণ করেন। কিন্তু 'ইতর' বাস্তবের বুকে সেই লাবণ্য-দীপ্তা মানস-প্রতিমার সন্ধান তো পাওয়া যায় না। কল্পনার স্বপ্ন-মন্থর সোনালী চিত্র অপেক্ষা বাস্তব চিরদিনই কুৎসিত, ক্লিষ্ট। বিহারীলাল তাঁ'র কল্পলোকের মানস-প্রিয়া সারদার অন্বেষণ করেছেন নিখিলের প্রত্যেক বস্তুতে। প্রত্যেক প্রাণীর মাঝেই পেতে চেয়েছেন সারদার পূর্ণরূপ। কিন্তু 'বিশ্বের কবিতা'কে 'গৃহের বণিতা'র মধ্যে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। হয়তো সেই মানস-

প্রিয়ার একটু আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু পূর্ণভাবে তো পাওয়া যায় না। বিহারীলাল তা' পানও নি—এখানে কবিহৃদয় বেদনায় বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে। সারদামঙ্গলের বহু কবিতায় গীতোচ্ছ্বাসের অন্তরাল হ'তে সেই বেদনাহত ম্লান সুরটি গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে :

চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।

অথবা :

পূর্ণিমা প্রমোদ আলো ;
নয়নে লেগেছে ভালো ;
মাঝেতে উথলে নদী দু'পারে দু'জন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে দু'জন !

দু'পারে দু'জন অথচ মাঝে অথৈ জলের গর্জনমুখর প্রবাহ। সম্ভবতঃ এখানেই রোম্যান্টিক মেলানকলির সুরমূর্ছনার পূর্ণ পরিণতি।

উপরের আলোচনা হ'তে আমরা কবির রোম্যান্টিক ভাবধারার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু এই রোম্যান্টিকতার সুর শেষ পর্যন্ত রহস্যময় রোম্যান্টিকতার দিগন্ত অতিক্রম করে' মিষ্টি-সিজম্-এর বিপুল সাম্রাজ্যে পদার্পণ করেছে। কবির চিন্তাধারা ও ভাবপ্রবাহ—কেমন করে' ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে রোম্যান্টি-কতা হ'তে মিষ্টিসিজম্-এ প্রবেশলাভ করলো তা' আলোচনা করার পূর্বে আমরা রোম্যান্টিসিজম্ এবং মিষ্টিসিজম্-এর মধ্যকার ভেদটি বুঝে নিতে চেষ্টা করবো।

কাব্যে রোম্যান্টিকধর্ম এবং মিষ্টিকধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়, উভয়ের মধ্যকার ভেদটা প্রকারগতও নয়—একান্ত ভাবেই স্তরগত। মিষ্টিসিজম্ হ'লো রোম্যান্টিসিজম্-এরই ঘনীভূত রূপ মাত্র। যে মানসিক ধ্যান-গভীরতায় কবি রোম্যান্টিক হ'য়ে ওঠেন—সেই ধ্যান-সমাহিত মন আর একটু গভীরে প্রবেশ করলেই মিষ্টিক্ হ'য়ে ওঠে। রোম্যান্টিকতার অবস্থায় বিশ্বের সকল কিছুই রহস্যময়, চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে একটা প্রবল বিরোধ সেখানে চিরদিনই বর্তমান। রোম্যান্টিক অবস্থায় মনে হয় অস্পষ্ট কুহেলীর

অন্তরালে কী যেন গোপন রয়ে গেল, কল্পলোকের ধ্যান-স্বপ্নকে যেন পাওয়া গেল না, সর্বদাই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক সুগভীর বেদনা চিত্তকে আচ্ছন্ন করে' রাখে। অসীম রহস্যরাজ্যে মানস প্রিয়াকে অন্বেষণের মধ্যেই যে মন সীমিত তা' একান্ত ভাবেই রোম্যান্টিক। কিন্তু মিষ্টিক্ কবি-মানস এই অন্বেষণের মাঝে, এই না পাওয়ার বেদনার মধ্যেই থামে না—"সে আরও অগ্রসর হইয়া এই কুহেলীর যবনিকা ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের আলোতেই তাহার ভিতরে একটা অদ্বয় সত্যকে লাভ করিতে চায়। যখন সকল রহস্যের ভিতর একটা অদ্বয় সত্য লাভ হইল, সংশয়ের দোদুল্যমান চিত্ত যখন একটা দৃঢ় বিশ্বাসের অবলম্বনে নিশ্চল হইল, তখন মানুষ হয় মিষ্টিক্। মিষ্টিসিজম্-এর প্রধান লক্ষণ এই, সে মানুষের মনকে শুধু অপরিচিত ঘাট হইতে ঘাটে ভাসাইয়া চলে না, সে হৃদয়ে আনে একটা গভীর বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস তাহাকে চালাইয়া যায় বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি অদ্বয় সত্যের দিকে।" রোম্যান্টিক্ মন কেবল রহস্যের মাঝেই দিক হারায়—কিন্তু মিষ্টিক্ মন সেই রহস্যের বক্ষ বিদীর্ণ করে' সত্যকে লাভ করে। রোম্যান্টিক অবস্থায় চিত্তে জাগে না পাওয়ার বেদনা, আর মিষ্টিক অবস্থায় নিখিল মনপ্রাণ পাওয়ার আনন্দে পরম প্রশান্ত রূপ ধারণ করে। আমরা পূর্বের আলোচনা হ'তে দেখেছি মানস-প্রিয়া সারদাকে না পাওয়ার জন্যে কবিচিত্তে নেমেছে বিষাদের সুরমূর্ছনা—এই অবস্থায় বিহারীলালের কবি-মানস একান্ত ভাবেই রোম্যান্টিক। কিন্তু এই অবস্থা অতিক্রম করে' চিন্তার গহন গভীরে নেমে অসীম রহস্যজাল দীর্ণ করে' কবি লাভ করেছেন এক অদ্বয় সত্যকে—এই অদ্বয় সত্যকে লাভ করার অঙ্গীকার আছে সারদামঙ্গলের শেষের দিকে এবং বিশেষ করে' সাধের আসনের প্রথম অধ্যায়ে। এখানে বিহারীলালের কবি-মানস একান্ত ভাবেই মিষ্টিক্ হ'য়ে উঠেছে। পূর্বে কবির কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হয়েছে মানস-প্রিয়াকে না পাওয়ার বেদনা—এখন তিনিই বলেন :

কবিরা দেখেছে তাঁকে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

অন্যত্র :

কহে সে রূপের কথা,
বসন্তের তরুলতা।
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন ফুল ;
শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলঢুল।

রোম্যাণ্টিক কবিকল্পনা এখানে স্পষ্ট মিষ্টিসিজম্‌-এ পরিণত হয়েছে। মানস-প্রিয়ার সন্ধান যে কবি প্রকৃতির মধ্যে পেয়েছেন, কবির নৈরাশ্য চেতনার মধ্যে যে একটি সুগভীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এসেছে তা'রই অভিনব স্বীকৃতি দেখি 'সাধের আসনে'র প্রথম অধ্যায়ের একটি কবিতায় :

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান্‌-গীতি বাজিতেছে সমস্বরে।
চাহি এ সৌন্দর্য পানে
কি যেন উদয়ে প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে।

এখানে কবি তাঁ'র চির-আরাধ্য সারদাকে পেয়েছেন। এ সারদা কেবল সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম এবং জ্ঞানেরই প্রতিচ্ছবি নয়—এ "সারদা বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিতা মূল মায়াশক্তি।" এ সারদাই অনাদি আদিম শক্তিরূপিণী—সেই শক্তির বলেই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরম রহস্যময়।

॥ *তিন* ॥

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে' স্বীকার করে' নেওয়া ভাল—বাংলা কাব্যের এপিক ধারাকে গীতি-কবিতার সীমাহীন সৌন্দর্য-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করালেও যে অসীমভেদী কল্পনা ঐশ্বর্যে ( Cosmic

Imagination ) বিশ্বের অন্তর্নিহিত উৎসকেন্দ্র হ'তে সৌন্দর্যরাশি ছিনিয়ে আনা যায় তা' বিহারীলালের ছিল না। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বিহারীলালের সৌন্দর্য চেতনা খণ্ডিত এবং অপূর্ণ।

বিহারীলালের সৌন্দর্য চেতনার ক্রমপরিণতির ধারা আলোচনা করলে আমরা তিনটি স্তর পাই—"বঙ্গসুন্দরী"তে সৌন্দর্যানুভূমির প্রাথমিক বিকাশ, "সারদামঙ্গল" এবং "সাধের আসনে"র প্রথম সর্গে সেই সৌন্দর্যানুভূতির পরিণতি এবং "সাধের আসনে"র দ্বিতীয় সর্গ হ'তে শেষ সর্গগুলিতে সেই সৌন্দর্যানুভূতি ক্রমজটিল হ'য়ে এলায়িত এবং খণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। তবুও মোটামুটিভাবে "সাধের আসন"কে "সারদামঙ্গলে"র পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। "সাধের আসনে"র প্রেমচেতনা এবং সৌন্দর্যানুভূতি অনেকটা "সারদামঙ্গলের"ই দোসর। বিশেষ করে' এই কাব্যের প্রথম সর্গটিতে যেন সমগ্র "সারদামঙ্গলে"র সুরটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এখানে অতীন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতির দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। তবুও এই সৌন্দর্যানুভূতির লাবণ্য সুষমায় নম্র নত এবং চিরজ্যোতিষ্মান। একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি অপরদিকে অতীন্দ্রিয় রূপসম্ভার—এই দুই বিপরীত কোটির দ্বন্দ্বে বিহারীলালের সৌন্দর্য চেতনা বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। যে 'সারদা'কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে' তিনি বলেছেন :

> কে তুমি জননী, পিতা,
> নন্দিনী, রমণী, মিতা
> প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?

অন্যদিকে সেই সারদাকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য সম্ভারে বিভূষিতা করে' তিনি লিখেছেন :

> কে তুমি মা জল স্থল
> মহান্ অনিলানল
> নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ।

বিশ্ব এবং কান্তি এই দু'য়ের সমন্বয়েই সৌন্দর্য সার্থক। একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য অন্যদিকে অতীন্দ্রিয় রূপ লাবণ্য, একদিকে 'কংক্রিট' অন্যদিকে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'—এই দু'য়ের সমন্বয় সাধনে সৌন্দর্য পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। বস্তুতঃপক্ষে বিহারীলাল পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক-চেতনার সাথে প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তার (মায়া) সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি অসীমভেদী কবিকল্পনা বিহারীলালের ছিল না—সুতরাং অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য চেতনার উৎসমূল আবিষ্কার করা তাঁ'র পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

"সাধের আসনে"র সমগ্র অংশটির সাথে প্রথম অংশের যেন কোথায় একটা বিরোধ আছে। দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ 'গোধূলি ও নিশীথে' অংশটিতে আমরা দেখেছি প্রকৃতির প্রাধান্য। এখানে অতীন্দ্রিয়চেতনা অনেকাংশে অবলুপ্ত। মোটামুটিভাব এ অংশে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশে আছে প্রকৃতি বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশের 'যোগেন্দ্রবালা' বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে গড়া নারী মূর্তি, অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। চতুর্থ সর্গের মধ্যে একান্তভাবে মানবীয় প্রেমের কথা বিঘোষিত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় রহস্য নয়—মানবীয় প্রেমই এখানে উচ্চকণ্ঠ। মর্তের মৃত্তিকার অমোঘ আকর্ষণে কবির রোম্যান্টিক নভঃস্পর্শী মন ধূলি-মলিন হ'য়ে উঠেছে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই—এখানে কবি মূল প্রসঙ্গ অতিক্রম করে' পদাবলী সাহিত্যের তত্ত্বকথায় প্রবেশ করেছেন। পঞ্চম সর্গে অমরাবতীর পথপরিক্রমায় পাই কবির পৌরাণিক উপলব্ধির কথা। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে ভক্তিভাব এবং প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা কবি-চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। এখানেও সৌন্দর্যানুভূতির বিশুদ্ধ রূপ আবিল হ'য়ে উঠেছে। নবম, দশম ও উপসংহার অংশে আমরা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনার আর এক বিপর্যয় লক্ষ্য করি। এখানে 'সারদা' আর কবির মানস-প্রিয়া নন—আসন-দাত্রী 'সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী'ই সারদার আসন গ্রহণ করেছেন। সুতরাং

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে "সাধের আসনে" কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও প্রেমচেতনা বিশুদ্ধ নয়—পাঁচমিশেলী চিন্তা-ভাবনায় এ সৌন্দর্য-বোধ খণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। ধ্যান-কল্পনার বিচ্ছিন্নতার জন্য অনেকাংশ অসংলগ্নও বটে। সাধের আসনের প্রথম সর্গটির সাথেই যা' সারদামঙ্গলের যোগ—অন্য অংশগুলি হ'তে কবি যে কা'কে ধ্যনে করেন বা তাঁ'র সৌন্দর্যানুভূতির স্বরূপ কী তা বোঝা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে এখানে যে কাব্যরূপ পাই তাতে সারদা মানস-প্রিয়া, বিবাহিতা পত্নী, পিতা, মাতা পুত্র, কন্যা, আসনদাত্রী দেবী সব কিছু। সকলে মিলে সারদা হওয়ার দাবি করায় শেষ পর্যন্ত, কেউই সারদা হ'য়ে উঠতে পারে নি। "সাধের আসনে" কবির সৌন্দর্য-চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ে এখানেই সব থেকে বড় বাধা। বস্তুতঃপক্ষে এ বাধা বিহারীলালের একার নয়—ঐ যুগের কবি-মানসের। সুরেন মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি সকলের মাঝেই রোম্যান্টিক ভাবধারার আবেগ লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সার্থক হ'তে পারেন নি কেউ। এঁরা সকলেই অর্ধ ক্লাসিক এবং ছদ্ম রোম্যান্টিক। একদিকে রোম্যান্টিকতার রহস্যলোকে ওড়ার দুর্নিবার আবেগ অন্যদিকে মৃত্তিকার অমোঘ আকর্ষণ—এই দুই বিপরীত কোটির দ্বন্দ্বে এঁরা না ক্লাসিক না রোম্যান্টিক হ'য়ে উঠেছেন। অবশ্য বিহারীলালের মধ্যে রোম্যান্টিকতার স্বর্ণ-গোধূলিতে পক্ষবিস্তার করার স্পৃহাই অধিক—তবুও মাটির মমতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি এবং এই জন্যেই তাঁ'র রোম্যান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি এবং প্রেমচেতনা দ্বিধাগ্রস্ত এবং দুর্বল। 'বিহারীলাল রোমাঞ্চ কুহকিনীর অস্পষ্ট আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন মাত্র। হৃদয়ে ব্যাকুলতা জেগেছে চোখে তৃষ্ণা জেগেছে কিন্তু গৃহ, গৃহিণী, পারিবারিক পরিমিতি এবং ধর্মীয় সংস্কার এক বিরাট সীমার গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। তাই কবি এই পরিমিতিকে কাটাতে পারেন নি। এই পরিমিতিকে অতিক্রম করে' যেদিন বাঙালীর গৃহাঙ্গন দূর মেঘলোকের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে

গেলো—সেই দিনেই রোম্যাণ্টিকতার নবযৌবন সঞ্চার। এর জন্যে যে সোনার কাঠির প্রয়োজন তা' ছিল কবির শ্রেষ্ঠ শিষ্য, বাংলা সাহিত্যের কল্প-স্বপ্নের সেই প্রথম রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের হাতে।'

॥ চার ॥

'নীরব কবিত্বে'র যদি কোন পৃথক্ মূল্য থাকে তা' হ'লে বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথের সাথে এক করে' দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে পদচারণা করেছেন (অবশ্য স্বকীয় সৃষ্টিই প্রধান ); কিন্তু বিহারীলাল স্ব-নির্মিত পথেই করেছেন যুগাভিসার। স্থানে স্থানে তাঁ'র রোম্যাণ্টিক ভাবকল্পনা সার্থকতার উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছে। যে মিষ্টিসিজম্-এর মহান্ সংগীত সুষমায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বের হৃদয় লুট করে' নিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে বিহারীলালের হাতেই তা'র প্রস্তাবনা। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বিহারীলালের 'সারদা'রই পরিমার্জিত রূপান্তর মাত্র। 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যা'কে বলেছেন :

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী

বহুপূর্বেই আমরা বিহারীলালের কাব্যে তা'র সন্ধান পেয়েছি :

> অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
> পরম আনন্দময়ী !
>
> কে তুমি, মা ! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিত ?

বিহারীলাল যা'কে বলেছেন :

> কি যেন মহান গীতি বাজিতেছে সমস্বরে···
> কে যেন কতই রূপে একা লীলা খেলা-করে।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই একই লক্ষ্য শিল্প-সুষমায় দোসরহীন অনন্য-সুন্দর হ'য়ে উঠেছে : -

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্নমুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্মহৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী'—বলে কবি যা'র রূপতন্ময় ধ্যান করেছেন এবং যে সুন্দরী আজীবন কবির কবিতায় নানাভাবে, বিচিত্র রূপসম্ভারে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—বস্তুতঃপক্ষে 'সারদার' সাথে তা'র কোনই পার্থক্য নেই। শেলীর কবিতায় যিনি 'এপিসাইকিডিয়ান', রবীন্দ্র-কাব্যে যিনি 'মানস-সুন্দরী', বিহারীলালের কাব্যে তিনিই 'সারদা'। তবে প্রকাশের দৈন্যে এই সারদা নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য নিকেতনের লীলারহস্যময়ী হ'য়ে উঠতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রিয়া এক দিকে 'গৃহের বণিতা' আবার অন্যদিকে 'বিশ্বের কবিতা' কিন্তু বিহারীলালের মানস-সুন্দরী পূর্ণরূপে 'গৃহের বণিতা'ই—আংশিকরূপে 'বিশ্বের কবিতা' মাত্র। অবশ্য এই মাসন-প্রিয়াই যে 'কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিত' বিহারীলালের কবিতা-কুঞ্জের বহুস্থানেই আমরা তা'র আভাস পেয়েছি—তথাপি এ সুন্দরী শেষ পর্যন্ত খণ্ডিতা হ'য়ে বিশ্বের বিপুল পথ হ'তে সরে এসে গৃহের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই চলাফেরা করেছে।

বিহারীলালের কাব্যগুলি গভীর ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় অসীমভেদী কল্পনার সকল আয়োজনই তাঁ'র মধ্যে বীজাকারে নিহিত ছিল। কিন্তু সেগুলি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে নি। তাঁ'র কাব্য যেন ডিমের মধ্য হ'তে সদ্যজাত চোখ-না-ফোটা শাবক—প্রাণ আছে, পাখা আছে কিন্তু তাদের যথাযথ কার্যক্ষমতা নেই। এই শাবকই বিপুল পক্ষ বিস্তার করে' দূর নভঃলোকের সৌন্দর্যপথে অভিনব স্পন্দন জাগিয়ে উড়ে গেছে রবীন্দ্র-কাব্যের

মধ্যে। প্রকৃতি রমণীকে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রেম নিবেদন করেছেন—কিন্তু এই প্রেম নিবেদনের স্তরগত পার্থক্য আকাশ পাতাল হ'য়ে উঠেছে। বিহারীলালের প্রেম নিবেদনে একটি মৌখিক স্বীকৃতি আছে মাত্র, মরমিয়া প্রেমিকের আত্মহারা ভাব নেই :

> প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে,
> যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে।

এই প্রেম নিবেদনের অতলস্পর্শী চিত্র পাই রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতায়। নিবেদন প্রারম্ভিক লগ্নেই সমাপ্ত হয়েছে—এখন সেই প্রেম-পরিণয়ের সম্ভোগচিত্র :

> ......হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
> কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
> শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
> প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
> প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে।

এ তো কেবল মৌখিক স্বীকৃতি নয়। বিরহী যক্ষ যেন যুগ যুগ তপস্যান্তে আজ পেয়েছে তাঁ'র প্রিয়ার নিবিড় সাহচর্য। যেন লক্ষ কোটি যুগের ব্যাকুল প্রতীক্ষিত তৃষ্ণার্ত হৃদয় কোটি কোটি মুখের পিপাসা নিয়ে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য-নির্যাসকে দুর্নিবার আগ্রহে পানোন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। এ চিত্র বিহারীলালে কোথায়? বিহারীলালের কবিকল্পনায় শিখরস্পর্শী চিন্তা আছে, তাঁ'র কবি-মানস অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যচেতনায় ভাস্বর কিন্তু কবি-মানস আর কাব্য এক নয়। প্রকাশই কাব্য, ধ্যান-চিন্তা কাব্য নয়। অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ যখন শিল্পকৌশলের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অভিনব রূপ-সম্ভারে প্রকাশিত হয় তখনই কাব্যরসিক-চিত্ত বিমুগ্ধ। বিহারীলালের কল্পনা ছিল অকৃত্রিম—কিন্তু প্রকাশ ছিল পঙ্গু। যে স্বর্ণকাঠির ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে কল্পনা কাব্য হ'য়ে ওঠে বিহারীলাল ছিলেন সেই স্বর্ণকাঠির উত্তরাধিকার হ'তে বঞ্চিত। তাঁ'র সাধ ছিল

কিন্তু সাধ্য ছিল না। তিনি যে পরিমাণে চিন্তানায়ক সে পরিমাণে রূপ-শিল্পী নন। তিনি মূলতঃ স্বভাব কবি, তাই সহজাত আবেগেই তাঁ'র কাব্য বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। রূপায়ণের জন্য যে রূপাল্পনার প্রয়োজন তা' তাঁ'র কাব্যে নেই। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় তা'ই বলা যায় "সার্থক শিল্প রচনার ক্ষেত্রে যে পরিমার্জনা ও সর্তকতার প্রয়োজন তা'র চিহ্ন তাঁ'র কবিতায় নেই। অনেক সময় কলাকৌশলহীন ভাষণই তাঁ'র লেখনীমুখে স্বতোৎসারিত হয়েছে। এ যেন এক বিচিত্র-কীর্তি সাহিত্যিক অভিমন্যু, যিনি অনায়াসে ব্যূহ ভেদ করেন কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ জানেন না।" রহস্যময়ী সারদা দূরলোক হ'তে রূপম ইংগিতে কবিকে পাগল করেছে। কবির দেহমন ব্যাকুল—সেই ব্যাকুলতার প্রকাশ এই:

> একি, একি কেন কেন,
> রসাতলে যাই যেন!...

এই পর্যন্তই থাক। একে কবিতা বলবে কোন্ পাগলে। অন্যত্র এই রহস্যময়ীর কথাই:

> চিনেছি মা, আয়, আয়
> বিকাইব রাঙা পায়!
> তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে!
> বিপদ সম্পদে, রাখ,
> অলক্ষ্যে আগুলে থাক্;
> যখন যেখানে আছি চেয়ে আছ মুখ পানে!

রাঙা চরণতলে নিজেকে বিলীন করার ইচ্ছা কবির মধ্যে প্রবল —কিন্তু কেমন ভাবে নিজেকে বিলীন করা যায় তা' কবির অজ্ঞাত। তাই শেষ পর্যন্ত 'অলক্ষ্যে আগুলে থাক' বলেই আপন-হারা ব্যাকুল আত্মার মূলে বজ্র হেনেছেন। নিজেকে আর রাঙা পায়ে বিলীন করা হ'য়ে ওঠে নি।

একটি রাত্রের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন:

> রাতি করে সাঁই সাঁই,
> জনপ্রাণী জেগে নাই,

কাব্য-রসিকের কাছে এ এক অদম্য হাসির খোরাক।

অধিক উদ্ধৃতি দিলে হয়তো আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে কবির প্রতি বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠবো—কিন্তু উদ্ধৃতি না দিয়েও বলা চলে বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশের এই চরম দুর্বলতা বহন করে' নিয়ে চলেছে। ক্ষীণতম এক ভগ্নাংশমাত্র কাব্য হ'য়ে উঠেছে। যেখানে তিনি কূলপ্লাবী ভাববন্যাকে সুকঠিন তটরেখায় আবদ্ধ করে' দূর মোহনার পথে অগ্রসর করে' দিতে পেরেছেন সেখানে তিনি সার্থক কবি—বড় কবি। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে এমন অংশ বিরল-দৃষ্ট। হৃদয়ে ভাব এসেছে কিন্তু মুখে ভাষা ফোটে নি। শিল্পী হিসাবে বিহারীলালের চরম ব্যর্থতা এখানে। তাঁ'র কাব্যের ছন্দ একান্ত ভাবে দুর্বল—পীড়াদায়ক। অন্ত্যানুপ্রাস অধিকাংশ স্থলে সুশ্রাব্য নয়—ভাষার তো কথাই নেই। 'প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া—ধপ্‌ করে বিছানায় পড়িল শুইয়া' জাতীয় গুরু-চণ্ডালে ভাষা প্রায় কবিতার সৌন্দর্য-সম্ভ্রমকে সমূলে ধ্বংস করেছে। মাঝে মাঝে তাঁ'র কবিতায় ছড়ার ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। ফলে অতীন্দ্রিয় ভাববাহী কবিতা অধিকাংশ স্থলে ছেলে ভুলান ছড়ার মত হ'য়ে উঠেছে।

বিহারীলালের এই দৌর্বল্যের প্রধান কারণ—তিনি সচেতন ভাবে কাব্যের ভাষাকে কোন দিনই অনুশীলন করেন নি। যত্নকৃত কলাকৌশলের অনুশীলন যেন তাঁ'র স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিহারীলালের কাব্যের রসভঙ্গের আর একটি প্রধান কারণ তাঁ'র কাব্যে অলৌকিক এবং লৌকিক চিন্তার নিরন্তর মিশ্রণ। তবুও মাঝে মাঝে যে তাঁ'র কাব্য 'সুন্দর' হ'য়ে ওঠে নি এমন নয়—সারদা-মঙ্গলের ঊষা-বর্ণনায় তিনি লিখেছেন :

বিরল তিমির জাল,<br>
শুভ্র অভ্র লালে-লাল<br>
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।

সন্ধ্যার রূপবর্ণনায় কবির কণ্ঠ হ'তে শুনি :

সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,<br>
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবী সুন্দরী।

"এই সকল চকিত চমকের ভিতর দিয়া কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় মেলে—কিন্তু চকিত চমকের ন্যায় তাহা বড় ক্ষণস্থায়ী। কাব্যের লোকোত্তর চমৎকারিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত আসিয়া গিয়াছে এমন অনেক লৌকিক বর্ণনা ও তাহার লৌকিক ভাষা যে আমাদের স্বপ্নও সব সময়ে জমিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই; স্বপ্নময় মন সোনালী হইয়া রাঙিয়া উঠিতে না উঠিতেই দমকা বাতাসে অপ্রত্যাশিত কালো মেঘ আসিয়া পড়িয়াছে।"

বলাবাহুল্য এই সব স্থলেই বিহারীলালের লাবণ্যদীপ্তা কবিতা-সুন্দরী রাহুগ্রস্তা।

# মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্য

॥ এক ॥

নব নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশক্তির নাম প্রতিভা। বাংলা কাব্যের বিদ্রোহী বিশ্বমিত্র মহাকবি শ্রীমধুসূদন সেই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য-কাব্য সৃষ্টিতে তিনি সর্বদা নতুনতর পথে পদচারণা করেছেন। নিয়ম-নির্দিষ্ট একই পথ-পরিক্রমাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তা'ই প্রতিটি সৃষ্টি একে অপর হ'তে স্বভাবে ও সৌন্দর্যে এক গৌরবদীপ্ত স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজি রেখে ধীরপ্রবহমান পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের সমাপ্তে বিরামচিহ্নের বুকে পদাঘাত হেনে দত্ত-কবি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ( Blank Verse ) আমদানি করলেন। রচিত হ'ল "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"—যা'র সমগ্র অঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দালোকে সমুজ্জ্বল; এর পর কবি নেমে এলেন সংগীত-সুষমার মৃদু কোমল ক্ষেত্রে। গীতিকবিতার সুরালাপনে "ব্রজাঙ্গনা"র সুকোমল কাব্যঝংকার অশ্রুত রাগিণীর ন্যায় আমাদের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষী হ'য়ে উঠল। কবি আবার পটভূমি পরিবর্তন করলেন। তাঁ'র কণ্ঠে দেখা দিল প্রলয়ের গর্জন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুতীব্র আন্দোলনে "মেঘনাদবধ কাব্যে"র অন্তরাত্মা বহ্নিমান হ'য়ে উঠল। মহাকবি ক্ষণিকের জন্যে দূরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করলেন তাঁ'র অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। কিন্তু সে নিতান্ত ক্ষণিক। এর অল্পকাল পরেই কবি "বীরাঙ্গনা" পত্রিকাকাব্য রচনায় মেতে উঠলেন। "বীরাঙ্গনা" কাব্যের এক কোটিতে আছে "ব্রজাঙ্গনা"র গীতঝংকার অন্য কোটিতে আছে "মেঘনাদবধে"র রণহুঙ্কার। এই উভয়বিধ বিরূপ সুরের সমন্বয়ে "বীরাঙ্গনা" কাব্যের

সৃষ্টি। "মেঘনাদবধে"র উদাত্ত ভেরীধ্বনি আর "ব্রজাঙ্গনা"র অমিয় সুরলহরী "বীরাঙ্গনা"য় এক অত্যাশ্চর্য সুমহান্ সমুন্নতি লাভ করেছে। কবি এই কাব্যে ধীরপ্রবহমান নদীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের কল্লোল গান লীন করে' দিয়েছেন। "মেঘনাদ-বধে"র দৃঢ়-পিনদ্ধ গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে' যাঁ'রা মন্তব্য করেছিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির লীলা-চাপল্য প্রকাশ করা অসম্ভব "বীরাঙ্গনা''য় একাধিক বনবাসিনী শকুন্তলার সকরুণ অশ্রুসজল ইতিহাস রচনা করে' বিদ্রোহী কবি তাঁদের সে অযৌক্তিক বিরূপ মন্তব্যের মর্মমূলে আঘাত হানলেন। যুদ্ধোন্মাদনা ও রণ-ভয়ঙ্করতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দে হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতির প্রকাশ যে কত সার্থক ও সুন্দর হ'তে পারে বাংলা কাব্যাঙ্গিকের ইতিহাসে "বীরাঙ্গনা" তার চূড়ান্ত দিকদর্শন হ'য়ে আছে। ছন্দ-সৌকুমার্যে "বীরাঙ্গনা" কাব্য আশ্চর্য মনোহর। এ কাব্যে মধুসূদনের সুকর্ষিত কাব্য-রীতি সাফল্যের উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছে। ইংরাজী কাব্যে যাঁ'রা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা করেছিলেন সেই Wyatt অথবা Surrey-এর দ্বারা সে ছন্দের উৎকর্ষ-সাধন সম্ভব হয়নি—এই নবাবিষ্কৃত ছন্দের পূর্ণ পরিণতির জন্য অলৌকিক প্রতিভাধর কবি Milton পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু বাংলা কাব্যে এ ছন্দের প্রবর্তন করেন মধুসূদন এবং আশ্চর্য তাঁ'র অসামান্য প্রতিভায় এ ছন্দের চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটে। "বীরাঙ্গনা" কাব্যই সে উৎকর্ষণার ফসল। অবশ্য মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখেছেন কিন্তু কোন কবিই মধুসূদনের স্বর্ণরেখাঙ্কিত সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি—"তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে যে ছন্দের জন্ম, "মেঘনাদবধ" কাব্যে যা'র শতবর্ণদীপ্ত গৌরবময় বিকাশ, "বীরাঙ্গনা" কাব্যে তা'রই সুমহান্ চরমোৎকর্ষ লাভ ঘটেছে। ভাবতরঙ্গমালার উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে "বীরাঙ্গনা"র ভাষা একাধারে মধুর, প্রাণময় এবং ওজস্বী। এ কাব্যের ছন্দ-প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট্

বঙ্কিমচন্দ্র তা'ই ঠিকই বলেছেন: "মেঘনাদবধের পর বীরাঙ্গনা কাব্যের স্বচ্ছন্দপ্রবাহ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহার সর্বত্রই একটি সংগীতধ্বনি ঝংকৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট; কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধু-কবির 'বীরাঙ্গনা' সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।"

ইংরাজী ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্য ও স্বচ্ছন্দ বিচরণের ফলে একান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই দত্ত-কবি পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকাল্ কবিগুরুদের নিকট থেকে আপন সাহিত্য-জীবনের মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁ'র অধিকাংশ সাহিত্য-সৃষ্টির ভাব, এমন কি বিষয়বস্তুর জন্যে তিনি কোন না কোন পাশ্চাত্ত্য কবির নিকট ঋণী। মহাকবি Milton-এর ব্যাপক প্রভাব আমরা পড়তে দেখেছি "মেঘনাদবধ" কাব্যের মধ্যে তেমনি "বীরাঙ্গনা" কাব্যের মধ্যে পড়েছে Ovid-এর প্রভাব। মধু-কবি যখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে ইটালীয় কাব্যসমুদ্র মন্থন করছিলেন তখনই রোমক কবি ওবিদের সাথে তাঁ'র ব্যাপক পরিচয় ঘটে। ওবিদের "The Heroides or Epistles of the Heroines" বা বীরপত্রাবলী নামক কাব্যগ্রন্থে কবি সুকৌশলে একুশজন পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের রোমান্টিক ভাবকল্পনায় প্রাণবন্ত করে' তুলেছেন। পুরাণ-বর্ণিত নায়িকাদের দেহ হ'তে সেই চিরপুরাতন সাজসজ্জা খুলে নিয়ে রোমাঞ্চ-মূর্ছনার অত্যুজ্জ্বল বর্ণাঢ্য অঙ্গসজ্জায় তাঁ'দের সজ্জিত করেছেন। এই নতুন আঙ্গিক-কৌশল দত্ত-কবিকে বিমুগ্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওবিদের ভাব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে "বীরাঙ্গনা" কাব্য রচনার সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অনেকগুলি পত্রে "বীরাঙ্গনা" কাব্যের ভাবপ্রেরণার স্থল ও উৎসমূলটি চিহ্নিত হয়েছে। মধু-কবি লিখেছেন: "বীরাঙ্গনা, i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be 21 Epistles

and I have finished eleven." অন্য একটি পত্রে লিখেছেন : "It is my intention, God willing to finish this poem in XXI Books. But I must print the XI already finished." ওবিদের মত একুশখানি পত্র দিয়ে "বীরাঙ্গনা" কাব্যটি সমাপ্ত করার ইচ্ছা কবির ছিল কিন্তু এগারটি লেখার পর অত্যধিক বিলম্ব হচ্ছে দেখে তিনি ঐ এগারখানি পত্রই মুদ্রিত করে' দেন। পরে অবশিষ্ট দশখানি পত্র রচনার ইচ্ছা কবির বহু ঈপ্সিত কর্তব্যের অপূর্ণতার মত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অসম্পূর্ণ দশটি পত্রের মধ্যে পাঁচটি পত্র রচনার সূত্রপাতও তিনি করেছিলেন কিন্তু তা' সমাপ্ত হয় নি।

সুতরাং এখন আমাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, মধুসূদন ওবিদের নিকট "বীরাঙ্গনা" রচনা সম্পর্কে প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ে ঋণী : প্রথমটি হ'ল এ কাব্য রচনার আঙ্গিক-রীতি। ওবিদের পুরাণ-খ্যাত নায়িকাগণ পত্র মারফত আপন হৃদয়াবেগ ও প্রেমব্যাকুলতা প্রেমাস্পদের নিকট জানিয়েছেন, মধু-কবির নায়িকাগণও পত্র-রচনার মাধ্যমেই আপনাপন হৃদয়োত্তাপ প্রিয়ের নম্র-কোমল প্রাণে সঞ্চারিত করে' দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হ'ল পত্রের সংখ্যা। ওবিদের কাব্যে ছিল একুশটি পত্র মধুসূদনও সমসংখ্যক পত্র-রচনারই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যের নামকরণের ব্যাপারেও মধুসূদন ওবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন এমন মন্তব্য কোনো কোনো সমালোচক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এরূপ মন্তব্য বোধ হয় সঙ্গত নয়। ওবিদের নায়িকাগণ সকলেই গ্রীক বা রোমীয় পুরাণের প্রণয়-বিগলিত নায়িকা কেবল দু' একজন নায়িকার পত্রের মধ্যে দর্প-ওজস্বীতার পরিচয় রয়েছে, রয়েছে বীরাঙ্গনার ব্যঞ্জনা। তাই ওবিদ তাঁ'র গ্রন্থের নাম দিয়েছেন "The Heroides or Epistles of the heroines," গ্রন্থের নাম করণের মধ্যে বীরত্ব ও কোমলতার ব্যঞ্জনা রয়েছে বলেই এ নামকরণ সার্থক। কিন্তু "বীরাঙ্গনা" নামকরণের মধ্যে কেবলমাত্র বীরত্ব-

ব্যঞ্জনার ভেরীনাদ শোনা যায়—অথচ কাব্যের নায়িকাগণ সকলেই—কেবল সম্পূর্ণরূপে জনা ও আংশিকভাবে কৈকেয়ী ছাড়া—শিশির-কোমল প্রেম-প্রস্রবণে ভাসমান। সুতরাং "বীরাঙ্গনা" নামকরণ ঠিক সুসংগত হয় নি। নামকরণের সাথে বিষয়বস্তুর বিরোধ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বীরাঙ্গনা উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের মানসলোকে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইত্যাদির মত বীর রমণীগণের যে প্রমত্ততা ফুটে ওঠে তা' এ কাব্যে বিরল-দৃষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে যে অর্থে Heroine শব্দ ব্যবহৃত হয়, মধুসূদন সে অর্থেই "বীরাঙ্গনা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরূপ মন্তব্যের ভিতর কবির পক্ষ নিয়ে তাঁ'কে সমর্থন করার মনোভাবই বর্তমান—সত্যকার বিচার-বিশ্লেষণ নেই। আমার মনে হয় কবি "বীরাঙ্গনা"র নায়িকাদের কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে বীর ললনার মনোভাবই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা' হ'য়ে ওঠে নি—তিনি বীরাঙ্গনার বদলে নায়িকার—Heroine—ধ্যান করেছেন। "মেঘনাদবধে"ও আমরা কবির অনুরূপ সংকল্প ও ব্যর্থতা দেখেছি। বীর-রসের কাব্য রচনা করার শপথ গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত "মেঘনাদবধ" করুণ রসের অশ্রুসজল লীলা-নিকেতন হ'য়ে উঠেছে। "বীরাঙ্গনা" কাব্যে কবির এরূপ সংকল্পের ব্যর্থতা প্রকট হ'য়ে উঠেছে। মধুসূদনের গোপন মনে কোমল করুণ রসের প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল—সেই আসক্তিই "বীরাঙ্গনা"র কঠিন কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে তা'কে সুকোমল করে' তুলেছে।

## ॥ দুই ॥

উৎস ও আঙ্গিক উভয় দিক হ'তে ওবিদের নিকট ঋণী হ'য়েও "বীরাঙ্গনা" কাব্য একান্তভাবে মধুসূদনের মৌলিক সৃষ্টি। এ কাব্যের কাহিনী ও ভাব-সত্য কবি গ্রহণ করেছেন রামায়ণ-মহাভারত হ'তে। ওবিদের পরিকল্পনা ও রামায়ণ-মহাভারতের

কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র ধরে মহাকবি উর্ণনাভের মত কল্পনার যে মোহজাল বিস্তার করেছেন তা' অলোকসামান্য প্রতিভাধর মধুসূদনের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকা কর্তৃক প্রেমাস্পদের নিকট পত্র লেখার রীতি লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের অন্যতম নায়িকা অশ্রুমুখী শকুন্তলা পদ্মপত্রে নখাঙ্কিত পত্র রচনা করে' রাজা দুষ্মন্তের কাছে পাঠিয়েছিলেন, পূর্বরাগোন্মত্ত রুক্মিণীদেবীও আপন হৃদয়ার্তি পত্র মারফত দয়িত শ্রীকৃষ্ণের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটি কথা স্বীকার করে' নেওয়া প্রয়োজন—সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকাদের পত্ররচনার নিদর্শন থাকলেও সে পত্র একাধিক কারণে স্মরণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ এ পত্রগুলি স্বল্প কথায় সমাপ্ত, দ্বিতীয়তঃ কাব্যরসের দিক হ'তে বিচার করলে পত্রগুলির নিকৃষ্টতা সহজেই ধরা পড়বে। পুরাণ-নায়িকাদের পত্রাবলীকে এরূপ ব্যর্থতার আলোকে দেখলে "বীরাঙ্গনা"র নায়িকাবৃন্দের পত্রাবলীর স্বর্ণসম্পদ ঝলকিত হ'য়ে উঠবে। এবং এখানেই মধুসূদনের মৌলিকতত্ত্ব। যে মানসিক অস্থিরতায় নায়িকা কর্তৃক নায়কের নিকট হৃদয়ার্তি জানিয়ে আবেগবহুল পত্র লেখা সম্ভব—কবি রূপদক্ষ শিল্পীর মত সুকৌশলে সেই পরিবেশ (situation) সৃষ্টি করে' পত্র লিখিয়েছেন। ফলে সুহৃদ্ পাঠকের রসচিত্তে সে পত্রাবলীর আবেদন অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

এখন পত্রাবলীর শ্রেণীগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি "বীরাঙ্গনা"য় মুদ্রিত পত্রাবলীর সংখ্যা এগার। এগারটি পর্বে এ গ্রন্থ সমাপ্ত। এক একটি পর্ব এক একটি পত্র। সমগ্র পত্রগুলিকে স্থূলভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রণয়পত্র ও বীররসাত্মক পত্র। এগারখানি পত্রিকার মধ্যে দশটি প্রণয়-পত্রিকা কেবল জনার পত্রটি বীররসাত্মক। এই একটি মাত্র পত্রের নায়িকাকে আমরা বীরাঙ্গনা রূপে দেখি—প্রচণ্ডা

প্রমীলা যেন "মেঘনাদবধে"র পৃষ্ঠা হ'তে উঠে এসে তেজস্বিনী জনার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। জনা প্রমীলারই দোসর।

সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রণয় পত্রগুলিকে আবার চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান-পত্রিকা। প্রেমাস্পদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে পত্র রচনা। কেবল একটি মাত্র পত্র 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয়তঃ লাঞ্ছনা-পত্রিকা। স্বামীর অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে প্রণয়িনী কর্তৃক গঞ্জনা-পত্র প্রেরণ। এ বিভাগেও একটি মাত্র পত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী'।

তৃতীয়তঃ দর্শনভিক্ষা-পত্রিকা। প্রোষিতভর্তৃকা কর্তৃক প্রবাসী স্বামীর নিকট দর্শন-প্রার্থনার পত্র। স্বামীর অদর্শনে চিত্তের দুনিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে' এই পত্রিকাগুলি রচিত হয়েছে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' এবং 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা'।

চতুর্থতঃ প্রেমপত্রিকা। নায়কের প্রেমানুগ্রহ ভিক্ষা করে' নায়িকা যে পত্র দিয়েছেন তাই প্রেমপত্র। এ পত্রগুলি প্রেমের অশ্রুজলে সিক্ত। 'সোমের প্রতি তারা', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা', 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' এবং 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'—এ চারিটি পত্রই নির্ভেজাল প্রেমপত্রের স্থান অধিকার করেছে।

এবার পত্রগুলির অন্তর্নিহিত ভাবরসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' (প্রত্যাখ্যান-পত্র) পত্রিকাটির মধ্যে বিষয়-বস্তুতে নতুনত্ব ছাড়া আর কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। আমরা চিরদিন জেনে এসেছি কোমল-প্রাণা নারী পতির কাছে প্রেম-ভিক্ষা করে কিন্তু পতির প্রেম-প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারেও যে নারী সুকঠোর হ'তে পারে জাহ্নবীর পত্র তা'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু পত্রিকাটির মধ্যে জাহ্নবীর অলৌকিক পূর্বকাহিনীর বর্ণনা থাকায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট

হ্রাস পেয়েছে। তাঁ'র প্রত্যাখ্যানের মধ্যে স্বর্গীয় কারণ মিশে থাকায় প্রেম-প্রত্যাখ্যানে নারীর বজ্রদীপ্ত কঠোরতা শিথিল হ'য়ে গিয়েছে। তা'ই প্রত্যাখান-পত্রে স্বামীর নিকট তিনি যখন লেখেন :

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,...
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে !

তখন পাঠকচিত্ত বিশেষ আবেগে আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে না। দর্শনভিক্ষা পত্রিকাগুলির মধ্যে শকুন্তলার পত্রিকাটি বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রটি মিলনের পর রচিত হ'লেও এর মধ্যে পূর্বরাগের দুর্লভ রেশটি মিশে আছে। পূর্বরাগের বিরল মুহূর্তে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে চিত্তে কল্পনাবেগ উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—শকুন্তলার হৃদয়েও তেমনি কল্পনার শতবর্ণ-দীপ্ত দলগুলি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। বনান্তরালে মর্মর-ধ্বনির মধ্যে তিনি প্রাণবল্লভের আগমন-ধ্বনি শ্রবণ করে' চকিত চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। প্রভঞ্জনকে আহ্বান করে' যখন তিনি বলেন :

...প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে,—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুল রাজা,
ফেল রাজ-পদতলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি।'

তখন শকুন্তলার বিহ্বল চিত্তের কল্প-স্বপ্ন সুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে। রাজা দুষ্মন্তের সাথে ক্ষণিক মিলনের পর শকুন্তলা পরিত্যক্ত হয়েছেন। ক্ষণিক মিলনের যে আনন্দ তা' আজ স্বপ্নময়। এখানেই শকুন্তলার জীবনের ট্রাজেডী। আশ্রমবাসিনী প্রেমখিন্না শকুন্তলার কণ্ঠে তা'ই একদিকে বিরহের রেশ অন্যদিকে পূর্বরাগের সংযত স্বর প্রগাঢ় হ'য়ে উঠেছে। কোন দীপ্ত অভিযোগ নয়, দাবী নয়, কেবল একটি বিরহ-কাতর ম্রিয়মাণ কণ্ঠ ধীরে ধীরে ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠেছে। শকুন্তলার সমগ্র পত্রটি যেন অশ্রুসিক্ত বিরহ-গাঁথা। বিবশা শকুন্তলাকে দেখে যখন অন্যান্য ঋষিবালা 'নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র,

মন্দ কথা কয়ে !' তখনও শকুন্তলার কণ্ঠ অভিমান-বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে না—কেবল অপরিসীম বেদনায় তাহার সমগ্র অন্তর ক্রন্দন-ফেনিল হয়ে ওঠে :

বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে !

উপেক্ষিত নারীর হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস পত্রিকাটির শেষ কয়টি ছত্রে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। যা'র মারফত পত্রিকাটি রাজসমীপে প্রেরিত হচ্ছে সে বনচারী—সুবিশাল রাজপ্রাসাদে গিয়ে সে প্রথা-সম্মত উপায়ে রাজার নিকট পত্রটি প্রদান করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তবুও আশ্রম-বালিকা একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখছেন :

বনচর চর নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

এইরূপ আশাহত নারীহৃদয়ের সুকোমল হৃদয়ভেদী অভিব্যক্তিতে, সুতীব্র উৎকণ্ঠা ও অনুযোগের স্পর্শে সমগ্র পত্রখানি দুর্লভ রমণীয় হ'য়ে উঠেছে।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' বিভিন্ন কারণে স্মরণযোগ্য। যে পরিবেশে দ্রৌপদী লিপিরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা' বিশেষরূপে নাটকীয়। বীরবর অর্জুন রাজ্যচ্যুত হ'য়ে বৈরনির্যাতনের জন্য অস্ত্রশিক্ষার্থে যখন সুরপুরে গমন করেছিলেন—প্রেমাস্পদের বিরহের সেই জটিলতম মুহূর্তে কাতরা দ্রৌপদী এই পত্রখানি রচনা করেছেন। পত্রটির মধ্যে এমন 'কতকগুলি চিহ্ন' রয়েছে যেগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় পত্ররচয়িতা অপরিণত বালিকা নয়—তিনি একাধারে পরিণত নায়িকা, প্রেম-সুধা আস্বাদনে অভিজ্ঞ। পত্রখানির মধ্যে দ্রৌপদীর বহু স্বামিত্বের প্রতি সুন্দর ইংগিত রয়েছে আর রয়েছে বীর্যবান পার্থের প্রতি দ্রৌপদীর

পক্ষপাতিত্বের সুকৌশল সমর্থন। পত্ররচনার প্রথমেই যে সুর রয়েছে তা' কেবলমাত্র বিবাহিতা নারীর কণ্ঠেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। অর্জুনের সুদীর্ঘকাল স্বর্গাবস্থানে দ্রৌপদী পার্থের অন্য নারীতে আসক্তির কথা কল্পনা করেছেন এইভাবে :

…সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী ; সু উরু রম্ভা ; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা ; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী !
উর্ব্বশী—কলঙ্কহীনা শশিকলা দিবে !
নিবিড়-নিতম্বী সহ সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা ;……
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি !

কিন্তু সুরবালাদের প্রেম-সুধা পান করে' অর্জুন সুখে থাকলেও দ্রৌপদীর আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি বিরহের সুকঠোর তাপে ম্রিয়মাণ। পার্থের সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হওয়ায় সূর্যকরোজ্জ্বল এ পৃথিবী দ্রৌপদীর নিকট প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন :

…আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন !

পঞ্চস্বামীগর্বে গর্বিতা দ্রৌপদী। তবুও তাঁ'র অবচেতন মনে ছিল অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত। পত্রের মধ্যেও এ কথা গোপন থাকে নি। প্রেমোন্মত্ত আবেগমুহূর্তে তিনি লিখেছেন :

পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয় ! এই জানি, এই মানি মনে।

দ্রৌপদী এখানেও থামেন নি। আর চারজনকে অবহেলা করে' কেবলমাত্র পার্থের প্রতি পক্ষপাত করার জন্যে যদি তাঁ'র পাপ হয় তা'র জন্যে যে কোনো কঠোরতর শাস্তি তিনি মাথা পেতে নিতে

রাজী আছেন। বীরাঙ্গনা সতী নারীর মত ধর্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেছেন :

> যা ইচ্ছা করুক ধর্ম, পাপ করি যদি
> ভালবাসি নৃমণিরে, যা ইচ্ছা নৃমণি!
> হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখে কে ডরে ভুঞ্জিতে ?

তাই পার্থকে অতি সত্বর সুরলোক থেকে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এমন কি এ পত্রের উত্তর তিনি চান না, পত্রবাহকের সাথে যেন পার্থ এ মর্ত্যের ধূলায় প্রত্যাগমন করেন :

> কি কহিনু নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
> পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে।

এ পত্রটি দ্রৌপদী ছাড়া অন্য কোন রমণীর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। পত্রটি স্মৃতির আল্পনায় দুর্লভ মনোহর হ'য়ে উঠেছে। পত্রের মালিকায় গাঁথা স্মৃতির রৌদ্র-নিটোল মুক্তাগুলি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে।

পত্রের মধ্যে একদিকে যেমন আছে স্বামীর প্রগাঢ় প্রেমে আস্থাশীল নারীর রহস্যপ্রিয়তা অন্যদিকে আছে অভিমানে কম্পমান অশ্রুসজল আঁখি। একদিকে আছে দাম্পত্যপ্রেমের অনাবিল পবিত্র চিত্র অন্যদিকে আছে বিরহ-কাতরা গৃহবধূর সন্দেহাকুল দীর্ঘশ্বাস। এরূপ উভয়বিধ দ্বন্দ্বের আন্দোলনে পত্রটি পাঠকচিত্তে সুগভীর রেখাপাত করে।

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' এবং 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' পত্রিকা দু'টিতে স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় সতী নারীহৃদয়ের অস্থির ব্যাকুলতা শতবর্ণরাগে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। দু'টি পত্রই এক নিদারুণ নাটকীয় পরিস্থিতিতে (Dramatic situation) লিখিত। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে হতাহতের কথা কৌরব-অন্তঃপুরে যথাসময়ে প্রচারিত হচ্ছে। পাণ্ডবদের বীরত্বে একে একে কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। তাই দুর্যোধন-স্ত্রী ভানুমতী স্বামীর সর্বনাশ-

আশঙ্কায় একান্ত উৎকণ্ঠিত। এই চরম নাটকীয় পরিস্থিতিতে মধুসূদন ভানুমতীকে দিয়ে পত্র রচনা করিয়েছেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্যেই পত্রশেষে এই কালসমর স্থগিতের অনুরোধ জানিয়েছেন ভানুমতী :

এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী !
কি অভাব তব, কহ ?

ভগ্নীপতি দুর্যোধনের অনুরোধে শ্যালক জয়দ্রথ কাল মহাসমরে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করে' অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধে তিনি অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে বধ করে' আপন বাহুবল ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই বীরত্বের ছিদ্র পথেই তাঁ'র নিজের জীবনের অবসান আসন্ন হ'য়ে উঠেছে। অর্জুন পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করে' জয়দ্রথ-পত্নী দুঃশলা আতঙ্কে তটস্থা। এই নাটকীয় মুহূর্তে মহাকবি সুকৌশলে দুঃশলাকে দিয়ে পত্র রচনা করিয়েছেন। কৌরব-অন্তঃপুরে সদ্য বিধবাদের ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত, আসন্ন বৈধব্যের কথা চিন্তা করে' শত কুলবধূর হৃদয় শঙ্কায় স্তম্ভিত। দুঃশলা চিন্তা করেন এ মহাসমরের কালাগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া তাঁ'র স্বামীর পক্ষে ঠিক হয় নি। জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের অধিপতি—সুতরাং এই কালসমরে যোগদান করে' নিজেকে মহামরণের মুখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে দেওয়া নিতান্ত অর্থহীন :

কি কাজ রণে তোমার ! কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?

ভানুমতী এবং দুঃশলার মধ্যে পতিসর্বস্ব আদর্শ ভারতীয় কুলবধূর চিত্র বর্ণোজ্জ্বল রেখায় বিধৃত। পতির অকল্যাণ আশঙ্কায় মৃদু হিল্লোলে কম্পমান বেতস লতার ন্যায় তাঁ'দের সুকোমল নারীহৃদয় বার বার কম্পিত হ'য়ে উঠেছে।

তারা, উর্বশী, রুক্মিণী ও শূর্পণখার পত্রগুলি রচিত হয়েছে পূর্বরাগের রোমাঞ্চ-রঙ্গীন মুহূর্তে। হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয়েছে, প্রাণবল্লভকে কেন্দ্র করে' বার বার বিভিন্ন ভাবে সে প্রেমবন্যা হৃদয়বেলাকে

উদ্বেল করে' দিচ্ছে অথচ প্রত্যক্ষ মিলনের কোন উপায় নেই। তা'ই এঁদের সকলের পত্রে প্রেমের স্বপ্ন-মুগ্ধতা ও গোপনে প্রিয়মিলনের ব্যাকুলতা অনন্যসুন্দর আবেগোন্মত্ততায় চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অ-ফোটা মুকুলের ন্যায় সুকোমল পাপড়ির বুকে কেহ আর প্রেম-সৌরভকে বন্দী করে' রাখতে পারেন নি। তাই সকলেই প্রাণবল্লভের বুকে আত্মাহুতি দিয়ে লীন হ'তে চেয়েছে।

তারার পত্রটি আপন বিশিষ্টতায় চিত্তহারী। সোমদেবের অপূর্ব রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন গুরুপত্নী তারা। এই অসঙ্গত প্রেমকে তিনি আপন বুকে গোপনে লালন করে' আসছিলেন। কিন্তু শিক্ষা সমাপনান্তে সোমদেব যখন বিদায় গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন তখন তারা আর এই গোপন প্রেমকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারলেন না—কূল-প্লাবী প্রেমবন্যা প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি করে' পত্রের মাধ্যমে আপনি বিকশিত হ'য়ে উঠল। কুল, মান, ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমোন্মাদিনীর মত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সোমদেবের কণ্ঠালগ্না হ'বার বাসনা জানালেন:

…দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তবে জন্যে,—ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবনপথে, ধর আসি তারে
তারানাথ!

চণ্ডীদাসের রাধিকার মত তারাও সোমদেবের পদমূলে আপন সতীত্ব, ধর্ম ও জীবনকে উৎসর্গ করেছেন:

…কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।

কিন্তু তারার প্রেমে রাধিকার আত্মতন্ময়তা নেই—এ প্রেম রূপজ। রূপের মোহে এ প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ এবং পরিণতি। শূর্পণখার প্রেমও এই জাতীয়। শতদলদীপ্ত যৌবন-সম্ভবা রূপ-পাগলিনী নারীর রূপজ প্রেমের মত এ প্রেম রূপবিভোরতা হ'তেই জন্মলাভ

করেছে। শূর্পণখার পত্রটিতে মধুসূদনের ভাব-কল্পনা সার্থকতার উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছে। মধুসূদন কোথাও রাক্ষসদের ভীষণাকৃতি করে' বর্ণনা করেন নি। শূর্পণখাও তা'ই তাঁ'র কবি-কল্পনায় ষোড়শীর অপরূপ রূপলাবণ্যে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। অকাল বৈধব্যে শূর্পণখার গহনমনে প্রেমের যে দুর্নিবার পিপাসা ছিল লক্ষ্মণের রূপোজ্জ্বল দেহকান্তি দেখে তা' সহস্রগুণ আবেগে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে। লক্ষ্মণের উদাস বৈরাগ্য অবলোকন করে' তিনি ভীতা নন, প্রাণবল্লভের সঙ্গ-সুখ পেলে তিনিও চরম কৃচ্ছ্রতার অন্তরালে আপনাকে লীন করে' দিতে পারেন :

> …অম্লান বদনে
> এ বেশভূষা ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
> সাজি, পুজি, উদাসীন পাদপদ্ম তব।…
> দেখিব প্রেমের স্বপ্ন, জাগিছে দু'জনে।

পত্রের শেষ কয়টি পংক্তিতে আশামুগ্ধা নবানুরাগিণী প্রেমিকার হৃদয়-চিত্রটি অনবদ্য। প্রেমোত্তাপে আনন্দোদ্বেলিত হৃদয় বিগলিত, আঁখিযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত—সে অশ্রু প্রপতিত হয়েছে পত্রে। তা'ই "ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা" বলে প্রেমবল্লভের পাদপদ্মে প্রেমাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

রুক্মিণী উপাখ্যানটির বর্ণনা আছে ভাগবতে। প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের রূপমুগ্ধা রুক্মিণী পূর্ব হ'তেই কৃষ্ণপ্রাণা। কিন্তু উদ্ভিন্ন যৌবনে যখন যুবরাজ শিশুপালের সাথে তাঁ'র বিবাহ অনিবার্য ও আসন্ন হ'য়ে উঠেছে তখনই এই পত্র মারফত আপনাকে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছেন কৃষ্ণকে। বলাবাহুল্য রূপজ মোহ হ'তে এ প্রেমের জন্ম কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে তারা কিংবা শূর্পণখার প্রেমের মত রুক্মিণীর প্রেম ক্ষুধার্থ যৌবন-লালসায় বিকৃত ও মদির নয়। এ প্রেমে রূপবিভোরতার সাথে আত্মবিভোরতা সমান হ'য়ে মিশেছে। এ পত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে পত্রের মধ্যে কোথাও প্রণয়াস্পদ কৃষ্ণের নামটি উল্লেখিত হয় নি—অতি সুকৌশলে

পরম শত্রু। প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর মত তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। একটি সামান্য প্রতিজ্ঞা বিস্মরিত হওয়া এমন একটা গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু তা'র পরিবর্তে যখন আমরা কৈকেয়ীকে বলতে শুনি :

…অসত্যবাদী রঘুকুল-পতি,
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!
ধর্ম-শব্দ মুখে—গতি অধর্মের পথে!

তখন তিনি নিজেই (রঘুকুল-বধূ) নির্লজ্জ হ'য়ে পড়েন, তাঁ'র ধর্মাচরণের প্রতিও আর আমাদের কোন আস্থা থাকে না।
এখানেই শেষ নয়—রঘুকুল-বধূ হ'য়েও তিনি গৃহত্যাগ করার সংকল্প প্রকাশ করেন :

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি!'

গৃহত্যাগ করার মূল উদ্দেশ্য দেশবিদেশে স্বামীর নিন্দা প্রচার করে' বেড়ান। যখন তিনি বলেন :

পথিক, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি!'

অথবা :

পুষি সারী, শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তা'রা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি!'

অথবা :

শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়ে তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুল-পতি !'

তখন তঁাকে কুলটা প্রতিহিংসাপরায়ণা সংকীর্ণমনা নারী ছাড়া আর কিছু বলে কল্পনা করতে আমাদের মন সায় দেয় না। সময় সময় তাঁ'র মুখে স্বামী দশরথ সম্পর্কে নারীর যৌবন-লালসার যে কুৎসিত ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে তা' কেবল মাত্রাতিরেকী উক্তি নয়—অশ্লীল এবং অমার্জনীয়। এই অসংযমী উক্তিতে কৈকেয়ী চরিত্রের যত কিছু মাহাত্ম্য ও মাধুর্য ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে জনার চরিত্রটি সংযমের মধ্য দিয়ে করুণ, বীর ও রৌদ্ররসের সংমিশ্রণে একাধারে ধীরোদাত্ত ও অগ্নিবর্ষী হ'য়ে উঠেছে। কৈকেয়ী পত্রের সর্বত্র যে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় পেয়েছি—জনা-পত্রের কোথাও যে কালিমার এতটুকু চিহ্ন নাই। সমগ্র পত্রখানি কলুষতা ও আবিলতা মুক্ত হ'য়ে আপন রৌদ্রভারে ঝলমল করে' উঠেছে। স্বামীর প্রতি জনা কোথাও অন্যায়ভাবে ক্রুদ্ধা হন নি। ক্ষত্রিয় বীর-ধর্ম ভুলে স্বামী নীলধ্বজ যখন পুত্রহন্তা রিপুকে তোষামোদে ব্যস্ত তখন আমরা তাঁ'কে মহারোষে ভীমনাদে হুঙ্কার করতে দেখি :

…কেমন তুমি, হায় মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নৃমণি ?

পুত্রহারা ক্ষত্রিয়জননীর এই রোষদীপ্ত উক্তিতে বীরাঙ্গনার বহ্নিমান কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে। কিন্তু এরূপ উক্তিতেও যখন নীলধ্বজের

শোণিতে বীরধর্মের গর্জন শোনা গেল না তখন তিনি অর্জুনের কলঙ্কময় জীবনেতিহাস ও নীতিহীন যুদ্ধের বর্ণনা করতেও পিছপাও হন নি এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয়েছে স্বামীর প্রতি কঠিনতম ধিক্কার। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় সে ধিক্কারের মধ্যে কোথাও নীলধ্বজকে হীন-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নাই, দুরন্ত অভিমান-বহ্নিতে স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিটোল শ্রদ্ধা শতবর্ণরাগে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠেছে : এবং জনা-জীবনের তীব্রতর ট্রাজেডি এখানেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে। একদিকে প্রবীরহন্তা রিপুর প্রতি প্রতিহিংসার প্রদীপ্ত রোষানল অন্যদিকে স্বামীর চরম নিষ্ক্রিয়তা এই উভয় প্রতিক্রিয়ার সুতীব্র তাড়নায় জনার জীবনের গগনস্পর্শী ট্রাজেডি-স্তম্ভ গঠিত। স্বামীর অন্যায় আচরণে কৈকেয়ী যখন গৃহত্যাগের সংকল্প জানান তখন সেই ঘৃণ্য কলঙ্কময়ীর উক্তিতে আমরা হাসি কিন্তু সংগ্রাম-পরাজিতা জনা যখন জাহ্নবীর অতলস্পর্শী সলিলে আত্মহত্যার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন আমাদের সমগ্র চিত্ত ঘনায়মান ট্রাজেডির উদাত্ত বিষণ্ণতার সুরে স্তম্ভিত হ'য়ে ওঠে।

> ...'কোথা জনা ?' বলি ডাক যদি,
> উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা ?' বলি !

পত্রের এই দু'টি সমাপ্তি-ছত্রের শব্দচিত্রে সমগ্র মেঘনাদবধ-কাব্যের করুণ গগনস্পর্শী বিষণ্ণতা যেন জমাটস্তম্ভিত হয়ে আছে।

# কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক

**॥ এক ॥**

আসন্ন সন্ধ্যায় যখন শেষ দিনালোকটুকু মন্দিরের চূড়া বেয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, যখন দিগন্ত-বিথারী বিলের কিনারায় সন্ধ্যার ঝিলিমিলি উৎসব ও কেয়ার বনে ঝিল্লির ঐকতানে ছেদ পড়ল তখন অশীতিপর এক শীর্ণকায় গ্রাম্য কবি আপন নীরব শান্ত গৃহাঙ্গনের তুলসী-বেদীতে প্রদীপ জ্বেলে হাতে তুলে নিলেন একতারা—একটি আকৃতি-কম্পিত ব্যাকুল-কণ্ঠ ধীরে ধীরে একতারার সুরালাপনে ক্রমোচ্চ হ'য়ে মাটির মমত্বরসে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেল, ভাবে-বিভোর খাদহীন একটি কণ্ঠ—সে কণ্ঠ কুমুদরঞ্জনের।

এ দীনের কুটিরে রাজসিকতার কোন আয়োজন নেই। এ তুলসী-তলায় তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো সাজে না। এ বাদ্যযন্ত্রে হাজার তন্ত্রীর বিচিত্র সমবেশ নেই। একতারার একটি মাত্র তন্ত্রাতে একটি বিশেষ সুরের গুঞ্জরণ। এ মন্দিরে থাকেন আপন-ভোলা মাটির মানুষ, অতি ক্ষুদ্র তাঁ'র আয়োজন। অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তুচ্ছ নয়, অতি দীন কিন্তু হীন নয়, অতি সামান্য কিন্তু অবজ্ঞার নয়। নিখিল বিশ্ব ভুলে একজন ভগবৎ-প্রেমিক গভীর ধ্যানে মগ্ন। পল্লী বাংলার অন্তরাত্মার সাথে কুমুদরঞ্জনের হৃদয়াবেগ মিশেমিশে একাকার হ'য়ে গেছে। পল্লীই কুমুদরঞ্জন, কুমুদরঞ্জনই পল্লী। একে অপরের সাথে অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত। খাদহীন, ছেদহীন। এই সংশয়, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসময় ক্রমবর্ধমান নাগরিক চেতনার যুগে পল্লীনিষ্ঠা ও প্রীতি যখন দুর্লভ, কুমুদরঞ্জনের ধমনি-প্রবাহে নিখিল বাংলার পল্লী-প্রাণের বিপুল স্পন্দন স্পষ্টরূপে অনুভব করা যা'বে সন্দেহ নেই।

এই পল্লীপ্রীতি একাধারে কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠতম ও শেষতম পরিচয়। জলের সাথে মাছের যে সম্পর্ক, বায়ুর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক অথবা ছায়ার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কায়ার—অবিশ্বাস্য হ'লেও অজয়-কুনুর তীরবর্তী শ্যাম-শ্রী শান্ত পল্লী বাংলার সাথে প্রেমপ্রসন্ন ভাবোল্লাসচিত্ত কবি কুমুদরঞ্জনও সেই বিরলদৃষ্ট অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে একীভূত। সমকালীন সামাজিক পরিবেশ ও অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে কুমুদবাবুর নিবিড় পল্লীপ্রীতির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়বে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে কবির জন্ম (১২৮৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) কিন্তু তাঁ'র চিত্তভূমির লালন হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতেই তাঁ'র কবি-মানসের লালন, বর্ধন এবং সম্প্রসারণ। এমন কি আজকের দিনে—এই বিংশ শতাব্দীর সপ্ত দশকেও কবির সৃষ্টি-প্রেরণা স্তব্ধ হ'য়ে যায় নি, জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত তা স্বতঃস্ফূর্ত। সুতরাং সঙ্গত কারণেই কবির ওপর বিশ শতকের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণে এ তথ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ দু'টি বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধ (১৯১৮ খ্রীঃ এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ) যখন উনবিংশ শতাব্দীর শান্ত সংহত ও সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা এবং সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে' দিল, যখন চারিদিকেই প্রশ্ন-সংকুল জীবনযাত্রায় সন্দেহ, দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হ'য়ে উঠল এবং তা'র সুগভীর ছায়া পড়ল সমকালীন সকল কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে, তখন কুমুদরঞ্জন নির্বিকার। তাঁ'র সমগ্র সৃষ্টির কোথাও এই যুগ-সমস্যার এতটুকু চিহ্ন পড়ে নি। কুমুদরঞ্জনের সৃষ্টি এই শতকের যন্ত্রণা এবং দাহ হ'তে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। যুগ-যন্ত্রণা বা আত্মগ্লানির অবিশ্বাস তাঁ'র কাব্য-সৌন্দর্যকে আবিল করতে পারে নি। অথচ সর্বধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া নিখিল ভারতের নিভৃত পল্লীর বুকে কেবল বায়বীয় ভাবলোকের কম্পন হিসেবে আসে নি, এসেছিল সমুদ্র-কল্লোলের বজ্র আঘাতের মত।

ভাঙনমুখী সমাজ-জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও গ্লানিতে তা'র স্বাক্ষর রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই বর্বর কল্লোলাঘাতকে উপেক্ষা করতে পারেন নি—বিশাল হিমাদ্রির উচ্চতম শিখর-প্রদেশে সে কম্পন অনুভূত হয়েছিল। অথচ কুমুদরঞ্জন? শান্ত সৌম্যমূর্তি বাউল নির্বিকার। হয়তো সজ্ঞানেই তিনি সতর্কতার সঙ্গে এই যুগ-যন্ত্রণার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁ'র মানস-চিত্তে লালিত ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিতা-কুমারী হয়তো প্রতিজ্ঞা করেছিল: "যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।" পঙ্কে বাস করেও তিনি পঙ্কজের মত নির্মল রয়ে গেলেন। তাই কুমুদরঞ্জন আধুনিক যুগের হ'য়েও আধুনিক মননের কবি নন, রবীন্দ্রকালীন হ'য়েও কাব্য-প্রকৃতির দিক থেকে তিনি প্রাক্-রবীন্দ্রযুগেরই অধিবাসী হ'য়ে রইলেন।

কুমুদবাবুর বিশিষ্ট মানস-প্রকৃতির জন্যেই এটি সম্ভবপর হয়েছিল। আপন সীমিত গণ্ডির মধ্যেই তিনি বিচরণ করতে ভালবাসতেন। তিনি যেটি জেনেছেন সে তথ্যটি জানিয়েছেন, যেটিকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন সেটাই তাঁ'র কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। ভাবের ঘোরে অযথা তিনি রোমান্স-রাজ্যে বিচরণ করেন নি। এবং তা' করার সামর্থ্যও তা'র ছিল না। পল্লীপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতি থেকেই তাঁ'র জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। এবং তাঁ'র জীবনবোধ হ'তেই তাঁ'র ধর্মবোধের উৎপত্তি। এই জীবনবোধ বা ধর্মবোধের মূলে যে সংস্কার তা' এক বিশেষ ভাবনা ও কল্পনার রং-এ রঙীন। বাউল বাংলার শান্ত সমাহিত পরিবেশই তাঁ'র এই বিশেষ কবি মানস বা প্রকৃতির অনুভূতি এবং রসদ জুগিয়েছে। জীবনে জীবন না থাকলে কাব্যের অঞ্জলি ব্যর্থ হয়, অনুভূতির এবং বাস্তবজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা হ'তেই সৎকাব্যের উৎপত্তি। কুমুদরঞ্জনের অভিজ্ঞতায় খাদ ছিল না। তাই তাঁ'র কবিতা সৎ কবিতা। জীবনে জীবন যুক্ত হওয়ায় তাঁ'র কবিতা দুষ্প্রাপ্য মনোহর হ'য়ে উঠেছে। এ হিসেবে কুমুদরঞ্জন জাত-কবি।

রবীন্দ্র এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাব্যসাধনা ও রীতির দিকে লক্ষ্য করলে চারটি দল চোখে পড়বে। প্রথম দল রবীন্দ্রানুসারী—এ দলে আছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রিয়ংবদা দেবী, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। দ্বিতীয় দল সত্যেন্দ্রানুগামী—এ দলের পথিকদের প্রধান হলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দল বিদ্রোহী দল—এ দলের সকলেই বলিষ্ঠ কবি এবং আপনাপন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এ দলে আছেন নজরুল ইস্‌লাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার। চতুর্থ দল হলেন আধুনিক কবিগোষ্ঠী—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি। কিন্তু এ চারটি দলেরই কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। সূর্যকে কেন্দ্র করে' তা'রই তীক্ষ্ণোজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকিত কয়েকটি গ্রহ-উপগ্রহ আপনাপথ কক্ষপথে বিচরণ করেছে মাত্র। সমুদ্রের কল্লোল-গানের সঙ্গে সঙ্গেই খালে কি নদীনালায় জলোচ্ছ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কম-বেশী সকলেই রবীন্দ্রালোকের পুণ্যস্পর্শে বিচিত্র বর্ণালী বিকীর্ণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কুমুদরঞ্জনের সম্পর্কটাই ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য মানস-প্রবণতার মধ্যে প্রকৃতি-প্রেম একটি। আর কুমুদরঞ্জন তো সারা জীবন প্রকৃতির প্রেম-কুটিরে আবদ্ধ। সুতরাং দু'জনেই প্রকৃতি-প্রেমিক, প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী নিয়ে উভয়েই কাব্য রচনা করেছেন, উভয়েরই অন্তর-দেউলে প্রকৃতি পূজার দীপা-লোক অনির্বাণ। অথচ কি বিপুল ব্যবধান! অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়: "রবীন্দ্রনাথকে পল্লীবঙ্গ প্রেরণা জুগিয়েছে, মধ্যবঙ্গের পল্লী। এখানে তাঁ'দের মধ্যে মিলন। কিন্তু আবার অমিলটাও কত দুস্তর। রবীন্দ্রনাথ পল্লীবঙ্গের প্রেরণাকে ক্ষণিকা কাব্যের এক পদক্ষেপে অতিক্রম করেছেন—পদক্ষেপ একটি মাত্র কিন্তু সে যে একেবারে দশকুশি ধাপ। অপরপক্ষে কুমুদরঞ্জন সারা জীবন ঐ ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। মিল পল্লীবঙ্গের

প্রেরণায়, অমিল ব্যক্তিগত বিভূতিতে। এই জন্যেই কুমুদরঞ্জনের পল্লীকাব্য ও ক্ষণিকা প্রেরণায় এক হ'য়েও ভিন্ন।"

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গবোধের সুর অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা। তা'র একদিকে আছে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব অন্যদিকে আছে কাব্যসুষমা-মণ্ডিত সুমহান্ ভাবকল্পনা। দর্শন এবং কাব্য সে দিগ্‌বিথার অসীম সমুদ্রে এক সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। শ্যাম-শ্রী পল্লীপ্রান্তরের বুকে তিনি যে অপরূপ নৈসর্গিক রূপ অবলোকন করেছেন দার্শনিক তত্ত্বের মোহাঞ্জন-স্পর্শে তা'কেই সঞ্চারিত করে' দিয়েছেন দূর নভোলোকের পথে। তাঁ'র ভাবনা-চিন্তা মাটির সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে মুহূর্তে দূর অসীমের পথে উধাও হয়েছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের নিসর্গপ্রীতিতে অন্য কোন ভাবের রং লাগে নি বা তাঁ'র এ নিসর্গপ্রীতি সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের বহু-বিচিত্র নয়নাভিরাম বর্ণালী বিকীর্ণ করতে করতে দূর নভোলোকের পথে উধাও হ'য়ে যায় নি। তাঁ'র পল্লীর মায়া পল্লীর গাছ-গাছালির ছোট্ট এলাকাটুকুতেই ঘুরে ফিরেছে। অজয়ের উভয় তীরের গ্রাম, তা'র পথঘাট, আকন্দ ফুল, ধানের ক্ষেত, ফিঙা পাখী, ঘোষাল-পুকুর, প্রাচীন বৃক্ষরাজী, চূর্ণী নদীর কলোচ্ছ্বাস, বনতুলসীর ঘ্রাণ—এই সীমিত এলাকাটুকুই তাঁ'র ভাবকল্পনার সঞ্চারণ ভূমি। এরই মাঝে তাঁ'র সকল মায়া-মমতা উজাড় হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন: "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁ'র এক পদক্ষেপের আঘাতে বাহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তাঁ'র অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে। অন্তরে ও বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়"—তখন আমাদের চিত্ত নতুনতর ভাবাবেগে আন্দোলিত হ'তে থাকে কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাব্যে যখন পড়ি:

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল,
তরুর ছায়াগুলি ভাঙিয়া অবিরল।

লহরী গায়ে ঢলি' পড়িছে, 'কাঁসালতি',
লয়মে মুখ চাপি' হাসিছে শতদল,
নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল।

॥ একটি চিত্র ॥

অথবা :

'ফটিক-জলে'রা মহা উল্লাসে
এখনো উড়িয়া বেড়ায় আকাশে,
শব্দিত করি' পক্ষ বাতাসে উড়িছে কপোতদল ;
লভিয়েছে সে যে শ্যাম বৈভব,
বেণুর কুঞ্জে মহা উৎসব
বিহগ-বন্ধু জুটিয়াছে সব, উঠে মধু কলকল।

॥ বৈকালী ॥

তখন আন্তরিক চিত্র-সম্পদের মাধুর্যে আমাদের চিত্তভূমি সিক্ত হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু ভাবনা-চিন্তা ডানা ঝাপ্‌টে দূর নভোলোকে যাওয়ার কোন বেগ অনুভব করে না। বস্তুতঃ কুমুদরঞ্জন কেন রবীন্দ্রনাথ হলেন না এ নিয়ে আমাদের কোন আক্ষেপ নেই কিন্তু এই তুলনামূলক আলোচনায় কুমুদরঞ্জনের কবি বৈশিষ্ট্যটি সুন্দর রূপে ধরা পড়বে। কুমুদরঞ্জন মহাকাশচারী বিহঙ্গ না হ'তে পারেন কিন্তু ভোরের ছায়ালোকে কোকিলের সে কুহু-ধ্বনিকে এড়িয়ে যাব কোন্‌ সাহসে? কুমুদরঞ্জনের ডাক ঐ একটি কিন্তু আন্তরিকতার গুণে তা' আমাদের গহন চিত্তকে বিমোহিত করবেই।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রীতির সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীতির মিল এক গোত্র ছাড়া আর কোথাও নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিল যতই থাক যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের চিত্তভূমির নৈকট্য অনুভব করা যায়। কিন্তু সেখানেও তর-তমের পার্থক্য আছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বহুতর কবিতায় পল্লীর শ্যামল শোভার স্নিগ্ধ রূপ ফুটেছে কিন্তু সেখানেও পল্লী ও কবির মধ্যে একটি ভেদ রেখা সুস্পষ্ট। কুমুদরঞ্জনের মত একাত্ম ভাবটির বড়ই অভাব। তাঁ'র "রেখা" কাব্যগ্রন্থের 'জন্মভূমি' কবিতাটির কয়েকটির পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :

ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' খেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে,
পুবের দিকে আম কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি !

'হৃদয় চুরির' ব্যাপারটি এখানে নিতান্ত মৌখিক স্বীকৃতি। করুণানিধানের কিছু কবিতায় বিহ্বল পল্লীপ্রীতির ছায়া পড়েছে। "পদ্মপুকুর"কে অবলম্বন করে' তিনি যে স্বর্ণখচিত কল্পনার ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছেন তা' কম মুগ্ধকর নয় :

ফুরালো জলঝরা, বকুল ফুল ভরা
গ্রামের চেনা পথে ফিরে রাখাল।
উপর পানে চাহি—দোলে অধীর
তালের বাকলেতে বাবুই নীড় ;
বলাকা উড়ে যায় কে জানে কে কোথায় !—
হয়তো নয় তারা এ পৃথিবীর।

এ কবিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। পল্লীবঙ্গের এক টুকরো মনোরম চিত্রের সঙ্গে একটি পেলব মসৃণ বিষণ্ণ ভাব যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ ভাবটি রবীন্দ্রনাথের উচ্চগ্রাম-স্পর্শী কল্পনা-সম্পদের সমকক্ষ হ'তে পারে নি আবার চিত্রটির মধ্যেও ঐকান্তিকতার অভাব সুস্পষ্ট।

কুমুদরঞ্জনের যে মূল সুর পল্লীপ্রীতি ও ঐতিহ্যপ্রীতি তা' বিশেষ

রূপে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে সমসাময়িক কবি কালিদাস রায়ের কবিতায়। তবুও মনোভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। কালিদাস রায়ের পল্লীপ্রীতি স্মৃতি-সর্বস্ব। তিনি বহুদিন পল্লী পরিত্যাগ করে' দেহে মনে শহরের অধিবাসী হয়েছেন। শহরের বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল গৃহকোণে বসে তিনি পল্লী সংক্রান্ত যে কবিতাই লিখুন তা' স্মৃতি আশ্রয়ী হ'তে বাধ্য। বহুদিন শহরের বদ্ধ নির্মম আলিঙ্গনে কাটিয়ে শ্যাম-শ্রীপল্লীর বুকে প্রত্যাবর্তন করে' পুরাতনকে ফিরে পাওয়ার মধ্যে যে দুর্লভ আনন্দ রয়েছে তা'র অনেকখানিই স্মৃতির বেদনায় ভারাক্রান্ত। কালিদাস রায়ের অনেক কবিতায়ই স্মৃতির রোমান্স বেদনায় মর্মরিত :

> ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে ফিরিয়া এলাম।
> বহু অপরাধ জমা, স্নেহভরে কর ক্ষমা, লও মা প্রণাম।
> চিনিবে কি ছেলেটিরে? সব ভোল গেছে ফিরে, দ্বিধা জাগে তাই ;
> মা কি কভু ছেলে ভোলে যতদূর যাক চলে?—বৃথাই শুধাই
> এ দগ্ধ ললাট-তট স্নিগ্ধ করি দিক বটচ্ছায়ার প্রসাদ,
> পাখীর ডানার ঘায়ে বকুল ঝরায়ে গায়ে কর আশীর্বাদ।
>
> ॥ প্রত্যাবর্তন ॥

কবির আত্মার সাথে পল্লীর যে একটি ব্যবধান রয়েছে সচেতন পাঠকের চোখে তা' সহজেই ধরা পড়বে। দৈহিক সম্পর্ককে দূরে রেখে কবি মনে মনে পল্লীমায়ের পূজারতি করেছেন। অধিকাংশ কবিই তাই করেন। কয়েক বছর পল্লীতে অতিবাহিত করে' যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন পরবর্তী জীবনের কাব্য-সৃষ্টিতে হয় তা'রই রোমন্থন। বোধ হয় উন্নতশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে এ পন্থাই শ্রেয়। কেন না আজীবন পল্লীতে বসবাস করতে হ'তে অতি পরিচয়ের ফলে মোহভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে। আজীবন পল্লীবাসে মোহভঙ্গ হওয়া তো দূরের কথা বরং তা' অধিকতর মনোরম ও মনোহর হ'য়ে উঠেছে। কুমুদরঞ্জনের কবি-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানেই নিহিত। মাত্র

ক'দিনের শহরবাস তাঁ'র কাছে বনবাসের সমতুল্য হ'য়ে ওঠে—তিনি ব্যাকুল হ'য়ে ফিরে যেতে চান 'অজয়ের সেই শ্যামকূলে' যেথায় বনফুল আপন গৌরবে বিকশিত :

বনবাস মোর শেষ হবে কবে? জান যদি কেহ কহ রে।
চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি শহরে।...
কোথা আমগাছ ঝুপ ঝাল্লায় কোথা বটগাছে ঝুলব?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল যেথা বুনো ফুল তুলব।

পল্লীর সাথে কবির মিলন যেন শ্যাম-রাধার মিলন। দীঘির জলে, কুমুদের পাপড়িতে, পত্রপল্লবের আলোছায়ায়, পথে-প্রান্তরে, মাটিতে ধূলিতে, রবিতে, শশীতে, গ্রহতারকায়, নম্র নত ধানের শিষে, গন্ধামোদিত কমলের বুকে, শিশির-কোমল তৃণশীর্ষে—সর্বত্রই কবি তাঁ'র আপন অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান :

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গণ আমি তার শশী-রবি,
আমি আলোছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্ত শোভি।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল,
আমিই কুমুদ, আমিই কমল,
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।

এই-ই কুমুদরঞ্জনে কবি-বৈশিষ্ট্য। পল্লীর প্রান্তরে, লতায় পাতায়, তৃণশীর্ষে অষ্টপ্রহর জড়িয়ে জড়িয়ে যিনি ঘুমের আবেশ অনুভব করেন তিনিই কুমুদরঞ্জন।

সমকালীন অন্যান্য কবিদের মানস-ভংগীর সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের কবিমানসের তুলনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাই ঠিকই বলেছেন : "কিন্তু কুমুদরঞ্জনের অতীতানুবর্তিতার স্বরূপ ইঁহাদের হইতে কিছুটা পৃথক্। অন্যান্য কবিরা যখন প্রাচীন সংস্কৃতির জয়গান করেন, মায়া-মমতা-স্নেহ-প্রীতি-দেবভক্তি-অধ্যাত্ম-আকৃতি-ভরা বাঙালী জীবনবোধের প্রতি উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে একটু বিদ্রোহের উষ্মা, একটু প্রতিবাদের

অসহিষ্ণুতার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মনে হয় যেন অন্যে নিন্দা করে বলিয়াই ইঁহারা ইহার বেশি করিয়া প্রশংসা করেন; অপরের বিমুখতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপই ইঁহারা সনাতন আদর্শকে আরও ব্যাকুল আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরেন। বাইরের প্রতিকূল, তীক্ষ্ণ বাদল-হাওয়া হইতে আত্মরক্ষা করার জন্যই ইঁহারা ভক্তি ও ভাববিহ্বলতার নামাবলীতে কাব্য-অঙ্গকে আরও পরিপাটিরূপে আচ্ছাদন করেন। ইঁহাদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু আতিশয্যের স্পর্শ আছে, উচ্চ-বিঘোষিত আনুগত্য শপথের মধ্যে অনুল্লিখিত কালাপাহাড়ী অভিযানের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা প্রকাশিত। ইঁহাদের যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নহে; কিন্তু খোঁচা না পাইলে ইঁহাদের স্বাজাত্যাভিমান ও প্রাচীন সংস্কৃতির পোষকতা এতটা উগ্রভাবে প্রকট হইত না এরূপ ধারণাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের মানস গঠন ইঁহাদের সহিত তুলনায় অন্যরূপ। ইনি বাহিরের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া নিজ অন্তরের সংস্কার-বিশ্বাসে একেবারে আত্মমগ্ন। তিনি কর্ণের মত অতীত যুগের শান্তি-সন্তোষ-ভক্তিপরায়ণতার সহজাত কবচ-কুণ্ডলে আবৃত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার শুচি-স্নিগ্ধ, ছায়ায় ঘেরা, নিবিড় অনুভূতি-তন্ময় পল্লীজীবন তাঁহার কবি-মনের আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সাকে এমন অনায়াস বেষ্টনী-রেখায় ধরিয়া রাখিয়াছে, যে ইহা তাঁহার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ও সহজ নিঃশ্বাস গ্রহণের অনিবার্য পটভূমি রচনা করিয়াছে; তাঁহার উজানি গ্রাম ও অজয়-কুনুর নদী তাঁহার দেহ ও মনের ভৌগোলিক ও আত্মিক সীমা চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছে। ইহাদের ছাড়িয়া তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে চাহেন নাই; তাঁহার মনের সমস্ত প্রয়োজন, তাঁহার কবি-কল্পনার সমস্ত দাবি, তাঁহার হৃদয়বৃত্তির সমস্ত ক্ষুধা এই এক বিঘত জমির মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইয়াছে।"

॥ দুই ॥

কবি কালিদাস রায় "কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন "কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি।" বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আবহাওয়া, হৃদয়ধর্ম ও বাংলার পল্লীর প্রতি কবির অপরিসীম মমত্ববোধ তাঁ'র কাব্য-প্রবাহে শতধারায় উৎসারিত। ফলে সঙ্গত কারণেই তাঁ'কে বাংলার আসল কবি বলা যায়। তবুও মন্তব্যটির মধ্যে কিছু উত্তাপ রয়েছে বলে মনে হয়। কুমুদরঞ্জনের সমগ্র কাব্য পড়ে আমাদের মনে হয়েছে কুমুদরঞ্জনকে 'বাংলার কবি' না বলে 'পল্লীকবি' বলাই অধিকতর সঙ্গত। আমাদের প্রবন্ধে আমরা সেটাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছি। মূল কারণ একটি। 'বাংলার কবি' বলতে প্রথমে চাই বাংলার সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কুমুদরঞ্জনের মধ্যে এই নিষ্ঠা আর পাঁচজন বাঙালী কবি অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দেখা গিয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠাই শেষ কথা নয়। কেন না নিষ্ঠাই কাব্য নয়। দেহ ও আত্মা নিয়েই কাব্য। রূপ ও রসের সঠিক সংমিশ্রণে চিরন্তন কাব্যাত্মা ঝলকিত। কেবল রস দিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না। কেবল আত্মা দিয়ে কাব্য অসম্পূর্ণ ই থেকে যায়। কুমুদরঞ্জনের বাংলার ঐতিহ্য-ধর্ম-সংস্কৃতি-প্রীতির কবিতা-গুলিতে এই রূপের বড় অভাব। এ সকল কবিতার আত্মা বলিষ্ঠ কিন্তু দেহ রুগ্ন। জীর্ণ দেহের কাঠামোয় আত্মা যত বলিষ্ঠই হোক —তা' ম্রিয়মান হ'তে বাধ্য। বক্তব্য (Subject-matter) এবং বলা (Form) সমান না হ'লে শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি হ'তে পারে না। কিন্তু সংস্কৃতিপ্রীতি সম্পর্কীয় প্রায় সকল কবিতায় কুমুদরঞ্জনের বক্তব্য ও বলা এক হ'তে পারে নি। বক্তব্য তাঁ'র আন্তরিক এবং মহৎ কিন্তু বলাটা অধিকাংশ স্থলেই নির্মমরূপে ব্যর্থ। এবং এ জন্যেই বাংলার সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ধর্মপ্রীতিমূলক অধিকাংশ

কবিতাই রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। খুব কম কবিতাই 'সুন্দর' হয়েছে। সুতরাং মাত্র কয়েকটি সুন্দর কবিতাকে অবলম্বন করে' কুমুদবাবুকে 'বাংলার আসল কবি' বলা কিছুটা অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। আমরা তাঁকে বাংলার আসল কবির শিরোপা না দিয়ে পল্লীকবি বলতে চাই। পল্লীর প্রকৃতি, লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, মাঠ-মাটি, তৃণ-শস্য সম্পর্কীয় কবিতায় কুমুদরঞ্জন অপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এ সকল কবিতার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবির বক্তব্য ও বলা অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। এ ছাড়াও সংস্কৃতি-প্রীতিমূলক কবিতাগুলির কোথাও কোথাও অনুকরণের স্পষ্ট ছায়া পড়েছে কিন্তু নিসর্গপ্রীতির কবিতাগুলিতে কুমুদরঞ্জন স্বকীয় মহিমালোকে ভাস্বর! এটি তাঁ'র খাসমহল—এ মহলের দ্বারে কান পাতলে বায়বীয় তরঙ্গে কুমুদরঞ্জনের অমৃতনিস্যন্দী শিহরণ-কম্পন শোনা যাবেই। তাই কুমুদরঞ্জন পল্লীকবি। পল্লার রূপদক্ষ শিল্পী।

॥ *তিন* ॥

এখন কুমুদরঞ্জনের বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কীয় কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঐতিহ্যপ্রীতি কুমুদরঞ্জদের মানস-ভংগীর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই ঐতিহ্যপ্রীতি ছন্দযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষরূপে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল এবং সম্ভবতঃ এ প্রীতি সত্যেন্দ্রনাথ হ'তে কুমুদ-চিত্তে সংক্রামিত হয়েছে।

ঐতিহ্য-চেতনার বিকাশ কবিচিত্তে তিন রূপে দেখা দিতে পারে। প্রথমতঃ কবি-সাহিত্যিকগণ কেবলমাত্র ইতিহাসকে উপাদান হিসেবে তাঁদের শিক্ষাকর্মে ব্যবহার করতে পারেন, দ্বিতীয়ত কেবলমাত্র পুরাণকথা শিল্পীর দৃষ্টিতে বেগ সঞ্চার করতে পারে, তৃতীয়তঃ ইতিহাস এবং পুরাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে শিল্পীর কল্পনাবেগ উদ্দাম করে' তাঁর

সৃষ্টিকে স্বর্ণপ্রসূ ক'রে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের কাব্যসাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা হ'তেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে। পরাধীন জাতির সম্মুখে তা'দের অতীত জীবনমহিমা ও স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হ'তে তুলে ধরতে পারলে তা' অব্যর্থ গোপন মন্ত্রোচ্চারণের মত কাজ করে। রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইত্যাদি সাহিত্যিকগণ সে চেষ্টাই করেছেন। এঁদের ঐতিহ্য-চেতনার মূলে রয়েছে জাতির অতীত ইতিহাসের বলদীপ্ত পৃষ্ঠাগুলির আবরণ উন্মোচন। ইতিহাসই এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্পে দুর্নিবার বেগ সঞ্চার করেছে। আর পুরাণগাথা ও শৌর্যবীর্যমণ্ডিত অলৌকিক কাহিনী যাঁদের কল্পনা, আদর্শ ও সৃষ্টি প্রেরণাকে উদ্বেলিত করেছে তাঁ'দের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রধান। এই দলের পুরোধা হলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র। পুরাণকাহিনীগুলি তাঁ'র নাটকাবলীতে এক অব্যর্থ বলিষ্ঠ শক্তি সঞ্চার করেছে। পুরাণের অলৌকিক মহিমামণ্ডিত কাহিনী ও অতীত ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল দিবসের চিত্র যুগপথ যাঁ'দের কাব্যে অঙ্কিত হয়েছে তাঁ'দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন ইত্যাদি প্রধান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের একটু স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা উচিত। কবিগুরুর শিল্পকর্মে ইতিহাস বা পুরাণ কোনটিও উচ্চশির হ'য়ে উঠতে পারে নি। বেদ, উপনিষদ, কালিদাস, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি সকল কিছুই কবির কাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে সত্য কিন্তু দুর্লভ প্রতিভার সম্মুখে সকল কিছুই অবদমিত ও নম্র নত। সকল সৃষ্টির মাঝে কবির স্বকীয় চিন্তা ও ভাবধারাই সরব হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা কারো কাছে নতি স্বীকার করে নি।

ঐতিহ্যপ্রীতি কুমুদরঞ্জনের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—কিন্তু এই ইতিহাস বা পুরাণ তাঁ'র কাব্যে সরাসরি বেগ সঞ্চার করে নি। এগুলি তাঁ'র কাব্যে এসেছে প্রাসঙ্গিক রূপে। প্রাসঙ্গিক রূপে এসে সমগ্র কাব্যাত্মাকে চকিতে ঝলকিত করে' দিয়েছে।

কবির এই ঐতিহ্যপ্রীতি সম্পর্কে আর একটি কথা আমরা স্পষ্ট করে' স্বীকার করে নিতে চাই। তাঁ'র এই ঐতিহ্যপ্রীতির এলাকা বড় সংকীর্ণ। সীমিত এলাকার মধ্যেই সে প্রীতিরস নিঃশেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যপ্রীতি বাংলা কিংবা ভারতের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে' যেখানে নিখিল বিশ্বের সম্পদ হ'য়ে উঠেছে সেখানে কুমুদরঞ্জনের এ প্রীতি কেবলমাত্র বাংলার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে গুমরে মরেছে। তাই কুমুদরঞ্জনের ঐতিহ্যপ্রীতি তাঁ'র বাঙালীত্ব-বোধেরই নামান্তর। কবির বাঙালীত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যপ্রীতি এক হ'য়ে মিশেছে। একে অপরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকের স্বল্পপরিসর ব্যবধানে যে ক্ষীণ স্বাতন্ত্র্যবোধ লক্ষ্য করা যায় তা' নিতান্ত তুচ্ছ। এ কথা স্মরণ রেখেই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি বা বাঙালীত্ববোধের মূল্যায়ন করতে হবে—নইলে কবির প্রতি অবিচারের সম্ভাবনাই বেশি।

পুরাণকাহিনীর স্মরণীয় ঘটনাগুলি যে সকল কবিতায় কবি আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বিবৃত করেছেন তা'দের মধ্যে দুঃখের রাজ্য, ছোটর দাবি, আজিকে রাতি, কৃষ্ণা রজনী, বিন্ধ্যের আনন্দ, অর্জুন ইত্যাদি প্রধান।

'দুঃখের রাজ্য' কবিতায় পুরাণের বেদনা-বিষণ্ণ কাহিনীগুলির উল্লেখ করে' তিনি ভারতবর্ষকে দুঃখের রাজ্য বলেছেন। এই দুঃখের রাজ্যে সীতা কাঁদে, সতী জ্বলে, বেহুলা মৃত পতিকে কোলে নিয়ে ভাসে গাঙ্গুরের জলে, শ্মশানের বুকে সম্মিলিত হয় রাজারাণী। চারিদিকেই কেবল বেদনা আর দুঃখ, দুঃখ আর বেদনা। তবুও ভারতবর্ষকে কবি কেবল দুঃখের রাজ্য বলে ক্ষান্ত হ'তে পারেন নি। এই দুঃখ জয়ের মধ্যেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, বেদনার গরল নির্যাস পান করেই ভারতবর্ষ চিরসুখী বিষয়বিমুখ নীলকণ্ঠ। যে ভারতবর্ষে এত অত্যাচার, নির্যাতন, দুঃখ—তবুও ভগবান বার বার সেখানেই অবতীর্ণ হন। কুমুদরঞ্জনের মানসপ্রবণতা সুন্দর রূপে এ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। দুঃখের দাবদাহে কোন বিষয়বস্তুকে সমাপ্ত

করা প্রেমিক উদার শান্ত কবির নীতিবিরুদ্ধ ছিল—তাই 'দুঃখের রাজ্যে'র মধ্যে স্বর্গের সুমহান্ শান্তির আবেশ এনে কবিতার সমাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছেন:

তারি লাগি' বারে বারে হয় তাঁরে আসিতে,
নাশিতে শাসিতে অরি, তারে ভালোবাসিতে।
শুধু তারি আঁখিজল
যমুনায় আনে ঢল,
সেই দেয় নব সুর কৃষ্ণের বাঁশীতে।

॥ দুঃখের রাজ্য ॥

'ছোটর দাবি' কবিতায় পুরাণোল্লিখিত ঘটনাবলীর শ্রীক্ষেত্র রচিত হয়েছে। কবি এ কবিতায় সুকৌশলে পাঠককে তা'দের অতি পরিচিত পুরাণ-ঘটনাবলীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। নিষাদপতি গুহকের সাথে রামচন্দ্রের মিলন, অশোককাননে বন্দিনী সীতা, রাবণের অনির্বাণ চিতা, কৃষ্ণপুরী দ্বারকার ঐশ্বর্য-সৌন্দর্য, কংসবধ, বিদুরের ক্ষুদের কথা, সিংহবাহিনী মহামায়ার মহিমা ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনার নীরব মিছিল যখন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে চলে যায় তখন আমরা গোপন হৃদয়ে এক অশরীরী রোমাঞ্চ অনুভব করি।

পুরাণোল্লিখিত ঘটনাবলীর রাজকীয় আধিপত্য বিস্তারিত হয়েছে 'আজিকে রাতি' ও 'কৃষ্ণারজনী' কবিতা দু'টিতে। 'আজিকে রাতি'তে মিলনের রোমাঞ্চে মর্মরিত আর 'কৃষ্ণারজনী'তে বিরহবেদনার সুগভীর বিষণ্ণতায় স্তব্ধ। 'সেই প্রিয় পূর্ণিমা রাতি, সেই চম্পক-সুরভি'তে কবি-মানস প্রাচীন মহামিলনের চিত্রাঙ্কনে কর্মচঞ্চল। 'আজিকে রাতি'র মিলনবাসরে যে সকল প্রণয়ীযুগল অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁ'দের মধ্যে আছেন: রাধা-কৃষ্ণ, সাবিত্রী-সত্যবান, চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, রোমিও-জুলিয়েট, শিরিন্-ফরহাদ। কবির মনে হয়েছে আজিকে রাতে, চম্পক সুরভিত এই রাতে, এই মহামিলনের রাতে—In such a night as this"—কোন কিছু

অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে থাকতে পারে না। মহামিলনের সঙ্গমতীর্থে পুরাণোল্লিখিত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-বিচরণ সমাপ্ত করে' কবি ফিরে এসেছেন বাস্তবের বুকে। কবিতাটির সমাপ্তিতে মিশে আছে এক পরম প্রশান্তির রেশ :

> …ভালো লাগে মোর অতিশয়,
> পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।
> সুরভিত হ'ল যে-নিশি মোদের স্মৃতির গোলাপী আতরে,
> তরুণ-তরুণী গোলাপে গোলাপে সাজাইছে তারে আদরে।
> আছে পথ-চাওয়া সেই গান-গাওয়া, বহে সেই হাওয়া অনুখন,
> ফোটে সেই ফুল সেই গাছে আজও, সেই সে-বিরহ সে-মিলন।
> সে-বাঁশীই বাজে অবিরাম—
> উহাদের খেলা আমাদের চোখে লীলা হ'য়ে রাজে অভিরাম।
>
> ॥ আজিকে রাতি ॥

চম্পকসুরভিত মধুযামিনীতে যেমন কবি মিলনের মালা গেঁথেছেন তেমনি 'কৃষ্ণারজনী'র অতল অন্ধকারে হৃদয়ে অনুভব করেছেন অপরিসীম বেদনা। এই উদ্দীপিত বেদনাবোধ পুরাণের বেদনাতুর স্মৃতিচিত্রনের দ্বারা অশ্রুরুদ্ধ আবেগে শতধারায় ভেঙে পড়েছে। অন্ধতামসী রজনী যেন বিরহে বিষণ্ণ। কবির অশ্রুসিক্ত আঁখি-পল্লবে তা'ই ভেসে উঠেছে মৃতপতিক্রোড়ে সতী বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রা, পতির জীবন-ভিক্ষায় সাবিত্রীর সকরুণ প্রার্থনা, শ্মশানের রিক্ত ভূমিখণ্ডে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়বিদারী পরিচয়-দৃশ্য, নলবিরহিতা দময়ন্তীর অশ্রুসজল করুণ আঁখি।

এসকল কবিতায় কবির পুরাণচেতনা সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। সরলমতি ধর্ম-বিশ্বাসী মহান্ উদারচেতা কবি কুমুদরঞ্জন। পবিত্র পুরাণ-গ্রন্থাদি তাঁ'র চিত্তভূমিতে সুগভীর রেখাপাত করেছে। পুরাণবর্ণিত ঘটনাবলীতে তাঁ'র জীবনবোধ ও ধর্মবোধ মিশে রয়েছে। তা'ই ভক্তকবির বহুতর কবিতায় অপ্রাসঙ্গিক ও উপমা হিসেবে এগুলির ব্যবহার অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র কাব্যাদর্শ ও সুমহান্

ধর্মবোধ শ্রীক্ষেত্রের মহামিলনে সম্মিলিত হওয়ায় কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে পুরাণোল্লিখিত ঘটনাবলীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া পড়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয়—যে সকল কবিতায় পুরাণচেতনার আধিক্য পরিবেশিত হয়েছে, কাব্য হিসেবে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হয় নি।

॥ চার ॥

কুমুদরঞ্জনের ইতিহাস-চেতনা ও দেশপ্রীতি সমসূত্রে গ্রথিত। একে অপর হ'তে অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাস-চেতনা হ'তে স্বদেশপ্রীতির জন্ম অথবা স্বদেশপ্রীতি হ'তে ইতিহাস-চেতনার। এখানে আমরা কবির স্বদেশপ্রীতির মর্মনির্যাসটি গ্রহণ করতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করে' নিতে হবে যে কবির স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতাগুলি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগে উৎসারিত নয়। এটি তাঁ'র কাব্যের মূল প্রবাহ নয়। তাই কবিকে কোনদিন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। আসলে কুমুদরঞ্জনের কবি-মানস ঠিক এ ধাতুতে গড়া নয়। সংগ্রামমুখর জীবন তাঁ'র নয়। বিপুল কর্ম-প্রবাহের উত্থানপতনের মুখোমুখি তিনি কোনদিন হন নি। আলোড়ন-বিক্ষুব্ধ কর্মমুখর জীবনপ্রবাহের মধ্যে এসে তিনি হাঁফিয়ে উঠতেন—তাঁ'র দেহমন মুক্তির নিঃশ্বাসের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাই স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ জীবনপ্রবাহে তিনি কোনোদিনও যুক্ত হন নি। অবশ্য স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা তিনি কিছু লিখেছেন। ইংরেজদের যা' কিছু মঙ্গলময়ী, শুভ এবং মহৎ তা' তিনি অকপটচিত্তে গ্রহণ ও প্রশংসা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'দের অকল্যাণকর অশুভ বুদ্ধি ও কর্মকে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু কান পাতলেই বুঝা যাবে কবির এ ঘৃণার বাণীতে বজ্রহুঙ্কারের কঠোরতা নেই—এ যেন মৃদু কোমল

তিরস্কার, সোহাগ-বিড়ম্বিত ভৎর্সনা। তা'ই ইংরেজদের পাপকার্যের নিন্দা ও পৈশাচিক উল্লাসের প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ-প্রসন্নচিত্তের 'বিদায়-আরতি' নিবেদন করেছেন। ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের প্রথমেই তাঁ'র কবি-কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ঝংকৃত ঃ

> বহু দোষ আছে, বহু পাপ আছে, সরল তোমরা নও,
> অহঙ্কারীও চরম, সদাই আপনার কথা কও।
>
> ॥ ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি ॥

কিন্তু তা'র পরের পংক্তিতেই সে সুর কি আশ্চর্যরূপেই না পাল্টে গেছে! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়—ব্রিটিশ-ভজনাই তাঁ'র কাম্য হয়েছে ঃ

> তবুও তোমার জাতির নিকট সকল জাতির হার,
> তোমরা মানবজাতির এবং ধরার অলঙ্কার।
> ভারত হইতে চলিয়া যেতেছ—পথ গৌরবময়,
> বিশ্বের ইতিহাসে রেখে গেল সব-সেরা পরিচয়।

এ কবিতার শেষাংশে তিনি সত্যই ব্রিটিশ-পূজা করেছেন ঃ

> ন্যাসের মতন ছিল এ ভারত, করি' প্রত্যর্পণ
> জানাইয়া দিলে নহ তুমি চোর—সত্যই মহাজন !···
> তোমরা যেতেছ সাফল্যময় আনন্দে অনুরাগে,
> যেমন দেউল করি' সমাপ্ত শিল্পী বিদায় মাগে।
> শঙ্খ-ঘণ্টা-হুলুধ্বনিতে মুখর তোমার পথ,
> গঙ্গার অবতরণ দেখিয়া চলে গেল ভগীরথ ॥
>
> ॥ ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কবির স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতাগুলি অকৃত্রিম বা মৌলিক নয়। সমকালীন অন্যান্য কবিগণ যখন ইংরেজ-বিরুদ্ধাচরণ করে' স্বদেশ-সংগীত ও কবিতাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখন কবিও তাঁ'দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। যুগের হাওয়াই তাঁ'কে এ সকল কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। আন্তরিকতার অভাব তা'ই এ সকল কবিতায় প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এরূপ দোষ-দুর্বলতা হ'তে মুক্ত হয়ে সমকালীন বিদ্রোহী কবি নজরুলের সংগ্রামশীল কবিতাগুলি এক অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলকিত। তাঁ'র কবিতাগুলি গহন প্রাণের আকূতি-সিক্ত ও আন্তরিকতার স্পর্শে এক মহান্ স্বর্গীয় বৈভব লাভ করেছে। পরাধীনা জননীর ব্যথায় কুমুদরঞ্জনও ব্যথিত। চারিদিকের অত্যাচার-নির্যাতন ও পৈশাচিক উল্লাস লক্ষ্য করে' স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণে সাহস সঞ্চারের জন্যে তিনি লিখেছেন :

প্রসব-বেদনা পরাধীনা দেবকীর
দেখি শঙ্কিত হ'য়ো না হে ভীরু তুমি,
নাশিতে ও ভালোবাসিতে আসিছে বীর,
নব কেশবের আজি জন্মাষ্টমী॥
॥ পূর্বাভাস ॥

কিন্তু এ শক্তি-সঞ্চারী মন্ত্র বায়বীয় তরঙ্গে বিলুপ্ত। এরই পাশে যখন বিদ্রোহী দুলাল নজরুলের কণ্ঠ শুনি :

চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তা'র লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে এক তান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!

॥ ফরিয়াদ : সঞ্চিতা ॥

তখন শ্রীদুর্গার অসুরনাশিনী এক দানবীয় দৈবশক্তিতে আমাদের সমগ্র চেতনা বার বার আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। এক মশালধারী নির্ভিক নিশানবর্দার যেন ঘন তামসীর চক্ষুকে আলোকিত করে' দুর্গম বন্ধুর পথে লক্ষকোটি জনতা-মিছিলের কুসুমাস্তীর্ণ পথ নির্মাণ করে' দেয়। এ সকল কবিতায় নজরুলের 'জীবনে জীবন যোগ'

হয়েছে—কিন্তু কুমুদরঞ্জনের তা' নয়। এই 'জীবনে জীবন' যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি কুমুদরঞ্জনের নিসর্গপ্রীতিমূলক কবিতাবলীতে সংঘটিত হয়েছে। সেইটি কুমুদ-কাব্যধারার মৌল প্রবাহ। ইতিহাস-চেতনামূলক কবিতাবলীতে কুমুদরঞ্জন অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ —অন্ততঃ তাঁ'র কাব্যধারার সার্থকতার পথটি তিনি এখানে খুঁজে পান নি। এ সকল কবিতাতেও কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগটি মিশে নেই। তাই অনেক স্থলেই কবিতাগুলি নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বিন্যাস মাত্র হ'য়ে উঠেছে। 'বাঙালী' একটি দীর্ঘ কবিতা—বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঐ উল্লেখই মাত্র। ঘটনাপঞ্জীর তাড়নায় কবিতাটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে সীমিত। বস্তুর সীমানা ডিঙিয়ে রসের এলাকায় এসে কবিতা 'কবিতা' হ'য়ে উঠতে পারে নি—ঘটনায় ভারাক্রান্ত মিলযুক্ত নিছক পয়ার মাত্র। এবং সে পয়ার অনেক স্থলেই শ্রবণ সুখকর নয়:

আমরা বাঙ্গালী হয়তো বা বটে দূষী,
মোদের নিন্দা করে যা'র যত খুশী।
...'কার্জন' হ'তে মার্কিনী 'মিস্ মেয়ো'
গালাগালি দিতে কসুর করে নি কেহ।
ডাকুক মশক, লাগুক যতই মাছি—
যেমন ছিলাম, তেমনি আমরা আছি।

।। বাঙ্গালী ।।

যে গুণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটি তথ্যভারাক্রান্ত হ'য়েও কবিতা হ'য়ে উঠেছে—'বাঙালী'তে তা'র বড় অভাব। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঐতিহ্য-চেতনা কুমুদরঞ্জনকে প্রভাবিত করেছিল—বহু কবিতায় সে প্রভাব-চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'বাঙালী' কবিতার বহুস্থলেই 'আমরা'র প্রতিধ্বনি শোনা যাবে:

বাঙ্গালী কপিল সগরবংশ দহি
সুন্দর ক'রে গড়িতে চাহে এ মহী।...
বাঙ্গালী দিয়াছে ভারতকে সেরা কবি,
বাঙ্গালী দিয়াছে ভারতকে সেরা ছবি।

বাঙ্গালী দিয়াছে দরদী বৈজ্ঞানিক,
ধীর সন্ন্যাসী, বাগ্মী অলৌকিক।...
বাঙ্গালী ঘটালো অঘটন দুনিয়ায়,
অদল-বদল পুজারী ও দেবতায়।..
শবসাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ,
হেরেছে 'কমলে কামিনী' আবির্ভাব।
বাঙ্গালী প্রেমিক রসের ব্যবসা করে'
গৌর করেছে সেই শ্যামসুন্দরে।...
পৃথক্ ধাতুতে গঠিত এদের হিয়া,
বজ্র এবং ব্রজের নবনী দিয়া।...
করিবে বাঙ্গালী ভুবন কান্তিমৎ
শুচি-সুন্দর শুদ্ধ শান্ত সৎ।

। বাঙ্গালী ॥

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সত্যকবির বিশেষ শব্দপ্রয়োগ, বিশেষণ, ছন্দভংগী ইত্যাদি অবিকৃত রূপে এ সকল কবিতায় আত্ম-প্রকাশ করেছে। কুমুদ-কবির 'দাবি' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব :

শশ্মানেতে শ্যামা তা'র গৃহে তা'র লক্ষ্মী,
আপদে বিপদে তা'র নারায়ণ রক্ষী।

। দাবি ॥

স্বজাত্যপ্রীতির কবিতাগুলিতে উভয় কবির কাব্যে ভাস্কর্য-সুঠাম মন্দিরগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। সত্য-কবির বহু কবিতায় তীর্থভূমি ও তীর্থাবাসের উল্লেখ রয়েছে। আর কুমুদরঞ্জনের তো কথাই নেই। ধর্মপ্রাণ ভক্ত কবির গোপন মনে এগুলির তো শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। তা'ই এক 'সোমনাথ'কে উপলক্ষ করে' কবি রচনা করেছেন একশো আটটি সুদীর্ঘ কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের 'বারাণসী'র সাথে কুমুদরঞ্জনের 'সোমনাথ' শীর্ষক কবিতাবলী স্মরণীয়। সোমনাথের পাষাণ-স্তূপে ভক্ত কবির বিনীত কল্পনাগুলি বিজড়িত হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে :

দেউল কি ? না না, এ বিস্ময়,—
আবির্ভাব সুন্দরের নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী মিশিয়াছে আকাশের নীলে।
ভূমারে আনন্দঘন আকার কে পাষাণেতে দিলে!
স্বরগের শিল্পী হেথা রেখে গেছে তা'র পরিচয়।

॥ মেগাস্থিনিসের সোমনাথ-দর্শন ॥

হিন্দুজাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার সকল কিছুর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মন্দিরগুলি। মন্দিরের গোপন গুহাবলীতে, তরঙ্গায়িত সোপান-শ্রেণীতে, গগনচুম্বী চূড়াগাত্রের সর্বত্রই সভ্যতা-ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের নয়নাভিরাম চিহ্নরাজী বিরাজমান। সমগ্র দেশের শত শতাব্দীর মর্মবাণী পাষাণের বুকে স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। স্তব্ধ কিন্তু বাঙ্ময়। পাষাণগাত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই চিত্রাবলীর গোপন কথা চকিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। কেবল চেয়ে থাকা। চেয়ে চেয়ে মর্ম উপলব্ধি করা। একবার, দু'বার, বার বার। তবুও আকুলতা মেটে কই :

মিটিল না সাধ, হয়তো আমায় আবার আসিতে হবে,
সে মুরতি তব না দেখি যে মোর আঁখি উপবাসী রবে।

॥ সোমনাথ ॥

পাষাণগাত্রে অপূর্ব দৃশ্যাবলীর চিত্র কবি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। দু' এক স্থলে তাঁ'র এ বর্ণনা 'সুন্দর' হয়েছে :

গুহায় গুহায় খোদিতেছে রূপ গুণী ভাস্করগণ,
করে অনন্তমূর্ত্তির কত মূর্ত্তি যে অঙ্কন।
কি অপরিমেয় চিরলাবণ্য ধারা
রঙে ও রেখায় ধরিয়া রাখিছে তারা,
পটে ও শিলায় আঁকিয়া রাখিছে তাদের আকিঞ্চন।

দেশ দেশ হ'তে আসে নর্ত্তক-নর্ত্তকী শত শত,
নৃত্যে তাদের কত ব্যঞ্জনা ভঙ্গিমা তার কত।
অঙ্গে অঙ্গে কি প্রয়াস প্রাণপাত
প্রসন্ন হ'ল প্রীত হ'ল সোমনাথ,
সর্ব্ব অঙ্গে পরমানন্দ করাই ব্রত।

॥ সোমনাথ ॥

সোমনাথের দীর্ঘ বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি দেশবাসীর সভ্যতা ও ধর্মের দার্শনিকতারও আলোচনা করেছেন। তবে সে সকল আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠ মনের বড় অভাব। তাঁ'র সকল তথ্য ও যুক্তি ভক্তমনের আবেগ-প্রাবল্যে তাড়িত। ফলে ভক্ত মনের আবেগই লক্ষিতব্য—রস বা দার্শনিকতা নয় :

কি বিরাট এ ধর্ম্মায়তন—দেবের যোগ্য গৃহ,
অদ্ভুত এই স্থাপত্যকলা যুগে যুগে স্মরণীয়।
একি সম্পদ, কি ঐশ্বর্য্য বিচিত্র মনোরম,
এ প্রাচীন জাতি কোনো জাতি চেয়ে সুসভ্য নহে কম।
উগ্রতাহীন উন্মাদনায় গভীর ভক্তিভরে
দার্শনিকের জাতি এরা তবু পাষাণের পূজা করে।
তারা বলে, এই গোটা বিশ্বের সবটুকু ভগবান,
সর্ব্বময়ের সঙ্গে শিলার কেন রবে ব্যবধান।

॥ আল্‌বেরুণীর সোমনাথ-দর্শন ॥

কুমুদরঞ্জনের ইতিহাস-চেতনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ তাঁ'র 'কঃ পন্থা' কবিতাটি। বিস্মৃত অতীতের 'স্পার্টাকাস্' হ'তে শুরু করে' আধুনিক যুগের 'কোরিয়া' পর্যন্ত এ কবিতায় স্থান পেয়েছে। এ কবিতাটির দু'টি স্মরণীয় স্তবক আমরা তুলে দিলাম :

সভ্যতার সে রোমীয় গতির হয় নি ব্যতিক্রম,
'কেপুয়া' হইতে আমরা চলেছি রোম।
সভ্যতার আজ রন্ধ্রে শনিগ্রহ,
চারিদিকে শুধু ক্রীতদাস-বিদ্রোহ,
সারি সারি সব ঝুলিতেছে ক্রুশে, এ নহে স্বপ্ন ভ্রম!

নগরী যখন পুড়িত তখন 'নীরো' বাজাতেন বীণা,
তা'তে ছিল তবু সুর-শিল্পীর চিনা!
বীণা না বাজায়ে 'বোমাই' বাজায় যারা
নীরোর চেয়ে কি বেশী সদাশয় তারা?
কহে হিরোসিমা, তপে বর চায় ধ্বংস, হিংসা ঘৃণা।

এ সকল কবিতায় ইতিহাস-চেতনার সাথে সাথে যে কবির কণ্ঠ

আধুনিক অ্যাটমযুগীয় বর্বর সভ্যতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তা' বলাই বাহুল্য। 'ব্যাঘ্রের তন্দ্রা' কবিতাটিতে মানুষের মাঝে সুপ্ত এই অশুভবুদ্ধি ও বর্বরতার কথা সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' ও 'আমাদের ভারত' কবিতাদ্বয়ে ইতিহাস-চেতনার সাথে ভৌগোলিক-চেতনার নিরন্তর সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ইতিহাস-রস বা সুদূর অতীতের রোমাঞ্চময় পরিবেশ দিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হ'তে পারে—যদি সেই রোমাঞ্চানুভূতিকে উপযুক্ত পটভূমি রচনার মাধ্যমে সহৃদয় পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করে' দেওয়া যায়—যেমনটি হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন এই অতীত রোমাঞ্চকে রসে পরিণত করতে পারেন নি। তিনি এই অতীত রোমাঞ্চের পাকে পাকে জড়িয়ে নিজেই রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছেন—ফলে পাঠককে রোমাঞ্চিত করতে পারেন নি। ইতিহাস-রস অবলম্বন করে' উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টির জন্যে এটাই ছিল তাঁ'র কাছে সব থেকে বড় বাধা।

ইতিহাস ও স্বদেশপ্রীতি এবং বিশেষ করে' পুরাণচেতনার কথা কবির বিভিন্ন কবিতায় বার বার বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপমা, রূপক ইত্যাদি রূপে এগুলির ব্যবহারের জন্যে কবির কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় নি। এ প্রসঙ্গে কবি-বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য: "কুমুদরঞ্জন সচেতন শিল্পী-কবি নহেন, তাঁহার রসসৃষ্টির মূলে কোনো কষ্ট-কল্পিত কলা-কৌশল নাই। প্রধানতঃ তিনি একটি উদ্দীপন বিভাবের তুর্নিবার তাড়নায় একটি হৃদয়াবেগকে রসমূর্তি দেন—কোনো কলা-কৌশলের সহায়তার জন্য প্রতীক্ষা করেন না। ঐ হৃদয়াবেগই কতকগুলি উৎপ্রেক্ষা, উপমা, নিদর্শনার মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। এইগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বচ্ছন্দাগত, এইগুলির একটিও উচ্ছিষ্ট নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত গভীর পরিচয়ই ভারতের পুরাণ, প্রাচীন কাব্য, ইতিহাস হইতে তাঁহার লেখনীর মুখে এইগুলি যোগাইয়া দেয়।"

## ॥ পাঁচ ॥

পল্লীপ্রীতিই কুমুদরঞ্জনের কাব্যধারার মৌলিক প্রবাহ। শান্ত শ্যামল পল্লীই কুমুদরঞ্জনের নিজস্ব সঞ্চারণক্ষেত্র। এলাকা সীমিত, তা' হোক—তবুও পল্লীর মুক্ত প্রান্তর-হাওয়ায় কবির স্বচ্ছন্দ গতি। পল্লীর আলো-হাওয়া, শ্যামলিমা, ধূলামাটি তৃণ-লতায় জড়িয়ে জড়িয়ে কুমুদবাবু মুক্তির শ্বাস ফেলেছেন। কবি নিজেও বহু কবিতায় স্বীকার করেছেন যে তিনি পল্লীর কবি ঃ

> চল গাবি গান উদাস বাতাসে তোর চেনা মাঠে সেখানে,
> নদী কলকল মিলাইবে সুরে যেখানে।
> উঠানে সূর্যমুখীটি উঠিবে ফুটিয়া,
> শেফালী হাসিবে ঘাসের উপরে লুটিয়া,
> তুই কবি তোর পল্লীরাণীর শ্যামল মাধবী-বিতানে
> চল গাবি গান উদাস বাতাসে তোর চেনা মাঠে সেখানে।

কবির এই চেনা মাঠ হ'ল আকন্দ বনতুলসী ঘেরা অজয়-কুনুরের উভয় তীরবর্তী মাত্র ক'খানা গ্রাম। এই ক'খানা গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই তাঁ'র কাব্যের প্রাণ, আত্মা। এই ক'খানা গ্রামকে ভালবেসেই কবি নিখিল বাংলার পল্লীতে তাঁ'র নিঃসীম পল্লীপ্রীতির নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। সে নিমন্ত্রণে বাদশাহী বিলাস না থাক—ফাঁকি নেই। তা'ই নিখিল বাংলার পল্লী সে নিমন্ত্রণে কথা কয়েছে, সাড়া দিয়েছে, করেছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পল্লীর সাথে কবির জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। কবি নিজেই লিখেছেন ঃ "অজয়'কে আমার ভাল লাগে কেন জানি না, বোধ হয় জন্মান্তরের সৌহার্দ্য। তা'র ধূসর চর, তা'র বন্যা সবই আমায় আকর্ষণ করে। পল্লী মাঠ ঘাট বাট, বৃহৎ বনস্পতি ফল ও ছায়াতরু, এমন কি তৃণ-গুল্ম আমার পরিচিত গ্রামবাসী বলিয়া মনে হয়। গাছ কাটিলেই

মাঠ যখন ফাঁকা হয়, আমার ব্যথা লাগে। বর্ষাকাল, মেঘলা আকাশ, দুর্যোগ রাত্রি, জ্যোৎস্না রাত্রি, ভোরের আকাশ ও মাঠ ভালবাসি, গ্রামের পাখিগুলিকেও ভালবাসি।"

কিন্তু ভালবাসা এক আর কবিতা লেখা অন্য। পুরাণের প্রতি সুগভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও পুরাণ ঘটনা অবলম্বনে কুমুদ-কবির পক্ষে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু নিসর্গপ্রীতি সম্পর্কিত কবিতায় কবি আশ্চর্যরূপে তাঁ'র সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজীর অনাবিল রূপসৌন্দর্যে তিনি বিভোর হয়েছেন, সেই বিভোরতা ফুটেছে তাঁ'র কাব্যে। পুরাণ ইতিহাস-ঐতিহ্য-চেতনার ক্ষেত্রে এই বিভোরতা হাউই বাজির মত কেবল তাঁ'র গহন মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশপথের একটুখানি আলোকিত করেই নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—কাব্যে যথাযথ রূপ পায় নি। কিন্তু নৈসর্গিক রূপ-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে? এখানে কুমুদরঞ্জন বিরল-দর্শন দক্ষতার অধিকারী। বনমল্লিকা, বনতুলসী আর বনফুলের ঝোপে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তকালে সুদূর অন্তরীক্ষে বর্ণাড়ম্বর মেঘপুঞ্জের অথবা সোনালী আবছায় ঘেরা পল্লী প্রান্তরের দিগন্ত রেখায় যে নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করেন, সে আবেগ কেবল কূল উপছান বন্যার মত বৃথা উভয় তীরবর্তী পথপ্রান্তরে ভেসে যায় নি—কবি তা'কে কাব্যের সুকঠিন তটে আবদ্ধ করে' দূর মোহনার পথে সঞ্চরমান করে' দিয়েছেন। ফলে তাঁ'র পল্লীকবিতাগুলি বিরল সৌন্দর্যের আবীর মেখে সুমহান্ হ'য়ে উঠেছে। এখানে আমরা কুমুদরঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম। ভাল করে' আস্বাদন করুন:

মাঝি—ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী—এ ঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুলগাছে
জলটি যেথায় ছুঁয়ে আছে,'
এখনো ওই যে-ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকন বাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

ডুবছে রবি নীল গগনে যদিই আঁধার হ'য়ে এলে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়ের হায় নামটি শুনে
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন্ বেদনা জেগে ওঠে হৃদয় মাঝে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁঝের দীপটি ছোট, বিষাদছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কিনা
ছিল আমার বড়ই চিনা,
ছবিটি যা'র আজও আমার হৃদয়-কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

এই নদীরই এই ঘাটেতে এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীটিরে কোমল তাহার বক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি'
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি',
পথের মাঝে আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে, তটিনীর ওই শ্যামল-কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজো যে সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
* আজও মধুর মুখখানি তা'র দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে॥

এই সায়াহ্ন-কোমল মধুর কবিতাটির পুরোটাই আমরা উদ্ধৃত করলাম। আস্বাদন ব্যাপারে কবিতাটির সাথে একাত্মা হ'তে পারলে এক দুর্লভ সৌন্দর্য লাভ করা যাবে; যে সৌন্দর্য মানুষের মনের সকল সংকীর্ণতা ও আবিলতাকে ধুয়ে মুছে পবিত্রোজ্জ্বল

করে' দেয়—সেই সৌন্দর্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কবিতাটির পূজা করি। কতদিন নিরালা গৃহকোণে একমনে পড়ে একাই কেঁদেছি। কেঁদে কেঁদে চোখের জলে পরম পবিত্রতায় দেহমনকে ভরিয়ে নিয়েছি। বিশেষ করে' শেষের স্তবক দু'টি—ব্যথা-বেদনায় টলমাটল হীরক-নিটোল অশ্রু। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এ কবিতার তুল্য প্রতিযোগী বিরলপ্রায়। এ কবিতায় কুমুদরঞ্জন তাঁ'র সার্থকতার উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছেন।

অনেকেই কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীতিমূলক কবিতাকে বাংলা সাহিত্যে দোসরহীন বলেছেন বা আমিও আমার আলোচনায় আবেগভরে কোথাও কোথাও হয়তো এমন কথা বলেছি— কিন্তু স্পষ্টতই মন্তব্য-গুলি আতিশয্যদোষে দুষ্ট। আমরা পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের সাথে কুমুদরঞ্জনের তুলনা হয় না—তেমনি তুলনা করা চলে না নজরুল ও জসিমউদ্দীনের সঙ্গে। ইংরেজ কবি Wordsworth এবং Burns-এর সঙ্গে কেউ কেউ কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রীতির তুলনা করতে চান কিন্তু সেখানেও কুমুদরঞ্জনের আসন নিম্নেই।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রীতি অনেক উচ্চস্তরের দুর্মূল্য সামগ্রী। নটরাজের পদপাতনে তাঁ'র অন্তর্লোকে যে ভাবের উদয় হয়—কুমুদরঞ্জনের তা'র আশা করা বাতুলতা। ষড়ঋতুর ক্রমবিবর্তনে রবীন্দ্র-মানসে যে অসীম সৌন্দর্যলোকের আবরণ উন্মোচন হয় তা' কুমুদরঞ্জনে কোথায়? বিশ্বনিখিল পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-শোভার স্তুতি করে' যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

> তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
> উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
> কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
> করিতেছে সঞ্চরণ···
>                     আনন্দের রস
> কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
> ধ্বনিছে কল্লোলগীতে।

তখন আমরা বিস্ময়ে নির্বাক্ ও নম্রনত হই। কুমুদরঞ্জনে এই বিশ্বব্যাপ্ত রসের বড় অভাব।

নজরুলের কবিতাবলী ও সংগীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বিস্তার ও পবিত্রতা দেখেছি তা কম গর্বের নয়। মাঝে মাঝে তা' অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিই :

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্রু পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ ( আ—হা ) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।
পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায় ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো—
শুকনো নিশ্বাস, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের ( আ—হা ) ভাঙা গলার সুর—
ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে॥

॥ পউষ : দোলন-চাঁপা ॥

দেশ-বিভাগ হওয়ায় জসিমউদ্দীনকে আমরা পর করে' দিয়েছি, তাঁর কাব্যের আলোচনা বা পঠন-পাঠন এ বঙ্গে আর নেই বললেই চলে। আজকের তরুণ ছাত্রসমাজের কথা বাদ দিয়ে শিক্ষকমহলও যে পাঠ্যপুস্তকান্তর্গত জসিমউদ্দীনের কবিতা ছাড়া তাঁ'র অন্য কাবতার খোঁজ রাখে এমন কথা মনে হয় না। রাখলে লাভবান হতেন। একদা জসিমউদ্দীনের কবিতা নিখিল বাংলায় বিপুল

আলোড়ন এনেছিল। তাঁ'র 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' পড়ে অশ্রুজল মোছেন নি এমন পাঠক বিরল। তাঁ'র 'রাখালী' ও 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থাদির মধ্যে যে নিবিড় পল্লীপ্রেম পরিব্যাপ্ত হয়েছে—আজ এই উন্নাসিকতার যুগে সত্যই তাঁ'র দোসর খুঁজে পাওয়া সৌভাগ্যের ফল। জসিমদ্দীনের ভিতর আমি এক দুর্লভ কবিপ্রাণ লক্ষ্য করেছি—যে প্রাণ বিহগ কাকলীতে বিগলিত, রাখালিয়া বাঁশীর সুরে উন্মনা, নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দূর সঞ্চারি, বালুচরের বায়ু-হিল্লোলে আবেগ-কম্পিত। কুমুদরঞ্জনের শ্যাম-স্নিগ্ধ পল্লী-রূপে যে মনের প্রকাশ, 'নক্সীকাঁথার মাঠ' বা 'সোজনবাদিয়ার ঘাটে' তা'রই মহত্তম বিকাশ। কুমুদরঞ্জনের পল্লীমন সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ, জসিমউদ্দিনে তা' দিগন্ত-বিস্তারী। কুমুদরঞ্জনে সূচনা, জসিমউদ্দীনে বিস্তার। প্রকৃতপক্ষে জসিমউদ্দীনের পল্লীপ্রীতি গভীরতর। কেবল পল্লীর সৌন্দর্য-শোভা বর্ণনার মধ্যে সে প্রীতি নিঃশেষিত হ'য়ে যায় নি—পল্লীর গৃহাঙ্গনের সৌন্দর্য বর্ণনায় এমন কি পল্লীবালার প্রেম-নিবেদনের মধ্যেও সে সুর ঝংকৃত :

…এমন সময়ে ঘরের খোপেতে মোরগ উঠিল ডাকি,  
রূপা কয়, "সখি! যাই—যাই আমি রাত বুঝি নাই বাকি!"  
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়; সাজু কয়, "ওগো শোন,  
আর কি গো নাই মোর কাছে তব বলিবার কথা কোনো?  
দীঘল রজনী—দীঘল বরষ—দীঘল ব্যথার ভার,  
আজ শেষ দিনে আর কোন কথা নাই তব বলিবার?"  
রূপা ফিরে কয়, "না কাঁদিয়া সখি, পারিলাম নাকো আর,  
ক্ষমা কর মোর চোখের জলের নিশাল দেয়ার ধার।"  
খানিক চলিয়া থামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিছু—  
"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,  
দু'টি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কালো কাজলের রাগে।  
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,  
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনী চাহিও আরশি-কোণে।

মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমী-ফুল।
যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে…না শুনি' আমার বাঁশী,
বাহুখানি তুমি এলাইয়া সখি মুখে মেখে রাঙা হাসি
দেখো মাঠ পানে—গলায় গলায় ছুলিবে নতুন ধান,
কান পেতে থেকো, যদি শোন কভু সেথায় আমার গান।
আর যদি সখি মোরে ভালবাস, মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া!"

ঘরের খোপেতে মোরগ ডাকিল, কোকিল ডাকিল ডালে,
দিনের তরণী পূর্ব্ব সাগরে দু'লে ওঠে রাঙা পালে।
রূপা কহে, "তবে যাই যাই সখি, যেটুকু আঁধার বাকী,
তারি মাঝে আমি গহন বনেতে নিজেরে ফেলিব ঢাকি।"
পায়ে পায়ে পায়ে কতদূর যায়, তবু ফিরে ফিরে চায়,
সাজুর ঘরেতে দীপ নিবু নিবু ভোরের উতল বায়।

Wordsworth-এর নিসর্গপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চগ্রামস্পর্শী না হ'লেও তা' কুমুদ-কবির চেতনা অপেক্ষা ব্যাপকতর। এবং তা' না হ'লে হয়তো Wordsworth-এর কবিতা কুমুদ-চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারত না। কবি তাঁর জীবন-বর্ণনায় লিখেছেন: "কলেজ-জীবনে প্রথমে Wordsworth-এর কবিতাই আমাকে কবিতার প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল।…ইংরেজী সাহিত্যের তিনটি মেয়েকে আমি ভালবাসি—Ophalia, Little Nell, আর Lucy Grey." লুসি গ্রে-কে কেন্দ্র করেই বোধ হয় Wordsworth-এর নিসর্গ-চেতনার সর্বোত্তম বিকাশ। কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতি-চেতনা যেখানে দৃশ্য ও শোভার মধ্যে নিঃশেষিত, Wordsworth-এর চেতনা সেখানে স্তব্ধ না হ'য়ে আরো অগ্রসর হয়েছে, দৃশ্য ও শোভার আবরণ ভেদ করে' তা' জীবন্ত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। Wordsworth-এর প্রকৃতি একটি চরিত্র—তা' একাধারে মানুষের বন্ধু এবং শিক্ষক।

এ পটভূমিতে বিচার করলে কুমুদরঞ্জনকে অনেক minor মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে কুমুদরঞ্জন মহৎ কবি না হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি অকবি নন। ক্ষুদ্র হ'লেও নিবিড় ঐকান্তিকতার স্পর্শে তাঁ'র কবিতা সজীব এবং প্রাণবন্ত। এখানেই কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব। আধুনিক যুগের অতিরিক্ত মসলা দেওয়া ভোজ্যে যখন অরুচির ভাব আসে তখন সরল সহজপাচ্য পথ্যে আকৃষ্ট না হ'য়ে উপায় কি! কুমুদবাবুর কবিতা সরল সহজ প্রাণের ব্যথা ও বেদনার প্রকাশে অম্লান।

পূর্বেই বলেছি কুমুদবাবুর ক্ষেত্র পরিসর নয়। ছোট প্রকৃতি, ছোট প্রাণ, ছোট ছোট ব্যথা-বেদনা—এই নিয়ে কুমুদবাবুর কাব্য। কুমুদরঞ্জনের মানস-প্রবণতা সম্পর্কে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "কুমুদরঞ্জন কিন্তু ভুঁইচাঁপা, জুঁই, ঝুমকা ফুল, ঝিঙে ফুল, তৃণকুসুম, পাথরের ফাটলের ছোট্ট বুনো ফুল এদের রাজ্যেই পরিভ্রমণ করেছেন। এদের সঙ্গেই তাঁ'র মানস-সামীপ্য। পাখীদের মহল্লায়ও তাঁ'র যাতায়াত আছে, তবে সেখানে টুনটুনি ফিঙেদেরই ভিড়, ক্বচিৎ ক্ষুদ্র চকোরের আনাগোনা; শুয়োপোকা, প্রজাপতি, মৌমাছিদের দাবিও তাঁ'র কাছে কিছু কম নয়। ঋতুর বিরাট চক্রাবর্তনে নটরাজ-নৃত্যের কল্পনা তাঁ'র কাছে কিছু কম নয়। ঋতুর বিরাট চক্রাবর্তনে নটরাজ-নৃত্যের কল্পনা তাঁ'র কবি-চিত্তের আয়ত্তগম্য তো নয়ই—এমন কি সাধারণভাবে বর্ষার প্রবল প্রাচুর্যের তুলনায় আকাশের মেঘ-করা; গ্রীষ্মের রুদ্র দাবদাহ, বসন্তের প্রগলভ আনন্দ ও ঐশ্বর্যের তুলনায় শীতের শীর্ণতা, তাঁ'কে অধিক মুগ্ধ করেছে। "শিশিরের দেশ" বার বার তাঁ'কে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। গ্রামের ঘোষালদীঘি আর তালপুকুরের যে আনন্দ, সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনেও তা' উপভোগ করেন নি। চূর্ণীনদীর মিঠে নাম ও স্থবির গতিই তাঁ'কে আকর্ষণ করেছে। অজয়ের বন্যা নিয়ে লেখা কবিতাও আছে, কিন্তু তা' একান্ত নিকট আত্মীয়ের ক্ষণিক ক্ষেপামি বলেই।"

সহজের কথা কবি নিজেই বলেছেন :

ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু'দণ্ডেরি আলাপই খুব ;
বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব ;
অকূলের কোন কেন্দুবিল্ব করবো গিয়ে পারণ গো ॥

কবি নিজেই তাঁ'র সীমাবদ্ধ গণ্ডির কথা বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, তাঁ'র গান 'পল্লীরাণীর শ্যামল মাধবীবিতানে'র গান, এ তিনি হাবভাবেই জানতেন এবং এর জন্যে তাঁ'র কোন ক্ষোভ ছিল না :

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে ?
কি করিবি আর বসিয়া একা তফাতে।
সু-তার সেতার বাঁশরী বীণায় কেবলি
যেথানে সুরের লহরী উঠিছে উথলি'
মাঠের জলের জলতরঙ্গ সেথায় এলিয়ে শোনাতে ?

মাঠের শোভা কবির কবিতায় এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। সুবর্ণমণ্ডিত সোনার শ্লোকের মত সমগ্র প্রান্তরটি একান্ত বাস্তব হ'য়েও রূপকথার কল্পনাবিলাসী 'সোনার কৌটো'র সমতুল্য হয়েছে। 'ধান্যক্ষেত্র' এরূপ একটি কবিতা। যাঁ'রা কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতি-চেতনার অনাবিল প্রেরণা আস্বাদন করতে চান এ কবিতাটি তাঁ'দের অবশ্য পাঠ্য। সমগ্র প্রান্তরটি কি লাবণ্য-শ্রীই না ধারণ করেছে :

হেমন্তে এই পল্লীমাঠে আয় গো,
দেখ্ গোধূলি কি সোনা ছড়ায় গো।
যায় যতদূর দৃষ্টিসীমা,
নত শীষের মাধুরিমা,
মিশে গেছে আকাশ-মোহনায় গো।...

ছেড়ে তাঁহার বাহন পেচক পক্ষী
অলক্ষ্যে আজ ফিরছে মাঠে লক্ষ্মী।
স্নিগ্ধ তাঁহার রূপের আলো
জুড়ালো মোর চোখ জুড়ালো।
তা'র দেখা তো ভাগ্যবানেই পায় গো।...

কি অপরূপ হেমন্তের এই সন্ধ্যা!
নাই ফুটিল শিউলি নিশিগন্ধা।
হেন কনকচূড়ের খনি,
অপূর্ব্ব যোগ চূড়ামণি,
ধরার গায়ে অমৃত গড়ায় গো॥

॥ ধান্যক্ষেত্র॥

অন্যের কাব্যে অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের আধার পল্লীর মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পড়ে কবি পল্লীকে ভালবাসে নি, পল্লীর নয়নাভিরাম শ্যামল শোভা অবলোকন করেও কবি পল্লীকে ভালবাসেন নি—তাঁ'র এ ভালবাসা মাতৃত্বের মহিমায় মহিমান্বিত। তাঁ'র এ ভালবাসা দেহের সাথে রক্তকণিকার সম্পর্কের মত অবিচ্ছেদ্য:

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেকো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।...
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে॥

॥ পল্লী॥

কুমুদরঞ্জনের আর একটি স্মরণীয় কবিতা হ'ল 'মায়ার বাঁধন'। কবিতাটি ক্ষুদ্র কিন্তু মুক্তা। প্রতিটি চরণ দৃঢ় পিনদ্ধ। শিথিল এলায়িত বিন্যাস যা' কুমুদরঞ্জনের কবিতার প্রধান দুর্বলতা তা' এ কবিতায় অনুপস্থিত। কবিতাটিতে পল্লীপ্রীতির সঙ্গে একটি স্পর্শকাতর দুর্লভ প্রাণের স্পন্দন যুক্ত হওয়ায় সমগ্র কবিতাটি সুন্দর হ'য়ে উঠেছে:

॥ ১ ॥

পথতরু-তলে বসে আছি বিকালে,
পোষাপাখি আসি এক বসিল ডালে।
এখনো চরণে তা'র শিকলের দাগ,
শিখানো বুলিতে তা'র ঝরিছে সোহাগ—
মিশিতে পারে না যেন পাখির পালে।

মন দিয়া যতবার আমি শুনিনু,
মুখে তা'র মধু বোল 'মিণ্টু মিনু',
কণ্ঠে বাজিছে ওর তাদেরি বাঁশি
বনে এসে মন তা'র আরো উদাসী—
যাদুর মোহন কাঠি কেবা ঠেকালে।

॥ ৩ ॥

'মিণ্টু মিনু'র বাড়ী কোন্ বিদেশে,
হেথা তাহাদেরি কথা বলে সে এসে।
আহা, সারা বনে বনে পাতার ফাঁকে
সারাদিন ঘুরি ফিরি তাদেরে ডাকে—
ঘর, তুমি বনচরে একি শেখালে!

॥ ৪ ॥

গৃহে থেকে এই দশা বন-পাখিরই,
গৃহী বল কি করিবে লয়ে ফকিরি?
দেখে তা'র দশা মোর চোখে আসে জল,
কয়টা বছরে তা'র এতই বদল!—
ভালবেসে দাসখত নিজে লেখালে॥

॥ মায়ার বাঁধন ॥

আর একটি কবিতা 'পাড়াগাঁয়ে'। হয়তো ছন্দ-ঝংকার নেই, নতুনত্ব নেই বলে হয়তো অনেকের ভাল না লাগার কথা, কিন্তু আন্তরিকতাটুকু লক্ষণীয়ঃ

আমি থাকি সুদূর গ্রামে বনরাজির মাঝ,
শোভন লোভন শ্যামল কোমল নিয়েই আমার কাজ।
শর্বরী নিঝুম ঝিঁঝিঁদের মরসুম
চারিদিকে মধুর মৃদু মিষ্টি সব আওয়াজ।

॥ পাড়াগাঁয়ে ॥

'প্রতীক্ষায়' কবিতাটিতে গোধূলি সন্ধ্যার বর্ণনা সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। 'হৃদয়রাজের' আশে কবি নদীকূলে বসে আছেন—

সে প্রতীক্ষার মধ্যেও কবির নিসর্গপ্রীতি কি অনবদ্য রূপেই না প্রকাশ পেয়েছে :

॥ ১ ॥

এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান,
নিরাশে কেটে গেল দীর্ঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে
তপন নিভে আসে,
দিনের আলো ধীরে হ'ল যে অবসান।

॥ ২ ॥

গহন কালো মেঘ ঢাকিছে নীলিমায়,
ঝটিকা হুহু করে মরম বেদনায়।
ধূসর তরুশিরে
আঁধার নামে ধীরে,
পথিকে একেবারে পথে না দেখা যায়।

॥ ৩ ॥

ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদীজল,
আঘাতি দু'টি তরী করিছে কলকল,
ভাঙা এ তরী মোর
ভাসাতে করে' জোর,
তরণী যায় যায় কাঁপিছে অবিরল। ইত্যাদি।

॥ প্রতীক্ষায় ॥

'অজয়', 'কুনুর' ইত্যাদি কবিতায় নদীর সাথে কবির প্রাণ-সম্পর্ক ও সুরালাপনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের প্রবন্ধে কবির পল্লীপ্রীতিমূলক কবিতার প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কবির যে কোন কবিতা পড়লেই তাঁ'র এই প্রীতি সুর ধরা পড়বেই। তাঁ'র বীণার ঐ একটি মাত্র সুর অবিরাম বেজেছে। কান পাতলে তা' শোনা যাবেই।

সর্বশেষে আর একটি কথা স্মরণীয়। আমরা পূর্বেই বলেছি পল্লী-প্রীতি থেকে কবির জীবনবোধ এবং জীবনবোধ থেকেই তাঁ'র

ধর্মবোধ গড়ে উঠেছে। পল্লীর প্রতি এই ভালবাসা হ'ল ভগবানকে ভালবাসার নামান্তর। পল্লীর শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যেই তিনি ভগবানের পরশ খুঁজে পেয়েছেন :

> কোন্ ধন-মান পাইবার লাগি' ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া ?
> কি পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে কঠোর জীবন যাপিয়া ?
> চিন্তামণির ধনে ধনী যাঁ'রা তাঁ'রা কি মুক্তামণি চায় ?
> বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে ক্ষিতি প্রতি অণুকণিকায়।
>
> ॥ কবির সুখ ॥

এই সুরই বোধ হয় কবির পল্লীপ্রীতির শ্রেষ্ঠতম সুর।

॥ ছয় ॥

কুমুদরঞ্জন ছোট ( minor ) কবি—তা'ই তাঁ'র কাব্যে যত ছোটর ভিড়। প্রকৃতপক্ষে ছোট জিনিসের এমন রাজকীয় আধিপত্য আর কোন কবির কাব্যে নেই।

'একতারা' কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন : "বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র ; ক্ষুদ্র 'একতারা'তে বড় সুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।"

বিনয়নম্র ভাবমধুর উক্তিতে কবির সমগ্র হৃদয়খানি যেন ধরা পড়েছে। এই-ই কুমুদরঞ্জন, এই-ই তাঁ'র কাব্য-বৈশিষ্ট্য, এই-ই তাঁ'র জীবন-জিজ্ঞাসা। এই বজ্রকোমল উক্তিটির মধ্যেই সমগ্র কুমুদরঞ্জন বিধৃত। গোষ্পদে আকাশের প্রতিবিম্ব দর্শনের মত ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যেই কবি বিরাটকে দর্শন করতে চেয়েছেন। ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়েই তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন মহতের স্পর্শ। পল্লীকে ভালবেসে, তা'র মানুষকে ভালবেসে কবি ভগবানকে পেতে চেয়েছেন। তা'ই ঘৃণ্য 'ডোমের মেয়ে'র বেদনা কবিচিত্ত অশ্রু-ভারাক্রান্ত। কবে কোন বিধবা গরীব বাগ্দিনীর মিঠা আম গাছটি ঋণের জন্যে বিকিয়ে জ্বালানী কাঠরূপে মানুষের স্থূল প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ল তা'র জন্যে কবির বেদনার অন্ত নেই। কবে

শীত-কম্পিত এক বালককে ছিন্ন বসন দেবার অঙ্গীকার করে' দেওয়া হয় নি সে স্মৃতি মনে করে' কবি বার বার অশ্রু মোছেন। কবে বদরীর পথে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাওয়ার কথা দিয়ে যাওয়া হয় নি তা'র জন্যে কবির কি তীব্র বেদনাবোধ! আর নিম্নের উদ্ধৃত-চিত্র দু'টি আস্বাদ করুন:

ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি' গিয়াছিনু আমি ভুলি'—
রাত্রে সাধুর ক্লেশ হ'ল কত কি হবে সে-কথা তুলি'।
আকাশেতে আজ শুনি ডাক তা'র,
মরমেতে মরি মরম-মাঝার,
চোখে আসে জল, ক্ষমা মাগি আমি হইয়া কৃতাঞ্জলি।

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল, দিলাম পয়সা ছুঁড়ি',
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝারে খুঁজিতে লাগিল বুড়ী;
গাড়ী চলে এলো, জানি নে তো আহা
সেই পসারিনী পেলে কিনা তাহা!
আজ মনে হয় সে রয়েছে চেয়ে মাথায়ে ফলের ঝুড়ি!

।। পথের দাবি ।।

কি অপূর্ব চিত্র! স্মৃতি-বেদনার কি অনবদ্য প্রকাশ! কত তুচ্ছ ঘটনা অথচ কি বিপুল পরিণতি! মদগর্বী অবিশ্বাসী মনের কাছে হয়তো একটা অদম্য হাসির খোরাক—কিন্তু ভক্ত কবির কাছে? অবহেলায় পয়সা ফেলে দেওয়াটা নরক যন্ত্রণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সে ঋণ বুঝি কবি সারা জীবন অশ্রুজলে পরিশোধ করবেন! ছোট জিনিসের প্রতি কবির যে একটা সুগভীর অনুরাগ ছিল—'ছোটদের দাবি' কবিতায় তা' স্বর্ণাক্ষরে স্বাক্ষরিত। বহু পঠিত এই কবিতায় বৃহৎ ও মহৎ জিনিস অপেক্ষা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের প্রতি কবির সুগভীর অন্তরাবেগ শত ধারায় ভেঙে পড়েছে। ছোট জিনিসকে ভালবাসেন বলেই ভুঁইচাঁপা, টুনটুনি, প্রজাপতি, চড়ুইভাতি, ফুল-ঝুমকা, ঘোষাল-পুকুর, বকুল তরু, পুরানো বাড়ি, প্রাচীন অশথ, চন্দন, চকোর ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁ'র কাব্যের

বিষয়বস্তু হয়েছে। আধুনিক মনন-সর্বস্ব কবির কাছে এগুলি হেয়, এমন কি অপমানিত হ'তে পারে কিন্তু কবি গর্বভরে লেখেন :

পাখিও গায় ফুলও ফোটে
জীবন মোদের মন্দ না,
ভীমরুল এবং ফড়িং থাকে
টুনটুনি ও চন্দনা।

॥ সাত ॥

কবির সমগ্র দেহটি যেন একটি দেউল—আত্মাটি তাঁ'র ঊর্ধ্বমুখী কমলের মত নভচারী, মাটির পৃথিবীর সকল মালিন্য অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে তা' ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, ভগবৎ-সান্নিধ্যের জন্যে তা'র সকল আয়োজন। কবির সমগ্র চেতনার মধ্যে ভগবৎপ্রীতি বিজড়িত। তাঁ'র সমগ্র সৃষ্টির ওপর এ প্রীতি এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্বর্গীয় ছায়া ফেলেছে। এই বৈষ্ণব-প্রীতি তাঁ'র সমগ্র সত্তায়, সমগ্র রক্তকণায় মিশে ছিল বলেই ছোট জিনিসের প্রতি মমত্ববোধ এমন গভীর, অনুরাগ এমন নিবিড় হ'তে পেরেছে। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য জিনিসকে ভালবাসা তাঁ'র ভক্তিরসসিক্ত মনের কাছে ভগবৎ-প্রেমেরই নামান্তর।

কবির নিখাদ নিটোল হরিভক্তি আজকের যুগের আধুনিক মনের কাছে অবিশ্বাস্য রকমে প্রবল বলেই মনে হবে। আধুনিক মন হেসে কুটি কুটি হবে যখন শুনবে—বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায়ের অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে চণ্ডীপূজা দিয়ে প্রসাদী বিল্বপত্র খামের ভিতর পাঠিয়ে লেখেন, "চিন্তা নেই এতেই নিরাময় হ'য়ে যাবে।" এই সুগভীর ঐকান্তিক ভগবৎপ্রীতি বুঝি আধুনিক দুনিয়া থেকে উঠে গেছে : এই অবিশ্বাস ও ভাঙনের যুগে বুঝি এ প্রীতির আর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষ তা'র সুস্থ, সরল, সহজ আত্মাটির বলিদান

করেছে। হয়তো কাব্যের ক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জনই এর শেষ, ধারক, বাহক এবং প্রতিভূ।

কুমুদরঞ্জনের হরিভক্তি ও বৈষ্ণব-প্রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন: "খানিকটা ভাষা, রচনারীতি ও কল্পনাবিন্যাসের পার্থক্য বাদ দিলে কুমুদরঞ্জন ভক্তিকেন্দ্রিক ও ভগবৎ-প্রেমবিহ্বল মনোভাবের দিক দিয়া তাঁহার স্বগ্রামের বৈষ্ণবকবি লোচনের সমধর্মী ও সমসাময়িক। মনে হয় যেন লোচনের যুগ হইতে কুমুদরঞ্জনের যুগের কোনই ভাবগত ব্যবধান নাই; সেই সুদূর ষোড়শ শতক হইতে আজ পর্যন্ত অজয়ের খাতে যে স্রোতধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্তনের কোন ছন্দ বিবর্তিত হয় নাই। লোচনের যুগে শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ছাড়া আর কোন বিষয় লইয়া কাব্যরচনার রীতি ছিল না; তাঁহার কবিতায় বৈষ্ণব সাধনার মহামন্ত্র 'তৃণাদিব সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা' শুধু চৈতন্য ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মহিমা প্রতিপাদনের জন্য উদ্‌গীত হইয়াছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই মহামন্ত্রেরই আরও ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রয়োগ—তাঁহার পরিবেশের তরুলতা ফুল মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই এই ক্ষুদ্রের মহিমানীতি বিঘোষিত।"

কবির নিজের কথায় তাঁর ভগবৎ-বৈষ্ণবপ্রীতির স্বরূপটি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে: "...বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্তন গান প্রথম যেদিন শুনি—আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশি বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্তন গান আত্মসাৎ করিয়াছে। দেবেন সেনের 'মলিন হাসি', 'নীরব বিদায়', 'বিজয়ী' প্রভৃতি কবিতা আমায় মুগ্ধ করিত, গোবিন্দ দাসের কবিতা খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। ...আমি 'ভক্তমাল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'পদকল্পতরু' ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি—

ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।"

কবির স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রীতি, পল্লীপ্রীতি, ছোটর প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি সকল প্রবণতার মধ্যেই ইষ্টদেবতার লীলারস সঞ্চারিত। প্রত্যক্ষ পথে হোক অথবা নেপথ্যলোক হ'তে হোক কবির সকল সৃষ্টিতে তাঁ'র ভক্তিপ্লুত মনের আবেশ আপন গরিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

তাঁ'র এই ধর্মপ্রীতি বা হরিভক্তি বা বৈষ্ণব-প্রেমের মধ্যে আমি একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছি—সেটি হ'ল তাঁ'র অন্তরের মহান্ উদারতা। তাঁ'র ধর্মমতের প্রতি, পূজা-অর্চনার প্রতি তাঁ'র অবিচল নিষ্ঠা—কিন্তু তা'ই বলে তিনি অন্য কোন ধর্মের প্রতি অনুদার নন। বাংলা সাহিত্যের এখন ভাঁটার যুগ, পট-পরিবর্তনের যুগ। এবং এই যুগে—আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করছি—কম-বেশি সকল সাহিত্যিক হয় অতি হিন্দু নয় অতি মুসলমান হ'য়ে উঠেছেন। সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তাধারা কারো মধ্যে আছে বলে মনেই হয় না—কচিৎ কখনো তা'র চকিত দীপ্তি চোখে পড়লেও তা' নিতান্ত মানসিক বিলাস বলেই মনে হয়, অন্তরের গহনতম প্রদেশপথ হ'তে যে সে পবিত্রালোক উৎসারিত হচ্ছে এমন কথা মনে হয় না। আমি যখন গল্প লিখব তখন জোর করে 'এশার নামাজ', 'অজুর পানি', 'আব্বা-আম্মা' বসাব অথবা মীরার সাথে মুজিবরের বিয়ে দেবই। আর আপনি যখন গল্প লিখবেন তখন নিশ্চয়ই ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে বিচিত্রবর্ণ চেককাটা লুঙ্গি পরা অপরিচ্ছন্ন দাড়িওয়ালা লোকটা অপরের গাঁট কাটবেই। এ ছাড়া আপনার কল্পনা বিস্তারিত হবে না। নতুন 'গফুর জোলা' অথবা 'রূপ কাকা' অথবা 'কাবুলিওয়ালার' আশা করা আজকাল নিতান্ত বাতুলতার পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা আমাদের কি বিষই দিয়ে গেল!

বাংলা সাহিত্যের তিনজন লেখককে এ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মনে হয়েছে—কুমুদরঞ্জন, নজরুল, বিভূতিভূষণ। এঁদের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি পংক্তিও আবিষ্কার করা যাবে না যেটি এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ছায়ায় ম্লান। কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি বর্তমান উঠতি শিষ্য কবি—যাঁরা তাঁ'র কাছে তালিম নিচ্ছেন—তাঁ'দের মধ্যে মুসলমান যুবকদের সংখ্যা বেশি এবং তাঁ'র অকপট মনের হৃদ্য ভালবাসার প্রায় সমস্ত অংশই তাঁ'রা অধিকার ক'রে আছেন। হৃদয়ের এই উদারতার জন্যেই 'অমর বিদায়' কবিতায় তিনি বলতে পেরেছেন ঃ

অমর বিদায় ও-যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
'কোরেসে'র অত্যাচারে ওই চলি' যায় দূরে
ইন্নম্মদ মহম্মদ ত্রিদিব-প্রভায়,
ওরে সে যে সর্ব্বত্যাগী ডরে না প্রাণের লাগি',
পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্ম জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা তখন বুঝে নি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি' পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাঁথায়।

ক্রুশে বিদ্ধ মহান্ যীশুখ্রীষ্টের জন্যে যেমন তাঁ'র প্রাণ কেঁদেছে, তেমনি বেদনা অনুভব করেছেন বুদ্ধের গৃহত্যাগে। গোঁড়ামির আবিলতায় যখন কম-বেশি সকল ধার্মিক ধর্মের অপমান করছেন তখন কুমুদরঞ্জনের এ অসীমব্যাপ্ত উদারতা নতুন আলোকের সন্ধান দেবে। এবং এই উদারতার জন্যে বাংলা সাহিত্য চিরদিন তাঁ'কে স্মরণ রাখবে।

॥ আট ॥

দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠ কাব্য গড়ে ওঠে—বক্তব্য এবং বলা। কেবল বক্তব্য বিষয় কাব্য হয় না, কেবল বলাও কাব্য নয়। মহান্ বক্তব্যের সাথে উত্তম বলার মণিকাঞ্চন যোগ হ'লে শ্রেষ্ঠতম কবিতা জন্মলাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটি বোধ হয় এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম উদাহরণ। এ কবিতার দেহ (Subject) ও আত্মা (Form) ইস্পাত-কঠিন বলিষ্ঠতায় অনন্য। রূপের সাথে রসের যোগ হওয়া চাই, সাধ এবং সাধ্যের সর্বোত্তম মিলন চাই। নইলে সার্থক কাব্যের অপমৃত্যু হয়।

কিন্তু কুমুদরঞ্জনের অধিকাংশ কবিতায় এ দু'টি জিনিসের সার্থক সমন্বয় হয় নি। বরং বলা যেতে পারে কাব্যের আঙ্গিক-সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ। মনের মধ্যে আবেগ এসেছে, দুনিবার আবেগ—কিন্তু 'যেন তেন' প্রকারে সেই আবেগ প্রকাশ করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা'র অপমৃত্যু হয়েছে। কুমুদরঞ্জনের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা যে তিনি সচেতন শিল্পী নন। Style সম্পর্কে একটু সজাগ থাকলে তাঁর অধিকাংশ কবিতা কি অপূর্বই না হ'তে পারত। আপন কবিতা সম্পর্কে এমন উদাসীন কবি আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। কবি তাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন: "কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জনতার দর্‌কার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি। নদীর বন্যা বা জোয়ার আসার মত কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে। আমি কবিতা গড়ি না। তারা রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মত ফোটে।"

আপন কবিতার উদাসীনতা সম্পর্কে কালিদাস রায় মহাশয়ও বলেছেন: "এই মানুষটি আকৈশোর কবিতা রচনা করিতেছেন—কিন্তু মান যশের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। লেখা শেষ

হইলেই যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। তারপর তাহা নকল করিয়া নির্বিচারে যে কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন; ভালোমন্দ বিচার করেন না, যত্ন করিয়া নকলও করেন না, সেজন্য ছাপায় ভুল হয়। এমন ভুল হয়—যাহাতে কবিতার রসের হানি হয়, তবুও তাহাতে কবির ভ্রূক্ষেপ নাই, রাগ নাই, ক্ষোভ নাই। আবেগের তাড়নায় যাহা কলমে আসিল তাহাই থাকিয়া গেল। দ্বিতীয়বার সংস্কার বা মাজাঘষা একেবারেই করেন না। ...কুমুদরঞ্জনের কবিতা দেবার্চনার মতো। নানা বনফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে—তারপরে সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না—সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয়-স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া লইয়া শিরে ধারণ করিল তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।"

কিন্তু এই সন্ধান না রাখাটা কবির কৃতিত্বের পরিচয় নয়। আবেগ তিনি অনুভব করেছেন কিন্তু তা'কে ধরে রাখতে পারেন নি। ধরে রাখার জন্যে যে সচেতন মন ও আঙ্গিকের প্রয়োজন তা' তাঁ'র ছিল না। আমাদের মনে রাখতে হবে আবেগ কাব্য নয়—তা'র রসসমৃদ্ধ প্রকাশই কাব্য। আত্মার জন্যে দেহ চাই। আত্মার সঞ্চারণ ভূমি না থাকলে তা' দুর্বল হ'তে বাধ্য। প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলেছেন: "কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা।...আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যত বেশি হোক না, অপরের কাছে তা'র যা-কিছু মূল্য, সে তা'র প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হ'লে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা' মুখরোচক হয় না।" কিন্তু এ বিষয় কুমুদরঞ্জন একেবারে উদাসীন ছিলেন। তাঁ'র অতিখ্যাত 'ছোটর দাবি' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কবিতাটির প্রথম দু'টি পংক্তি এই:

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চ'লে;
রেখা টেনে ছোটর গতি, বড় যে জল গাবিয়ে চলে।

॥ ছোটর দাবি ॥

কুমুদরঞ্জনের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এই কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে স্বীকার করি কিন্তু 'জল গাবিয়ে' কথাটি? এমন একটি অকুলীন শব্দকে যে কোনো কবি তাঁ'র কাব্যে ব্যবহার করতে পারেন তা' ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়। কোনো কবিতায় এরূপ একটি শব্দের ব্যবহার কেবল অসুন্দর নয়—সৌন্দর্য-হানিকর।

সোমনাথ-বিষয়ক অনেকগুলি কবিতায় কবির এ ব্যর্থতা বিশেষরূপে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। মন্দিরের বর্ণনায় বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করার পর কবি লিখছেন:

কি বর্ণনা দিয়ে যাব—আসে মনে দ্বিধা ও সংশয়
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতায় দেব কি ইহার পরিচয়।

সোমনাথের ঐশ্বর্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বার বার বিরাট, বিপুল মহান্ ইত্যাদি অনেক কথাই বলেছেন কিন্তু তা'র সুবিশালত্বের কোন কিছুই পাঠক-মানসে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন নি। সোমনাথের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন:

ঝঞ্ঝায় আমি শুনি, হই অস্থির,
ভাঙ্গার শব্দ সোমনাথ-মন্দির,
চিতোরী জহর ব্রতের গন্ধ পাই,
উড়ে ঝঞ্ঝার দগ্ধ পুঁথির ছাই,
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার আলেকজান্দ্রিয়ার।

এ কবিতায় রসের ব্যঞ্জনা আছে কি!

অনেক কবিতায় কবি যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা' বহুস্থলেই রসবোধের সহায়ক হয় নি। অজয়ের বালুচরের প্রশস্তি বর্ণনায় কবি হরিহরছত্র, কন্যাকুমারীর তীর্থমহিমা ইত্যাদির উল্লেখ করায়, পাড়াগাঁয়ের রাত্রির ঘন অন্ধকারের বর্ণনায় রাজসূয় যজ্ঞের উপমা দেওয়ায় কবিতার মহিমা তো বাড়েই নি—বরং ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ সকল উদাহরণে ঔচিত্যবোধের বড় অভাব। যেমন সাঁওতাল যুবতীকে তিনি 'কাদম্বরী'র সাথে তুলনা করেছেন:

স্বাধীন-সরল, কঠিন কোমল গিরির মধুকরী
বিশ্বকবির কাব্য সজীব 'বাণের' 'কাদম্বরী'।

॥ সাঁওতাল যুবতী ॥

জুঁইকে উদ্দেশ্য করে কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তিনি 'রামী'র সাথে তুলনা করে' লিখেছেন :

হরির কাছে আগিয়ে যে যাই তোরে যখন ছুঁই
অনুরাগের পাথের সাথী আমার 'রামী' তুই।

॥ জুঁই ॥

'ভুঁইচাঁপা'কে বরুণরাণী এবং শকুন্তলার সাথে তুলনা করে' কবি অনৈচিত্য বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই অনৈচিত্য বোধের আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি :

ফায়ার-ব্রিগেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে ডিঙি, তাহারা ক্রুজার।

অথবা :

কোথাও গো-গাড়ী আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে চলছে,
টোঙ্গা একা পাল্কী ছক্কা লক্কার মত টলছে।
ছুটেছে অশ্ব দুষ্ট,
উষ্ট্রের দল পুষ্ট,
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি' দাপটে ভূমিরা দলছে।

এ সকল কবিতা পড়ে মনে হয় কবি যত বড় রূপদক্ষ তত বড় রূপশিল্পী নন। তাঁ'র ভাব আছে, ভাষা নেই। রূপ আছে কিন্তু রস নেই। আত্মার পরশ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু দেহকঙ্কাল মাত্র। তাঁ'র সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। কীট্‌স্‌ যাকে fine excess বলেছেন কুমুদরঞ্জনের কাব্যে তা'র বড় একটা সাক্ষাৎ মেলে না।

কাব্য সমাজ-জীবনের দর্পণ—mirror। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাব্য? এই যুগচেতনার অভাবই কবির আর একটি বড় ত্রুটি। সম্মুখে

যে কষ্টের সংসার তা'র কোন চিহ্ন পড়ে নি তাঁ'র কাব্যে। সংসারের দারিদ্র্য দুঃখ হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনার জগতে আপনি গান গেয়েছেন। যুগসমস্যা হ'তে পলায়নপর মনোবৃত্তি কোনক্রমেই প্রশংসার নয় এবং এ জন্যে অনেকেই কবিকে বলেছেন Idle singer.

॥ নয় ॥

তা' হ'লে প্রশ্ন জাগে কুমুদরঞ্জনের কবিতা কি ব্যর্থ? স্বীকার করি তিনি Idle singer, স্বীকার করি তাঁ'র কাব্যে যুগচেতনার বড় অভাব, স্বীকার করি তাঁ'র কাব্য-রীতি সুকর্ষিত নয়, কিন্তু তা'ই বলে কি তাঁ'র অসংখ্য কবিতার মধ্যে fine excess-এর এলাকায় যাওয়ার মত একটি কবিতাও নেই? তাঁ'র কোন কবিতার আত্মা ও দেহ বলিষ্ঠ নয়? রূপ ও রসের সার্থক সমন্বয় হয় নি? বক্তব্য এবং বলা রসোত্তীর্ণ হয় নি? সাধ এবং সাধ্য সার্থক নয়?
সার্থক কবিতার বহু উদাহরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি। এ প্রসঙ্গে 'মায়ার বাঁধন', 'নৌকাপথে,' 'প্রতীক্ষায়' ইত্যাদি কবিতাগুলিকে স্মরণ করতে বলি। কবির ছন্দের উৎকর্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিই :

আয় রে অলি, আয়রে অলি,
মনের বনের চৌদিকে মোর ফুটলো কলি, ফুটলো কলি।
আয় রে মধুর গুনগুনিয়া
সারঙ-সুরের জাল বুনিয়া,
নিমন্ত্রণ আজ করছে তোরে সুসজ্জিত বনস্থলী।
॥ অলির নিমন্ত্রণ ॥

এ কবিতাটিকে ছন্দ-যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের বলতে অস্বীকার করবে কে? নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির বলিষ্ঠ কাব্য-দেহ ও শব্দ-সংযোজনা

লক্ষ্য করুন—ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও ছন্দভংগীর হিল্লোল কি অপূর্ব সৌকুমার্যই না লাভ করেছে :

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল,
তরুর ছায়াগুলি ভাঙিয়ে অবিরল।
লহরী সনে চলি
পড়িছে 'কাঁপাত'ল'
সরমে মুখ চাপি হাসিছে শতদল,
নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল।

কুমুদরঞ্জনকে প্রাচীন এবং গ্রাম্য বলে অপাংক্তেয় করার পিছনে উন্নাসিকতা ছাড়া অন্য কোন সংগত কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যা'কে 'শাশ্বত আধুনিক' বলেছেন কুমুদরঞ্জনের কাব্য তা'ই। কুমুদরঞ্জনের কাব্য শাশ্বত আধুনিক, জানি এ মন্তব্যে অনেকেই রুষ্ট হবেন। জানি প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার ক'রে বলবেন, কুমুদরঞ্জনের কবিতাও যদি আধুনিক হ'ল তা' হ'লে অ-আধুনিক কবি কে? কিন্তু আধুনিকতার সংজ্ঞা কি ঠিক আছে? তা'র সঠিক মাপকাঠি কি? মহাকালের পদসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আধুনিকতার সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে যুগে যুগে। আজ যা' আধুনিক কাল তা প্রাচীন। বঙ্কিমযুগে তাঁ'র উপন্যাসকে আধুনিক বলেন নি এমন পাঠক কেউ ছিলেন কি? অথচ সেই বঙ্কিম আজ নিতান্ত 'সেকেলে'। শরৎচন্দ্রের যুগে নিখিল বাংলার লক্ষ কোটি ভক্ত পূজারী তাঁ'কে সগর্বে আধুনিকের কোঠায় ফেলেছিলেন —অথচ আজ তাঁ'কে ঠিক আধুনিক বলতে মন সায় দেয় না। তারাশঙ্কর সম্পর্কেও ঐ এক কথা। তাঁ'র জীবিতাবস্থাতেই তিনি অতীতচারী রোম্যান্টিকতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন। কাব্যে মুকুন্দ-রামকে আধুনিক বলেন নি কে? মোহিতলাল-যতীন সেনগুপ্তের পথে যখন সাহিত্যাঙ্গনে নজরুলের সাড়ম্বর আবির্ভাব হ'ল তখন তো আমরা তাঁ'কে অতি আধুনিকের কোঠায় ফেলেছিলাম—সেই নজরুল আজ প্রেমেন-বুদ্ধদেব-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সেকেলে না হ'লেও ঠিক আধুনিক নন। যে বঙ্কিম-শরৎ-নজরুলকে আমরা

সেকেলের কোঠায় ফেলতে চাই তাঁদেরই উপন্যাস-কাব্য পাঠকালে দেখা যায় 'ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার ব্যাকুলিয়াছে বুকের কাছে।' কিন্তু অতি আধুনিকদের কাব্য-উপন্যাস পড়ে তো এরূপ আবেগ অনুভব করা যায় না। তা' হ'লে? আসলে আধুনিকতার কোন সঠিক মাপকাঠি নেই। আমাদের মতে যে কাব্য পাঠে অনন্ত অতীত হ'তে সুদূর ভবিষ্যতের সকল পাঠক সমান ভাবে আকৃষ্ট হবে তা'ই আধুনিক। তা'ই কুমুদরঞ্জনও আধুনিক। বর্তমানের মোহ-সর্বস্ব আধুনিকতার ঝাঁজ মরে এলে কুমুদরঞ্জন আমাদের কাছে না হোক পুত্র-পৌত্রদের কাছে আধুনিক হ'য়ে দেখা দেবেন।

বর্তমানের যুগটাই জোরাল কণ্ঠ আর ঢাকের যুগ। চিৎকার যাঁ'র যত বেশি তাঁ'রই বাজিমাত। এখন সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের বাজার। বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে দেখছি বিজ্ঞাপনের সাড়ম্বর ঘোষণায় যে বই-ই প্রকাশিত হচ্ছে তা'ই আধুনিক, বাংলার সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ এবং অপূর্ব সংযোজনা। কিছুদিন পরে শুনব অমুক পুস্তকে শততম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং মূল্য পঞ্চাশ টাকা আর এক ঘণ্টায় এক লক্ষ কপি নিঃশেষ হ'য়ে দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে। এই দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের যুগে সবই সম্ভব। কাঞ্চন আছে—আড়ম্বরের অভাব কি? যুগটাই দর্প অহংকার আর মিথ্যার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখন এই ঢাক-ঢোলের পাশে একতারার ক্ষীণ সুরালাপন শোনা যাবে না—কিন্তু বলেছিই তো এই ঝাঁজ-সর্বস্ব উত্তেজনার মরসুম পার হ'লেই কুমুদরঞ্জনের চিরন্তন কাব্য-সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করবে। জানি এই অবিশ্বাসের যুগে বিনয়-নম্র প্রণামের কোনই মূল্য নেই, হৃদয় বিমোহিত একবিন্দু অশ্রুজল নিতান্ত উপহাস্য—কিন্তু মিথ্যার এই বেসাতি চলতে পারে না। যুগমানসের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুঝি তা'র সূচনাও হয়েছে। নইলে আমিই বা এমনটি বলার সাহস পেলাম কোথায়?

তাই বলি আজকের বনবাসী রামচন্দ্র একদিন তাঁ'র হারান সিংহাসন ফিরে পাবেনই। আমরা সেই শুভদিনের আশায় দিন গুনছি।

# ॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

## ॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক প্রবন্ধকারগণের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর রচনা তীক্ষ্ণধার, দীপ্তোজ্জ্বল এবং বলিষ্ঠ। বক্তব্য নয়, বলার রীতিই তাঁ'র প্রবন্ধের প্রাণসম্পদ। অনমনীয় ইস্পাত-কঠিন গদ্যরীতিতে তিনি যা' প্রকাশ করেছেন তা' যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি দৃঢ়-পিনদ্ধ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রবণতা তাঁ'র রচনার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। "Style is the man himself"—এ কথা প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে সত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার বক্তব্য এবং বলা দুই-ই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। তিনি যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন বক্তব্যই সেখানে উচ্চ শির হওয়ার কথা, তথাপি বলার গুণে সেই দুরূহ তথ্য ও তত্ত্ব কথা সরস হ'য়ে উঠেছে। বক্তব্য এবং বলা দুই-ই সমান্তরাল সরলরেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর রচনার মত রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা যদিও তীক্ষ্ণধার হ'য়ে ওঠে নি তথাপি তাঁ'র রচনা মর্ম্মস্পর্শী। প্রমথ চৌধুরীর রচনা অতি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণধার হওয়ায় অধিকাংশ সময়ে কর্কশ মনে হয় কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় সর্বত্র একটি মসৃণ কমনীয়তা বিরাজমান। এতে রচনার লাবণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ রচনা সৃষ্টিধর্মী। মৌলিক চিন্তাধারার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে প্রবন্ধগুলি অনন্তসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। বক্তব্য এবং বলার রীতি উভয়ের মাঝে একটি সহজ মনোরম অদ্বৈত সম্বন্ধ আছে। তাঁ'র বক্তব্য প্রদীপ্ত এবং প্রাণবন্ত। বলার রীতি সহজ এবং সাবলীল। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা বলেন্দ্রনাথের মত সৃষ্টিধর্মী

নয়—প্রধানতঃ সংকলনধর্মী। প্রখ্যাত মনীষীদের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে তিনি আপনার মত করে' সংকলন করেছেন। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তাধারার যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ আছে তা' রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে প্রধান হ'য়ে না উঠলেও মাঝে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সেই গুণেই তাঁ'র প্রায় রচনা মৌলিক সৃষ্টির প্রান্তসীমা-স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে।

প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর বহু পথেই পদচারণা করেছেন। বহুবিধ উপাদানকে তিনি প্রবন্ধ রচনার বিষয়ীভূত করেছেন। তাঁ'র প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—১॥ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ২॥ বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ ৩॥ সৌন্দর্য তত্ত্ব এবং ৪॥ সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। সকল প্রকার লেখার মধ্যে প্রবন্ধের গুণগুলি বর্তমান। তথ্য-তত্ত্ব ধ্যান-ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুণাবলী তাঁ'র প্রবন্ধগুলিকে আদর্শস্থানীয় করে' তুলেছে। কিন্তু তাঁ'র রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যের এই মৌলিক গুণাবলীর অতিরিক্ত আছে এক সাহিত্যিক আমেজ এবং এই সাহিত্যস্পর্শেই তাঁ'র তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলিও লাবণ্য-শ্রীতে অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে লেখক আপন মনের মাধুরীর এমন সঞ্জীবনস্পর্শ রেখে গেছেন যে প্রবন্ধগুলি আপাতঃ রূঢ়তার খোলস ত্যাগ করে' সজীব হ'য়ে উঠেছে। দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে সাহিত্যিক গুণের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধের প্রধান গুণ বিষয়-বক্তব্যের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি সে সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল গীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শন শাস্ত্র বা রসায়ন শাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।" বিজ্ঞান এবং

দর্শনের নীরস তথ্য ও তত্ত্বগুলি যথাযথ পরিবেশন করলে যে তা' প্রবন্ধ হ'য়ে উঠবে না তা' ত্রিবেদী মহাশয় ভালভাবেই জানতেন এবং সেই জন্মেই তাঁ'র প্রবন্ধের সর্বত্রই তথ্য ও তত্ত্বের অতিরিক্ত সৌন্দর্য-সুষম-স্পর্শ ফুটে উঠেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ রচনার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'লো তিনি সুগভীর তত্ত্বকথা এবং বিষয়-ভারাক্রান্ত জিনিসগুলিকে সৃষ্টির আবেগে সহজ, সরল ও সুন্দর করে' প্রকাশ করতে পারতেন। পণ্ডিতের মত তিনি জটিল বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্যের আর এক পোঁচ তুলি টেনে জটিলতর করে' তোলেন নি। দুরূহ সকল বিষয়কে তিনি সর্বপ্রথম আপনার হৃদয়-মূলে গ্রহণ করতেন তারপর আপনার জারক রসে জরিয়ে বিষয়ের সকল জটিলতম গ্রন্থি উন্মোচিত করে' একান্তভাবে আপনার মত করে' নিয়ে তবে প্রকাশ করতেন। ফলে তাঁ'র বক্তব্যের মধ্যে একটি সরল এবং সহজ প্রাণস্পর্শ মিশে থাকতো—বস্তুতঃ তাঁ'র বক্তব্য হ'লো আপনার হৃদয়ের কথাকে আপনার মত করে' বলা।

দুরূহ এবং কঠিন বিষয়ের অবতারণের পূর্বে তিনি পরিবেশটাকে অত্যন্ত সহজ এবং আকর্ষণীয় করে' নিতেন। কেননা তিনি জানতেন গম্ভীর বিষয়কে যদি আরও একটু গম্ভীরভাবে উপস্থিত করা যায় তা' হ'লে পাঠক আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তা'কে গম্ভীর-ভাবেই এড়িয়ে যাবে। ফলে প্রথমেই তিনি পরিবেশটাকে এমন সহজ ও আকর্ষণীয় করে' তুলতেন যে পাঠক হাসিমুখেই সেই দুর্গম পথে পদচারণার জন্মে এগিয়ে আসতো। 'মুক্তি' (salvation) একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ। লেখক সমগ্র পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্যের ধর্মজগৎকে মন্থন করে' তা'র সারতম অংশ দিয়েই গড়েছেন 'মুক্তি' প্রবন্ধ। কিন্তু সেই দুর্গম গবেষণারণ্যে প্রবেশপথটি তিনি কী সুন্দরভাবেই না আলোকোজ্জ্বল করে' তুলেছেন। প্রবন্ধটির সর্বপ্রথম পরিচ্ছেদ এই: "ডাক্তার জ্বর পরীক্ষার পর রোগীকে কুইনীন ব্যবস্থা করিলেন; বলিলেন,

তোমার কুইনীন সেবন কর্তব্য। এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনীন সেবন মানুষের কর্তৃব্য নহে, পরোপকারই মানুষের কর্তব্য, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, রোগীর কোন উপকার হয় না।"

এই মন্তব্যে পরিবেশ যে কত তরল হ'তে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। এই পরিবেশ তারল্যকৃতের মধ্যে আর একটি জিনিস লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে—তা' বিশুদ্ধ হাস্যরস। বস্তুতঃপক্ষে এই হাস্য-রস সৃষ্টিও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রায় প্রবন্ধের কঠিন ভূমি হাস্যরসের অনাবিল স্রোতে সরস হ'য়ে উঠেছে। 'প্রলয়' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যখন তিনি বলেন : "বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই পৃথিবী এক সময় উলটিয়া যাইবে। সেদিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কিনা স্মরণ নাই। মনের ভিতরে প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালায় একটি প্রাচীনতর বন্ধু আশ্বাস দেন পৃথিবী উলটাইবে সন্দেহ নাই, তবে এখনো তাহাতে লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে। এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উলটান অপেক্ষাও পণ্ডিত মহাশয়ের বর্তমান সামীপ্য অধিক উদ্বেগের কারণ নির্ধারিত করিয়াছিলাম—" তখন আমরা না হেসে থাকতে পারি নে। এমনি ভাবে তিনি প্রবন্ধের বহুস্থানেই আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে হাসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান।

রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক প্রবন্ধের মধ্যে একটি 'ব্যক্তি-স্পর্শ' লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ প্রবন্ধে এমন একটি স্বভাবানুগ মনোহর স্পর্শ আছে যা' রামেন্দ্রসুন্দরকে বাংলার অসংখ্য প্রবন্ধ লেখক হ'তে স্বতন্ত্র করে' রেখেছে।

ঘরোয়া ভাবে কথোপকথনের একটি ভাব ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিকে একান্ত সরসতা দান করেছে। বৈঠকী আলোচনার মত তিনি লঘুচালে কথা বলে গেছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলে

শ্রোতাদের নিকট হ'তে উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতে সমগ্র প্রবন্ধটি বলিষ্ঠ ঋজুতায় সহজ সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

অসংখ্য উপমা প্রয়োগেই বোধ হয় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রবন্ধাবলীতে যখনই তিনি কোন দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করেছেন সাথে সাথেই তিনি দিয়েছেন অসংখ্য উপমা দৃষ্টান্ত। ফলে বিষয়টির কাঠিন্য অধিকাংশে হ্রাস পেয়েছে। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটিতে যেন দৃষ্টান্ত উপমার শ্রীক্ষেত্র রচিত হয়েছে। এই উপমা প্রয়োগে বক্তব্য বিষয়ের কোন অঙ্গহানি তো ঘটেই নি বরং সৌন্দর্য-সম্ভারে ও সরলতার মাধুর্যে অধিকতর প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই উপমা প্রয়োগের সার্থকতম সব্যসাচী। এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগের মধ্যেও যে রামেন্দ্র-সুন্দরের মৌলিক সাহিত্যিক মনের পরিচয় মিশে রয়েছে সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্তের মন্তব্য স্মরণযোগ্য ঃ "এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা প্রয়োগের ভিতরেও রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ; এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা তিনি প্রায়শই গ্রহণ করিতেন প্রাচীন ভারতীয় নানাবিধ শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে ; ফলে তাঁহার লেখার বিষয়বস্তুতেই শুধু নয়, লেখার রীতিতেও একটি ভারতীয় গন্ধ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা পড়িলে বেশ বুঝা যাইত, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার একটি নিবিড় পরিচয় ছিল এবং সেই নিবিড় পরিচয় তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়াছিল।"

প্রচুর বক্রোক্তি-ব্যবহার রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁ'র বাক্-তীর্যক ভাষণের অন্তরাল হ'তে একটি বিদ্রূপাত্মক মনোভাব শাণিত হাসির মত ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। এই হাসির স্মিতালোকে প্রবন্ধের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিপথ সহসা আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে আমরা ব্যঙ্গ-বক্রোক্তির প্রচুর নিদর্শন পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের বহুতর প্রবন্ধ এই তো বক্রোক্তির প্রাণোচ্ছল রূপায়ণ।

আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে প্রধানতঃ সংকলনধর্মী বলেছি—

কিন্তু মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভাও তাঁ'র ছিল। সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁ'র ধ্যান চিন্তাগুলি একান্তভাবেই মৌলিক। তা'র বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্যটিও মৌলিক সৃষ্টিধর্মী। এখানে কেবল কতকগুলি ঘটনা ও তথ্যকে বা'র হ'তে জুড়ে দেওয়া হয় নি—অন্তরের অসীম অনুরাগে তা' অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। মহাকাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধীয় লেখাটি আজিও আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে বিমণ্ডিত করে' দেয়।

প্রকৃতপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন সার্থক প্রবন্ধ-শিল্পী। তা'র প্রবন্ধ যে একেবারে ত্রুটিশূন্য তা' নয়—তথ্যের ভারে ও তত্ত্বের চাপে মাঝে মাঝে পীড়িত হ'য়ে উঠেছে, বর্ণনা এবং প্রকাশভংগীও কোন কোন সময় নীরস মনে হয়—কিন্তু তিনি যে দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তা'তে এই ত্রুটিগুলি একান্তভাবেই গৌণ। তিনি সুকৌশলী শিল্পীর মত, সুনিপুণ পথ-প্রদর্শকের মত পাঠককে ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়েছেন তত্ত্বের গহনতম প্রদেশে আবার সেখান হ'তে বা'র করে' নিয়ে এসেছেন মুক্ত আলো বাতাসে। শিল্পী হিসাবে বোধ হয় রামেন্দ্রসুন্দরের চরম সার্থকতা এখানেই।

॥ দুই ॥

'জিজ্ঞাসা'র প্রথমেই লেখক পিতৃদেবের চরণে মুগ্ধমনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন: "জীবনদাতা, পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্তিভেদ।" জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে এত বড় প্রিয় সত্য-ভাষণ বোধ হয় আর কোথাও নেই। গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রশ্নচঞ্চল মনের কত শত ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই না আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনটি দর্শনের, কোনটি বিজ্ঞানের, কোনটি রসায়নের, কোনটি পদার্থের, কোনটি জ্যোতিষের, কোনটি সাহিত্যের, কোনটি সমাজের আবার কোন প্রশ্ন বা রাষ্ট্রের মূল সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সত্যই "জিজ্ঞাসা" গ্রন্থ অনন্ত জিজ্ঞাসার বিচিত্র এ্যালবাম। সত্যকে জানার জন্য, অজানার আবরণ উন্মোচনের চেষ্টায় কত না অসীম জিজ্ঞাসা মনীষী

ত্রিবেদীর মনে উদ্বেল হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ সেই অনন্ত জিজ্ঞাসারই বিচিত্র সংযোজনা।

গ্রন্থে সংযোজিত প্রবন্ধগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিনিষ্ঠ মন বিনা যুক্তিতে কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নির্ভেজাল সত্য বলে গ্রহণ করে নি। সব তথ্য, সব তত্ত্বকেই তিনি যুক্তির বেড়াজালে ফেলেছেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেছেন সব সত্য সেই জালের আয়ত্তাধীন কিনা। তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে তাঁ'র চেষ্টার সীমা নেই। সংগ্রহ তিনি করেছেন অনেক কিন্তু সব কিছুর সত্যতা সম্পর্কে তাঁ'র মনে সংশয়ও জেগেছে অনন্ত। কেননা অনেক প্রতিষ্ঠিত তথ্যই যেন ধোপে টেকে না। জিজ্ঞাসা গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির দু'চারটি আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব তাঁ'র জিজ্ঞাসা কত অনন্ত এবং সেই জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর সংগ্রহের জন্যে তাঁ'র কী অসীম ব্যাকুলতা।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে বা দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি অস্বীকার যেমন করেন নি তেমনি সব সত্য বা তত্ত্বকে মেনে নিতেও পারেন নি। দু-একটি জায়গা ছাড়া অবশ্য তিনি কোথাও নতুন তত্ত্বের বা তথ্যের সন্ধান দেন নি।

বিজ্ঞানের তথ্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'য়ে তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকটি সত্যের অবতারণা করে' তা'র বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানের মূল সত্য সমগ্রভাবে পদার্থের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। পদার্থের ধ্বংস নেই, শুধু পরিবর্তন ঘটতে পারে মাত্র। ত্রিবেদী মহাশয় বিজ্ঞানের এই সত্যে উপনীত হয়েছেন পদার্থ সম্পর্কে তাঁ'র প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে। যেহেতু আজ পর্যন্ত পদার্থের ধ্বংস দৃষ্টি-গোচর হয় নি সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে পদার্থের ধ্বংস নেই। অতএব এই তথ্যকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু প্রবন্ধকারের মন্তব্য এই যে তা' হ'লে এ সত্য মানুষের ধারণার অপেক্ষা রাখে। অতএব এ সত্য আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু কাল অনন্ত, সেই অনন্ত কালের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না

বা মানুষের ধারণাশক্তি প্রসারিত হবে না এমন কথা কে বলতে পারে। অনেক সত্যের ক্ষেত্রেই তো দেখা গিয়েছে মানুষের জ্ঞান প্রসারের সাথে পূর্বতন সত্যের দৃঢ় ভিত্তিও শিথিল হয়েছে। জড় পদার্থের ধ্বংস নেই—ইলেক্ট্রন আবিষ্কারের পর এই মূল সত্যের ভিত্তিও যেন অনেকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। অতএব কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে ধ্রুব সত্য বলে ধারণা করা যায় কেমন করে'? সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যা'কে আমরা সত্য বলে মনে করছি তা' হয়তো আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

বিজ্ঞানের আর একটি সত্য এই যে প্রকৃতিতে মিরাকল্ বলে কিছু নেই। প্রকৃতির খেয়াল বলে কিছু নেই, সব কিছুরই মধ্যে আছে একটি চিরন্তন নিয়ম, যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মিরাকল্ বা অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মেরব্যভিচারী বা বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সুতরাং কোন্‌টি প্রকৃতির নিয়ম আর কোন্‌টি নিয়ম নয় তার স্থিরতা কি! ফলে কোন ঘটনা সাধারণতঃ অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'লেও তা' অপ্রাকৃত নাও হ'তে পারে বা আজ যা'কে অপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছে, জ্ঞানের প্রসারণের ফলে কাল তা'কে প্রাকৃত বলেই মনে হ'তে পারে। হাজার হাজার বৎসর ধরে একই নিয়ম চলতে দেখে আমাদের মনে কতকগুলি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে এই নিয়মগুলি চিরন্তন সত্য। মাধ্যাকর্ষণ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি বিষয়গুলির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এতে দেখা গিয়েছে এই অতি বিশ্বাস অনেক সময় মানুষের সর্বনাশ সাধন করেছে। মানুষ তা'র এই অতি বিশ্বাসের ফলে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির পাদদেশে বসবাস শুরু করল, কিন্তু একদিন দেখা গেল হঠাৎ আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্‌গার করে' মানুষের অতি বিশ্বাসের অনুচিত সাহসের প্রতিফল দিয়েছে। তাই সূর্য আজ যে নিয়মে চলছে কালও যে এই নিয়মে চলবে শতবর্ষ পরেও যে এই নিয়ম ঠিক থাকবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? জগদ্‌যন্ত্রের গতির পর্যালোচনা করে' এই সকল সত্যের

আবিষ্কার করতে হয়। ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল প্রাকৃতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে এই সকল সত্যের মূর্তিও তেমনি পরিবর্তিত হয়। চিরকাল এক মূর্তি থাকে না। সকল অলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধেও লেখকের মনে জেগেছে বিরাট জিজ্ঞাসা। গ্রহগুলি মহাকাশে অবিরাম নিশ্চিন্তে আপন আপন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেন? কিসের বলে? এ সম্পর্কে সুদূর অতীত কাল হ'তে অনেকে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। কোপার্নিকাসের সময় পর্যন্ত মানুষ জানত পৃথিবী ঘোরে না সূর্যই ঘোরে। কোপলার দেখালেন সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে এবং উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। গ্রহসমূহ নিজ নিজ দূরত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সূর্যকে আবর্তন করে। কিন্তু তা'রা ঘোরে কেন এ প্রশ্নের সদুত্তর কোপলার দিতে পারেন নি। কোপলারের পর দেকার্তে বললেন সূর্যমণ্ডলকে ও সৌরজগৎকে ঘিরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে, গ্রহগুলি সেই ঝড়ের অভিমুখে ভেসে চলেছে। এই ঝড় যতদিন না থেমে যাবে ততদিন গ্রহগুলি আপন আপন পথে ঘুরবে। পরে নিউটন এলেন নতুন পথের সন্ধান নিয়ে। তিনি দেখালেন পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি আছে বলেই তা'রা ঘুরে। এই আকর্ষণের বলের একটা আঙ্কিক পরিমাণও তিনি স্থির করলেন। গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে' ঘুরে কেন? সূর্য অভিমুখে বল আছে বলে। কয়েক শত বৎসর পূর্বেও এই গতি বলের মধ্যে কোন নিয়ম থাকতে পারে তা' তো আমাদের জানা ছিল না। নিউটন জানালেন। নিউটন দেখিয়েছেন আপেল ফল যে নিয়মে নীচে পড়ে—গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড সেই নিয়ম অনুসারেই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এর পরেও 'কেন' আছে। গ্রহ-উপগ্রহ-চন্দ্র-পৃথিবী-সূর্য সকলেই একটা নিয়মের বশবর্তী হ'য়ে চলে মাত্র, কিন্তু কেন চলে সে প্রশ্নের তো জবাব

মেলে না। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে লেখক এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা কতকগুলি উপমা প্রয়োগের দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এইরূপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ পদার্থ বিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তি পান নি। তা'ই শেষ পর্যন্ত তিনি 'বিজ্ঞানে পুতুল পূজা' দিয়ে তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের, বিরাট জিজ্ঞাসার যবনিকা টেনেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন: "কল্পিত বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ বা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক একটি পুতুলের এক একটি মূর্তি দিয়াছি। বিজ্ঞান বিদ্যা মানুষের মনগড়া মূর্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই, কেননা যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান, প্রকৃতি সংকীর্ণভাবে—মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকে উল্লিখিত সংকীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।"

উপরের বিভিন্ন আলোচনায় আমরা দেখলাম বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যের উপর লেখকের ঠিক যেন আস্থা নেই—গোপন প্রাণের কোথায় যেন একটু সংশয় দেখা দিয়েছে। তবু লক্ষণীয় বিষয় এ সংশয় কোথায়ও মিথ্যার দিগন্ত স্পর্শ করে নি। সুতরাং খাঁটি অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পূর্ণ সংশয়বাদী বলা চলে না। দার্শনিক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর একজন ভাববাদী। দার্শনিক তথ্যানুসন্ধানেও তাঁ'র আগ্রহের সীমা নেই, জানবার ইচ্ছা সেখানেও প্রবল। কিন্তু জিজ্ঞাসা সেখানেও আছে, রামেন্দ্রসুন্দরের অনু-সন্ধিৎসু মন সেখানেও হাজার প্রশ্ন তুলেছে। সুখ বেশি না দুঃখ বেশি এ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে লেখক বিভিন্ন পন্থীদের মতামতের

মধ্যে উত্তর হাতড়িয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক কা'রও মতের দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি বলে মনে হয়। এক এক পক্ষের ঝোঁক এক একদিকে। সুখ বেশি এই মতবাদ যাঁ'রা পোষণ করেন তাঁ'দের মতে সুখ বেশি বলেই মানুষ এখনও টিকে আছে এবং জীবনের উপর তা'র মোহ আছে। দুঃখ বেশি হ'লে দুনিয়ায় আত্মঘাতীর সংখ্যা বেশি হ'তো। দুঃখবাদীদের মতে দুঃখই বেশি—সুখ নেই বললেই হয়। বাঁচবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নয় এ ইচ্ছা দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতির ইচ্ছা; তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। আমাদের দেশে দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। দুঃখ হ'তে মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ করতে গিয়েই বৌদ্ধধর্মের জন্ম। ভারতীয়দের মতে ভোগে সুখ নেই, আছে দুঃখ। ত্যাগেই সুখ অর্থাৎ দুঃখকে সহ্য করাই সুখ। বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা—সুখের প্রলোভন দেখিয়ে সে দুঃখেরই পথে মানুষকে নিরন্তর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুখ বড় না দুঃখ বড় লোকের এই প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নের সমাধান ঠিক হ'ল না, তবে মনে হয় দুঃখের দিকেই লেখকের ঝোঁক বেশি।

জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধেও লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য, অন্য সম্প্রদায়ের মতে এটা কাল্পনিক। উভয় মতই নিরীহ মানুষকে নিয়ে টানাটানি করছে। জগৎ যদি থাকে তা'র স্বরূপ কি? এ প্রশ্ন নিয়ে তর্কই চলেছে কিন্তু মীমাংসা হয় নি। জগৎকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি অংশ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমি, দ্বিতীয়তঃ আমা ছাড়া অর্থাৎ আমা ছাড়া আর যা' কিছু আছে। আমার অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই, তা' হ'লে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তারপর আমা ছাড়া জগৎকে নিয়ে গণ্ডগোল। বহির্জগৎকে স্বীকার করে' নিলেও বলতে হয় এর খানিকটা প্রত্যক্ষগোচর খানিকটা অনুমানগোচর।

জড়জগৎ যে সদ্বস্তু নয় সে সম্পর্কে প্রাচী ও প্রতীচীর সকল জ্ঞানিগণই একমত। তবে দৃশ্যমান মায়াপটের অন্তরালে যে একটা সৎপদার্থ আছে তা' যেন বুঝা যায়, তা' অজ্ঞেয় অব্যক্ত। এরূপ দার্শনিক মত দ্বৈতবাদ। সদ্বস্তু দুই—উভয়ই অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয়—একের নাম পুরুষ বা আত্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম প্রকৃতি বা জ্ঞেয়। কিন্তু এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। বেদ বলে 'ব্রহ্ম'ই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। কিন্তু এর স্বরূপ কি? এই আনন্দ স্বরূপের প্রকাশ কিসে এ প্রশ্নের সমাধান হয় নি। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যেন কিছু দিশাহারা হ'য়ে পড়েছেন। সেখানে ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধেও যেন সন্দেহ জেগেছে। তাঁ'র ইচ্ছাতেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু তিনি তো সৌন্দর্যময় তবে জগতে এত কুৎসিতের স্থান হ'লো কেমন করে'? তিনি তো করুণাময় তবে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি তো ন্যায়বান তবে দুর্বলের উপর এত পীড়ন কেন? অনেকেই বলেন শয়তানের কারসাজিতে এইরূপ হয়। তা' হ'লে বুঝতে হবে তিনি সর্বশক্তিমান নন। এর উত্তরে অনেকে বলেন সুন্দর, করুণা, ন্যায় প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্যই অসুন্দর, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নানা মতের অবতারণা করেছেন, বহু যুক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছেন, বিনা যুক্তিতে কিছু তিনি স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু বহু যুক্তিতেও প্রশ্নের মীমাংসা কতটা হয়েছে বলা শক্ত। 'এক না দুই' প্রবন্ধে ব্রহ্ম ও জীবের দ্বয়ত্ব বা অদ্বয়ত্ব আলোচিত হয়েছে। অনেক যুক্তি তর্কের পরে লেখক যেন অদ্বয়ত্বকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সংশয়—আমি কে? এর উত্তর আর পাওয়া যায় নি।

এইরূপ দর্শনের সুবিশাল ক্ষেত্রে সর্বত্রই লেখক যুক্তিবাদী মন নিয়ে পদচারণা করেছেন। মুক্তিতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব কিছুই বাদ যায় নি। সব কিছুই জানবার ইচ্ছা যেন লেখককে প্রবলভাবে

গ্রাস করেছে। তাই দেখি—লেখকের জ্ঞান-পিপাসা বা জিজ্ঞাসা অনন্তের দিগন্তাভিসারী। দেশী, বিদেশী, জ্যোতিষতত্ত্ব দর্শনতত্ত্ব, বিজ্ঞান—কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। সব কিছুরই সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পিপাসা যেন তাঁ'র মেটে নি। তত্ত্ব ও তথ্যকে স্বীকার করেও সর্বত্র—তাঁ'র সংশয় রয়ে গিয়েছে—পূর্ণ সমাধান—যেন মেলে নি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছেন—সেখানে প্রকৃতির নির্বাচনতত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্বের আমদানি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন ডারউইনের মতবাদ দিয়ে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, মনই সেখানে সব, অনুভূতিই প্রধান।

এমনি ভাবে আমরা দেখতে পাই সর্বত্রই লেখকের যুক্তিবাদী মনের প্রশ্নচঞ্চল সঞ্চারণ। জানার আবেগে তিনি যেন অণুপরমাণুর বুকে বুকে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্বের গ্রন্থশালার গ্রন্থরাশি পড়ে শেষ করে' ফেলেছেন—তবুও প্রশ্নের সমাধান হয় নি—জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে নি। মরুগ্রাসী পিপাসায় অনন্ত জিজ্ঞাসা বেড়েই গিয়েছে। তাই গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে যে বাণী-শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন জিজ্ঞাসা গ্রন্থ সম্পর্কে তা' পূর্ণ সত্য।

# ॥ বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ॥

## ॥ এক ॥

মানবশিশুকে ঘিরে কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি বিরাজমান। এই সহজাত বৃত্তিগুলির একটি প্রধান বৃত্তি হ'লো অনুকরণপ্রিয়তা। মানুষের এই চিরন্তন সহজাত অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই যাত্রার উদ্ভব। যার পরিণতি নাটকে।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম সমাজে মানুষ নৃত্যগীতের উদ্বোধনে লোকধর্ম পালন করতো। অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে সম্মিলিত নরনারী নাচগানের মাধ্যমে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে করতে একস্থান হ'তে অন্য স্থানে গমন করতো। যাত্রা শব্দটির মূল উৎস এইখানেই—এই স্থানান্তর গমনের মধ্যে। কিন্তু কালক্রমে যাত্রা অর্থে স্থানান্তরে গমন কথাটি আর অপরিহার্য রূপে রইল না—একই স্থানে বসে লীলাভিনয়ের মধ্যে তা' সীমিত হ'লো।

স্মরণাতীত অতীতে, বৈদিকযুগে দেবতার সম্মুখে যে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল তা'র বহু প্রমাণ অতীত যবনিকার অন্তরাল হ'তে আমাদের সামনে এসেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্তভাবে তা'র নজির ছড়ানো আছে। যজ্ঞস্থলে সমবেত নরনারীর পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ বিধানের জন্য যে বংশদণ্ডসহ নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল সে কথা ঋগ্বেদের মধ্যেই বিঘোষিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগেও দেবতার স্নান-পর্ব ইত্যাদি উপলক্ষে অনুরূপ নৃত্যগীতের আনন্দানুষ্ঠান হ'তো। বৌদ্ধযুগে রথোৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত কৌতুকের মাধ্যমে অগণিত নরনারী যে ব্যাপক ও গভীরভাবে জমাট হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করতো ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা' জানেন। যাত্রার মূলে প্রাচীন সৌর বৎসরের দানও গভীর এবং ব্যাপক।

"সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ করে' এই সকল উৎসব এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।" কিন্তু এত সব আনন্দানুষ্ঠান ছাড়াও বাঙালীর কাছে বুঝি শিবোৎসব বাকি ছিল। ভাল মানুষ শিবকে নিয়ে কোন স্মরণাতীত কাল হ'তে কতভাবেই না কত উৎসব, কত পূজা, কত পার্বণের প্রচলন হয়েছে। ধর্মসংহিতায় শিবের সামনে আনন্দানুষ্ঠানাদির এক কৌতুকময় বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিব-পুরাণ, ধর্মসংহিতা ইত্যাদির কয়েকটি পৃষ্ঠা তো শিবোৎসবের আনন্দানুষ্ঠানের বর্ণনায় মুখর। শিব শস্যোৎপাদক দেবতা—সেই জন্য গ্রাম্য নরনারীগণ তা'দের প্রাণের আনন্দ ও বেদনাকে শিবদেবতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। তা'ই এই দেবতাকে নিয়ে অগণিত গ্রাম্য নরনারী এক ব্যাপক এবং বিপুল আনন্দানুষ্ঠানে মিলিত হ'তো। এই শিবোৎসব হ'তে যে যাত্রা ও নাটকের উৎপত্তি হয়েছে এমন অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। এই শিবোৎসব বর্তমানে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে পরিণত হয়েছে। 'হনুমান সুখানুষ্ঠান' এই গাজনের অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান। এই হনুমান অনুকরণপ্রিয়তা যাত্রা উদ্ভবের একটি প্রধান লক্ষণ। তা' ছাড়া মঙ্গল গান, লোকসঙ্গীত, পালাগান ইত্যাদির মধ্যেও যাত্রার বীজ নিহিত আছে। চণ্ডীমঙ্গল গীত ও মনসার ভাসান এমন কি বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্গসজ্জা করে' বিশেষ অঙ্গভংগী সহকারে গাওয়া হ'তো। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে কৃষ্ণলীলার আদি উৎস। শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় তাই স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, "এই কাব্যগুলির (গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তী কালের যাত্রাগানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

মঙ্গলগান, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ পূর্বে পাঁচালিছন্দে গীত হ'তো। প্রাথমিক যুগে পাঁচালি কেবল একজন মূল গায়েন কর্তৃক গীত হ'তো। কিন্তু কালক্রমে পাঁচালির প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে একজন মূল গায়েনের সহকারীরূপে একাধিক গায়েন ও

অভিনেতার প্রয়োজন অনুভূত হ'লো। ক্রমে ক্রমে পাঁচালি পালাগান হ'তেই জনপ্রিয় যাত্রাগানের উদ্ভব হয়েছে। হয়তো, কিংবা, সম্ভতঃ ইত্যাদির কোন আবরণ না রেখেই ডাঃ সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেছেন "পাঁচালি হইতেই যাত্রার উদ্ভব।"

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাত্রাকীর্তন যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলো। ভাবোন্মাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বদা নৃত্যগীতে বিভোর থাকতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয়দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হ'তো। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই যাত্রা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। 'কালীয়দমন' যাত্রার পরে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে শখের যাত্রার দল। শখের যাত্রাদলের ব্যাপক প্রচলনের কয়েকটি কারণ আছে। এই যাত্রা প্রাচীনতার পটভূমি হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নতুনতর গরিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন নাটকীয় উপাদান ইহার প্রাণস্পন্দনের মূলে বেগ সঞ্চার করে। এ ছাড়াও এই যাত্রাদলের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো দেবকাহিনী বর্জন। দেবীলীলা মাহাত্ম্যক কাহিনীর পরিবর্তে এই দলই সর্বপ্রথম যাত্রায় মানবীয় কাহিনীর প্রচলন করেন। "বিদ্যাসুন্দর" কাহিনী এই শখের যাত্রাদলের পরম প্রিয় বস্তু ছিল। খেমটা নাচের প্রবর্তন এই যাত্রা থেকেই শুরু হয়। এর পর প্রয়োজনের তাগিদে যাত্রার বহু সংশোধন ও সংস্কার সাধিত হয়। একদিকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, অন্যদিকে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা এই দুই-এর চাপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের অনুকরণে এক নতুন ধরনের যাত্রার উদ্ভব হয়। এই যাত্রার মধ্যে সুসামঞ্জস্য কাহিনী এল, নাটকের ন্যায় অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ স্থানলাভ করলো এবং নাট্যিক কলা-কৌশলেরও প্রচলন হ'লো। তবে প্রকাশ্য স্থানেই এ সব যাত্রার অভিনয় হ'তো এবং কোন দৃশ্যপট থাকতো না। বর্তমানে নিখিল বাংলা দেশে এই ধরনের যাত্রাই প্রচলিত আছে।

প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে' নেওয়া দরকার—

যাত্রা হ'তে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয় নি। ডাঃ সুকুমার সেন ও শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ উভয়েই এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যাত্রা হ'তে নাটকের উদ্ভব না হ'লেও যাত্রার প্রভাব যে নাটকে নেই এ কথা বলা চলে না, বরং উভয়ের মাঝে একটা গভীর ঐক্য অনুভূত হয়। বস্তুতঃ বাংলার প্রথম যুগের নাটকগুলি যাত্রার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রথমে যাত্রার কোন নির্দিষ্ট কাহিনী ছিল না। সংগীতাংশ ঠিক থাকতো কিন্তু মাঝের সংলাপ গায়েন কর্তৃক ইচ্ছামত মুখে মুখেই রচিত হ'তো। কিন্তু কালের পরিবর্তনে মানুষের রুচিতেও পরিবর্তন এলো। তা'র ফলে যাত্রার মনগড়া কাহিনীর পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই কাহিনী হয়তো বহু কবি ও নাট্য-কারকে নাটক রচনার দুর্নিবার শক্তি দান করেছে। পূর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মহাপ্রভু নিজেই যাত্রার অভিনয় করতেন। কিন্তু তাঁ'র সময় কোন সুস্পষ্ট কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা হয় নি। তা' হ'লেও তাঁ'র প্রাঞ্জল অভিনয় বহু বৈষ্ণব গ্রন্থকারকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তা'র প্রমাণ পাই 'বিশ্বকোষে': "শ্রীচৈতন্যের প্রাণোন্মাদকর কৃষ্ণলীলাগীতির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া বা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তৎপরবর্তী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নাটক রচনা করিতে মনোযোগী হন।"

অধিকাংশ যাত্রার কাহিনীতে একজন করে' 'বিবেক' থাকে। যাত্রায় এই বিবেকের অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় বহু নাটকে এই বিবেক অথবা বিবেকের অনুরূপ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কৃত এবং ইংরাজী নাটকের মত বাংলা নাটকেও প্রথমে সঙ্গীত ছিল না—কিন্তু যাত্রায় ছিল সঙ্গীতের বাহুল্য। জনসাধারণও সঙ্গীতে হয়েছিল আকৃষ্ট—তা'ই দেশীয় রুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে সঙ্গীতের সংযোজন করা হয়।

বর্তমানে বাংলা নাটক যাত্রা হ'তে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ এবং দু'-এর

মাঝে কোন সামঞ্জস্য-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ প্রথমাবস্থায় যাত্রার প্রভাব যে নাটকে ছিল এ কথা ধ্রুব সত্য।

॥ দুই ॥

কাব্যকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। সুদীর্ঘ এক-সহস্র শতাব্দীব্যাপী কাব্যকে নিয়ে কতই না লীলাখেলা। গদ্যের সৃষ্টি সম্প্রতি কালের—অধিকতর সম্প্রতিকালের সৃষ্টি এই নাটক। তা'র জন্মেতিহাস মাত্র একটি শতাব্দীর। একটি শতাব্দী অতীত হ'লো বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাটকের এই যে পদক্ষেপ এর মূলে আছে সংস্কৃত নাটক, যাত্রা, রঙ্গমঞ্চ এবং ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে এই ত্রিশক্তি বাংলা নাটকের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছে।

বাংলা নাটকের অভ্যুদয় কালে সংস্কৃত নাটক যে তা'র দিশারী হয়েছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃত নাটকই অমানিশার গভীর অন্ধকার বিদূরিত করে' নবীন প্রভাত সূর্যের ন্যায় বাংলা নাটকের ভালে কুমকুমের জয়টীকা এঁকে দিয়েছে, পথ-প্রদর্শক হ'য়ে তা'র দুর্গম যাত্রাপথকে বিমুক্ত, সহজ ও সরল করেছে। তা'ই বাংলা নাটকের গঠমান যুগে দেখি সংস্কৃত নাটকের একচ্ছত্র প্রভাব। অনুবাদ যুগে যে ইংরাজী নাটকের প্রভাব ছিল না তা' নয়, কিন্তু রাজবেশধারী সংস্কৃত ভাষার দাপটে তা'র প্রভাব অনেকখানি ক্ষীণ। বস্তুতঃ এই যুগে পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোন লক্ষণীয় প্রভাব বাংলা নাটকে পড়ে নি। সংস্কৃত নাটককে কেন্দ্র করেই এই যুগের বাংলা নাটক লালিত পালিত হ'য়ে বেড়ে উঠেছে। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষের মতে "সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনূদিত বাংলা নাট্য সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কেবল ভাষা নয় আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়াও নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যধারাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।" এ প্রসঙ্গে

একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এ অনুবাদ কেবল আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। নাট্যকারগণ প্রধানতঃ ভাবাকে অবলম্বন করেই নাটক রচনা করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকল্পিত দু'-একটি চরিত্রও নাটকের মূল ঘটনা-প্রবাহে মিশিয়ে দিতেন।. হরচন্দ্র ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ এই উভয়ের উপর সংস্কৃত নাটকের সুগভীর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এঁদের "ভাষা সংস্কৃত শব্দে আড়ষ্ট এবং নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি সংস্কৃত রীতিও ইহাতে আছে।" কালীপ্রসন্ন সিংহের সাবিত্রী-সত্যবান ( ১৮৫৮ ) কেবল মূলভাবে নয় ভাষা এবং আঙ্গিকের দিক দিয়েও সংস্কৃতানুগ। সংস্কৃত নাটকের তরল উচ্ছ্বাস এবং সুদীর্ঘ খেদ ও অবান্তর বিলাপ নাট্যকার বর্জন করতে পারেন নি। এঁর 'মালতী-মাধব' ( ১৮৫৮ ) ভবভূতির প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ। এই যুগে অন্যান্য যে-সব সামাজিক নাটক লেখা হয়েছিল তা'তেও সংস্কৃত নাটকের ছাপ সুস্পষ্ট। "নান্দী, সূত্রধার ইত্যাদির মধ্য দিয়া অধিকাংশ নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদের অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগের দিক দিয়াও ইহারা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছে।"

প্রাক্-ন্যাশনাল থিয়েটার যুগের মধুসূদন এবং দীনবন্ধু এই দুই শক্তিমান নাট্যকারের উপরেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। বিষয়বস্তুতে না হ'লেও ভাব এবং বিশেষ করে' সংলাপে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। সংস্কৃত নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বগতোক্তি, দীর্ঘসংলাপ, সীমাহীন উচ্ছ্বাস, কাব্যিক ধরনের কথাবার্তা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার অজস্র প্রয়োগ, সুদীর্ঘ খেদোক্তি, ধ্বনিময় নিনাদকারী গম্ভীর ভাষা ইত্যাদি। সংস্কৃত নাটকে নাট্যিক সূক্ষ্ম কলাকৌশল অপেক্ষা সমাসবদ্ধ সুদীর্ঘ পদ-ঝংকারই বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। যাত্রাপথে মহারাণীর পিছনে শত শত দাসদাসীর মত নাটকের মূল সংলাপের অন্তরালে অফুরন্ত উপমা ও শব্দধ্বনি আপন আবেগে গুঞ্জন ক'রে উঠেছে।

বলা বাহুল্য মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটক সংস্কৃত নাটকানুগ অলংকৃত বর্ণনায় এবং সংলাপের আত্যন্তিক দীর্ঘতায় মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে। মাইকেলের নাটক পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় আমরা যেন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পড়ছি। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'মায়াকাননে' সংস্কৃত প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। কেবল ভাষায় নয় রচনারীতিতে এবং সংলাপে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এই দুই নাটকের যাত্রাপথকে আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও আবিল করে' তুলেছে। দীনবন্ধুর নাটকেও পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের ভাষা, তাদের চরিত্র বিকাশের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষকে দুরূহ সংস্কৃত বহুল ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করতে দেখলে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। কেবল ক্ষুণ্ণই হয় না মাঝে মাঝে হাস্যোদ্রেক করে। সামান্য উদ্ধৃতি আমাদের এই উক্তির সমর্থনে যথেষ্ট হবে।—"এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহ নাই, লীলাবতী আমার সহধর্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম। আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ করলেন—আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হ'লো। আমি দুস্তর বিপদ-বারিধি জলে নিপতিত হলেম।" (লীলাবতী পঞ্চম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।) 'নীলদর্পণ' এবং বিশেষ করে' 'কমলে কামিনী'র মধ্যে ধ্বনি বৈচিত্র্য, অর্থগৌরবদীপ্ত দীর্ঘ ভাবোক্তি এবং অলংকার বহুল খেদোক্তি সমূহ সংস্কৃত নাট্য-প্রভাবেরই পরিচয় বহন করে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর হ'তে ইংরাজী নাট্যপ্রভাব ব্যাপক হওয়ায় সংস্কৃত নাট্যপ্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা' বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়।

নাট্যশালা যে অসংখ্য নাট্যকারকে উৎকৃষ্ট নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এ কথা অনেকেই অস্বীকার করতে চান। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় স্পষ্ট অস্বীকার না করলেও, প্রকারান্তরে

করেছেন। তাঁ'র মতে নাট্যশালা স্থাপিত না হ'লেও বাংলা নাটক অলিখিত থাকতো না। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় কিন্তু স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে নাট্যশালার সাথে বাংলা নাটকের গভীর যোগ আছে। উভয়ের মধ্যে যে একটি আত্মিক নিবিড়তা আছে তা' তিনি যুক্তিতর্কসহ উপস্থিত করেছেন। বাংলা দেশে সর্বপ্রথম নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক। তিনি 'বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করে 'Disguise এবং Love is the Best Doctor নামক দু'খানি ইংরাজী নাটকের অনুবাদ অভিনয় করান। তারপর ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত সাঁশুলি রঙ্গালয়, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রভৃতিতে অভিনীত কয়েকটি ইংরাজী বই ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করল—কিন্তু দেশের বিরাট অংশ সেই খুশীতে যোগ দিতে পারল না। তা'রা অন্ধকারেই পড়ে রইল।

চিন্তাশীল ধনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'লো। এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাঁ'রা রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল। তারপর অল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লো বিদ্যোৎসাহী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চগুলি। নাট্যশালার এই ক্রমবর্ধমানতার সাথে সাথে অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের চাহিদা বেড়ে গেল, ফলে পাত্র-পাত্রীর মত কালি কলম নিয়ে বাংলার সাহিত্যিকগণও সাহিত্য অভিনয়ে মেতে উঠলেন। নবীন সম্ভাবনায় বাংলা নাটকে সৃষ্টি হ'লো নবযুগের সূত্রপাত। নিছক আনন্দের জন্য লিখিত নাটকাপেক্ষা অভিনয়ের তাগিদে লিখিত নাটকের সংখ্যাই অধিক। মধুসূদনের অধিকাংশ নাটক তো অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা। "বেলগাছিয়া থিয়েটার এবং ইহার কর্মকর্তাদের সহিত জড়িত না হইলে হয়তো মধুসূদন নাটক লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন না। এবং কে

জানে তাঁহার প্রতিভার বিকাশে ব্যাঘাত এবং বিলম্ব ঘটিত।” প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের পূর্বে অভিনয়োপযোগী সার্থক নাটক বিরলদৃষ্ট। অভিনয় দেখতে গিয়ে কুরুচিপূর্ণ সংলাপ এবং নাট্যিক কলাকৌশলবিহীন গতি দেখে স্বয়ং মধুসূদন অনুতপ্ত হন। ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের ভূমিকায় দেখতে পাই সেই অনুতাপেরই প্রকাশ :

অলীক কুনাট্যে রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

এই ‘প্রাণে নাহি সয়’ হ’তেই মধুসূদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং এই প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে যে অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটক রচনার প্রতিজ্ঞা মিশে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি নাট্যকারগণের রচনার মূলেও নাট্যশালার প্রভাব বিদ্যমান। রঙ্গালয়ের সাথে গভীর যোগসূত্র না থাকলে ভারতের সেক্সপিয়র গিরীশচন্দ্রকে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অতি আধুনিক কালের বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রত্যেকের নাটক রচনার মূলে যে নাট্যশালার প্রভাব এবং তাগিদ আছে তা’ প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। এই সেদিন বাংলার নব নির্মিত রঙ্গমঞ্চ বিশ্বরূপায় অভিনয়ের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরোগ্য নিকেতনের নাট্যরূপ দিতে দেখেছি। এই সব লক্ষ্য করেই অজিত ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করেছেন “বাংলা সাহিত্যের সকল নাট্যকারই কোন না কোন রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।” বস্তুতঃ বাংলা নাটকের উপর যে নাট্যশালার প্রভাব বর্তমান তা’ কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে যত অধিক নাটক রচিত হয়েছে এত অধিক নাটক রচনা আর কোন সময় সম্ভব হয় নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই উভয় ভাবেই রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটকের প্রাণমূলে বেগ ও বল সঞ্চার করেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত নাটক রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির প্রভাব ব্যাপক, গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী নয়। এরা চন্দ্রের মত গহন রাতের গভীর অন্ধকারকে ক্ষণিক আলোকিত করেই আবার কৃষ্ণপক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। এরা বাংলা নাটককে আধুনিক মর্যাদায় উন্নীত করতে পারে নি, প্রাচীনতার আবরণ ছিন্ন করে' নাট্যভারতীকে যে আধুনিকভাবে সজ্জিতা করেছে সে হ'লো পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্য। বাংলা নাটকের গঠমান যুগ হ'তে তা'র ক্রমবিকাশমানের জটিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পথটিকে আলোকিত করেছে পাশ্চাত্ত্য নাট্যালোক। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার পর বাংলা নাটকের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তা'তে কোন প্রাণস্পন্দন পাওয়া গেল না। তা' একান্ত-ভাবেই রুগ্ন এবং মৃতপ্রায়। কেতাদুরস্ত সংস্কৃত নাটকের রাজকীয় প্রভাবে তা'র প্রাণ কণ্ঠাগত। পাশ্চাত্ত্য নাটক তা'র এই অযথা গাম্ভীর্যের খোলস বদল করে' স্বাভাবিক সরস পরিচ্ছদ পরিয়ে দিল, অভিনব সম্ভাবনায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবীন অভ্যুদয় হ'লো। হেরাসিম লেবেডেফ যে Disguise এবং Love is the Best Doctor এই দুইখানি নাটকের অনুবাদ করিয়েছিলেন তা'র পরিচয় আমরা প্রথমেই পেয়েছি। এর পর হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতীর চিত্তবিলাস' ( ১৮৫২ ) নামে Shakespeare-এর 'মারচেন্ট অব ভেনিস'-এর ভাবানুবাদ করেন। এঁর 'চারুমুখ চিত্তহরা' ( ১৮৬৪ ) 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র অনুবাদ। বাংলা নাটকের মৌলিক রচনাধারা প্রবর্তিত হয় 'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুনে'র মাধ্যমে। কিন্তু এর কাহিনী মৌলিক হ'লেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত নাট্যরীতি অনুগ। পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির বিশেষ প্রভাব বিকশিত হ'য়ে ওঠে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে। মাইকেল ইংরাজী সাহিত্য সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী এপিক সাগর মন্থন করে' তিনি রচনা করলেন "মেঘনাদবধ" কাব্য আর ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য-সাগর মন্থন করে' তিনি বাংলা নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

সে সময়ে বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাট্যানুযায়ী যে দীর্ঘ সংলাপ ও খেদোক্তি থাকতো পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মহলকে তা' তৃপ্তি দিতে পারে নি, স্বয়ং মধুসূদনও তৃপ্তি পান নি। সংস্কৃত প্রভাববিমুক্ত পাশ্চাত্ত্য ছাঁচে ঢালা নাটক রচনার দিকে মধুসূদনের চেষ্টা যে নিয়োজিত হয়েছিল তা'র প্রমাণ পাই গৌরদাস বসাককে লিখিত তাঁ'র একটি পত্রে ঃ "And that is my intention to throw off the fetters forged for us by servile admiration of everything Sanskrit".

বাস্তবিক মধুসূদনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের প্রথায় তাঁ'র নাটকসমূহকে পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত করেন : Exposition, Growth or Development, Climax. Fall, Catastrophe or Denouncement. প্রত্যেক অঙ্ককে আবার কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেন। এ ছাড়াও দর্শকগণের মন লঘু ও হালকা (relief) করবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি গান সংযোজিত করেন। এ ছাড়াও মধুসূদনের নাটকের প্রধান গুণ তা'র জমাট কাহিনী। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কাহিনীর একটি জমাট স্রোত ব'য়ে গেছে। এই দৃঢ়সংবদ্ধ ঐক্যের ( unity ) জন্যও তিনি পাশ্চাত্ত্য নাটকের নিকট ঋণী। দীনবন্ধু এবং তাঁ'র পরবর্তী সকল নাট্যকারগণের উপর যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছে তা' বলাই বাহুল্য। দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'তে মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসরে'র ছায়াপাত হয়েছে। বর্তমানে নাটকের যে রূপ আমরা দেখি আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা' সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুগামী। বাংলা প্রহসনগুলিও ইংরেজী Farce নাটক হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলায় যে একাঙ্কিকা নাটকের প্রচলন হয়েছে তা'-ও পাশ্চাত্ত্য One Act play-র প্রভাবের ফল।

বাংলা নাটকের উপর যে ইংরেজী নাটকের গভীর প্রভাব বর্তমান এ কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগে ভোরের আকাশে পূর্বদিগন্ত হ'তে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের যে রক্তিম ছটা

দেখা দিয়েছিল আজও দিগবিথার নীলাম্বর জুড়ে সেই অপূর্ব রক্তিম ছটাই আলোক দান করছে।

॥ *তিন* ॥

আমাদের সমগ্র জীবনকে ঘিরে দু'টি সত্তা বর্তমান—আনন্দ এবং বিষাদ। আনন্দধারা আমাদের সমগ্র জীবন-প্রবাহকে হাসির আলোড়নে উদ্বেল করে' তোলে। যত কিছু দুঃখ, যত কিছু মালিন্য, জীবন হ'তে ধুয়ে মুছে অনাবিল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর বিষাদ আমাদের জীবনে আনে অশ্রুর প্লাবন। বেদনা এবং ব্যথার অভিঘাত জীবনকে বেদনামলিন করে' তোলে। সমগ্র নাট্য-প্রবাহের ভিতর দিয়ে আমরা এই হাসি ও অশ্রুরই লীলা দেখি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ধূলিমালিন্যের ভিতর যে হাসি এবং অশ্রু লুকিয়ে থাকে নাটকের ভিতর আমরা সেই হাসি এবং অশ্রু-নির্ঝরকে নতুন চেতনা এবং নতুন মহিমায় দেখি। সুখ দুঃখে ভরা অখণ্ড জীবন-প্রবাহকে নিয়েই নাটক—তাই আনন্দ এবং বিষাদের মত নাটকেও দুইটি স্পষ্ট বিভাগ বর্তমান। জীবনের ব্যথা বেদনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে Tragedy আর Comedy-তে হয়েছে হাসি আনন্দের রূপায়ণ। এই Comedy আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর Comedy-তে দেখি জীবনের হাসি এবং আনন্দের চরম রূপায়ণ। কোন গভীর সমস্যাকে নিয়ে ব্যথা বেদনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে' হাসি আনন্দের মধ্যে মিলন মাধুরিমার চরম রূপদান করাই এই শ্রেণীর Comedy-র লক্ষ্য। কিন্তু আর এক শ্রেণীর Comedy আছে যা'রা জীবনের কোন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাস্যোচ্ছলতায় মেতে ওঠে। এই শ্রেণীর Comedy-কে বাংলায় বলা হয় প্রহসন (Farce)।

লেটিন Farcio শব্দ হ'তে Farce শব্দের উদ্ভব। নাট্যজগতে এই

Farce শব্দটির অর্থ দাঁড়াল "The type of drama staffed with low humour and extravagant wit. ষোড়শ শতকে যে-সব Comedy Shakespeare ও Ben Johnson কর্তৃক রচিত হয়েছিল তা'দের ভিতর দেখা গিয়েছে অপূর্ব নাট্যিক কলাকৌশল এবং অফুরন্ত হাস্যরসের স্ফুরণ। কিন্তু পরবর্তী কালে Comedy-গুলিতে নাট্যকারগণ রসের সেই অপূর্ব দীপ্তি আনতে সমর্থ হলেন না ফলে পূর্ণাবয়ব হাস্যোচ্ছলতায় ভরপুর "পঞ্চাঙ্ক Comedy-র স্থলে তিন অঙ্কের স্বল্পপরিসরের লঘু ও তরল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস সমন্বিত নাটক" পরিবেশিত হ'তে লাগল। কালক্রমে Comedy-র সাথে Farce-এর একটি স্পষ্ট বিভেদ রেখা গড়ে উঠলো। বহিরঙ্গ অর্থাৎ আয়তনে পঞ্চাঙ্ক Comedy এবং তিনাঙ্ক Farce-এর মধ্যে যে প্রভেদ দেখা গেল অন্তরঙ্গেও সে প্রভেদ ব্যাপক এবং সুতীব্র হ'য়ে উঠল। আয়তনের বিশালতার জন্য পূর্ণাঙ্গ Comedy-তে নাট্যকার চরিত্র চিত্রণের জন্য সুবিস্তৃত পটভূমি পেতেন, কিন্তু আয়তনের স্বল্পতার জন্য Farce-এ সে সুযোগ ছিল না। স্বল্পপরিসর আয়তনে লেখককে কাহিনী উপস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ এবং তদুপরি নাটকীয় চমক দিতে হ'তো বলেই এই শ্রেণীর রচনায় অতিরঞ্জন এবং কিছু পরিমাণে অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। শেষকালে Farce-এর রূপ দাঁড়ালো "A Short humourous play." আলংকারিকের পরিভাষায় প্রহসনকে বলা হয় "হাস্যোদ্দীপনকাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।" জীবনের কোন জটিল সমস্যা বা আনন্দ-বেদনার কোন পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়—সম্ভব অসম্ভব ঘটনার দ্বারা দর্শকের হাস্যাকুল করে' তোলা এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মদনমোহন কুমার বলেছেন "Comedy জীবনের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় পরিস্থিতির মধ্যে সমাপ্তির মাধুর্য বিকশিত হইয়া ওঠে; সেখানে হাস্য স্নিগ্ধ,, মধুর, উজ্জ্বল। Farce-এ কাহিনী সংক্ষেপ

করিয়া পদে পদে হাস্যকর ঘটনার সমাবেশ করিয়া লোক হাসাইবার আয়োজন করা হয়। এ হাস্য উদ্দাম, উচ্ছল, অট্টহাস্য।”

বাংলা নাটকের অন্যান্য ধারার মত অনুবাদ হ’তেই প্রহসন রচনার সূত্রপাত হয়। ইংরাজী এবং সংস্কৃত Farce-এর অনুবাদে বাংলা নাট্যধারায় যে হাস্যোচ্ছলতার উদ্দাম স্রোত নেমে এলো তা’কে কেন্দ্র করেই প্রহসন রচনা শুরু। অবশ্য এর আগে অত্যন্ত নিম্ন-রুচিসম্পন্ন যাত্রা, সঙ এবং বিভিন্ন নকশার মধ্য হ’তে প্রহসনের আদি রূপটি আবিষ্কার করা যায়।

বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম প্রহসন হ’লো Disguise এবং Love is the Best Doctor নামক দু’খানি ইংরাজী প্রহসনের অনুবাদ। হেরাসিম লেবেডেফ একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক, তাঁ’র ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা এই প্রহসন দু’খানিকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করান। সংস্কৃতের ‘হাসার্নব’, ‘কৌতুক সর্বস্ব’ ইত্যাদি প্রহসনগুলি উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলায় অনূদিত হয়। কিন্তু এগুলি উপাখ্যান আকারে গদ্যে ও পদ্যে রচিত—নাটকের আকারে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হবার পর আমরা যে বাংলা নাটকগুলি পেলাম সেগুনি প্রধানতঃ কোন না কোন সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করেই লিখিত হয়েছে। বাল্য-বিবাহ, স্বপত্নী-বিরোধ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলি সে যুগে বিশেষ ভাবে আলোচ্য হ’য়ে ওঠে। বলা বাহুল্য নাট্যকারদের শ্যেনদৃষ্টি এই বিষয়গুলির উপর নিক্ষিপ্ত হ’তে বিরত হয় নি। ফলে আমরা একে একে পেলাম—উভয় সংকট, চক্ষুদান, বুঝলে কিনা, যেমন কর্ম তেমন ফল ইত্যাদি নাটকগুলি। এই নাটকগুলি লেখেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এঁর ‘কুলীনকুল-সর্বস্ব’ ঠিক প্রহসন জাতীয় না হ’লেও হাস্যোচ্ছলতায় ভরপুর। নাটকখানি প্রায় প্রহসনের প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে’ গেছে।

এই নাটকের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় কৌলীন্য-প্রথার দোষ এবং অসংগতি। এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের চার কন্যা—বড়টি

যৌবনের বিদগ্ধ দিনগুলি অতিক্রম করে' প্রৌঢ়ার কোঠায় পদক্ষেপ করেছে, ছোটটি সবেমাত্র নবযৌবনোদ্গমে কম্পমান। পূর্বরাগের অনাস্বাদিত মাধুরিমাই তা'র এখন কাম্য। অবশেষে এই চার কন্যার বিবাহ এক শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের সাথে সম্পন্ন হয়। সুতরাং নাটকটি পরিণতির দিক দিয়ে অশুভান্তক, কিন্তু ভিতরে পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তায় প্রহসনের খাঁটি বীজটি খুঁজে পাওয়া যায়। নারী-চরিত্রগুলি বিশেষ করে' সরল এবং সরস হওয়ায় হাস্যময়তায় ভরপুর হ'য়ে উঠেছে। পুরুষদের চরিত্র কিন্তু বড় গম্ভীর—এই চরিত্রগুলি ঠিক প্রাহসনিক চরিত্র হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে একদিকে ছড়া ও অন্যদিকে প্রবচন থাকায় হাসির অনাবিল স্রোতে ভেসে গিয়েছে। ঘটক, পুরোহিত ইত্যাদিকে নিয়ে যে রঙ্গরস করা হয়েছে তা' অপূর্ব। কিন্তু সর্বাপেক্ষা হাস্যরসের বীজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীদের নাম নির্বাচনে। অমৃতাচার্য, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, কুলীনপালক ইত্যাদি নামগুলি বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—নামের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি-চরিত্রের অন্তঃসত্তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্নের পটুত্ব অপূর্ব। ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা পাঠকদের হাস্যাকুল এবং মর্মাহত করে' দেয়। 'উভয় সংকট' যেন হাসির খনি। দুই সতীনের প্রতিযোগিতামূলক প্রাণহীন বিকৃত উদ্দাম আদরযত্নের প্রাবল্যে কর্তার যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা' অপূর্ব এবং অভিনব। মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' বোধ হয় প্রাক্-মধুসূদন-যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। যেমন নাম তেমনি বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই নাটকটির মধ্যে প্রহসনের প্রাণস্পর্শ পাওয়া যায়। এক মদখোর, এক আফিংখোর, এক গুলিখোর ও এক গাঁজাখোর—এই হ'লো চার ইয়ার, এই ইয়ার-গণের যে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে তা' যে কেমন তীর্থযাত্রা তা' প্রহসনখানিকে স্পর্শ না করেও অনুমান করা যায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়বস্তুর মধ্য হ'তে কেমন এক অপূর্ব হাসির ঝিলিক

আমরা অনুভব করি। প্রাক্-মধুসূদন-যুগের 'বাসর-কৌতুক'ও একখানি উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

এর পর বাংলার কবিতার ক্ষেত্রের মত প্রহসন রচনার ক্ষেত্রেও সূচিত হ'লো বিদ্রোহী মধুসূদনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁ'র হাতেই আমরা পেলাম 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই দু'খানি গ্রন্থ বাংলার প্রহসন বিভাগে অপূর্ব সংযোজনা। হাসির দীপ্তি যেন গ্রন্থ দু'খানির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রহসন রচনার প্রাথমিক যুগে আমরা যে এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রহসন পেয়েছি তা' একান্ত গৌরবের বিষয়।

মধুসূদনের নাটক রচনায় অনেক দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উল্লিখিত প্রহসন দু'খানি আশ্চর্যভাবে সেই সব দোষ-ত্রুটি হ'তে মুক্ত। এই প্রহসন দু'খানি তাঁ'র অপূর্ব নাট্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে' নিয়ে চলেছে। প্রহসন রচনা করতে গেলে সমাজ সম্বন্ধে যে বাস্তব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা' মধুসূদনের ছিল এবং সর্বোপরি তাঁ'র বচন-ভংগীমায় সে জ্ঞান অনবদ্য হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'একেই কী বলে সভ্যতা' দু'-অঙ্কে সমাপ্ত। মানুষের (বাঙালীর) জীবনের কয়েকটি অসঙ্গত আবেগ এবং ভ্রান্ত মুহূর্তকে এই নাটকে ধরে রাখা হয়েছে। যে সময় বাঙালীর মানস-প্রবণতা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানুগ হ'য়ে উঠেছিল ব্যক্তি-মানসের সেই বক্রগতির পিছনে অন্ধ অনুরাগ ছাড়া কোন যুক্তিতর্ক নিহিত ছিল না। একগ্লাস মদ খেয়ে নব্যশিক্ষিতগণ বাঙালীর কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করলেন বলে মনে করতেন। ইংরাজীতে কথা বলার যে কী তীব্র স্পৃহা সে যুগে গজিয়ে উঠেছিল তার উলঙ্গ ছবি দেখতে পাই নবকুমারের কথায়—"আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে doctor-কে call করা গেল। তিনি একটি Physic দিলেন। Physic বেশ operate করেছিল—four, five time motion হ'লো। অদ্য কিছু better বোধ করছেন।"

এমনিতর আরো বহু হাসির খোরাক 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাত্র একদিনের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত অথচ এমন কোন চিত্র নেই যা' এতে স্থান পায় নি—অন্ততঃ সমকালীন ইংরাজ-স্পর্শ-গর্বী নব্য যুবকদের বুঝতে গেলে যে চিত্রটুকুর প্রয়োজন তা'র সবটাই এতে স্থান পেয়েছে। তবুও আশ্চর্যের বিষয় গ্রন্থটিতে একটিও অবান্তর কথা স্থান পায় নি—খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি একত্রিত হ'য়ে যেন এক অখণ্ড রস-প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রহসনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হয়েছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্বোৎকৃষ্ট।"

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর ভিতর দিয়ে সমাজের উপরতলার ভণ্ড কর্তাদের এবং বকধার্মিকদের উপর তীব্র কশাঘাত করেছেন। এ প্রহসনটিও প্রথমোক্ত প্রহসনের ন্যায় দু'-অঙ্ক ও চার গর্ভাঙ্কে পরিসমাপ্ত। সামাজিক প্রহসন হিসেবে এ গ্রন্থখানির মূল্য অনেক। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—"এই শ্রেণীর বকধার্মিক ( ভক্তপ্রসাদ ) সেই যুগেই যে শুধু বর্তমান ছিল, এই যুগে নহে—তাহা বলিতে পারা যায় না; ইহা একদিন ছিল এবং চিরদিনই থাকিবে। সেই জন্য তাঁহার এই প্রহসনখানির নিত্যকালীন মূল্য আছে।"

মধুসূদনকে আমরা সাধারণে উচ্চ ভাবকল্পনা-সমৃদ্ধ কবি হিসেবেই জানি কিন্তু তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তাঁ'র রচিত মাত্র দু'খানি প্রহসনকে অবলম্বন করে' এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি বাংলার মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান প্রহসন রচনাকারীদের মধ্যে একজন।

মধুসূদনের পর প্রহসন রচনাকার হিসাবে বঙ্গ নাট্যমঞ্চে আমরা পেলাম শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে তাঁ'র স্বভাবজাত পরিহাসপটুতার অবিস্মরণীয় প্রমাণ রয়েছে। "সেক্সপিয়রের প্রথম যুগের কমেডি 'Merry Wives

of Windsor,' Comedy of Errors' প্রভৃতি নাটকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হাস্যরসই দীনবন্ধুর নাটকের প্রাণ। মনে হয় আমাদের অসংগত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যত কিছু হাস্য-রসের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকে ব্যঙ্গ আছে, আঘাতও আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সব স্থানেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে।"

'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এবং 'জামাই বারিক' এই তিনখানি হ'লো দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন। 'সধবার একাদশী'র পাণ্ডুলিপি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ কথা সত্য যদি এ গ্রন্থটি প্রকাশিত না হ'তো তা' হ'লে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রহসন লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে থেকে যেতো! শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"হাস্যরস যদি প্রহসনের প্রাণ এবং সমাজ-শোধন তাহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না।" 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে আমরা হাস্যরসিকতার চূড়ান্ত রূপায়ণ দেখতে পাই। শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধ রাজীব লোচন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তাঁ'র বিয়ের বাতিক কমে নি—এই বিয়ে পাগলা বুড়োকে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র উদ্দাম হাস্য-প্রবাহের যে জমাট প্রহসন গড়ে তুলেছেন তা' কোনদিন ভোলবার নয়। "ইহার মধ্যে ধারাল কথার তীব্র ঝলক নাই, কোন গভীর সমাজ-সমস্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও নাই, হাস্যরসের অনর্গল ধারায় প্রহসনখানি আগাগোড়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া রাখা হইয়াছে।" কিন্তু দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসপ্রধান প্রহসন 'জামাই বারিক'। বাংলায় রচিত অন্য কোন প্রহসনে হাসির এমন উদ্দাম-প্রবাহ আছে বলে মনে হয় না। কুলীন নিষ্কর্মা জামাইরা বেকার অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী থাকে। হতভাগ্য জামাইগুলির জীবনযাত্রার বিচিত্র দৃশ্য এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। বগলা ও বিন্দুবাসিনীর ঝগড়া, স্বামীর স্নেহকে ভাগাভাগি

করে' নেওয়ার ব্যাপার, বেচারা স্বামীকে চোর ভেবে উত্তমমধ্যম দেওয়ার দৃশ্যগুলি কি অপূর্ব কৌতুতেই না জমাট বেঁধে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনীতে লিখেছেন "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে যে অনেকে আর হাসিতে পারে না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ রয়েছে 'জামাই বারিকে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। এ প্রহসনের প্রতিটি দৃশ্য আমাদের চিত্তকে হাসির অনবরত আঘাতে সকৌতুকে নাচাতে থাকে। জামাইদিগকে পাস নিয়ে যখন আমরা অন্তঃপুরে যেতে দেখি তখন প্রহসন পাঠ করা বন্ধ করে' আমাদিগকে একচোট হেসে নিয়ে জমে ওঠা হাসির পাহাড়কে ক্ষয় করতে হয়। 'জামাই বারিক' নিঃসন্দেহে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রহসনগুলির একটি।

'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রহসন রচনার ধারা এখানেই শেষ হয়েছে। এই যুগে মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক অনেক নাটকই লেখা হয়েছিল কিন্তু প্রহসন রচনার ধারা বুঝি সকল ধারাকেই ছাড়িয়ে উঠেছিল। পরবর্তী যুগে গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অতি আধুনিক যুগের প্রমথ বিশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেই প্রহসন রচনা করেছেন, কিন্তু কেউ-ই বাংলা নাটকের গঠমান যুগে রচিত প্রহসনের উজ্জ্বল দীপ্তিকে ম্লান করে' দিতে পারেন নি। প্রাক্-ন্যাশনাল থিয়েটার যুগের নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বোধ হয় এইখানেই—এই প্রহসন রচনায়।

# ॥ দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ ॥

## ॥ এক ॥

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আকাশে দীনবন্ধু মিত্র একটি অম্লান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁ'র নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি দিক আছে যে দিকগুলিতে তিনি বর্তমানকাল পর্যন্ত অপরাজেয়, এই বিশেষ দিক-গুলিতে তিনি এখনও পর্যন্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা বিশেষরূপে প্রয়োজন, তাঁ'র নাটকের অংশতঃ নিয়ে বিচার করলে এই দিকগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে—সামগ্রিক বিচারে নয়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে দীনবন্ধুর নাটকের দোষ-দুর্বলতা অনেক, বহুক্ষেত্রে পীড়াদায়ক। আপন অভিজ্ঞতাকে যেখানে তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন সেখানেই তিনি পূর্ণাঙ্গ, আপন বিশিষ্টতায় উন্নত-শীর্ষ কিন্তু অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য হেতু যেখানে তিনি কল্পনার দ্বারস্থ হয়েছেন সেখানে তাঁ'র পতন অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছেন: "দীনবন্ধু এই জীবনকে যতটুকু দেখিয়াছিলেন, ততটুকুই তাহার যথার্থ নাট্যরূপ দিয়াছেন। কিন্তু যতটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততটুকুই ভুল করিয়াছেন। দীনবন্ধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, দূরদ্রষ্টা কিংবা অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন না; কিন্তু নাট্যিক চরিত্র সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি অপেক্ষা দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কম প্রয়োজনীয় নহে, সেই জন্য তাঁহার সাফল্য আংশিক বলিতে হইবে।"

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রই বস্তুতান্ত্রিকতার অগ্রদূত। বাস্তব সমস্যাবলী ও ঘাত-প্রতিঘাত তাঁ'র অধিকাংশ নাটকের সূতিকাগার। দীনবন্ধু মিত্রই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বাস্তববাদী লেখক।

প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব বিশেষরূপে স্মরণীয়। প্রহসন রচনায় তিনি যে উন্নত ধরনের নাট্যিক কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তা' বিরল-দৃষ্ট। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু মিত্র কেবল কাতুকুতু দিয়ে নিছক সস্তা বাক্যজাল বিস্তার করে' পাঠককে হাসান নি—হাসিয়েছেন অন্তর দিয়ে। হাস্যরসের মধ্যে Humour বা করুণ হাস্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ—দীনবন্ধু মিত্রের অধিকাংশ প্রহসন এই করুণ হাস্যরসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধারায় অভিসিক্ত। প্রতিটি প্রহসন পাঠকের অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। হাস্যরস সঞ্চারে দীনবন্ধু মিত্র যে একজন বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়াছে অনেকে আর হাসিতে পারে না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" হাসলেই দীন-বন্ধু মিত্রকে একান্ত ঘরোয়া, আপন এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়, হাসি বন্ধ করলে তিনি গম্ভীর এবং অসুন্দর হ'য়ে ওঠেন, যত কিছু সৌন্দর্য মাধুর্য যেন অবলুপ্ত হয়। তাঁ'র রচিত প্রহসনগুলিই তাঁ'র স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অনেকে দীনবন্ধু মিত্রকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মনে করেন কিন্তু আমাদের মনে হয় দীনবন্ধুর মধ্যে অশ্লীলতা ছিল না—তাঁ'র রচনায় ছিল গ্রাম্যতা। এই গ্রাম্যতাকে অনেকে অশ্লীলতার সাথে এক করে' ভুল করেছেন। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা এক জিনিস নয়। বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতা আছে, গ্রাম্যতা নাই; দীনবন্ধুতে গ্রাম্যতা আছে অশ্লীলতা নাই। দীনবন্ধুর দোষ যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা' ছিল একান্ত গ্রাম্যতায় বা বাস্তবানুসরণে—বিশেষ কোন রুচিবোধে নয়।'

গুণের সাথে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে দোষ দুর্বলতারও অন্ত নেই। নাটক রচনায় দীনবন্ধু মধুসূদনকেই অনুসরণ করেছিলেন—ফলে মধুসূদনের মত তাঁ'র নাটকেও সংস্কৃত-প্রভাব অনিবার্য হ'য়ে

উঠেছে। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে তিনি গদ্যে-পদ্যে নাটক রচনা করেছেন। সামাজিক নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখে পদ্যের কথা-বার্তা একেবারে অশোভন। তা' ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য-প্রতিভা ছিল নিতান্ত সাধারণ স্তরের, ফলে নাটকের মধ্যে সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী একেবারে অশোভন ও একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে।

ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনা দীনবন্ধুর সার্থক নাটক রচনার আর একটি প্রধান অন্তরায়। ভাব-প্রাবল্যে তিনি ভেসে গিয়েছেন। সংস্কৃত উপমা, অলংকার, ধ্বনি-বৈচিত্র্য এবং দীর্ঘ অর্থগৌরব ভাবোক্তিতে প্রায় নাটকের বহু সংলাপই প্রাণহীন এবং অপ্রীতিকর মনে হয়।

যা' হোক শত ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর পদক্ষেপ যে বলিষ্ঠ এবং সার্থক সে কথা আজ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

॥ দুই ॥

নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের পদক্ষেপের প্রথম ফল স্বরূপ আমরা পেলাম "নীলদর্পণ"।

অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে আমরা কয়েকজন শক্তিমান নাট্যকারকে পেয়েছি—কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং মধুসূদন। কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি মৌলিক নাটক এবং স্বপত্নী নাটক, কুলীনকুল-সর্বস্ব ইত্যাদি বিখ্যাত প্রহসনগুলি "নীল-দর্পণে"র পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের বুকে আত্মপ্রকাশ করেছে। "নীলদর্পণ" পাশ্চাত্ত্য নাট্য-রীতি অনুযায়ী পঞ্চমাঙ্কে সমাপ্ত—কিন্তু এর আগেই শর্মিষ্ঠায় আমরা এই রীতির সংযোজনা দেখেছি—সুতরাং এদিক দিয়ে নীলদর্পণের মৌলিকতা নেই। মধুসূদনই প্রথম সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বন্দীশালা হ'তে নাট্যভারতীকে উদ্ধার করে' আধুনিক সাজসজ্জা ও অলংকারে তা'কে ভূষিত করেছিলেন।

তা' ছাড়া "নীলদর্পণে"র কাহিনীতে একটি নিটোল ঐক্য (Unity) নেই—মাঝে মাঝে সংলাপ-দোষে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে গেছে। এই সংলাপের দুর্বলতার জন্যেই নাটকের প্রধান চরিত্রের একটিও আপন চারিত্রিক মাধুর্যে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে নি। নবীনমাধব এই নাটকের নায়ক—কিন্তু কোন স্থলেই নায়কসুলভ ভাবভংগী তা'র ভিতর নেই। তিনি উদার, মহান্ এবং অমায়িক। এমন চরিত্র হয়তো কোন দুঃখপূর্ণ সামাজিক নাটকের নায়কের ভূমিকায় শোভনীয় হ'তো কিন্তু নীলদর্পণে যেখানে নিরীহ চাষীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার চরমে উঠেছে সেই অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত জনগণের নেতা হিসাবে চরিত্রের ভিতরে যে দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, কঠোরতা এবং সর্বোপরি অনমনীয় মনোভাব থাকা উচিত ছিল নবীনমাধবের চরিত্রে তা' নেই। স্বরপুর-বৃকোদর নবীনমাধবের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় সমগ্র নাটকে দু'বার দেখেছি—একবার সাধুচরণের কথায় আর একবার ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের বেলায়। কিন্তু সাধুচরণের কথা অপেক্ষা দৃশ্যটি যদি নাটকের মধ্যে উপস্থিত থাকতো তা' হ'লে dramatic action এবং নবীনমাধব-চরিত্রের বিকাশের পক্ষে তা' অধিকতর ফলপ্রসূ হ'তো। মোট কথা নবীন-মাধবের চরিত্র আমাদের মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না। অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে গোলক বসু এবং সাধুচরণের চরিত্র।

এই নাটকের সংলাপ মাঝে মাঝে যে অত্যন্ত দুর্বল সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় অলংকৃত-উপমাবহুল সংলাপের আত্যন্তিক দীর্ঘতা, শোকাচ্ছ্বাস-বাহুল্য মাঝে মাঝে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। প্রণয়ে কিংবা প্রলাপে চরিত্র-গুলির মুখ হ'তে যে ভাষা ধ্বনিত হয়েছে তা' তা'দের অন্তঃস্থল হ'তে উৎসারিত হয় নি, তা' আহৃত হয়েছে সংস্কৃত নাটক হ'তে। একটি দৃষ্টান্তে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। বিকৃতমস্তিষ্কা মাতার হাতে স্ত্রীর মৃত্যু দেখে বিন্দুমাধব বলছে, "আহা! মৃত-পতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কী সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রাচীরে

বেষ্টিত; শোকশার্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম।” এ উক্তি আমাদের মনে শোক সঞ্চার করা দূরে থাক হাসিয়ে পাগল করে। নাটকটি পুরাপুরি Tragedy-ও হ'য়ে ওঠে নি। মানুষ নিষ্ঠুর ভাগ্যের সাথে বিরামহীন সংগ্রাম করে' যখন পরাজিত হয় এবং সেই পরাজয়ের দ্বন্দ্বে যখন তা'র হৃদয়-মূল ক্ষতবিক্ষত হয় তখনই তা'র হৃদয়-মূলে পতিত হয় Tragedy-র বজ্রাঘাত। কিন্তু এই নাটকে কোথাও সে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটে নি। এ নাটকে দৃশ্য-দৃশ্যান্তে আমরা পেয়েছি কেবল একটানা নিপীড়নের ইতিহাস, ক্ষমতাশালী কর্তৃক দুর্বলের নির্যাতন—কিন্তু সেই নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পুরুষকার প্রতিরোধ কই? কেবল একটানা ছেদহীন দুঃখভোগের মাঝে Tragedy নেই। এই সব ত্রুটি মনে রেখে এই নাটককে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সার্থক নাটক বলতে আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

কিন্তু এই সাথে আমাদের আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। দোষগুণ নিয়েই মানুষ, তা'র সৃষ্টিও তাই আলো-আঁধারেই ভরপুর। ত্রুটিহীন নাটক পৃথিবীর সাহিত্যেই বা ক'টা আছে? প্রথম শ্রেণীর যত ভাল উপন্যাস-নাটকই হোক না কেন—তার ভিতর থেকে ত্রুটি বের করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু এই ত্রুটি দিয়ে যদি তা'র মান নির্ণয় করতে যাই তা' হ'লে গ্রন্থটির প্রতি অবিচার না হ'য়ে পারে না। চাঁদে কলঙ্ক আছে তাই বলে আমরা যদি তা'কে কলঙ্কিনী বলে উপহাস করি তা' হ'লে তা' আমাদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হবে। সকল কলঙ্কের মাঝে, সকল অন্ধকারের মাঝে তা'র নয়নাভিরাম অনাবিল সৌন্দর্যরাশি আমাদের হৃদয়-বেলা-ভূমিতে যে অপূর্ব আনন্দের আলোড়ন আনে সেখানেই চাঁদের সৌন্দর্য-মূল্য নিহিত। শত ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা নাটকের গঠমান যুগে ভোরের আকাশে নীলদর্পণ যে অপূর্ব রক্তিমচ্ছটা এনেছিল তা' আজিও অম্লান রয়েছে।

নীলদর্পণের মূল কাহিনী গোলক বসু-পরিবারকে কেন্দ্র করেই

কল্পিত হয়েছে কিন্তু এই মূল কাহিনীর সাথে সাধুচরণের পরিবারকে অবলম্বন করে' আর একটি উপকাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন যে কী গভীর ও ব্যাপক হয়েছে—নিখিল বাংলার হ'য়ে এই দুইটি পরিবারই তা'র সাক্ষ্য দিয়েছে। উভয় পরিবারই সর্বস্ব হারিয়ে পথের কাঙাল হয়েছে, অবশেষে আত্ম-পীড়নে মৃত্যুবরণের মাঝে চরম শোকাবহ পরিণতি নেমে এসেছে। দু'টি পরিবারের ক্রমপরিণত পরিণামের বিকাশধারা নাটকটির মধ্যে অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে। এই দু'টি পরিবারই নীলকরদের সহজ অত্যাচার রীতির মাঝে সংঘাত এনেছে—আর সেই সংঘাতের ইন্ধন যুগিয়েছে গোপীনাথ ও পদীময়রাণী। "নীলদর্পণের বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সংহতি ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য ও অবান্তর চরিত্রের অনুচিত অবতারণা দ্বারা ইহার ঘটনা-প্রবাহ কোথাও তির্যক কি তরল করা হয় নাই। স্বল্পকালের পরিসরের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু সীমায়িত হওয়ার ফলে ইহার মধ্যে এক ঘনগম্ভীর ভাবচেতনা প্রাণময় রূপলাভ করিয়াছে। অনেকগুলি দৃশ্যের উত্তেজনামূলক চমকপ্রদ ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া নাট্যকার তাঁহার কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও চমৎকারিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন।" বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে রাইয়তদের দুঃখভোগ, রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা এবং নবীনমাধব ও তোরাপ কর্তৃক তা'র উদ্ধার সাধন ইত্যাদি ঘটনাগুলি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মত মূল কাহিনীর মধ্যে চমকিয়ে ওঠে। এই ঘটনাগুলির দ্বারায় যে dramatic action-এর সৃষ্টি হয়েছে তা' অনবদ্য।

কাহিনী বিকাশে লেখক পাশ্চাত্য-রীতি অনুসরণ করেছেন। প্রথম অঙ্কে গোলক বসু ও সাধুচরণ এই দুই পরিবারের ওপর দুর্যোগের আভাস হ'তে Exposition শুরু। দ্বিতীয় অঙ্কে নির্যাতনের সূচনা—গোলক বসুকে কারারুদ্ধ করবার সংকল্প ইত্যাদি হ'তে কাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে ( Growth or Development )। তৃতীয় অঙ্কে দুই পরিবারের চরম অবস্থা ( Climax ),

নবীনমাধবের প্রকাশ্য সংগ্রাম এবং ক্ষেত্রমাণর প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার ইত্যাদি। চতুর্থ অঙ্কে সংঘর্ষের করুণ পরিণতি ( Fall ), মৃত্যুমুখে গোলক বসুর পরিবার এবং পঞ্চম অঙ্কে অঙ্কিত হয়েছে সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলায় দু'টি পরিবারের নিষ্ঠুর ও সর্বনাশা পরিণতি (Catastrophe)। নীলদর্পণের পূর্বে মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" নাটকে পাশ্চাত্ত্য-রীতির এমন সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ ছিল না। এদিক দিয়ে নীলদর্পণের বিশিষ্টতা সহজেই চোখে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য-রীতি অনুযায়ী নাট্যকার এক একটি অঙ্ককে কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেছেন এবং পাঠকের মনকে লঘু ও হালকা করার জন্যে (Relief) মাঝে মাঝে রসিকতা ও ছড়াগানের সংযোজনা করেছেন।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্র বিকাশে দীনবন্ধু মিত্র কোন মৌলিকতা দেখাতে না পারলেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার যে মুন্‌শীয়ানা এবং পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা' নিঃসন্দেহে অভিনব। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী ইত্যাদি চরিত্রগুলি কেবল অনবদ্য নয় বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই চরিত্রগুলি তা'দের আপন আপন পরিবেশে অপূর্ব রূপে বিকশিত হয়েছে। তোরাপ অশিক্ষিত, গেঁয়ো চাষা। জীবনে সে বেপরোয়া। যা' ভাল বোঝে তা' সে করবেই—প্রাণ থাক আর যাক, পরোয়া নেই। সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, আর চোখের বদলে চোখ। কিন্তু কঠোরতার অন্তরালে রয়েছে সুমহান্ আত্মত্যাগ, নিঃসীম প্রভুভক্তি আর অকৃত্রিম স্নেহসিক্ত মনুষ্যপ্রীতি। শ্রদ্ধেয় অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের ভাষায়, "বাংলা সাহিত্যে তোরাপ ও রাইচরণের মত কৃষক এবং আদুরীর মত ঝি আর কোথাও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না।" বাস্তবিক নাটক পড়ার সময় আমরা এই চরিত্রগুলির সংলাপ কেবল ছাপার অক্ষরে পড়ি না—কয়েকটি জীবন্ত মানুষকে যেন বইয়ের পাতায় দাপাদাপি করে' ফিরতে দেখি। দীনবন্ধু মিত্রের এই সৃষ্টি কখনো ভোলবার নয়। গোপীনাথ এবং পদীময়রাণী চরিত্রহীন কিন্তু তা'দের অন্তরের যে প্রীতি ও প্রেমের

পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা'তে এই চরিত্রগুলিও অন্যান্য প্রধান চরিত্রের সাথে তা'দের সমুদয় মালিন্য ও কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে কখন কোন অজ্ঞাতসারে আমাদের মনের গহনে একধারে একটুখানি ঠাঁই করে' নিয়েছে।

কিন্তু এসব ছাড়াও নীলদর্পণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আত্মগোপন করে' আছে তা'র কাহিনীর চিরন্তনতায়। সাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে' লিখিত এই নাটকের বিষয়বস্তু সাময়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করে' সর্বকালীন হ'য়ে উঠেছে। বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে এই গ্রন্থ যে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল তা'র নজির অন্য কোথাও আর বড় একটা নজরে পড়ে না। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিখিল বাংলার নিপীড়িত কৃষককুল যখন মনে মনে প্রতিশোধের চরম পরিকল্পনা করছিল তখন নীলদর্পণ তা'দের দুর্যোগঘন অন্ধকার পথযাত্রায় নির্ভীক দিশারী হ'য়ে মশালের মত জ্বলে উঠলো। সেই অগ্নিশিখায় চরম দীক্ষা লাভ করল অগণিত দেশবাসী এবং দাবানলের মত সে আগুন ছড়িয়ে গেল নিখিল বাংলার পথে প্রান্তরে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠলো। "ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহাউদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।" কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার শেষ হয়েছে বলে নীলদর্পণের মূল্য এতটুকুও কমে নি—এই গ্রন্থে যে বিদ্রোহের বাণী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে তা' দুঃখ-লাঞ্ছনা, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিত্যকালের প্রতিবাদ। "সে-জন্য তাহার রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।" অতীতে বহু নাটক লিখিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমান কালে তা'দের আর সন্ধান পাওয়া যায় না, বড় জোর তা'দের স্থান বিশিষ্ট লাইব্রেরীর অন্ধকার সেলের মধ্যে হয়েছে—কিন্তু এই অতি আধুনিক যুগেও নীলদর্পণের পাঠ এবং অভিনয় তোড়জোড় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। গ্রন্থখানি

যে চিরন্তন এবং শাশ্বতকালের ভাবসম্পদে ভরপুর তা' বলাই বাহুল্য।

নীলদর্পণই বাংলার সর্বপ্রথম সামাজিক এবং রাজনৈতিক নাটক। গোলক বসু এবং সাধুচরণের পারিবারিক চিত্র এর অক্ষয় সম্পদ। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" যেমন পরবর্তীকালের বহু কবিকে "গীত" রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল তেমনি নীলদর্পণ পরবর্তীকালের বহু নাট্য-কারকে "সমাজ-দর্পণ-নাটক" লিখতে প্রলুব্ধ করেছে। নীলদর্পণ হোক ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু বর্তমানের কোন ত্রুটিবিহীন নাটককে তো এই ত্রুটিপূর্ণ নাটকের মত মর্যাদা পেতে দেখা যায় না। এই সীমাহীন প্রভাব, এই চিরন্তনতাতেই নীলদর্পণ শাশ্বতকালের পূজনীয় গ্রন্থ। সত্যই নীলদর্পণই বাংলার সর্বপ্রথম সার্থক নাটক—নীলদর্পণ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় সংযোজনা।

॥ *তিন* ॥

একজন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক বলেছেন ঃ গোপন করাই সাহিত্য। গোপন করার 'আর্টে' যিনি সিদ্ধহস্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। যা' বলা হয়, যা' প্রকাশ করা হয় তা' অপেক্ষা যা' অকথিত, যা' অপ্রকাশিত তা'র ব্যঞ্জনাই সাহিত্যে অধিকতর মূল্যবান। কেবল ছাপার অক্ষরে যে তথ্য পরিবেশিত হয় তা' একান্ত স্থূল, তার গণ্ডি সীমিত কিন্তু এই প্রকাশিত তথ্যের অন্তরালে যে অপ্রকাশিত জগৎ, যে অপ্রকাশিত সৌন্দর্যরাশি আপন মহিমায় শত বর্ণরাগে অনন্য হ'য়ে ফুটে ওঠে তা'র মূল্য অসীম। বস্তুতঃ এই অপ্রকাশিত সৌন্দর্যালোকের জন্যেই সাহিত্য সুন্দর। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে লেখককে অনেক কিছুই গোপন করতে হয়। ভাবের প্রাবল্যে, অনুভূতির তীব্র বেগবান স্রোতধারায় লেখক যদি কেবল ভেসেই চলেন তা' হ'লে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি কোন কালেই সম্ভব হয় না। ভাবকে আত্মস্থ করে' অনুভূতির মাধুরিমা মিশিয়ে তা'কে প্রকাশ করলে সাহিত্য প্রাণবন্ত এবং শাশ্বতকালের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে।

নীলদর্পণে আমরা দু' শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করি : উচ্চ-শ্রেণীর চরিত্র—যা'র মধ্যে গোলক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা প্রধান এবং নিম্নশ্রেণীর চরিত্র—যা'র মধ্যে তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উচ্চশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার ভাবের প্রাবল্যে ভেসে গিয়েছেন, অনুভূতির তীব্রতায় দিকহারা হয়েছেন—ফলে এই চরিত্রগুলি আপন স্বরূপে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে নি ; এক অপরিণত ভাবে এবং অস্পষ্টতার মাঝে এরা সলিল-সমাধি লাভ করেছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এদের বেলায় লেখক ভাবকল্লোলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান নি বরং ভাবকে আত্মস্থ করে' এদের সাথে একাত্মা হ'তে পেরেছেন। গোপনতার প্রকাশ মহিমায় তা'ই এই চরিত্রগুলি একান্ত সজীব ও ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে লেখন একদিকে যেমন ভাবের প্রাবল্যে ভেসে গিয়েছেন তেমনি এদের মুখে সংলাপও দিয়েছেন কাব্যধর্মী। অলংকৃত এবং উপমাবহুল সংলাপের অন্তরালে এই চরিত্রগুলি তা'দের আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। সৈরিন্ধ্রী এবং ক্ষেত্রমণি উভয়েই তা'দের স্বামীকে ভালবাসে। সৈরিন্ধ্রী যে তা'র স্বামীকে কী গভীর ভাবে ভালবাসে নবীনমাধবের মৃত্যুর পর একস্থানে তা'র প্রকাশ দেখতে পাই। নবীনমাধবের মৃতদেহ অবলোকন করে' সৈরিন্ধ্রীর উক্তি : "আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পরাণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন।" এখানে আর যাই প্রকাশ পা'ক সৈরিন্ধ্রীর অন্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা উজাড় হ'য়ে প্রকাশ লাভ করে নি। অন্যত্র : "...প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন।"...এখানে অলংকৃত ভাষার কাড়া-নাকাড়া-খোল-করতাল-মৃদঙ্গের গম্ভীর নিনাদের

অন্তরালে মূল সুরটি খান খান হ’য়ে ভেঙে নিঃশেষ হ’য়ে গেছে।

পক্ষান্তরে বেগুনবেড়ের কুঠিতে যখন পদীময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে রোগ সাহেবের কাছে যেতে জোরজবরদস্তি করে তখন ক্ষেত্রমণির মনোভাব কত সুন্দর এবং সরলভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে: “মুই পরাণ দিতি পারবো ধর্ম দিতি পারবো না।” পদীময়রাণী তা’র কথায় এগিয়ে যায়। বলে, এখানে ধর্ম দিলেও কেউ কিছু দেখতে পাবে না। এই কথার উত্তরে ক্ষেত্রের ধর্মানুগত্য এবং স্বামীর প্রতি নিঃসীম ভালবাসা কী সুন্দর ভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে: “ভাতারই যেন জান্‌তি পারলে না—ওপরের দেবতা তো জান্‌তি পারবে। …আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভালবাসবে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে।” অমার্জিত চাষার উলঙ্গ ভাষায় সতীত্বের কী মহিমাময় প্রকাশ এবং এই সতীত্ববোধের জন্যেই অবশেষে তা’র কণ্ঠে সেই চিরন্তন অস্বীকারের বাণী: “জানাই হোক, অজানাই হোক—মুই উপপতি কর্তি কখনই পারবো না।” রোগ সাহেবকে অঙ্গদান করলে সুন্দর একসেট বিবির পোশাকের উপহারের কথা যখন পদী উচ্চারণ করে তখন গ্রাম্য ভাষার আবরণে ক্ষেত্রমণির হৃদয়টা উজ্জ্বল হ’য়ে প্রকাশ পায়: “চট পর্য়ে থাকি সেও ভাল তবু য্যান বিবির পোশাক পরতি না হয়।” সাহেবকে বাবা বলে অনুনয় বিনয় করে’ যখন ক্ষেত্র ব্যর্থ হয় তখন তা’র বিদ্রোহিনী মূর্তি ভাস্বর হ’য়ে উঠে: “…ও ভাইভাতারির ভাই, মার না মোর প্রাণ বার কর্য়ে ফ্যাল না আর যে মুই সইতি পারি নে।”…

“ভাতার” এই বিশিষ্ট বাক্যটি সরলতা, সাবিত্রী কিংবা সৈরিন্ধ্রী এদের মুখে শোনা যায় নি—এদের মুখে আমরা প্রাণনাথ, প্রাণাধিক, প্রাণকান্ত ইত্যাদি উপমাযুক্ত·বিশেষণই শ্রবণ করেছি। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রমণির মুখে শুনি আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীল গ্রাম্য ভাষা। কিন্তু এই গ্রাম্য ভাষার অন্তরাল হ’তে ক্ষেত্রমণির চরিত্রটি

পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। ক্ষেত্রমণি এই গ্রাম্যপরিবেশে মানুষ, এই পরিবেশ হ'তে ছিন্ন করে' যদি তা'কে চক্‌চকে শহুরে পরিবেশে আনা হ'তো—তা' হ'লে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু অনিবার্য হ'য়ে উঠতো। আপন পরিবেশে, আপন গ্রাম্যতায় আছে বলেই ক্ষেত্রমণি এত সুন্দর, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

অনুরূপে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে তোরাপের চরিত্রটি। তোরাপ-চরিত্রাঙ্কনে লেখক সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তোরাপ অশিক্ষিত, বেপরোয়া এবং গ্রাম্য চাষা। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে সে জানে না—যা' মুখে আসে তা'ই বলে, সেই মত কাজ করে। এবং এই জন্যই তোরাপকে বুঝতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না। বেগুনবেড়ের কুঠিতে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে গিয়ে রোগ সাহেবের প্রতি নবীনমাধবের লাঞ্ছনা-বাক্য এই: "রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানদের দয়া, বিনয়শীলতা? আহা, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার!" আর তোরাপের গঞ্জনা বাক্য এই: "সমিন্দি দেঁড়য়ে যেন কাঠের পুতুল—গোড়ার বাকিয় হরে গিয়েছে—বড়বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা' ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা।" এই বিদ্রূপবাণগুলি বাণের মতই কাজ করে। তীরের ফলার মত গিয়েই বুকে বেঁধে। কিন্তু নবীনমাধবের কথা আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা হ'লেও ধারহীন। তোরাপের রূঢ় গ্রাম্য কথা অনিবার্য লক্ষ্যভেদী, নবীনমাধবের উপমাবহুল কথা পথের বাঁকে দিক হারায়।

সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে নিখিল বাংলার প্রজাকুল। তা'র আভাস পাই নবীনের কথায়। নীলকরদের জবরদস্তি কম হবে কিনা পিতার এই জিজ্ঞাসায় নবীনমাধব উত্তর দেন: "জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে্য কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়?" নির্যাতনে অতিষ্ঠ হ'য়ে অবশেষে নবীন-

মাধবের কণ্ঠে শোনা যায় হতাশার দীর্ঘ নিশ্বাস : হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ!" কিন্তু তোরাপ একেবারে বেপরোয়া —ধরণী দ্বিধা হও এই কাতর প্রার্থনার বদলে তা'র কণ্ঠ হ'তে উৎসারিত হয় এক দীপ্ত বিদ্যুৎবহ্নি : "সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতার-মারির মাটে পাই, এমনি ধাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়ুয়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।" হোক এ কথা গ্রাম্য, রুচিহীন—কিন্তু উপমাবহুল রুচিপূর্ণ ভাষায় এর সাথে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য কোথায়?

তোরাপ প্রভুভক্ত। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও "একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করো্যে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে" প্রস্থান করেছিল। কিন্তু নবীনমাধব গুরুতর আহত হওয়ায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। তারপরই তোরাপের সেই বুকফাটা আর্তনাদ : "আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে—মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না!" অকৃত্রিম প্রভুভক্তির কী অনবদ্য প্রকাশ!

নবীনমাধবের মত তোরাপ উদার নয়—"ক্ষমার মহিমা সে জানে না, আবেদনের কোন মূল্য তাহার কাছে নাই, সে সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।" এবং এই জন্যই সে সাহেবের নাক ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই একগুঁয়েমী এবং জান্তব প্রেরণার অন্তরালে তোরাপের মর্মমূলে আছে আদিম মানবপ্রীতি : "বড়বাবু যদি আপনি পলাতে পাত্তেন, সমিন্দির কান ছুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।" অত্যাচারী হোক, নেমকহারাম হোক তবু সাহেবগুলো খোদার জীব! একদিকে অকৃত্রিম প্রভুভক্তি অন্যদিকে নিঃসীম মানবপ্রীতি এই উভয়বিধ গুণ তোরাপ-চরিত্রকে মহিমান্বিত করে' তুলেছে।

'ভাতার', 'শালা', 'সমিন্দি', 'মুই', ছাড়া তোরাপ এবং ক্ষেত্রমণির মুখে কথা নেই। এ কথা অশ্লীল, অরুচিকর এবং গ্রাম্য তবুও এই

'গেঁয়ো' কথাগুলিই অনুধারণ করে' পরিপূর্ণ সজীব তোরাপ এবং ক্ষেত্রমণিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। নবীনমাধব, গোলক বসু, সৈরিন্ধ্রী এঁরা ভদ্রঘরের—মুখে ভদ্রোচিত ভাষা—কিন্তু সে ভাষা এদের কাউকে জীবন্ত করে' তুলতে পারে নি। "তাহাদের মুখের ভাষার তোড়ে হৃদয়ের ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে, হৃদয়বৃত্তির কোন প্রবল সংঘাত তাহাদের মধ্যে নাই।" কিন্তু তোরাপ ও ক্ষেত্রমণির মধ্যে এটি হয় নি। তা'দের প্রাণ সহজ এবং সরল। তা'রা অশিক্ষিত —সুতরাং প্রাণের দিক দিকে তা'রা আদিম গ্রাম্যতারই অধিকারী। আর ভাষার তো কথাই নেই। এই ত্রিবিধগুণের জন্যই তা'রা নাট্যাকাশে নির্মল, নিষ্কলুস শুকতারার মত জ্বলেছে। নাটক যখন আমরা পাঠ করি তখন তোরাপ কেবল কল্পলোকের একটি গ্রাম্য চাষা হ'য়ে আমাদের সামনে ধরা দেয় না—বরং আমরা দেখতে পাই একটি জীবন্ত গোঁয়ার-নম্র মহিষ নাটকের পাতায় পাতায় দাপাদাপি করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যিই তোরাপের মত চাষা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও আঁকা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ক্ষেত্রমণি বাংলার পল্লী ঘরের এক সরল বালিকা —তা'র লাজ-নম্র-বিধুর ছবিটি আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। সত্যই এই নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি কেবল যে নাট্যরসের আধিক্য ঘটিয়েছে তা' নয়—এই চরিত্রগুলি নাটকের গতিধারায় তীব্রবেগ সঞ্চার করে' সমগ্র নাটকটিকে দ্রুত মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

॥ *চার* ॥

সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায় "Art for Arts Sake" এবং Art with a purpose" এই দু'টি কথার সাথে আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হ'তে হয়। একটির অর্থ সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি। আর অন্যটির অর্থ প্রয়োজনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি। এই দু'টি

আদর্শের কোনটি ঠিক এবং কোনটিকে অবলম্বন করে' সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত তা' নিয়ে কেবল বাংলা দেশের নয় নিখিল বিশ্বের পণ্ডিতমহলে কত তর্কযুদ্ধই না হয়েছে। সুদূর অতীত-কালে কে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তা' আমাদের জানা নেই কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নকে নিয়ে বিরামহীন গতিতে মসীযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে—কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে কেউ সমর্থ হন নি। Art for Arts Sake-এর দল বলেছেন —যে সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হয় তা'ই শাশ্বত, তা'ই কাল হ'তে কালান্তরে পদচারণা করে' নিত্যকালের হ'য়ে ওঠে আর Art with a purpose বাদীরা বলেছেন সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যদি কোন উদ্দেশ্য নিহিত না থাকে, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন দিয়ে যদি সাহিত্য সৃষ্টি না হয় তা' হ'লে যে সাহিত্য কখনো দেশকালব্যাপী চিরন্তন সাহিত্য হ'য়ে উঠতে পারে না। মাঝ হ'তে একদল নিরপেক্ষ মত দিয়ে বলেছেন শাশ্বত সাহিত্যে এই উভয়বিধ গুণ-ই বর্তমান। সাহিত্যকে দেশ-কালের সীমারেখা অতিক্রম করে' যদি চিরন্তন হ'য়ে উঠতে হয় তা' হ'লে তা'কে মানুষকে বিশুদ্ধ আনন্দ দান করতে হবে এবং সাথে সাথে কোন না কোন প্রয়োজন মেটাতে হবে। কেবল যদি একটি সাময়িক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে' সাহিত্য রচিত হয় এবং তা'র শিল্পসম্মত প্রকাশ গৌণ হ'য়ে যদি প্রয়োজনটাই মুখ্য হ'য়ে ওঠে তা' হ'লে সে সাহিত্য কখনো চিরন্তন হ'য়ে উঠতে পারে না। সাময়িকভাবে তা' পাঠকের চিত্ত হরণ করলেও প্রয়োজন সমাপ্তির সাথে সাথে তা'র অবসান ঘটবেই।

নীলদর্পণকেও আমরা এই উভয় মানদণ্ড দিয়েই বিচার করবো। নীলদর্পণ রচনার পিছনে যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না এ কথা কখনই বলা যাবে না। নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমূলক নাটক। ভূমিকায় লেখকের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এই : "নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক

তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাবৃন্দের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়।" এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নীলদর্পণ পরিপূর্ণরূপেই উদ্দেশ্যমূলক। এমন কী এর চরিত্রগুলিও একান্ত বাস্তব। নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়ে রাইয়তদিগকে নীল বুনবার চুক্তিতে বলপূর্বক আবদ্ধ করতেন। নীলকরদের এই অত্যাচারের ইন্ধন যুগিয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং কয়েকটি বিদেশী চালিত সংবাদপত্র। যে সব রাইয়তরা নীল বুনতে অসমর্থ হ'তো তা'দের গুলি করে' কিংবা বর্শাবিদ্ধ করে' হত্যা করা হ'তো। হতভাগ্য নিপীড়িত প্রজাদের জন্যে সবুট অভ্যর্থনা তো হামেশাই চলতো। গোলক বসু এমনি এক অত্যাচারিত পরিবারের কর্তা, নবীন ও বিন্দুমাধব এমনি এক নিপীড়িত পরিবারের সন্তান। তোরাপ এবং রাইচরণ এমনই এক সর্বস্বান্ত ও বিধ্বস্ত গ্রাম্য চাষা। গোলক বসু তা'র জীবন দিয়েছে, তোরাপ তা'র হাত দিয়েছে, রাইচরণ তা'র বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছে নীলকর পাষাণদের নির্মমতায়। গৃহস্থকন্যা এবং বধূগণও এই পাষাণ শ্বেতাঙ্গদের হাত হ'তে রেহাই পেত না। তা'দের আত্মমর্যাদা, তা'দের সতীত্ব লুণ্ঠিত হ'তো এই শ্বেতাঙ্গ পশুদের দ্বারায়। ক্ষেত্রমণি এমনি এক নির্যাতিত গৃহস্থকন্যা, আদুরী এমনি এক গৃহস্থ-ঝি। আর্চিবল্ড হিল্‌স্‌ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষককন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ঐ কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একদিন দীঘি হ'তে জল আনবার জন্যে বাড়ির বা'র হয় তখন আর্চিবল্ডের লোক হরমণিকে জোর করে' ধরে কুঠিতে অর্ধরাত পর্যন্ত আটক রাখে। এই সত্য ঘটনারই ছায়াপাত হয়েছে নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির চরিত্রে। প্রজাদের মনে অসন্তোষের আগুন ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। তা'রা নীরবে বহু অত্যাচার সহ্য করেছে এখন তা'রা নিজেদের অধিকারে সচেতন।

নিখিল বাংলার আকাশে বাতাসে যখন এই বিদ্রোহের বাণী গুঞ্জন করে' ফিরছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে নীলদর্পণ প্রদীপ্ত অনল-বর্তিকার মত জ্বলে উঠলো। আকুল হ'য়ে ব্যাকুল হৃদয়ে বুকের মাঝে বরণ করে' নিল নিখিল বাংলার আপামর জনসাধারণ। সেই অগ্নি স্পর্শ করে' চরম দীক্ষায় দীক্ষিত হ'ল তা'রা। বিধ্বস্ত কৃষককুল একতার মধ্যে এক মহাশক্তি খুঁজে পেল। বাঙালীর জাতীয় জীবনে হ'লো এক মহাশক্তির উদার অভ্যুদয়। "অত্যাচারের লেলিহান জিহ্বা মুহূর্তকালের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই মহাউদ্দীপনার ফল স্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।"

নীলদর্পণ যে উদ্দেশ্যমূলক নাটক সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় যা' কামনা করেছিলেন তা' পরিপূর্ণভাবেই সফল হয়েছে। নীলকর-অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন: উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরই কি নীলদর্পণের সমুদয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে? পরবর্তীকালের মানুষের ওপর তা'র কি কোন প্রভাব নেই? নবীনমাধব, তোরাপ কি আমাদের কানে আর কোন নতুন মন্ত্র দান করে না? যদি করে সেখানেই নীলদর্পণের চিরন্তনতার মূল বীজটি সুপ্ত আছে।

নীলদর্পণের সমসাময়িক বহু নাটক রচিত হয়েছিল—কিন্তু সে-সব নাটক আজ বিস্মৃতপ্রায়। তা'দের কোন স্মৃতি আজ আর আমাদের মনকে আলোড়িত করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু নীলদর্পণ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়। নীলদর্পণ যখনই আমরা পড়ি তখনই এক অপূর্ব উন্মাদনা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত একটি চকিত দীপ্তি যেন আমাদের সর্বাঙ্গে চাবুক মারে। গোলক বসু, নবীনমাধবের কথা তখন আমরা ভুলে যাই—গোলক বসু নবীনমাধবকে অতিক্রম করে' আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অত্যাচারিত জনগণের বিধ্বস্ত ছবি। পাষাণ শ্বেতাঙ্গদের নির্মম প্রহারে যখন তোরাপের

বক্ষ হ'তে রক্তের ধারা প্রবাহিত হ'তে দেখি তখন আমাদের হৃদয়-মন ব্যাকুলভাবে দুরন্ত আবেগে কেঁদে ওঠে। দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের অত্যাচার কী উলঙ্গভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সম্মুখ হ'তে তোরাপ মিলিয়ে যায়, রাইচরণ অবলুপ্ত হয়—থাকে কেবল চির-লাঞ্ছিত, চির-অপমানিত মানবতার এক করুণ ছবি।

নবীনমাধব যখন প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তোরাপ যখন পেশী ফুলিয়ে তা'র আদিম স্বভাব নিয়ে মরণ পণ করে' প্রতিশোধের জন্য উন্মত্ত হয়—তা' কেবল নিষ্ঠুর নীলকরদের বিরুদ্ধে গ্রাম্য চাষীর প্রতিবাদ নয়, দুঃখ-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তা' নিত্যকালের প্রতিবাদ। সেজন্য নীলদর্পণ "রক্ত-আখরে চিরকালীন শোষিত, মুক্তিকামী জনগণের জীবনবেদ" হ'য়ে উঠেছে।

ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেব যখন চরম অত্যাচারে মেতে ওঠে সে অবমাননা কেবল নীলকর এবং বাংলার বধূদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—তা'তে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের জান্তব চরিত্রের কাছে দুর্বল নারীর আত্মাহুতি এবং লাঞ্ছনারই পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রভুর সাহায্যের জন্যে তোরাপের যে বিক্রম দেখেছি তা' চিরকালীন প্রভু-আনুগত্যের সোনালী লিখন। বর্তমানের বাস্তবতার সূত্রপাত নীলদর্পণেই হয়েছে। নীলদর্পণেই দীনবন্ধু বাস্তবতার পথনির্দেশ করেছেন। "লেখকের দৃষ্টি এই সর্বপ্রথম আদর্শের নন্দনকানন হইতে বিদায় লইয়া বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায় সঞ্চরণ শুরু করিয়াছে, ধনীর বিলাস-হর্ম্যের মায়া কাটাইয়া দরিদ্রের করুণ্য-কুটিরে প্রকৃত সত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, ক্ষেত্রমণিও তাহাদের দুঃখবেদনা শুনাইবার দরদী শ্রোতা পাইয়াছে।" নীলদর্পণ পরবর্তী বহু নাট্যকারকে যে সামাজিক নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল তা' বলাই বাহুল্য। তা' ছাড়াও এই গ্রন্থে যে করুণরস বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী বহু নাট্যকারকে এমন কি নাট্য-সম্রাট গিরীশচন্দ্রকেও তা' গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তা'র প্রমাণ নিহিত রয়েছে গিরীশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' ইত্যাদি বহুবিখ্যাত নাটকের পৃষ্ঠায়। নীলকরদের অত্যাচার উচ্ছেদের মধ্যেই যদি নীলদর্পণের কাজ শেষ হ'য়ে যেত তা' হ'লে কখনই পরবর্তী নাট্যকারগণ এমন ভাবে প্রভাবিত হতেন না। সব শেষে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ উক্তি : "বহু পুরাতন জনপ্রিয় নাটক বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিকার দিনেও নতুন করিয়া নীলদর্পণের অভিনয়ের আয়োজন যে দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহাতে প্রমাণিত হয় সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিত্যকালের সাহিত্য-দরবারে ইহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।"

নীলদর্পণ রচনার পিছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল তা' আমরা দেখেছি—কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সাধনই এই নাটকের প্রাণধর্ম নয়। প্রকাশভংগীর গুণে এ নাটক সেই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে' সর্বকালীন হ'য়ে উঠেছে। এখানেই এই গ্রন্থ সর্বকালীন শাশ্বত-সম্পদ।

॥ *পাঁচ* ॥

নায়ক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নায়ক-চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। নায়কের ধ্যান, নায়কের কল্পনা, নায়কের কার্যকলাপ ইত্যাদিকে অবলম্বন করেই নাটকের দৃশ্যাবলীর ক্রমবিকাশ সাধিত হয় এবং কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে বেড়ে চলে। নাটক যদি বিয়োগান্ত না হয় তা' হ'লে সে নাটকের নায়ক সাধারণতঃ শান্ত, ধীর স্থির হ'য়ে থাকে। দয়াশীল, ক্ষমাশীল এবং পুণ্যবান হওয়াও বিচিত্র নয়। ধর্ম কোন কোন নাটকের নায়কের প্রাণবস্তু হ'য়ে ওঠে।

নীলদর্পণ নাটকের মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি চরিত্রে আমরা উল্লিখিত গুণগুলির সমাবেশ দেখি—গোলক বসু এবং নবীনমাধব। গোলক বসু পরম ধার্মিক—দয়াশীল এবং ক্ষমাশীলও। কিন্তু নায়কোচিত যে চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন তা' গোলক বসুর চরিত্রে নেই। তিনি অল্পে ভীত হ'য়ে পড়েন; সামান্য বিপদেই তাঁ'র প্রাণান্তকর অবস্থা উপস্থিত হয়। ফলে তাঁকে নীলদর্পণের নায়কের পদে বরণ করে' নিতে আমাদের মন সায় দেয় না। অবশ্য গোলক বসুকে কেন্দ্র করে' নাটকের গতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সত্য, তা'র কারাবাসে নবীনমাধবের বিচলিত অবস্থা ইত্যাদি, কিন্তু মূল কাহিনীতে গোলক বসু অপেক্ষা নবীনমাধবের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে অধিক। নবীনমাধবও পিতার ন্যায় ধর্মভীরু এবং শান্ত নিরীহ মানুষ। কিন্তু বিপদ দেখে তিনি বিচলিত হ'লেও ধৈর্যহারা হ'য়ে পড়েন না। এখানে তাঁ'র চরিত্রে নায়কোচিত স্বভাবেরই সমাবেশ ঘটেছে। প্রজাবৃন্দ এবং প্রতিবেশিগণ নবীনমাধবের ওপর অধিকতর আস্থাশীল। Dramatic action দেখবার জন্যে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের সরল কাহিনীতে এসে সংযুক্ত হ'য়ে তা'কে জটিল করে' তোলে। নায়ক সেই বিপদরাশি অতিক্রম করে', জটিলতার গ্রন্থিজাল ছিন্ন করে, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সাথে আপন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু নীলদর্পণে কোন চরিত্রে আমরা এই বলিষ্ঠতার পরিচয় দেখি না। সাধুচরণের কথায় একবার মাত্র জানা যায় স্বরপুর-বৃকোদরের বিক্রম-কাহিনী, আর একবার এই বিক্রম দেখি ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের বেলায়। সেখানে নবীনমাধব যথেষ্ট সংগ্রামশীল হ'য়ে উঠেছেন—কিন্তু ঐ একটিবার মাত্র। নাটকের মধ্যে আর সর্বত্র তিনি জড় পুত্তলিকা। সুতরাং নবীনমাধবকেও এই গ্রন্থে নায়ক বলা যায় না।

দৃঢ়তা এবং সংগ্রামশীলতার পরিচয় অদ্ভুত হ'য়ে ফুটেছে তোরাপ চরিত্রে। বিপদে সে ভেঙে পড়ে না। যে তা'কে অপমান করে সে-ও তা'কে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়। গ্রাম্য চাষা, সে

সেই আদিম আইনে বিশ্বাসী—হাতের বদলে হাত, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জীবনের বদলে জীবন। ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের বেলায় তা'র চারিত্রিক যে দৃঢ়তা ও সংগ্রামশীলতা দেখি তা' কোনদিন ভোলবার নয়—কিন্তু তোরাপ একটি পার্শ্ব চরিত্র মাত্র, সে নায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়।

নীলদর্পণ বিয়োগান্তক নাটক। সুতরাং বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্যের সাথে নীলদর্পণের প্রধান চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁর 'Theory of Drama-'তে বলেছেন যে, পুরুষ-চরিত্রই সব সময় ট্রাজেডির নায়ক হবে। নীলদর্পণ পুরুষ-চরিত্র-প্রধান নাটক—সুতরাং এদিক দিয়ে এ গ্রন্থের নায়ক পুরুষ হওয়া বিচিত্র নয়। Aristotle তা'র Poetics' গ্রন্থে বলেছেন যে ট্রাজেডির নায়ক অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ হবেন না, তিনি পাপী এবং দুষ্কৃতকারীও হবেন না কিন্তু কোন মানবীয় ( human ) ভ্রান্তির জন্য ট্রাজেডি অনিবার্য হ'য়ে উঠবে: 'But a character of this is one who neither excels in virtue and justice, nor is changed through vice and depravity into misfortune from a great renown and prosperity, but has experienced this change through some ( human ) error, এ মানদণ্ডেও বিচার করলে দেখা যায় গোলক বসু এবং নবীনমাধব নীলদর্পণের নায়ক হওয়ার উপযুক্ত নন —কেননা তাঁ'রা পাপী ও দুষ্কৃতকারী নন বরং তাঁ'রা অত্যন্ত ধার্মিক। ন্যায়পরায়ণতাই তাঁদের জীবনের মর্মমূল হ'তে উৎসারিত হয়েছে। অন্যায়ের পথে তাঁ'রা কোনদিনই পদক্ষেপ করেন নি। তা' ছাড়াও এই গ্রন্থ যদি ট্রাজেডিপূর্ণ হয় তা' হ'লে এ ট্রাজেডি কোন মানবীয় ভ্রান্তির ( human error ) দ্বারা সংঘটিত হয় নি। এ ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে।

সেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ ট্রাজিক নাটকগুলিতে দেখা যায় নায়কের স্ব-কৃত

কোনো না কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ট্রাজেডি নিয়তির মত অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু এখানেও সেই একই কথা। গোলক বসু কিংবা নবীনমাধব এদের কোন স্ব-কৃত ভ্রান্তির জন্যে ট্রাজেডি সংঘটিত হয় নি—এ ট্রাজেডি এসেছে বাইরে থেকে।

নীলদর্পণের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একটিও দানা বেঁধে জমাট হ'য়ে ওঠে নি। গোলক বসু, নবীনমাধব কিংবা অন্য কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করে' এ কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নি। কেন্দ্রীভূত কোন চরিত্রই এতে নেই। দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে কয়েকটি খণ্ডিত ছবি যেন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফলে এ গ্রন্থের কোন চরিত্রকেই আদর্শ নায়ক বলা যায় না। যদি কোন চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে নায়ক বলে' স্বীকার করতেই হয়—তা' হ'লে নবীনমাধবের চরিত্রই এই গৌরবের অধিকারী। কাহিনী তাঁ'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হ'লেও অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা মূল কাহিনীতে নবীনমাধবের প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

## ॥ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

### ॥ এক ॥

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় পৃথিবীর সকল দেশে সকল সাহিত্যেই সর্বপ্রথম হয়েছে পদ্যের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। পদ্যের আগমন এবং সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুকাল পরে ধীরে ধীরে গদ্যের উন্মেষ ঘটেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সকল দেশেই মানুষ তা'দের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে মনের ভাব প্রকাশ করেছে গদ্যের মাধ্যমে—সেখানে পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গদ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সর্বাগ্রে কিন্তু সাহিত্যে তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বহুকাল পরে। কেন? কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সকল দেশের সাহিত্যের কৈশোরাবস্থা কেটেছে যুক্তি-তর্কহীন অন্ধ ধর্মীয় আবেগের মধ্যে। সেখানে অন্ধ বিশ্বাস, অসীম উচ্ছ্বাস ছিল বিশেষরূপে ক্রিয়াশীল। পদ্য এই অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের উপযুক্ত বাহন। কবিতায় যে ভাবে সীমাতিক্রমী আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয় গদ্যে তা হয় না। গদ্য বৈজ্ঞানিক মনের দান। উচ্ছ্বাসহীন যুক্তিতর্কের পটভূমিতেই তা'র জন্ম। তা'ই কালের অগ্রগতিতে মানুষের মন যখন অন্ধ বিশ্বাসের আবেগবহুল পথ পরিত্যাগ করে, ক্রমান্বয়ে বিচার-বিবেচনার পথে পদচারণা করল তখন নিয়তির মত অনিবার্য কারণ বশতঃ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের হ'লো আবির্ভাব। আধুনিক কবিতায় যে গদ্যের প্রবেশাধিকার ঘটেছে তা'রও মূল কারণ এখানে নিহিত। আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে' বাংলা কবিতা এখন সমস্যা-সঙ্কুল বাস্তবাভিসারী হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব যে পরে ঘটেছে সে সম্পর্কে আরো একটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। পূর্বে বাংলা কাব্যের

"প্রধান বাহন ছিল পয়ার ছন্দ। বাংলা পয়ার ছন্দ বড়ই নমনীয় এবং সর্ববিধ ব্যবহারের উপযোগী। অনতিস্বল্পপরিসর পয়ার ছন্দের মধ্যে বাংলা ভাষার সরল বাক্যমূলক বাক্‌ভংগীর প্রকাশে কোন বাধা হয় না। এই হেতু পুরাতন বাংলা সাহিত্যে বোধ এবং যুক্তিমূলক ভাবপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। পয়ারের মধ্যে সংযোজক অব্যয় অথবা অসমাপিকার প্রাচুর্যের কিংবা তালহীন জটিল বাক্য-পরম্পরার অবসর একেবারেই নাই, এজন্য পয়ারের ছাঁদে পর পর সরলবাক্যের মধ্য দিয়া ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিচারেও যে পয়ার ছন্দের ক্ষমতা কত দূর প্রসারিত হইতে পারে তাহার সুষ্ঠু পরিচয় পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য-চরিতামৃত'গ্রন্থে।"
এবার আমরা বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শনাদির দিকে মনোযোগ দেব। বাংলা পদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'—যার রচনা-সূত্রপাত আনুমানিক ৯৫০ খ্রীঃ হ'তে। কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে মাত্র ষোড়শ শতাব্দী হ'তে। বহু অনুসন্ধানের পরও এর পূর্ববর্তীকালের এক ছত্র গদ্য লেখা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নি। ষোড়শ শতাব্দী হ'তে আমরা বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাই তা' প্রধানতঃ চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে। বলাবাহুল্য বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারায় এদের যে স্বল্পমূল্য আছে সেটুকুই এদের একমাত্র প্রাপ্য—এ ছাড়া এদের কোন স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য নেই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে তোডরমলের সময় 'সেকশুভোদয়া' নামে একটি বই সংকলিত হয়। বইটির ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের অন্তরালের বাংলা গদ্যের স্বরূপ এবং কাঠামো সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। সেজন্য বিশিষ্ট সমালোচকগণ পুস্তকখানিকে ষোড়শ শতকের বাংলা গদ্যের প্রতিচ্ছবির নিদর্শন হিসেবে ধরেছেন। বাংলায় লেখা প্রাচীনতম পত্র এবং নিদর্শন হিসেবে পণ্ডিতগণ যে পত্রটির কথা উল্লেখ করেন তা' ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ("শক ১৪৭৭ মাস

আষাঢ়”) কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আসামরাজকে লিখিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ই আষাঢ়, ১১০৩ সালে) লিখিত একটি চুক্তিপত্রের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলের উপভাষার একটি সুন্দর রূপ ধরা পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত (১১৩৮ সালের বৈশাখ মাস) যে দলিলটি পাওয়া গিয়েছে তা' যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবেও তেমনি মূল্যবান। রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া স্ত্রী অথবা পরকীয়া নায়িকা এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্বকীয়াবাদের সমর্থক জয়পুরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বাংলায় আসেন এবং পরকীয়াবাদের সমর্থক আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের সাথে সুদীর্ঘ ছ' মাস ধরে তর্কে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে' রাধামোহন ঠাকুরকে গুরু স্বীকার করে' এই দলিল লিখে দেন।

Father Hasten-এর মন্তব্য মন্তব্য হ'তে আমরা জানতে পারি যে ১৫৯৯ খ্রী: পূর্বে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলায় কিছু কিছু পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। বাংলা সাহিত্যে বিদেশীর দান নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন বৈষ্ণব সাধকগণের পুস্তক রচনায় বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী বৈষ্ণব-সাধকদিগের একটি সম্প্রদায় গদ্যে পদ্যে “কড়চা” জাতীয় কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। কড়চা অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীতে নরোত্তম দাস রচিত “দেহকড়চা” এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই কড়চার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'লো:

“তুমি কে? আমি জীব। তুমি কোন্ জীব? আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা? ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে হইল? তত্ত্ববস্তু হৈতে। তত্ত্ববস্তু কি? পঞ্চ আত্মা।” ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলা গদ্যের সাধু রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালে লিখিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটকের গদ্যাংশযুক্ত সংলাপ হ'তে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরো কয়েকখানি গদ্য নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তা' ছাড়া বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনূদিত ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের গদ্যানুবাদ হ'তে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বিক্রমাদিত্য-বেতাল ঘটিত অপূর্ব কাহিনী হ'তে সেকালের গল্প বলা ঢং-এর বাংলা গদ্যের নিদর্শনটি সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে রচিত "শূন্যপুরাণে" বাংলা গদ্যের কিছু কিছু রূপ ধরা পড়েছে কিন্তু বিশিষ্ট সমালোচকগণ "শূন্যপুরাণে" ব্যবহৃত গদ্যাংশকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন না বলে ছড়া বলার পক্ষপাতী।

॥ দুই ॥

বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে বিদেশী লেখকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অকৃপণ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়। বাংলা গদ্যে বিদেশীদের দানের আলোচনা সুবিধার জন্যে আমরা বিষয়টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে' নিতে পারি। প্রথম ভাগের কাল-সীমা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ হ'তে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বে বাংলা গদ্যের যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা' একান্ত ভাবে রোম্যান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোর্তুগীজ পাদরীদের দ্বারা। দ্বিতীয় পর্বের কাল-পরিধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পাদরীদিগের দ্বারা প্রথম পর্বে বাংলা গদ্যের যে উন্মেষ ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্বে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত মিশনারীদিগের দ্বারা তাঁই অভিনব প্রাণ-প্রাচুর্যে ও সম্ভাবনায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম পর্বের আলোচনা: ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পোর্তুগীজগণ

ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে বাংলা দেশে আসেন। বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই পোর্তুগীজ পাদরীগণ এদেশে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাধ্য হ'য়ে তাঁ'দের বাংলা ভাষা শিখতে হয়। কেন না বাঙালীর সাথে মেলা-মেশার জন্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাংলা ভাষা শিক্ষালাভ করে' কথ্য এবং লেখ্য উভয় প্রকারে তাঁ'রা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। ধর্মপ্রচারে এই লিখিত প্রচেষ্টাই বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। পাদরীগণ খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে' তা' জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করতেন। Father Hasten-এর উক্তি এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ'-এর প্রস্তাবনা হ'তে জানা যায় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই ধরনের দু-একটি পুস্তক রচিত হয়েছিল। এই পুস্তিকাগুলির কোন সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও গদ্যের ক্রমবর্তন ইতিহাসে তাদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এখানে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক পাদরীগণের এই অনুবাদ-প্রচেষ্টার সম্মুখে বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ বা নমুনা ছিল কিনা। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকগণ বলেছেন যে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়গণ সাধনতত্ত্ব সম্পর্কীয় যে প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা কড়চা রচনা করেন সেগুলিই ছিল এই অনুবাদ-প্রেরণার উৎস-মূল এবং আদর্শ স্থানীয়। এ ছাড়া তখনকার দিনে "বাংলা সাধু-ভাষায় গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছিল।" এর পর বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠ রূপদানে দোম আন্তোনিওর—Dom Antonio—নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। দোম আন্তোনিও আসলে বাঙালী। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার এক রাজপুত্রকে মগ-দস্যুরা চুরি করে' নিয়ে যায়। এক পোর্তুগীজ পাদরী বহু টাকার বিনিময়ে দস্যুদের হাত হ'তে রাজপুত্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং নামকরণ করেন দোম আন্তোনিও। এই দোম আন্তোনিও ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অবিচ্ছিন্ন গদ্যে 'ব্রাহ্মণ রোম্যান

ক্যাথলিক-সংবাদ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থকেই অবিচ্ছিন্ন সাধুভাষায় রচিত প্রাচীনতম গদ্য পুস্তক বলে মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ এই গ্রন্থের মাত্র কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'লো: "রামের এক স্ত্রী, তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ, তাহান ভাই লকন, রাজা অযোদ্যা বাপের সত্য পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন...ইত্যাদি।

এর পরবর্তী গ্রন্থ পাদরী মানোএল-দা-আসুম্পসাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহর হ'তে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিকে পণ্ডিতগণ প্রাচীনতম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক বলে মনে করেন। এবার গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। গ্রন্থখানি রচিত হয় ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। মানোএল-দা-আসুম্পসাঁ — Manoel-da-Assumpsam ঢাকা জেলার ভাওয়ালে অবস্থান করতেন। সুতরাং তাঁ'র গ্রন্থের মধ্যে ভাওয়ালের কথ্যভাষার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। দোম আন্তো-নিওর গ্রন্থখানি ছিল পুরাপুরি সাধুভাষায় লেখা কিন্তু আসুম্পসাঁর গ্রন্থখানি কথ্য এবং সাধুভাষার সংমিশ্রণ বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে গ্রন্থখানির ভাষা পোর্তুগীজগন্ধী। কেবল গ্রন্থ রচনায় নয়—বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট কাঠামো গঠন করার জন্যে আসুম্পসাঁ পোর্তুগীজ ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণও রচনা করেন। এই ব্যাকরখানিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ব্যাকরণ। বাংলা পোর্তুগীজ শব্দকোষ-সংকলন আসুম্পসাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা: মানোএল-দা-আসুম্পসাঁর পর প্রথম পর্বে আর কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচিত হয় নি। এর পর মুদ্রণ কার্যে বাংলা অক্ষরের প্রবর্তনায় বাংলা গদ্যের নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষাৎভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে বাংলার শাসনভার। এর পর হ'তে কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে বাংলা শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে। এ উপলক্ষে কোম্পানির কর্মচারী ব্র্যাসি হ্যাল্‌হেড ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে

সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে একটি বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়, স্যার উইলিয়ম জোন্স্ হলেন বাংলা মুদ্রণ-অক্ষরের সৃষ্টিকর্তা।

কোম্পানির আইনের পুস্তকগুলি অনুবাদ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল এ সময়। এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধি সংক্রান্ত তিনখানি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই সব অনুবাদের ভাষা সর্বত্র সহজ এবং সুগম নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যের নবজন্ম ঘটে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী এবং মে মাসে যথাক্রমে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—College of Fort William স্থাপিত হয়। বাংলা গদ্যের ক্রমপরিপুষ্টিতে এই উভয় প্রতিষ্ঠানের দান চিরস্মরণীয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বাইবেল, খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে' শিক্ষিত এবং সাধারণ সমাজের মধ্যে বহুলরূপে প্রচার করা। তা' এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মাধ্যক্ষগণ করে' ছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এবং এই গ্রন্থের পূর্বেও 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে Gospel of st. Mothew-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা শিক্ষা করা কোম্পানির কর্মচারীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। বাংলা বিভাগ ছিল এই কলেজের অন্যতম। এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম কেরী এবং কেরীর অধীনে ছিলেন দুজন পণ্ডিত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি—এবং ছ'জন সরকারী—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। বাংলা পড়াতে গিয়ে কেরী সাহেব বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করেছিলেন। মূলতঃ

তাঁ'র অদম্য উৎসাহে বাঙালী পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, ফলে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিকতার সাথে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি গঠিত হয়। বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও দু'খানি বাংলা গদ্য পুস্তক, একখানি ইংরাজীতে বাংলা ব্যাকরণ এবং 'কথোপকথন', 'ইতিহাসমালা' নামে আরো দু'খানা বই কেরীর নামে প্রচলিত আছে। শেষোক্ত বই দু'খানা উইলিয়ম কেরীর রচনা কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ আরোপ করেছেন। যা' হোক কেরী সাহেবের নিজস্ব রচনা ছাড়া তাঁ'র অদম্য উৎসাহে এবং উপদেশে বাঙালী পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাংলা গদ্যের যে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছিল—সেখানেও কেরীর দান এবং মূল্য বাঙালী মাত্রই চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রচার-প্রসার এবং বিবিধ পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য বিকাশের যে অভিনব পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেখানেও বিদেশীগণই পথপ্রদর্শক। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল এবং মে-তে বিদেশীগণের দ্বারাই সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' এবং সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। বলাবহুল্য এই পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের অভিনব বিকাশ ঘটেছিল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কার, অনুবাদ গ্রন্থ এমন কি সংবাদপত্র ইত্যাদি সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান-আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশীগণ ক্রমে ক্রমে বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠ রূপ দান করার চেষ্টা করেছেন। জন্ম-লগ্ন হ'তে কৈশোরাবস্থা পর্যন্ত বাংলা গদ্য যেন বিদেশীদের হাতেই লালিত-পালিত হয়েছে। এ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে বিদেশীগণকেই বাংলা গদ্যের জনক বলা সঙ্গত। কিন্তু কিছু কথা আছে। কেবলমাত্র বিদেশীগণের দ্বারাই যে বাংলা গদ্যের জন্ম এবং বিকাশ সাধিত হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। কেন না পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি বিদেশীগণের আগমনের পূর্বেও বিভিন্ন কড়চা ইত্যাদির

মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছে। এছাড়াও বিদেশীগণের রচনার বলিষ্ঠরূপ গড়ে ওঠার পূর্বেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শাস্ত্রের বলিষ্ঠ গদ্যানুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল। এ সকল পুঁথির কথা উল্লেখ করে' ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: "এই সকল পুঁথির সন্ধান না রাখিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে শ্রীরামপুরের পাদরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তন হইয়াছিল। এই অনুমানের মূলে আছে একদেশদর্শিতা এবং অসম্যক্‌বোধ।" এ প্রসঙ্গে ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত একটি সুন্দর কথা বলেছেন: "অনেকের ভিতরে এইরূপ একটা অদ্ভুত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয় বণিক এবং ধর্মযাজকগণের আবির্ভাব না ঘটিলে আমাদের গদ্য সাহিত্য গড়িয়াই উঠিত না। বাংলা গদ্য সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার কাজে ইউরোপীয় ধর্মযাজকগণের দান কিছুতেই অস্বীকার্য নয়,—তাই বলিয়া তাহাদের অনাগমনে এখনও পয়ার বা লাচাড়ী প্রবন্ধে আমরা আমাদের সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত করিয়া চলিতাম এমন কথাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কালপ্রবাহের ভিতরে বীজাকারে উপ্ত ছিল গদ্য সাহিত্যের সম্ভাবনা,—প্রকৃতির অযাচিত দানের ন্যায় পশ্চিমের আলো-হাওয়া, বাংলার উর্বরক্ষেত্রে তাঁহার সহৃদয় বর্ষণ এই বীজকে অতি অল্পকালের ভিতরে বাড়াইয়া তুলিয়াছে শাখায়-পল্লবে ফুলে-ফলে।" বস্তুতপক্ষে বাংলা গদ্যে বিদেশীগণের দান সম্পর্কে এটাই হ'লো সার কথা। বিদেশীদিগকে বাংলা গদ্যের জনক বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে যেমন সত্যের অপলাপ হয় তেমনি পরশ্রীকাতরতায় তাদের নামকে প্রত্যাখ্যান করলেও অন্যায় করা হয়। আসলে কালের প্রবর্তনে বাংলা গদ্যের উন্মেষ বাঙালীদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। বিদেশীদের আগমনে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় সেই উন্মেষ ত্বরান্বিত হয়েছে মাত্র।

॥ তিন ॥

বর্তমান বাংলা গদ্যের অর্থগৌরব-দীপ্ত এবং অলংকার সমৃদ্ধ যে অনন্যসাধারণ উন্নতরূপের সাথে আমরা পরিচিত তা' প্রধানতঃ সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার উদ্ভবের সাথে সাথে বাংলা গদ্য বিকাশের রুদ্ধ বেগবান উৎসমূলটি খুলে গিয়েছে। যে সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে' বাংলা গদ্যের এই অসাধারণ উন্নতি তা'র জন্ম কিন্তু সেদিন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। অবশ্য এর আগেও দু'-একখানি পত্র-পত্রিকার সন্ধান মেলে—সেগুলি ইংরাজীতে মুদ্রিত, বাংলা গদ্যের উন্নতি-সাধনে তাদের কোন মূল্য নেই।

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রথম প্রবর্তনার মতো আমাদের দেশে সংবাদপত্রেরও প্রতিষ্ঠা হয় ইংরাজদের দ্বারা। বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র Hicky-র 'Bengal Gazette'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নামকরণ কেবল ইংরাজীতে নয়—ইহা ইংরাজীতে মুদ্রিত এবং এরও সম্পাদক ছিলেন একজন ইংরেজ। এর পর 'India Gazette', 'Calcutta Gazette', 'Harkara' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ১৭৮০ খ্রী: হ'তে ১৮১৮ খ্রী: মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এ পত্রিকাগুলিও পূর্বের মত ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত। সাময়িক পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যবহার পাই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে—শ্রীরামপুরের মিশনারী হ'তে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি ক্ষুদ্রায়তন মাসিক পত্রিকায়। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটিতে 'ভূগোল, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী প্রকাশিত হ'তো। দিগ্‌দর্শনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী। সেজন্য

স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগ্‌দর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলন লাভ করেছিল।'

দিগ্‌দর্শনের পর উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ'। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক এবং প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশের তারিখ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস। এ পত্রিকাটিও শ্রীরামপুর মিশনারী হ'তে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। কিন্তু নামে মাত্র। আসলে পত্রিকাটির সকল কিছু করতে হ'তো জয়গোপালাল তর্কলঙ্কার মহাশয়কে। 'সমাচার দর্পণে'র প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি হ'তে বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা' লঘু এবং গুরু উভয়প্রকার গদ্যের পরিচয়বাহী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের রচনায় আছে সংস্কৃতাদর্শের গুরুগম্ভীর রচনা আবার ছোট ছোট চিত্তাকর্ষক বর্ণনা এবং উপাখ্যানে পাওয়া যায় সহজবোধ্য লঘুরচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন 'সমাচার দর্পণের' প্রধান লেখক—এর রচনায় লঘু এবং গুরু উভয় প্রকার গদ্যাদর্শের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

বাঙালীর দ্বারা সম্পাদিত এবং মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম 'বাংলা গেজেট'। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক। সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক কলিকাতা হ'তে ১৮১৮-র জুন মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বাংলা গেজেটে'র কোন সংখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ পত্রিকার বাংলা গদ্যের আদর্শ যে কিরূপ ছিল তা' জানবার কোন উপায় নেই।

এর পর যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বাহির হয় তা'র নাম 'সংবাদ কৌমুদী'। পত্রিকাটি রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন নেতার অদম্য উৎসাহে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা হ'তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রকাশের একটু ইতিহাস আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা ছিল বলে এতে হিন্দুধর্মের কুৎসা এবং আক্রমণমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হ'তো এবং

প্রতিবাদমূলক কিছু ছাপা হ'তো না। 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশ তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমে রামমোহন 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির উপযুক্ত জবাব দিতেন এবং এই উত্তর প্রত্যুত্তর-এর মাধ্যমে রামমোহন রায় কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে বিতণ্ডামূলক গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশক। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের স্বল্পকাল পরেই ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্র ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশ করেন। এই ভাবে রামমোহন-পক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। রামমোহন-পক্ষীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা তিনটি—'ব্রাহ্মণ সেবধি' —১৮২১, 'সংবাদ কৌমুদী'—১৮২১, এবং 'বঙ্গদূত'—১৮২৯ আর রামমোহন বিপক্ষীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রধান হ'লো দু'টি— 'সমাচার চন্দ্রিকা'—১৮২২, এবং 'সংবাদ তিমিরনাশক'—১৮২৩। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এই যুগের বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রধান লেখক রামমোহন রায়ের রচনা অপেক্ষাকৃত সরল। তিনি উপদেশাত্মক, আখ্যানমূলক বা শিক্ষামূলক যে সকল প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সেগুলিতে আধুনিক বাংলার ছোট গল্পের কিছু রূপ ধরা পড়েছে। এগুলি যেমন অনাড়ম্বর, সরল, তেমনি চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু রাম-মোহনের প্রবন্ধাদির অধিকাংশই সংস্কৃতগন্ধী। রামমোহনের গদ্যরচনা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য : "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এ জন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"

'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পাদক এবং প্রধান লেখক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ ভাবধারা এবং আদর্শে ছিলেন প্রাচীনপন্থী। সমাজ-সংস্কারের উগ্রতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। রামমোহনের সাথে মনোমালিন্য হওয়ার মূল কারণও ভবানীচরণের এই মানসিক দৃষ্টিভংগীর কৌণিকতা। তাঁ'র নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয় ইত্যাদি নিবন্ধ পুস্তকগুলি সে-যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ভবানীচরণের গদ্যভংগী অজটিল নয়। মাঝে মাঝে দীর্ঘবিলম্বিত সংস্কৃত লয়-তালের সমাবেশ ঘটেছে।

এর পর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'সংবাদ-প্রভাকর'। পত্রিকাটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের—১২৩৭ সাল, মাঘ—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে দৈনিকে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য 'সংবাদ-প্রভাকর'ই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় বহু কবি-সাহিত্যিকের আত্মবিকাশ ঘটে। বাংলা গদ্যের উন্নতি-সাধনে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র মূল্য অল্প নয়। অলংকারবহুল নতুন ধরনের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় 'সংবাদ-প্রভাকরে'র মধ্যেই। বঙ্কিমের অনুপ্রাসবহুল গুরুগভীর অলংকৃত গদ্যরচনা প্রকাশের সূত্রপাতও এই পত্রিকায়। ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বলা যায় যদিও তাঁ'র গদ্য রচনার প্রভাব এই যুগের সকল লেখক এবং পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল তথাপি পদ্যে তিনি যে সুনাম অর্জন করেছিলেন গদ্যে তা' অনুপস্থিত।

'সংবাদ-প্রভাকরে'র পর 'জ্ঞানান্বেষণ', 'জ্ঞানোদয়' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাগুলি ১৮৩১ হ'তে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় কিন্তু বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় এদের সামান্য মূল্য থাকলেও সাহিত্যের ইতিহাসে এদের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এর পর 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'—বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ গদ্যরচনার সূতিকাগার। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে' বাংলা গদ্যে নতুন প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার ঘটে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩

খ্রীষ্টাব্দে। সম্পাদক হন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকাটি ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। সমিতির বিবরণ, কার্যসভার আলোচনা বক্তৃতার অনুলিখন, সংবাদ ইত্যাদির প্রকাশ ছিল এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা গদ্যের নবযুগ প্রতিষ্ঠার সকল বলিষ্ঠ লেখকগণই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত আত্মপ্রকাশ করেন। অসংখ্য লেখকের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা ছিল তত্ত্ববোধিনীর প্রাণ-সম্পদ। অধ্যাপক মদন-মোহন কুমারের ভাষায়ঃ "সুদীর্ঘ মিশ্র বা যৌগিক বাক্য ব্যবহারের কৌশলকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া বাংলা গদ্যের মধ্যে যে শ্রুতিসুখকর গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতার সৃষ্টি করা যায়, তাহা অক্ষয়কুমারের প্রকাশিত বক্তৃতাগুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। কেবল বাগ্মিতা-প্রকাশে নয়, বৈজ্ঞানিক রচনার তত্ত্বনিষ্ঠায় ও ঐতিহাসিক আলোচনার যুক্তিপূর্ণ গাম্ভীর্যে অক্ষয়কুমারের রচনা সমভাবেই সার্থক এ কথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনায়, ইতিহাসের তথ্যানুশীলনে, ভাষাতত্ত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য কঠিন আলোচনায় যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ কতখানি সুষ্ঠু হইতে পারে অক্ষয়কুমার তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষাগত সৌন্দর্যবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রবন্ধত্রয়ের ভাষায়। বাংলা গদ্যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তাঁহার রচনারীতির দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক সুদীর্ঘ বার বছর তত্ত্ববোধিনী সম্পাদিত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েক বছরের জন্য পত্রিকাটির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগরের মহাভারত উপক্রমণিকা পর্বের অনুবাদ সর্বপ্রথম এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয়—যে গদ্য এবং উপাখ্যান রচনায় বিদ্যাসাগরের নিজস্ব গদ্য-রীতি, শিল্প-সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে তা' কোন মাসিক বা সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

তত্ত্ববোধিনীর পর উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। পত্রিকাটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকাটিই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সচিত্র পত্রিকা। বিবিধার্থের প্রথম সংখ্যাতেই তা'র উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে : "যাহাতে এই পত্র সকলে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের কর্তব্য ;...অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্র-সমাজে কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদে।" এই ঘোষণাপত্র হ'তে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে বিদ্যাসাগরীয় সমাসবহুল সংস্কৃতগন্ধী সাধু-ভাষা অপেক্ষা প্রচলিত সহজ সরল ভাষার দিকেই ছিল এ পত্রিকার পরিচালক-গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব। বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে সাধুভাষাকে নাকচ করে' দিতে না পারলেও পত্রিকাখানি সাধুভাষার গুরুগম্ভীর নিনাদকে অনেকখানি ক্ষীণ করে' ফেলেছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টার পরও সাধুভাষার যে বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত আবরণ ছিল 'মাসিক পত্রিকা'র আবির্ভাবে তা' একেবারেই ছিন্ন হ'য়ে গেল। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকদ্বয়ের সরব ঘোষণা বিশেষরূপে লক্ষণীয় : "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই ঘোষণার উপযুক্ত ভাষ্যরূপ প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যে আটপৌরে চলতি ভাষা এতদিন ব্যবহৃত হ'য়ে আসছিল 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে সর্বপ্রথম তা'দের একটা কৌলীন্যরূপ দেওয়া

হ'লো। বস্তুতপক্ষে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বিরুদ্ধে 'আলালের ঘরের দুলাল' যেন চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই চলতি ভাষা ব্যবহারের জন্যে বাংলা গদ্যের বিবর্তনধারায় 'আলালের ঘরের দুলালে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এবং এর প্রভাব সে সময়ের বিভিন্ন গদ্যলেখক এমন কি বিদ্যাসাগরের ওপর পর্যন্ত পড়েছিল। এই জন্যেই 'সীতার বনবাসের' শেষাংশের সমাসবহুল দীর্ঘ পদগুলি ভেঙে পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র সরল সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। এ পত্রিকার লেখকগণ ছিলেন প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির অনুকারী। তবে 'মাসিক পত্রিকা'র মাধ্যমে বিদ্যাসাগরীয় রীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছিল তা'রও কিছু কিছু ছাপ এ পত্রিকায় আছে।

এর পর 'বঙ্গদর্শন'—বাংলা মাসিক পত্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকা। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সাথে সাথে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যাসাগরীয় এবং টেকচাঁদী ভাষার যে দ্বন্দ্ব এতদিন চলে আসছিল বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তা'দের একটা সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই উভয় রচনা-রীতির সুন্দর সমন্বয় দেখি ১৮৭২ খ্রীঃ হ'তে বঙ্গদর্শনে ক্রমপ্রকাশিতব্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র মধ্যে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই উভয় উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বর বহুল ভাষার সাথে 'বিষবৃক্ষে'র ভাষার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিষবৃক্ষের ভাষাতেই আধুনিক বাংলা গদ্য যেন আপন বলিষ্ঠ স্বরূপটি খুঁজে পেয়েছে।

আধুনিক বাংলা গদ্য লেখকগণের প্রত্যেকেই কমবেশী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত।

এর পর 'ভারতী' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ-লগ্ন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই

পত্রিকার মধ্য দিয়েই কল্পস্বপ্নের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার প্রথম সূত্রপাত। এ ছাড়া বালক, সাধনা ( ১৮৯১ ), নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ( ১৯০১ ), প্রবাসী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা অবিরাম প্রকাশিত হ'তে লাগল। বাংলা গদ্যের যতপ্রকার রীতি এবং প্রকাশ-বৈচিত্র্য আছে তা'দের সকলের সমন্বিত রূপ ধরে যেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। কোন কোন প্রবন্ধে গুরুগম্ভীর বিদ্যাসাগরীয় রচনা রীতির ছাপ আছে, আবার কোন প্রবন্ধ বা আলালী ভাষার উপযুক্ত বাহন হ'য়ে উঠেছে। কোন কোন প্রবন্ধের অঙ্গ অলংকার-বৈচিত্র্যে দীপ্তোজ্জ্বল আবার কোন কোন গদ্যরচনা লিরিকের সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। গদ্যরচনাও যে কবিতার সীমা-স্পর্শী হ'য়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা তা'র প্রথম প্রমাণ পেলাম। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার শিল্প-সৌন্দর্যের এবং অলংকার সুষমার কাছে অন্যান্য সকল গদ্যলেখকের রচনা যেন নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছে।

সাময়িক পত্র-পত্রিকারণ্যে "যমুনা" পত্রিকাটিরও একটি বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রাদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যমুনার মধ্য দিয়েই গদ্যের অপূর্ব সারল্য-সৌকুমার্য নিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। 'Style is the man himself', কথাটি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রযোজ্য। সারল্য, মাধুর্য সমন্বিত শরৎচন্দ্রের লাবণ্য-সুষমামণ্ডিত গদ্যরচনা বাংলা গদ্য সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত অতি সাধারণ কথ্য ভাষার অন্তরালে যে শিল্প-সৌন্দর্যের এমন সুমহান অভিব্যক্তি লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্রের গদ্যরচনা না পেলে হয়তো আমরা তা' কোনদিন বিশ্বাসই করতাম না।

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সবুজপত্রে'র মধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আর একটি বিশেষ দিকের আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। এ পত্রিকার প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী। এখানে আমরা যে গদ্যরীতির সন্ধান পেলাম

তা' কাব্যধর্মী নয়—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তা' তীক্ষ্ণধার, ভাষার শানিত প্রয়োগে তা' ঝলকিত। বাক্যের শিথিল প্রয়োগ কিংবা এলায়িত বাক্‌বিন্যাস নয়—ভাষার কারুকরণ-সমৃদ্ধ অলংকার গৌরব ভূষিত মননশীল গদ্যরীতিই 'সবুজপত্রে'র বিশিষ্ট দান। বীরবলের 'হালখাতা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' এই গদ্যরীতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বর্তমানে বাংলা দেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা চালু আছে তন্মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, পরিচয়, দেশ, অমৃত প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সওগাৎ মোহাম্মদী, মাহেনও, ইমরোজ, আজাদ, জাগরণ ইত্যাদির নামও বিশেষরূপে স্মরণীয়। এ ছাড়াও আছে দৈনিকের শারদীয়া সংস্করণ। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বাংলা গদ্যের যে উন্নতি তা' কেবলমাত্র পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই সাধিত হচ্ছে। সুদূর অতীত কাল হ'তে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে তা' চিন্তা করলে বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে যেতে হয়। এক একটি প্রভাবশালী মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে' যে শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তা'র একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'লো :

| *পত্রিকা* | *লেখক গোষ্ঠী* |
|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৪৩ খ্রীঃ ভাদ্র মাস। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার দত্ত। | অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। |
| বঙ্গদর্শন, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। |

| পত্রিকা | লেখক গোষ্ঠী |
|---|---|
| ভারতী, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ, সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎকুমারী চৌধুরাণী, অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি। |
| সাধনা, মাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ইত্যাদি। |

॥ চার ॥

এখন প্রথম দিকের কয়েকজন শক্তিশালী গদ্য-শিল্পীর গল্প গদ্য-রীতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকগণের মধ্যে বাংলা গদ্যরচনায় সর্বাপেক্ষা দক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি কেরীর অনুরাগভাজন এবং সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। জন্ম এবং নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। পূর্বে এ অঞ্চলটিকে উড়িষ্যায় মধ্যে গণ্য করা হ'তো। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনার স্বরূপ পাঁচটি গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থগুলি এই: বত্রিশ সিংহাসন—১৮০২, রাজাবলি—১৮০৮, হিতোপদেশ—১৮০৮, বেদান্ত চন্দ্রিকা—১৮১৭, এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা—১৮৩৩ খ্রীঃ।

'বত্রিশ সিংহাসন' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। বহুস্থানে আক্ষরিক অনুবাদ হওয়ায় অনূদিত গ্রন্থের সৌন্দর্য-সুঠাম ভংগী বহুস্থানে খণ্ডিত। বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানির বাক্য প্রায়ই জটিল এবং এই জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের সল্পতায়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর রাজাবলি। এই গ্রন্থখানিই দেশী লোকের লেখা সর্বপ্রথম ভারত-বর্ষের ইতিহাস। আলোচ্য গ্রন্থে চন্দ্রবংশের রাজা বিচিত্রবীর্য হ'তে

বাংলা দেশে ইংরেজ আগমন ও প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। গ্রন্থখানি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: "রাজাবলির ভাষা প্রাঞ্জল এবং সেই গুণেই ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাপর গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে অনুবাদের আড়ষ্টতা, শব্দাড়ম্বর এবং লেখ্য ও কথ্য পদ্ধতির বিসদৃশ মিশ্রণ আছে। রাজাবলির ভাষা এই সব দোষ হইতে অনেকটা বিমুক্ত বলিয়া ইহার রচনা জমাট বাঁধিয়াছে।"
তবে 'রাজাবলি' সম্পর্কে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য—এ গ্রন্থে ফারসী শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। সামান্য উদাহরণেই আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে: "তৎপরে নবাব সিরাজদ্দৌলা আপনি সুবেদার হইয়া ঐ মোহনলালকে নাএব সুবেদার করিয়া মহারাজ বাহাদুরী খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব ও সাহেবে নওবৎ মাহীমরাতব ইত্যাদি মনসবেতে সরফরাজ করিলেন এবং বাদশাহ-কুলি নামে আপন ভ্রাতাকে বাদশাহী দেওয়ান করিলেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের অপর তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির অধিকাংশই লেখকের স্বাধীন রচনা। গ্রন্থখানি সে যুগে বিভিন্ন কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং পর পর পাঁচটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থখানিকে মৃত্যুঞ্জয়ের এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যপুস্তক বলা চলে।
মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার প্রধান ত্রুটি সংস্কৃত সাহিত্যানুগ অলংকৃত ভাষা, অনুপ্রাস এবং সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার। তৎকালীন পণ্ডিতদের ন্যায় তাঁ'রও ধারণা ছিল পাণ্ডিত্যদ্বারা বাংলা ভাষা অলংকৃত করা যাবে। অনুপ্রাস-বাহুল্য হেতু তাঁ'র গদ্য লেখা স্থলে স্থলে ঢক্কানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্বোধ্য হ'য়ে পড়েছে। তথাপি সেই যুগে তাঁ'র রচনায় যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা' সত্যই অভিনব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে যে গদ্যরীতির শুরু করেন তা' মোটামুটি একইভাবে পরবর্তীকালের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল। সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় ভাবানুবাদে তাঁ'রা যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন তা' সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হ'য়ে রইল। তারপর সাময়িক পত্রের প্রচলনে সাধারণের বোধগম্য লেখার প্রচলন হ'লো বটে তবে ভাষা দোষ-দুর্বলতা-মুক্ত হ'লো না। চলতি বাংলা শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। বাক্যের ছন্দ ও তাল না থাকবার দরুন শ্রুতিমাধুর্যও বিশেষ ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়॥ বাংলা গদ্যের এমন এক ক্রমজটিল পরিস্থিতির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিখিল ভারতবর্ষে যিনি আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন—লেখনীতে বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের ফলে তাঁ'র মাধ্যমে বাংলা গদ্য সাহিত্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত হ'লো। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্ম এবং দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে' বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে তিনি যে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা' সত্যই বিস্ময়কর। রামমোহন রায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো বেদান্ত গ্রন্থ—১৮১৫, বেদান্তসার—১৮১৫, এবং কয়েকটি বিতর্কমূলক গ্রন্থ। এই বিতর্কমূলক গ্রন্থাদির রচনা-উৎসগুলি ডক্টর সুকুমার সেন এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "রামমোহন প্রবর্তিত বেদান্তচর্চা ও ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রণয়ন করেন। তাহার জবাবে রামমোহন লেখেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকা। ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন সহমরণ প্রথার অযৌক্তিকতা ও অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দুইখানি পুস্তিকা লেখেন—'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। রামমোহনকে কটাক্ষ করিয়া কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

'পাষণ্ডপীড়ন' রচনা করেন (১৮২৩)। ইহার উত্তরে রামমোহন লিখিলেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)।" প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণদের সাথে তর্কযুদ্ধে নেমে রামমোহন যেমন উল্লিখিত পুস্তিকাগুলি রচনা করেন তেমনি হিন্দুধর্মের ওপর কটাক্ষ করে' শ্রীরামপুরের পাদরীগণ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কয়েকটি সাময়িক পত্রের প্রবর্তন করে' এবং বিভিন্ন পুস্তিকার মাধ্যমে তিনি তা'র সমুচিত জবাব দেন। কয়েকটি উপনিষদের গদ্যানুবাদ এবং কয়েকটি পারমার্থিক সংগীত রচনা ছাড়াও ভগবদ্‌গীতার পদ্যানুবাদ এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনাপেক্ষা বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জলতা এবং সরসতা দানের জন্য রামমোহন রায় আমাদের নিকট যুগযুগান্ত স্মরণীয়। যে যুগে বাংলা গদ্যে সরলতা বলে কোন জিনিসই ছিল না, বাংলা গদ্যের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা-র যুগে রামমোহন রায় আপন সুদুর্লভ প্রাণ-প্রাচুর্যে অসীম শক্তি ও সাহস দান করে' গদ্য-শিশুকে প্রাঞ্জল সারল্যে উত্তর-যৌবনের প্রদীপ্ত বলিষ্ঠতায় উন্নীত করেছেন। সমকালীন বাংলা গদ্য রচনা সরল না হ'য়ে ওঠার পিছনে দু'টি কারণ ছিল—একটি ছেদচিহ্নের স্বল্পতা এবং অপরটি দূরান্বয়। রামমোহন এই উভয় ত্রুটি সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বেদান্ত চন্দ্রিকার ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন "এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভূত হয়। ...বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"

সমকালীন বাংলা গদ্যের এই দোষ-দুর্বলতাগুলি অবহিত ছিলেন বলেই রামমোহনের রচনা বিশেষরূপে সরল, সহজ এবং সুষম ( balanced ) হ'য়ে উঠেছিল। তিনি প্রথম বাংলা গদ্যকে আড়ষ্টমুক্ত করে' তা'র গণ্ডিকে সুদূরপ্রসারী করেন। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গদ্য সাহিত্যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। কিন্তু রামমোহন বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা দূর করে' তা'কে সরল এবং প্রাঞ্জল করলেও তাঁ'র রচনায় একটি মারাত্মক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। সরল এবং সহজ হ'য়েও তাঁ'র রচনা ছিল সাহিত্য রস হ'তে বঞ্চিত। ঈশ্বরগুপ্ত তা'ই ঠিকই লিখেছেন: "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন…কিন্তু সে-লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" প্রকৃতপক্ষে এই সাহিত্য রসের অল্পতাই হ'লো রামমোহনের রচনায় সর্বাপেক্ষা বড় দুর্বলতা। বাংলা গদ্যের এই বড় রকমের অভাবটি মিটেছিল আরো কিছুকাল পরে—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ পূর্বেই বলেছি বাংলা গদ্যে সাহিত্য রসের সঞ্জীবনীধারার অভাব পূরণ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলা গদ্যের বুকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হলেন। যে সুধার অভাবে বাংলা গদ্য এতদিন নীরস হয়েছিল সেই সঞ্জীবনী সুধার দু'কূলপ্লাবী বন্যায় তিনি বাংলা গদ্যের বেলা-ভূমিকে উদ্বেল করে' দিলেন। বাংলা গদ্য প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলো। কৈশোর ছেড়ে যৌবনের দীপ্তরাগে হ'লো উন্নীত। বিশ্বকবির ভাষায়: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ একটি বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ

করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটি তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না।··· বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমসাড়ম্বর ভাব হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বব্যবহারযোগ্য করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষা-রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।" যতিচিহ্ন স্থাপনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। এই চিহ্নগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের ছন্দ এবং ঝঙ্কারকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কানেই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের Rhythm ধরা পড়ে। ধ্বনির আরোহ এবং অবরোহ নিপুণতম ছন্দ-শিল্পীর ন্যায় বিদ্যাসাগর ধরেছিলেন। ধ্বনি-ঝংকার অনুসরণ করে' উপযুক্ত স্থানে যতিচিহ্ন স্থাপন করে' বাক্যাংশগুলিকে শ্বাসপর্ব ও স্বার্থপর্ব অনুসারে সাজিয়ে তিনিই প্রথম গদ্যছন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রচনারীতি সংস্কৃতগন্ধী বলে একটা দুর্নাম আছে—এ কথা সর্বতোভাবে সত্য নয়। "উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও বাক্‌ভংগীর ব্যবহার করিয়া বিদ্যাসাগর

বিশেষ শব্দকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।" তাঁ'র শেষের দিকের রচনা ক্রমেই সংস্কৃতবাহুল্য মুক্ত হ'য়ে উঠেছিল। নিম্নের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলেই তা' বোঝা যাবে: "জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া সখীর নিকটে গিয়া পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায় করি বল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্বনাশীরা আসিয়াছে; সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবে? সখি তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল অপবাদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।"

লেখার ভিতর দিয়ে লেখক আপনার ব্যক্তি সত্তাকে রেখে যায়। শ্রেষ্ঠ লেখকের রীতি বা Style কেবল তা'র বক্তব্যকে প্রকাশ করে না, তা' কেবল ভাষার বাইরের অলংকারও নয়—তা'র ভিতরে রয়ে যায় লেখকের অন্তঃপুরুষের সুনিবিড় প্রকাশ, গতিসত্তার অনবদ্য রূপায়ণ। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে আমরা বিদ্যাসাগরের যে গদ্যরীতির পরিচয় পাই 'বিদ্যাসাগর চরিতে'র মধ্যে তদপেক্ষা প্রাঞ্জল, মনোহর, শক্তিশালী রীতি আছে। এই রীতি পরিবর্তনে তাঁ'র প্রগতিশীল মন বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতি আপন মাধুরিমায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকদ্বয়ের অনেকস্থলে যে ক্রিয়া-পদের ব্যবহার হয়েছে তা' কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ: "শকুন্তলা কহিলেন—হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক ভাল আছি।" শকুন্তলায় ব্যবহৃত গদ্যরীতিতেই বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং এ রীতি আধুনিক গদ্যরীতির প্রান্তসীমা স্পর্শ করে' গেছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হ'তে এতদিন কোন স্পষ্ট

প্রকাশ-রীতি গড়ে ওঠে নি যে রীতিকে অবলম্বন করে' পরবর্তী লেখকগণ আপন হৃদয়কে পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত করে' দেবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে এ অভাব আর রইল না। তিনি আদর্শ রচনা-রীতি গঠন করে' তা' সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরলেন। ভবিষ্যৎ গদ্য-লেখকদের পথকে তিনি সুপ্রসারিত ও সুগম করে' দিয়ে গেলেন। এতদিন যে ধারা কোন রকমে আপন সত্তাটিকে রক্ষা করে' আসছিল বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে সেই শুষ্ক-প্রায় ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বেগবান হ'য়ে উঠলো। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা ভাষার অবয়ব খাড়া করেন, রামমোহন রায় আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দূর করেন আর বিদ্যাসাগর লালিত্য ও মাধুরিমা দিয়ে তাকে প্রাঞ্জল করে' তোলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র ॥ বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি আদর্শ মুগ্ধকর গদ্যরীতি পাওয়া গেলেও কথ্যভাষা তখন ব্যাপকভাবে সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে নি। সাহিত্যের আনাচে-কানাচে কোন রকমে সে আত্ম-গোপন করে' ছিল। কথ্যভাষাকে তা'র আত্মগোপনের স্থান হ'তে তুলে নিয়ে তা'কে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করার জন্যে এলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাধুভাষার মধ্যে এনেছিলেন গদ্য ছন্দের গুরুগম্ভীর ভংগী আর প্যারীচাঁদ মিত্র আনলেন বাংলা চলতি ভাষার অবয়বে বাংলা গদ্য ছন্দের অভিনব লঘু ভংগী। এই অভিনব ভংগীতে লেখা আলালের ঘরের দুলালের প্রথম প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের বুকে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নভেল বা উপন্যাস বলতে যা' বোঝায় বাংলা সাহিত্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' দিয়ে তা'র সর্বপ্রথম সূত্রপাত। এই গ্রন্থে কথ্যভাষার সাথে বাংলার বহু প্রবাদ স্থান পেয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার প্রধান গুণ এর সর্বসাধারণের বোধগম্য সারল্য। "সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের পরিবর্জন, কথ্যভাষার ব্যবহৃত ফার্সী-শব্দের এবং কথ্যভাষা

সুলভ বাক্যাংশ বা ইডিয়াম এবং প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ—ইহাই স্থূলতঃ 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়াছে।"

'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'যৎকিঞ্চিৎ' ইত্যাদিতেও এই গদ্য-রীতির ব্যবহার হয়েছে। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতিতে যে কথা উপমা অলংকার ইত্যাদিতে আবৃত হ'য়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ত প্যারীচাঁদ মিত্রের রীতিতে তা'র সম্পূর্ণ সত্তাটি ধরা পড়েছে।

গদ্যরীতিতে এই সরসতা দান প্যারীচাঁদ মিত্রের এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা। তাঁ'র প্রধান কৃতিত্ব এখানেই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র পর্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে ধারা আমরা পর্যালোচনা করলাম তা'তে একক ভাবে কা'কেও প্রাধান্য দিলে অন্যায় করা হবে। প্রত্যেকেই আপন সাধ্যানুযায়ী বাংলা গদ্য সাহিত্যধারায় বেগ সঞ্চার করেছেন। একটি কুসুমের মুকুল অবস্থা থেকে পূর্ণ পরিস্ফুট হওয়ার মধ্যে অখণ্ড প্রবাহ বিদ্যমান। অপরিণত মুকুল ছাড়া বিকশিত পুষ্প পাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্রের সময় যদি বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকশিত অবস্থায় থাকে তা' হ'লে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনে তা'র মুকুল অবস্থা। মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনকে না পেলে আমরা কোনক্রমেই বিদ্যাসাগর ও মিত্র মহাশয়কে পেতাম না। শিশুর শৈশবের হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থা থেকে যৌবনের সুদৃঢ় পদক্ষেপ সঞ্চারণের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, এক অখণ্ড ধারায় তা' গ্রথিত। কোন বিশিষ্ট মুহূর্তকে যৌবনের স্বর্ণাসনে বসান যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট একজনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা যায় না। বাংলা গদ্যের গঠনান যুগ হ'তে তা'র পূর্ণ রূপদানের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ কারও প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা গদ্যের পিতৃত্বের দাবিতে তাই কমবেশি সকলেই অংশীদার।

## ।। ছিন্নপত্র ।।

### ॥ এক ॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মত পত্র-সাহিত্যের উৎসমূল খুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রাণ-প্রাচুর্যে তা'কে সাবলীল ও বেগবান ক'রে তুলেছেন। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে এই ধারাটির জন্মক্ষণ সূচিত হ'লেও সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সে তখনো পায় নি। তখন চিঠি কেবল চিঠিই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে সে ফতুর হয়ে গেছে। বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন-ঋণ মিটিয়ে সে দেউলে হ'য়ে পড়তো। যে গুণের জন্য চিঠি ব্যক্তিগত হ'য়েও সর্বসাধারণের আনন্দের, ব্যষ্টির হয়েও সমষ্টির সম্পদে পরিণত হয়, প্রাক-রবীন্দ্রযুগে তার বড় একটা সন্ধান মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি তাঁ'র রচনা বিচারের মানদণ্ড হ'য়ে উঠেছে। তা'র বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। কোন বইটা উপন্যাস হ'লো আর কোনটা বড় গল্প, গ্রন্থের কোন অংশ নীতিবোধের ঔজ্জ্বল্যে প্রাণবন্ত আর কোন অংশ দুর্বল ইত্যাদির হিসাবনিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিগুলির সমুদয় রস ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং সে চিঠি প্রয়োজনের বেড়ি পায়ে পরে মরণ-মুখে এগিয়ে গেছে। মধুসূদনের চিঠির বিশেষ রসমূল্য আছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমা ডিঙিয়ে সে চিঠি সাহিত্যিক মর্যাদা দাবি করার স্পর্দ্ধা রাখে, কিন্তু তাঁ'র সমুদয় চিঠি ইংরাজীতে লেখা। স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি-গুলির প্রকাশ এমন মর্মস্পর্শী—যা'র পৃথক সাহিত্যিক মূল্য আমরা না দিয়ে পারি নে, কিন্তু রসবিচারে সে চিঠি ধোপে টেঁকে না। প্রমথ চৌধুরীর চিঠিই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম চিঠি—যা'র একটি বিশেষ রসমূল্য আছে। প্রয়োজনের ইস্পাত-কঠিন সীমা-রেখা সহজেই ছিন্ন করে' দিয়ে সে চিঠি সাহিত্যের দরবারে আপন

আসনটি দখল করে' নিয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তা'দের বুদ্ধিদীপ্ত মনন প্রধান আলাপচারণা—এই নতুন ভংগীতে, নতুন বাক্‌বিন্যাসের মূলে রয়েছে চৌধুরী মহাশয়ের ক্ষুরধার সুকর্ষিত গদ্যরীতি। এই অননুকরণীয় বুদ্ধিমুখর গদ্যরীতি চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাবলীর এক বিশেষ গুণ। তবুও এই চিঠিগুলিকে ঠিক যেন অন্তরের সঙ্গে এক করে' মনের মানুষটির সাথে মিলিয়ে গ্রহণ করা যায় না। মনে হয় কোথায় যেন কী একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। ঠিক ঠিক যতটা ঘরোয়া ও আপন হ'লে আমাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে, এই চিঠিগুলি ঠিক যেন সেই পরিমাণে ঘরোয়া নয়। তাই সকল প্রাচুর্যের মাঝেও যেন চিঠিগুলি ঠিক প্রাণবন্ত ও আপন হ'য়ে ওঠে নি। পত্রসাহিত্যের এই সকল দুর্বলতা দোষ ত্রুটি হ'তে মুক্ত করে' রবীন্দ্রনাথ তা'কে এক অপূর্ব সৌকুমার্য ও রূপ লাবণ্য দান করলেন। এতদিন যে অকুলীন মেয়ের মত পরিত্যক্ত হ'য়ে পথের ধুলোয় আপন দেহভার নিয়ে লজ্জামলিন হয়েছিল, আজ সেই পত্রসাহিত্যই কৌলীন্যের জয়টিকা কপালে এঁটে সাহিত্যের রাজদরবারে অসংখ্য রাজপুত্রের মাঝখানে অকস্মাৎ স্বয়ংবরার পসরা খুলে বসলো। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ মৃত পত্রসাহিত্যের উপরে জীবনকাঠির স্পর্শ বুলিয়ে তা'কে সজীব' প্রাণবন্ত ও অপরূপ করে' তুলেছেন।

ছিন্নপত্রের বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-পত্রসাহিত্যের কল্পনা-স্বরূপের ও ব্যাপকতার প্রকাশ ঘটবে, কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী কম উল্লেখযোগ্য নয়। সুদীর্ঘ গৌরবময় সাহিত্য-জীবনে ও বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে নানাজনের কাছে পত্র লিখতে হয়েছে অবিরাম; কখনো তাগিদে, কখনো লৌকিকতায়, কখনো খেয়াল-খুশীতে, কখনো কারণে, কখনো ইংরাজীতে, কখনো বাংলায়। কৈশোরের প্রথম কবিতা উন্মেষের সূত্রপাত হ'তে শুরু করে' আমরণ চলেছে এই চিঠি লেখালেখি। গুরুজন, পুত্র-পৌত্র, নাতি-নাতনী, জামাতা-কন্যা,

ভ্রাতা-ভাইঝি, ব্যবসায়ী-বন্ধু, জ্ঞানী-গুণী সকলের কাছে তিনি চিঠি লিখেছেন। ফলে চিঠিতে তিনি কখনো বন্ধু, কখনো পিতা, কখনো বা স্বামী, কখনো বা পুত্র। নাতি-নাতনীদের কাছে লেখা চিঠিগুলি পরম রসিকতায় ভরা। আবার পুত্রদের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি অযথা কঠোরও নন। তাঁ'র চিঠির কতকগুলি জার্ণাল-ধর্মী, কতকগুলি ডায়েরীধর্মী, আবার কতকগুলি বা ভ্রমণ-কাহিনী-মূলক। তাঁ'র পরিবারাশ্রয়ী চিঠিগুলির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কোন কোন চিঠিতে তিনি করেছেন তত্ত্বালোচনা, আবার কোন কোন চিঠিতে দেখি তিনি পরম হাস্যবেগে মেতে উঠেছেন, আবার কোন কোন চিঠিতে পাওয়া যায় তাঁ'র কবিমানস ও কাব্যজীবনের অপূর্ব ব্যাখ্যা। পত্র রচনার বোধ হয় এমন কোন দিক নেই, যেদিকে রবীন্দ্রনাথ পদচারণা করেন নি। সাহিত্য রচনার মত পত্র রচনার সকল দিকে তাঁ'র কল্পনার পক্ষীরাজ দুরন্ত গতিতে উড়ে বেড়িয়েছে। সুতরাং বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার স্পর্দ্ধা পৃথিবীর খুব কম পত্র-লেখকেরই আছে। এই বৈচিত্র্যময়তা আবার উদার কল্পনা-মহত্ত্বে সজীব। কোথাও কোন দৈন্য নেই, কোথাও কোন কষ্টকল্পনা নেই—পত্রগুলি আপন স্বরূপে আপনি উজ্জ্বল। অপূর্ব বাক্‌বিন্যাস এবং সুকর্ষিত গদ্যরীতি এই পত্রগুলিকে অনবদ্য করে' তুলেছে। অধিকাংশ পত্রতেই তিনি অননুকরণীয় গদ্যরীতিতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে খেয়াল-খুশীর মালা গেঁথে চলেছেন। কখনো এক একটি পত্র আবার কল্পনায় মোহাঞ্জন-স্পর্শে নিটোল মুক্তোর মত ঝিরিকের অখণ্ড সুরে বেজে উঠেছে। সবার পেছনে আছে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃজনশীল মন—যা'র স্পর্শে সকল চিঠিই ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমষ্টির, প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের লীলারসের অঙ্গীভূত হয়েছে।

॥ দুই ॥

ছিন্নপত্রে সংকলিত চিঠিগুলি লেখার পরিধি ১।৮।৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১।৮।৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বমোট একশো বাহান্নটি চিঠি স্থান পেয়েছে এর মধ্যে প্রথম পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা চিঠির সংখ্যা মাত্র তেরটি আর অবশিষ্ট চিঠিগুলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে পরবর্তীকালে লেখা। ছিন্নপত্রের সমুদয় চিঠিগুলি লেখা হয় কবি-বন্ধু শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র-গবেষক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "ছিন্নপত্রের মুদ্রিত সংস্করণের (১৩১৯ সন) প্রথম আটখানি পত্র (২৭ পৃষ্ঠা) লিখিত হয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তারপর ২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, ১২৯৪, আশ্বিন হইতে ১৩০২ পর্যন্ত কালের মধ্যে পত্রগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত। ১৪ বৎসর হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী এই পত্রগুলি পান।"

ইন্দিরা দেবীর নিকট লেখা চিঠিগুলি উৎকর্ষতার প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা সবাই জানি যে সকলের কাছে লেখা সকল চিঠি সুন্দর হ'তে পারে না— বিশেষ লোকের কাছে লেখা বিশেষ পত্রটি সর্বোৎকৃষ্ট হয়। ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা বিশ্বকবির চিঠিগুলি যে মহোত্তম সে সম্পর্কে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন—"তো'র এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তা'র চিঠিতেই দেখা দেয় তা' হ'লে এই বুঝতে হবে যে, যা'কে চিঠি লেখা হচ্ছে তা'রও একটি চিঠি লেখার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ

করে' নিতে পারে নি।...তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।" কিন্তু ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি 'অচ্ছিন্ন'—অর্থাৎ যে অবস্থায় লেখা হয়েছিল, সেই অবস্থায় মুদ্রিত হয় নি—'ছিন্ন' অবস্থায় এগুলির মুদ্রণ-কার্য শেষ হয়। পত্রগুলি লেখার পঁচিশ বছর পরে যখন কবি এগুলি ছাপতে অনুমতি দেন তখন পত্রগুলি হ'তে ব্যক্তিগত অংশ বাদ দেওয়া হয়। তাই গ্রন্থের নামকরণ হয় ছিন্নপত্র।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয়—রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উপলক্ষে "ছিন্নপত্রাবলী" নামে পূর্বপ্রকাশিত "ছিন্নপত্রে"র পূর্ণতর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮৮২ শক। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে: "বাংলা ১৩১৯ সনে প্রকাশিত ছিন্নপত্র গ্রন্থে, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ১৪৫টি পত্র রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সংক্ষেপণ ও সম্পাদনপূর্বক সংকলন করেন। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখা আরও ১০৭টি পত্র সংকলিত: তাহা ছাড়া এই গ্রন্থে পূর্বপ্রকাশিত 'ছিন্নপত্র'-সমূহেরও পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যাইবে।"...

ছিন্নপত্র এক আশ্চর্য পত্র-সংকলন গ্রন্থ। স্বাদ-বৈচিত্র্যে, লিপি-চাতুর্যে এবং সহজ বেগবান বাক্‌বিন্যাসে গ্রন্থখানি কী মহান্ সুন্দর! অস্পষ্টতার এবং ম্লানতার এতটুকু গ্লানি পত্রগুলিকে স্পর্শ করতে পারে নি—পরম স্পষ্টতায় পত্রগুলি সহজ, সরল এবং সরব। নীল পদ্মাতীরে বসবাসের সুদীর্ঘ দশ বছরের এই যে জীবন—এই জীবনটিকেই যেন ছিন্নপত্রের বুকের মধ্যে একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করি! ঘূর্ণিত পদ্মার স্রোত মাথায় ফেনিল আবর্ত নিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম—রূপমুগ্ধ কবি অনিমেষ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে বাক্যহারা, হয়তো বা সংবিৎহারাও। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি তখন একাত্ম, প্রকৃতি আর কবি মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেছেন! একের অন্তরে আর একের কী নিঃসীম প্রবেশ!

ছিন্নপত্র বিশাল প্রকৃতির একখানি অভিনব চিত্র এ্যালবাম। প্রকৃতির চিত্ররসে ছিন্নপত্র রসায়িত। পদ্মাতীরে নিখিল নিসর্গ-প্রীতি কখনো বক্রায়িত ছন্দে, কখনো নিরুদ্বেগহীন হাস্যমুখে, কখনো বিষণ্ণতার মহিমায়, কখনো বিপুল অর্থভরা নীরবতায় কবির মানস-লোকে দূর দূরান্তরের কত না কলগুঞ্জনকে নিবিড়ভাবে মেলে ধরেছে। ছিন্নপত্র তো এই সব নিবিড় চিত্রবিলাস-স্পন্দনের সরব মূর্ছনা। মূক প্রকৃতি এইভাবে মুখর হ'য়ে ওঠায় গ্রন্থখানি চিরন্তন কালের শাশ্বত রোম্যান্টিক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ছিন্নপত্র সত্যই বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যকালের নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রসাহিত্যের সঙ্গে ছিন্নপত্রের বোধ হয় মূল পার্থক্য এইখানে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী'—এই দু' গ্রন্থের মিলিত সংযোজনায় আমরা পাই ভিক্টোরীয় যুগের গ্ল্যাডষ্টোন-শাসিত ইংল্যাণ্ডের এক অপূর্ব ছবি—এ সব পত্রেও প্রকৃতির ছবি কিছু কিছু আছে, কিন্তু ছিন্নপত্রের সঙ্গে তা'দের পার্থক্য আকাশ-পাতালের। 'ভানু-সিংহের পদাবলী'তে কবির ভাব অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সাদাসিধে। গদ্যরীতির কিংবা ভাব প্রকাশের কোন ইস্পাত-কঠিন নিয়ম-কানুন নেই। হাল্কা চালে আপন খেয়াল-খুশী মত কবি তাঁ'র আপন বক্তব্য বলে গেছেন। বক্তব্য যাই হোক, প্রকাশভংগীর সৌকুমার্যের মাপকাঠিতে 'ভানুসিংহের পদাবলী'কে ঠিক শানবাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই। ছিন্নপত্রের সঙ্গে ভানুসিংহের পদাবলীর মূল পার্থক্যও এইখানে। ছিন্নপত্রও ঘরোয়া, তবু ভাব-প্রকাশ মহিমায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্যের মত একটি অপূর্ব দীপ্তি, তা'র সারা অঙ্গে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের পরিবারাশ্রয়ী চিঠিগুলি সংকলিত হ'য়ে আজ পর্যন্ত ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী এবং পৌত্রী নন্দিনী দেবীর নিকট লেখা পত্র-গুলির মধ্যে হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপটি অতি সুন্দররূপে ধরা

পড়েছে। এ সব চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ঘরোয়া, অত্যন্ত কাছের মানুষ, কৌতুক পরিহাসের যেন চূড়ান্ত প্রতীক। কয়েকটি উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে: "শীত রীতিমত জমেছে, পিঠের ওপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠেছে। ধোপার গাধার যে কী দুঃখ তা' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।" অন্য আর একটি পত্রাংশ: "গতকাল অপরাহ্নে চারু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটি চিরকুট এসে পৌঁছল। তা'তে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্ষ্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে' তা'র মাতামহের লোক বিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষার খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিত চক্ষু মাষ্টার মহাশয়ের জয় জয়কার। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করেছি তা'র স্মরণাগত হ'ব, অন্ততঃ ম্যাট্রিকটাও যদি কোনমতে তরে যেতে পারি।"

ছিন্নপত্রের মধ্যেও যে হাস্যরস নেই তা' নয়—তবে হাস্যরসই ছিন্নপত্রের মুখ্য বিষয় নয়। হাস্যপরিহাসের মাঝে মাঝে কবির যে কল্পনা-জমাট ভাব-নিবিড় মনের প্রকাশ ঘটেছে, তা'র স্পর্শ এই সব ঘরোয়া চিঠিগুলির মধ্যে কোথায়? স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এবং কন্যা মাধুরীলতা ও মীরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে পরিবারাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাথকে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে প্রথম যৌবনের উন্মাদ-মদির বিহ্বলতা নেই বললেই চলে—মাঝে মাঝে উপদেশ বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং এ সকল পত্রের মধ্যে আর যা'ই থাক, ছিন্নপত্রের সেই বিপুল কল্পনা-বিলাসী মনটি অনুপস্থিত। প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে কবির বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। চৌধুরী দম্পতির কাছে লেখা চিঠিগুলিতে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সমান তালে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠে একই সমান্তরাল সরলরেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। কিন্তু ছিন্নপত্রের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তি প্রবল।

'পথে ও পথের প্রান্তে', 'জাপানে পারস্যে', 'জাভা-যাত্রীর পত্র',

'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি পত্রগুলি প্রায় একই রকমের। সবগুলিই ভ্রমণ-কাহিনীমূলক। বিশ্বগ্রাসী খ্যাতি নিয়ে কবি যখন যে দেশে যাত্রা করেছেন—নতুন কিছু রচনার উল্লাসে তখনই কবি মেতে উঠেছেন—স্টীমার জাহাজে বসেও কবির বিরাম নেই—রূপমুগ্ধ স্রষ্টা কেবিনে বসে বসে সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছেন। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় তাই ঠিকই বলেছেন: "সর্বত্রই একটি গভীরাশ্রয়ী মন চিন্তার গ্রন্থি মোচন করে' চলেছে। প্রাচীন ইজিপ্টের ভূগর্ভউদ্ভূত স্থাপত্য-কীর্তি, কায়রোর হোটেল, ম্যুজিয়ম, আরবী সাহিত্য, সহযাত্রী জার্মান নৃ-তত্ত্ববিদ্‌ প্রভৃতি টুকরো কথার মধ্যে কবির মন্তব্যগুলি গভীরপ্রসারী। ভ্রাম্যমান কবি চলার ফাঁকে ফাঁকে জগৎ ও জীবনের সে সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা' বিস্ময়কর।" বস্তুতঃ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের এটাই সার কথা। চলমান দিনগুলির কত কথাই না তিনি এই গ্রন্থগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে কেবল 'পথে ও পথের প্রান্তে' একটু ভিন্ন ধরনের গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি কোন নির্দিষ্ট দেশের ভ্রমণ-কাহিনী নয়—চলিষ্ণু জীবনের টুকরো ঘটনার আবেগময় রূপায়ণ। এই গ্রন্থটির সঙ্গে ছিন্নপত্রের একটি নিকট সম্পর্ক আছে। ছিন্নপত্রের পত্রগুলি যেমন গভীরাশ্রয়ী আত্মলীন ধ্যান ধারণার আবেগে কম্পমান, তেমনি 'পথে ও পথের প্রান্তে'র অনেকগুলি পত্রে হয়েছে অতলান্ত মনের ধ্যান-কল্পনার অভিনব উদ্‌ঘাটন। তবুও ছিন্নপত্রে আমরা কবির বিপুল কল্পনা-প্রবণ মনের যে পরিচয় পাই, 'পথে ও পথের প্রান্তে' সে পরিচয় কোথায়? ছিন্নপত্রের সকল চিঠিই পত্রসাহিত্যের সীমিত এলাকা অতিক্রম করে' ডায়েরীর সীমায় পদাচারণা করেছে। মনে হয়, এই পত্রগুলি কবি কাউকে লেখেন নি—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার মদির বিহ্বলতায় আপনিই নেশাতুর হ'য়ে পড়েছেন; চিঠিগুলি যেন মনের গহনে সদাজাগ্রত মানুষটির কাছেই লেখা। রোম্যান্টিক কল্পনার বিপুল উন্মেষে ছিন্নপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় সমুদ্ভাসিত। তাই মাঝে

মাঝে মনে হয়, গ্রন্থখানি যেন পত্রের সংকলন নয়—একশো বাহান্নটি অখণ্ড বিচিত্র লিরিক কবিতার অপূর্ব সমাবেশ। ছিন্নপত্র নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-পত্রসাহিত্যের মধ্যমণি।

॥ *তিন* ॥

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ব্যাপক প্রচারে এবং তা'দের অন্তর্নিহিত পরিচ্ছন্ন ভাব দেখে একটি কথা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন—রবীন্দ্রনাথ পত্র লেখেন না—পত্রের নামে লেখেন প্রবন্ধ, প্রচার করেন আপন কবিধর্মের স্বরূপটিকে। অনেক চিঠিই তিনি লিখেছেন কেবল প্রকাশ করবার তাগিদেই। তিনি বিশেষরূপে জানতেন, কোন না কোন সময়ে তাঁ'র পত্রাবলী বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে, সাময়িক এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি তাঁ'র পত্র পাওয়ার আশায় হা করে' তাকিয়ে আছে। বিশ্বগ্রাসী কবি-প্রতিভা এবং সুনাম এই 'অপেক্ষার' পিছনে বিরাজমান। অনুমানটি মিথ্যা না হ'লেও সর্বাংশে সত্য নয়। কেন না কেবল প্রকাশের জন্যেই তিনি পত্র লিখতেন, এ কথা ব্যাপক খ্যাতির জন্য শেষ বয়সের বেলায় সত্য হ'লেও প্রথম জীবনের জন্য সত্য নয়। ছিন্নপত্র তিনি যখন লেখেন তখন তিনি মাত্র খ্যাতির কৈশোরে পদার্পণ করেছেন—সুতরাং এই চিঠিগুলি যে কোনদিন প্রকাশিত হবে, এমন কল্পনাও হয়তো কবি করেন নি। আর তা' ছাড়াও কেবলমাত্র প্রকাশের তাগিদে যে এমন চিঠি লেখা যায় না—তা' ছিন্নপত্রের পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। আসল কথা, এসব চিঠিতে তা'র বিপুল প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা কবিমানসের নিভৃত পদসঞ্চার ঘটেছে।

চিঠিপত্র প্রকাশের একটি মস্ত বড় বিপদ হ'লো এই যে ভালমন্দ নির্বিশেষে কবির সম্পূর্ণ স্বরূপটি তা'তে উদঘাটিত হ'য়ে যায়। কোন বিশেষ কবিকে তাঁ'র কাব্য পড়ে আপন মনের কল্পনায় তাঁ'র যে পবিত্র মূর্তিকে খাড়া করি, চিঠিপত্রের মধ্যে এমন অনেক অজ্ঞাত

এবং অপ্রীতিকর তথ্য প্রকাশিত হয়, যা' কবির জীবন মহিমাকে অনেকখানি ম্লান করে' দিয়ে যায়। মনে হয় এ চিঠির প্রকাশ না হ'লেই ভাল হ'তো। কিন্তু সুখের বিষয়, ছিন্নপত্র সে জাতের পত্র-সংকলন নয়। এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত না হ'লে কবির কাব্য-জীবন-ধারার অনেক মূল্যবান তথ্যই অনুদ্ঘাটিত রয়ে যেত—আমরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতেম। কাব্য রচনার অন্তরালে কবিমানস যে কেমন ধীরে ধীরে আপনার কল্পনার দলগুলি মেলে দিচ্ছিল, কেমনভাবে মনের উপলে ভেঙে পড়েছিল ভাবের ঊর্মিমুখর ঢেউগুলি, অতি নিভৃতে কেমনভাবে চলছিল কল্পনার স্বর্ণমসলিন দিয়ে কাব্য বয়নের পালা—ছিন্নপত্র যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো অতি সঙ্গোপনে সেই সকল কথাই আমাদের কানে কানে বলে দিয়ে যায়। সুতরাং কবির কাব্য-জীবনধারার বিকাশ-রূপ বুঝতে গেলে ছিন্নপত্র অবশ্য পাঠ্য।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ছিন্নপত্রের রচনাকাল ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হ'লেও মুখ্যতঃ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে লেখা চিঠিগুলিই এতে স্থান পেয়েছে। আর এই সময়টি রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনার যুগ। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই যুগটিই রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনার 'স্বর্ণযুগ'। ভাবের জোয়ার প্লাবনে কবিচিত্তের বেলাভূমি বার বার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। দু'কূল ছাপানো বান-ডাকা জোয়ার প্লাবনে শোনা গিয়েছে উদার অসীম উদাত্ত সমুদ্রকল্লোল। প্রাণ-প্রাচুর্যের কী অপূর্ব উন্মাদনা! ভাব ঐশ্বর্যের কী দুর্বার প্রক্ষেপ! রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম মর্তপ্রীতি এই যুগে জমাট বেঁধে উঠেছে। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার সুস্নিগ্ধ রশ্মিমালা অনন্তের অলৌকিক পথে মোহ-জাল বিস্তার করেছে এই যুগেই। লোকালয়ের তীরে তীরে ঘুরে চলমান জীবনের সুখ-দুঃখে রাঙানো কবিমানসের যে অনবদ্য প্রতিফলন দেখি সংখ্যাতীত ছোট গল্পের মধ্যে—এই পদ্মাতীরে বাসের কালেই তা'র সূচনা। অসীমের সঙ্গে মিলনের যে সুবিপুল বাসনা

পরবর্তী যুগে কবিকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল এই অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাগত দিবসের নির্জন কূলে বাসের সময়েই তা' নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কবির চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। দু'কূল ভাঙা সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনার ইতিহাসও এই সময়কার দিনগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান। ছিন্নপত্রের দিনগুলি তাই কবির কাব্য-জীবনে মোহাঞ্জন মাখানো প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা স্বপ্নবিহ্বল মুহূর্ত। কাব্যে, গানে, গল্পে, পত্রে এই দিনগুলি অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে শুভ্র শুকতারাটির মত অম্লান হ'য়ে আছে।

সমকালীন সৃষ্টির সঙ্গে ছিন্নপত্রের এক গভীর সম্পর্ক আছে—সে সম্পর্ক নিবিড় ঐক্যের, সে সম্পর্ক রক্তের। সোনার তরী, চিত্রা, গল্পগুচ্ছ আর ছিন্নপত্রের মধ্যে তাই দেখি একই সুর, একই ভাব, একই ধ্যান-কল্পনার গুঞ্জন। সকলের ধমনীতে যেন একই রক্ত আপন আবেগে সঞ্চালিত হয়েছে। গল্পগুচ্ছের পোষ্টমাষ্টার, ছুটি, সমাপ্তি, ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র গল্পগুলির জন্মেতিহাস যথাক্রমে ছিন্নপত্রের (২১, ৬০), ২৮, ৩০, ১১০ এবং ১০৬ সংখ্যক পত্রের মধ্যে লুকান আছে। ২১ ও ৬০ সংখ্যক পত্রের যে বিশেষ অংশগুলিতে "পোষ্টমাষ্টার" গল্পের জন্মেতিহাস লুকান আছে তা' এই :

"এখানকার পোষ্টমাষ্টার এক একদিন সন্ধ্যের সময়ে এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেন। আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্টআফিস, বেশ সুবিধে, চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোষ্টমাষ্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীরভাবে বলে যান।..."

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তুত হ'য়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোষ্টমাষ্টার এসে উপস্থিত।......অতএব পোষ্টমাষ্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হ'লো। এই

লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্টআফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোষ্টমাষ্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোষ্টমাষ্টারবাবু তা'র উল্লেখ করে' বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে' যান, আমি চুপ করে' বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।"...ছুটি গল্পের ফটিক এবং মাখন চক্রবর্ত্তীদ্বয়কে যেন ২৮ সংখ্যক পত্রের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই:

..."কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তা'দের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র খুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ান যেতে পারে তা' হ'লে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ, 'সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো! মারো ঠেলা—হেঁইয়ো!' মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দু'টি একটি মেয়ে আছে, তা'দের ভাব আর একরকম। সঙ্গী অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এই সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তা'দের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে, এমন স্থলে হার মানাই ভালো; তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা

করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তা'কে বিশ্রামের জন্য অন্যস্থান নির্দেশ করে' দিলে, সে তা'তে সহজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দু'টি হাত জড়ো করে' নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অনতিবিলম্বে কৃতকার্য হ'লো। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগল—এমন কি খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তা'র নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে' কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে।"...ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে স্পষ্ট রূপ ১১৯ সংখ্যক পত্রের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে আমাদের সামনে এসেছে। সোনার তরী এবং চিত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে ছিন্নপত্রের বিশেষ কয়েকটি পত্রে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির স্পষ্ট রূপ পাই ৩৮, ৬৪ এবং ৬৭ সংখ্যক পত্রের মধ্যে। বসুন্ধরা, যেতে নাহি দিব, শৈশব সন্ধ্যা (সোনার তরী) এবং সুখ, অন্তর্যামী (চিত্রা) ইত্যাদি কবিতাগুলির ছায়া পাই যথাক্রমে ৫৭, (১০, ১৯), ১০৮, (২২, ২৬, ৪৩), ২০২ সংখ্যক চিঠিগুলির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের মত বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য: "স্বর্গ হইতে বিদায়, বৈষ্ণব কবিতা, পুরস্কার, বসুন্ধরা, জীবনদেবতা প্রভৃতি যে সকল কবিতা ভাবে ও প্রকাশে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে, যাহাদের অর্থ সীমাবদ্ধ তত্ত্বমাত্র নহে কিন্তু বিচিত্ররূপে ব্যঞ্জনাপূর্ণ, যাহাদের ভিতরকার দৃষ্টি বিশ্বপ্রসারিত এবং প্রকাশ উপমায় ও রূপে জীবন্ত ও বস্তুগত—আমি তো কখনই মানিতে রাজী নই যে, কবি আপনার ভাব-জীবনকে পরিস্ফুট করিয়া লইবার এমন অবসর না পাইলে সে সকল কবিতায় এরূপ প্রসার বিচিত্রতা ও সত্যতা কদাচ দেখা যাইত।" বাস্তবিক পদ্মাতীরে বসবাসের এই জীবনটা কবিকে কী অদ্ভুত ভাবেই না পরিপূর্ণতা দান করেছে। প্রকৃতি দেবী যেন স্বয়ং

আপন শ্যামল হাতের পরশ দিয়ে কবির চিত্তকে প্রসারিত উদার বিপুল অসীমের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি কবির চিত্তে যে অভিনব রূপলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে, ছিন্নপত্রের বহু স্থানেই তা'র অঙ্গীকার আছে: "যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পিয়ালার মত আগাগোড়া পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে; যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তা'র সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে"—পঃ সঃ ১২২।

..."কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী আর তারি মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলী-পরা বধূ, অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে, ধীরে ধীরে শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নদীর উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে, মৌনমুখে, শান্তপদে প্রদক্ষিণ করে' আসছে। তা'র বর যদি কোথাও নেই তবে তা'কে এমন সোনার বিবাহ বেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!"—পঃ সঃ ১৫২।

মোট কথা, পদ্মাতীরে বসবাসের জীবনটি কবির মানসলোকে যে গোপন বিস্ময়কর সৃষ্টির পট-পরিবর্তনের পালা চলছিল, সেই অজ্ঞাত মানসলোকের রহস্য ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রের এই 'উপরি পাওনা'টাই, বোধ হয় আমাদের সব থেকে বড় লাভ।

এই পত্রগুলির বুকে যে অফুরন্ত মণিমাণিক্য লুকান আছে, সে সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হ'তে একটি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন: "আমার অনেক সময় ইচ্ছে করে, তোকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার

অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আর চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সের মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লে সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা' কিছু ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়, কিন্তু যেটাকে আমি বাইরে থেকে সঞ্চয় করে' এনেছি, সেটা এক একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল তোর সেই চিঠির বাক্সের মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই—তা'র মর্যাদা আমি যেমন বুঝব, এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার চিঠিগুলো দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেন না, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি, তা' হ'লে এক সময় নিশ্চয়ই বুড়ো হ'য়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হ'য়ে থাকবে—তখন পূর্ব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে। তখন আজকের এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা ভাবে ফিরে পাব···আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এ রকম করে' গাঁথা নেই।”

ছিন্নপত্র হ'তে ব্যক্তিগত অংশটুকু ছিন্ন করায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কেন না এগুলি ছিন্ন করায় চিঠির যেটি মূলরস অর্থাৎ ব্যক্তিগত রস, সেটা থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এই ব্যক্তি-রসই চিঠিকে অনবদ্যতা দান করে এবং এর জন্যে পাঠকমণ্ডলী পত্রসাহিত্যের প্রতি একান্ত কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। প্রিয় কবি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বরূপটি এই ‘ব্যক্তি-রসে'র

মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত হয়। সুতরাং ছিন্নপত্র হ'তে এই 'ব্যক্তিগত রস'টি উধাও হওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বিশেষ অংশগুলি না থাকাতেও চিঠির রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এগুলি না থাকার জন্যেই বরং সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে একটি অখণ্ড রসপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। পড়তে পড়তে চিঠিগুলি এত সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত হয়েছে বলে মনেই হয় না। একটি অখণ্ড রস এবং ভাব ঐক্য আমাদের মনে এক বিশেষ রকমের ভাল লাগার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। অচ্ছেদ্য রসপ্রবাহের এই বিশেষ বিরামহীন সুরটি ছিন্নপত্রকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

পত্রসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'ভারহীন সহজের রস' এবং 'ব্যক্তিগত রস' এই দুইটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ছিন্নপত্রের মধ্যেও এই দুইটি ভাবের সাক্ষাৎ মেলে। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি যেন প্রাণাবেগে আপনিই উৎসারিত হয়েছে। সহজ দৃষ্টি এবং সরল প্রাণের ভাল লাগা মন্দ লাগা বিষয়গুলি এখানে অনাবৃত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির মত কোন সচেতন প্রয়াস এই চিঠিগুলিকে স্পর্শ করে নি। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ভাব সরল হ'লেও সেখানে শিল্পীর সদাজাগ্রত মন ক্রিয়াশীল। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে—কিন্তু ছিন্নপত্রের উল্লাস থাকলেও কবি কোথাও তাঁ'র ব্যক্তিগত সীমা ডিঙিয়ে যান নি। জাগ্রত শিল্পী মন তাঁ'র সৃষ্টিকে শাসন করতে পারে নি। চিঠি লেখার নামে প্রবন্ধ লেখার যে দুর্নাম রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটেছে ছিন্নপত্র অন্ততঃ সেদিক থেকে মুক্ত। "একান্ত আত্মকেন্দ্রিক মনন কল্পনা নয়—হালকা চালে আলাপ করে' যাওয়া, লঘুপদভারে চারিদিকের তথ্যের সংসারের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সংবাদ পরিবেশন করাই হ'লো চিঠি লেখার আসল উদ্দেশ্য।" বলা বাহুল্য এদিক দিয়ে বিচার করলে ছিন্নপত্র আদর্শ

পত্রসাহিত্য। মাঝে মাঝে দু'-এক স্থানে যে তত্ত্বকথা প্রকাশ পায় নি তা' নয়—কিন্তু সে তত্ত্বকথা একটুখানি মাত্র উঁকি দিয়েই ব্যক্তিগত কথার ভিড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। অলংকার নইলে কবিতা রমণীর লাবণ্যই ফোটে না। দোদুল ছন্দ এবং অনুপ্রাসের আন্দোলন না হ'লে সে অনেকখানি ম্রিয়মাণ। কিন্তু ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির জন্যে এমন কোন সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় নি। এই চিঠিগুলির বেণী বাঁধা হয় নি, বেশবাস এলায়িত, সাজসজ্জা করে' যেমন ছিল তেমনি এসে হাজির হয়েছে—তাই পত্রগুলি এমন আশ্চর্য মনোহর।

॥ *চার* ॥

লঘুপক্ষ ছিন্নপত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর হাস্যরস। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন পরম হাস্যরসিক। ছিন্নপত্রের মধ্যে তাঁ'র সেই পরিহাসপ্রিয় মনটার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। গুছিয়ে না রাখা সাদা কথায় কবি যে চিত্ররূপ এবং ভাবরূপের আনন্দঘন প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই গ্রন্থে—তা'র পাশে হাস্যকৌতুকের যে একটি বেগবান স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে তা'র মূল্যও বড় কম নয়। মনে হয় এই নির্মল হাস্যরসের ধারাটি গ্রন্থটিকে একটি অনাবিল মাধুর্যময় সহজ সারল্য দান করেছে। সকল উদার ধ্যান-কল্পনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনাবিল প্রকাশ—সবার পিছনে হাস্যরসের উচ্ছল সজীবতা মিশে এক অপূর্ব ঝঙ্কার তুলেছে। গ্রন্থের একদিকে গভীর কথায় কবি যেমন গম্ভীর তেমনি অন্যদিকে ব্যঙ্গকৌতুকে তিনি লঘুভার। কৌতুক পরিহাসের ধারাটি যেন কবির রক্তে মিশে ছিল—তা'ই দেখি অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়ের আলোচনাতেও পরিহাস-ব্যঙ্গ তা'র দলবল নিয়ে উন্মাদের মত কবির লেখায় এসে ভিড় জমিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দু'টিই যথেষ্ট হবে। আটচল্লিশ সংখ্যক চিঠিতে কল্পনার প্রসারতার সাথে হাস্যরসের অনবদ্য প্রকাশ

ঘটেছে। মনোরম বিকেলে কবি সবান্ধবে বেরিয়েছেন বোলপুরের মাঠে ভ্রমণের জন্যে। আকাশে ছিল হালকা মেঘের স্বচ্ছ আবরণ। কিন্তু হঠাৎ "দেখি সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হ'য়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হ'লো এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই নিরাপদ।...বাড়ীর যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি তিন-চারটে চাকর মহাসোরগোল করে' দ্বিতীয় আর একটা ঝড়ের মত আমাদের উপর এসে পড়লো।...হয়তো কোনদিন বাধ্য হ'য়ে কাব্যে বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্য দিয়ে ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে' অকাতরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যা কথা লিখতে পারবো না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব—কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে।"

"ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপঝপ করে' দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থাক্যে আন্তে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে' সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিংবা নন্দন-কানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই; কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগ স্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা' বলা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তা'র দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে, তা'তেই বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও

আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল; যুবতীর মন ভারী হ'লে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তা'র একটা সংবাদ পাওয়া গেল।"...

ছিন্নপত্র যেন হাসির খনি। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েও যে এমন ভাবে মানুষকে হাসান যায় তা' কল্পনা করেও বিস্মিত হ'তে হয়। এর পাতায় পাতায় এমনি কত না হাসির টুকরো ছড়ান আছে। রবীন্দ্রনাথ যে পরম হাস্যরসিক ছিলেন এক ছিন্নপত্রকে তা'র দলিল হিসেবে উপস্থিত করলেই যথেষ্ট হবে।

ছিন্নপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠবে এর ভাষার অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশি। এমন ভাষায় না লিখলে বুঝি ছিন্নপত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যেত। ভাষা যেন ভাষা নয়—বিমূর্ত মানব প্রকৃতির এক বিশেষ রূপ। কুমারীর প্রথম প্রণয়ের মত ভাষা যেন কথা কয়ে আমাদের অন্তর-ওষ্ঠে চুম্বনের পর ব্যাকুল চুম্বন দিয়ে সমুদয় প্রেম-সুধা দান করছে। শিল্পী মানুষটিকে তথ্যপুঞ্জের আড়াল থেকে টেনে এনে একেবারে পাঠকের সামনে অনবদ্য ভাবে প্রকাশ করে' তুলেছে। তথ্যভার অপসারিত করে' কবি-সত্তাটিকে চিনে নেওয়ার কাজ সহজ করেছে। উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করে', শাল পিয়ালের বন মাড়িয়ে উদ্বেল কলহাস্য প্রিয় ঝরনা যেমন দুরন্ত পথে পাড়ি জমায়—সরল সহজ অনবদ্য ভাষা তেমনি সমুদয় ভাবরাশিকে মাথায় নিয়ে দুরন্ত বেগে পাঠকের অন্তর-বেলাভূমিতে প্লাবন জাগিয়েছে।

বাংলার পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে ছিন্নপত্র এক অপূর্ব সংযোজনা, এমন লঘুপক্ষ ভাববাহী সারল্য মাধুর্যে ভরা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। ছিন্নপত্র পত্রসাহিত্য, ছিন্নপত্র লিরিক কবিতা, ছিন্নপত্র সংগীত মূর্ছনা, ছিন্নপত্র ভ্রমণ-কাহিনী, ছিন্নপত্র ডায়েরী, ছিন্নপত্র রসবাহী, ছিন্নপত্র চিত্রগরিমার শ্রীক্ষেত্র, ছিন্নপত্র মানব হৃদয়ের বিচিত্র সুরাল্পনার আন্দোলন। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় কবি খেয়াল-খুশীর মালা গেঁথেছেন—যে মালা অনবদ্য, অপূর্ব, দোসরহীন, অনন্যসুন্দর।

## ॥ জীবনস্মৃতি ॥

### ॥ এক ॥

আত্মজীবনী বোধ হয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তা'র জন্ম অতি অল্প দিনের। রাসু সুন্দরীর "আমার জীবনী" হ'তেই সম্ভবতঃএই জাতীয় আত্মচরিতের সূত্রপাত। তারাশঙ্করের "আমার কালের কথা"ই বোধ হয় এই জাতীয় গ্রন্থের শেষতম প্রকাশ। আধুনিক কালে এই জাতীয় গ্রন্থের সমাদর বাংলায় দুর্বার হ'য়ে উঠেছে। বাঙালী পাঠক অত্যন্ত সমাদর ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই আত্মচরিত জাতীয় গ্রন্থকে আপন আনন্দ সহচর হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে চরিত গ্রন্থের প্রচলন বহুপূর্ব হ'তে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার এবং প্রসার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের হ'লেও আনন্দের কথা তা' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে।

কবি এবং লেখকদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় জানার জন্যে সাধারণ মানুষের মনে একটা অনন্ত কৌতূহল আছে। কাব্যে এবং গল্প-উপন্যাসে সেই অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়ার মত নয়—এ সবের অতিরিক্ত আরো কিছু প্রয়োজন, যেখানে পাঠক-পাঠিকা তা'দের প্রিয় কবি লেখকের সাথে একান্ত পরিচিতের মত মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াবে, একান্ত আপনজনের মত শুনতে পাবে তাঁ'দের চলমান জীবনের নিগূঢ় সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি কথা। আত্মচরিত গ্রন্থসমূহের বোধ করি এইটাই সবচেয়ে বড় লাভ। জীবনচরিত গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা ও আলোচনার মাধ্যমে আমরা লোকটির ব্যক্তি-পুরুষ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কিন্তু অন্তঃপুরুষের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করতে পারি নে। জীবনীতে আমমহলের দ্বারই উদঘাটিত হয় কিন্তু অন্দর-মহলের দ্বার থেকে যবনিকার অন্তরালে। জীবনীকারের পক্ষে-

সেখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কেন না কায়িক রবীন্দ্রনাথের অন্তরালে যে আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন, কবি-সত্তা প্রকাশের অন্তরালে যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি সত্তা বিরাজমান—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সেই সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। নজরুলের ব্যক্তি-পুরুষের অন্তরালে যে আর এক নজরুল জীবিত—সে নজরুলের সন্ধান দেবে কে? এখানেই প্রয়োজন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের, স্বয়ং নজরুলের। নিজের জীবনের চারপাশ ঘিরে দৈনন্দিন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা স্বর্ণমসলিন বয়ন করে' চলেছে অবিরাম—আপনা ছাড়া আর কারও পক্ষে তা'র যথার্থ চিত্রণ সম্ভব নয় : আত্মজীবনী গ্রন্থে থাকে এই চিত্রাবলীর সুন্দরতম রূপায়ণ। জীবনী গ্রন্থে যা আভাসে ইঙ্গিতে সমাপ্ত আত্মপরিচয় গ্রন্থে তাই রং ও রেখায় অনন্যসাধারণ। জীবনী গ্রন্থ প্রধানতঃ বাইরের এবং প্রসঙ্গতঃ অন্তরের আর আত্মপরিচয় গ্রন্থ প্রধানতঃ অন্তরের এবং প্রসঙ্গতঃ বাইরের ঘটনাবলীতে সুসমৃদ্ধ। জীবনী গ্রন্থ ব্যক্তির কর্মময় জীবনকে সুন্দর করে' তুলে ধরে এবং তা' Objective আর আত্মপরিচয় গ্রন্থ অন্তঃপুরুষের পরিচয়ে উজ্জ্বল তাই এই জাতীয় গ্রন্থ প্রধানতঃ Subjective-ধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি আত্মচরিত জাতীয় গ্রন্থ। তথাপি কবি গ্রন্থটিকে আত্মপরিচয়, আত্মকথা কিংবা আত্মচরিত নাম না দিয়ে জীবনস্মৃতি নাম দিয়েছেন। এই নামের অন্তরালেই নিহিত আছে গ্রন্থটির স্বরূপ।

আত্মজীবনীর বিষয়বস্তু ও স্বরূপ নির্ণয়ে পণ্ডিত মহলে মত বিরোধের অবধি নেই। এক একজন এক একভাবে এর স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কেউ বলেছেন আত্মজীবনী হবে আত্মোদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি। আত্মোদ্‌ঘাটন না হ'লে আত্মজীবনীর কোন অর্থই হয় না। সকল ভালমন্দ, সকল পাপপুণ্য মিলিয়ে যে 'আমি' সেই দোষগুণ সংপৃক্ত 'আমি'র রূপ ফোটানটাই আত্মজীবনীর প্রধান লক্ষ্য। প্রখ্যাত মনীষী রুশো এবং সেন্ট আগষ্টিনের কনফেসান্‌স্‌

এই জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে রুশো এবং সেণ্ট আগষ্টিন যে ভাবে আপন পাপাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা' কল্পনা করাও যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে অসম্ভব। রুশোর গ্রন্থে নিজের যে উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে তা' একদিকে যেমন ভয়াবহ তেমনি বাস্তব প্রেরণা-সমৃদ্ধ। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি গ্যায়টের আত্মজীবনীও এই জাতীয় গ্রন্থের একটি। সেখানে গ্যায়টের যে পরিচয় পাই তা' অপূর্ব। পাপপুণ্যের সংমিশ্রণে সে গ্যাটে রহস্যাবৃত। পাপপুণ্যের উদ্ঘাটনই যদি আত্মজীবনীর মানদণ্ড হয় তা' হলে জীবনস্মৃতিকে কোনক্রমেই আত্মজীবনী বলা যায় না। রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে পাপ করা বিচিত্র নয়। কিন্তু জীবনস্মৃতির দিগন্ত যে পর্যন্ত বিস্তৃত তা'তে জীবনের প্রধান অংশই বাদ পড়ে গেছে এবং এ কথা জোর করেই বলা যায় পাপপুণ্যের যথাযথ স্বীকৃতি এ গ্রন্থে নেই।
এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা প্রয়োজন। নিজেকে উলঙ্গরূপে প্রকাশ করা পাশ্চাত্ত্য রীতি হ'লেও ভারতীয় রীতি তা' নয়। ভারতের রীতি সকল প্রকাশের মধ্যে কল্যাণের সজীবতাকে প্রধান করে' দেখেছে, সকল প্রকাশের মধ্যে দীপালোকের মত মঙ্গলের শিখাকে খুঁজে ফিরেছে। তা' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখেছেন পরিণত বয়সে এবং এ সময় কবি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং নিজেকে উলঙ্গরূপে প্রকাশ করা কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি যে তাঁ'র দুষ্টামীর পরিচয় দেন নি—এমন কথা বলা যায় না। গ্রন্থের কোন কোন স্থানে তা'র পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।
আত্মপরিচয় গ্রন্থের দ্বিতীয় লক্ষণ সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন এই জাতীয় গ্রন্থে আত্মোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে দেশকালের কথা। তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' এই জাতীয় গ্রন্থের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ গ্রন্থের একদিকে আছে সমসাময়িক দেশকালের অনবদ্য প্রকাশ। সমাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার ক্রম প্রকাশের সাথে সাথে আত্মপরিচয় মিলিত হ'য়ে গ্রন্থখানিকে অপূর্ব

করে' তুলেছে। এই মানদণ্ডেও জীবনস্মৃতিকে আত্মপরিচয় গ্রন্থের গণ্ডিতে ফেলা যায় না। কেন না সমসাময়িক দেশকালের কথা গ্রন্থের মধ্যে অতি অল্পই স্থান পেয়েছে। স্বরাজ-আন্দোলন এবং দেশী জিনিসপত্রের প্রসার সম্পর্কীয় সামান্য আলোচনা হ'তে জীবনস্মৃতির দেশকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে এইটুকু বোঝা যায়, সে সময় দেশ স্পষ্ট পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পড়েছে, নতুন জোয়ার আসার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে তা'র সারা দেহে।

আত্মজীবনী সম্পর্কে আর একদলের মত এই জাতীয় গ্রন্থে থাকবে আপন শিল্পীজীবনের কথা। শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের আত্মোদঘাটন করাই এই জাতীয় গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। গ্যাটে তাঁ'র সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Poetry and Truth'-এ তাঁর শিল্পী জীবনের ধারাটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। "আমার সাহিত্যিক জীবন"-এ তারাশঙ্কর ঠিক এই ধারাটিকে নতুন রূপ দান করেছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের বিকাশধারার কিছু পরিচয় পাই। বলা বাহুল্য এই বিকাশধারার ইতিহাস প্রাথমিক স্তরের। জীবনের প্রথম প্রভাতে কবিতা উন্মেষ হ'তে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত এই প্রাথমিক ধারাটিরপ রিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে। এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি হ'লেও পরবর্তী যুগে কবির কাব্যমানসের যে অনন্ত বিশাল প্রসরণ দেখেছি তা'র সামান্যতম আভাসও এ অংশে অবর্তমান। রবীন্দ্র-কবিমানসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁ'র ঐকান্তিক মর্তপ্রীতিতে, নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যা-কাঙ্ক্ষায় এবং জীবনদেবতার ইঙ্গিতে অভিসারের যাত্রায় তথা আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র পর কবির কাব্যে যখন নীরব পদসঞ্চারে এই সকল অভিনব অনুভূতির আবির্ভাব হচ্ছে ঠিক সেই সময় জীবনস্মৃতির দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। ফলে শিল্পজীবনে বিকাশধারার অখণ্ড পরিচয় এই গ্রন্থে অনুপস্থিত। সুতরাং এই মানদণ্ডেও জীবনস্মৃতিতে আত্মপরিচয় গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত

কল্পা বোধ হয় সমীচীন নয়। স্থূল দেহের অন্তরালে যে কবিপুরুষের সৌন্দর্যময় সত্তা বিরাজমান তা'র পরিচয় নিহিত রয়েছে বিশ্বকবির "আত্মপরিচয়" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে শিল্পীজীবনের ক্রমোন্নতির ধারাটি ধীরে ধীরে অভিনব রূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

আত্মজীবনী গ্রন্থের স্বরূপ সম্পর্কে আর একদলের মত এই গ্রন্থ হবে স্মৃতি কথায় ভরপুর। স্মৃতিধূপের সুরভি রচনা করা এই জাতীয় গ্রন্থের চরম লক্ষ্য। অতীত দিনের সেই স্বল্পায়ু মুহূর্তগুলি, সেই বেদনাবিধুর চিরসুন্দর ক্ষণগুলি রোমন্থন করে' অপূর্ব গরিমায় উদ্ভাসিত করাই আত্মপরিচয়মূলক গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য এই মানদণ্ডে জীবনস্মৃতি এক পরমাশ্চর্য গ্রন্থ। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্মৃতির এক একটি অপূর্ব চিত্র আপন দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থখানিই স্মৃতির রোমন্থনে পরম বৈচিত্র্যময়। পরিণত জীবন-নদের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি কল্পনায় ফিরে গিয়েছেন তাঁ'র সেই স্বপ্নঘন রঙীন দিনগুলিতে, উদ্ধার করে' এনেছেন এক একটি চকিত-দীপ্ত ক্ষণ-উজ্জ্বল মুহূর্তকে। মুহূর্তগুলি আপন সৌন্দর্যে আপনি উজ্জ্বল, অনিন্দ্যসুন্দর। বাড়ীর মধ্যে সেই চাকরদের শাসন, রেলিংগুলিকে ছাত্রকল্পনায় বেত্রহস্তে কবির সেই শিক্ষকতা, পিতার সেই তপস্যানিমগ্ন পরমাশ্চর্য ধ্যানগম্ভীর মূর্তি, নীরব মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে বসে দূর আকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জের সেই চিরমধুর আনাগোনা, বৌঠাকুরাণীর নিবিড় ভালবাসা-রাঙানো সেই স্বপ্নঘন দিনগুলি, নির্জন নিশীথে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বল্প জ্যোৎস্নালোকিত সেই ছায়া সুনিবিড় মুহূর্ত, আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে বর্ষার আকাশে সেই নবমেঘমালার নীরব পদসঞ্চার, শরতের সেই পরম নির্জনতার ও মোহময় পরিবেশের মধ্যে জীবনটাকে বিশাল উদার আকাশের সাথে এক করে' দেখা এমন কত না দূরাগত মধুর চিত্র কবির কল্পনায় অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে চিরমধুরতায় নিবিড় হ'য়ে ধরা দিয়েছে। সমগ্র জীবনস্মৃতি গ্রন্থটি এমনি সুমহান্ চিত্রের একখানা বিশাল এ্যালবাম। কেবল চিত্রের

পর চিত্র, কেবল ছবির পর ছবি। এই চিত্র এই ছবি এরা প্রত্যেকেই সুদূর অতীতের এক একটি বিমল মুহূর্তকে নিবিড়ভাবে আপন বুকের মাঝে ধরে রেখেছে। শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় জীবনস্মৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই সত্যই বলেছেন: "মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটি চিত্ররস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।" বস্তুতঃ জীবনস্মৃতি আত্মজীবনী নয়, আত্মপরিচয়ও নয়—ইহা স্মৃতিরই চিত্র। আর স্মৃতিচিত্র যদি আত্মপরিচয়ের অন্তর্গত হয় তা' হ'লে গ্রন্থখানি আত্মপরিচয়ের অংশ মাত্র।

॥ দুই ॥

জীবনী অপেক্ষা আত্মজীবনী লেখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেন না জীবনী লেখক আপন চোখে অপরকে বিচার করেন সেখানে আপনাকে অযথা বেশি প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আত্মজীবনী লেখকের পক্ষে এই বাধাটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুরতিক্রমী। আত্মজীবনী লিখতে গেলেই আপন মনের অগোচরে আপনার কথা এত বেশি এসে ভিড় জমায় যে আত্মপ্রতারণা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। নিজের প্রতি অবিচার না হ'য়ে পারে না। পদে পদে অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে লেখার স্বচ্ছতাকে বর্ষার পঙ্কিল জলের মত আবিল করে' তোলে! তা'র সম্ভ্রম এবং শুভ্রতা নষ্ট হয়। অহংবোধ ভুলে আপনাকে অপরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে ঠিক অপরের মত করে' না তুলতে পারলে ভাল আত্মজীবনী লেখা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কিন্তু নিজেকে পর ভাবা কঠিন —অনেকের পক্ষেই সাধ্যাতীত। তাই প্রথম শ্রেণীর আত্মপরিচয় জগতে এত বিরলদৃষ্ট। সুখের বিষয় 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেকে ভুলতে পেরেছেন। আপনাকে অচেনা জনারণ্যে দাঁড় করিয়ে

নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। আপনার কথা কোথাও পল্লবিত করে' বলে ভাবসৌন্দর্য এবং গতিমাধুর্যকে ছায়াচ্ছন্ন করে' তোলেন নি। সর্বত্রই একটা প্রশান্ত উদার দৃষ্টির পরিচয় মেলে। আত্মবিশ্লেষণে বিশ্বকবি যে নিবিড় সংযম ও একান্ত নিরাসক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন তা' কেবল বঙ্গে নয় পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আত্মপরিচয়ে মেলা ভার। ভানুসিংহের পদাবলী, বাল্মীকি-প্রতিভা, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যের আলোচনায় এবং মূল্য নির্ধারণে কবি অত্যন্ত কঠোর হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সব কাব্যের স্বরূপ ও মূল্য নির্ধারিত হয় নাই। নিজেকে এমন ভাবে ভুলে কবি আত্মপরিচয় লেখার এক নতুন ধারার উৎসমূল খুলে দিয়েছেন।

জীবনস্মৃতি বিশালায়তন গ্রন্থ না হ'লেও নিছক স্বল্পায়তনেরও নয়। কিন্তু এই গ্রন্থের তিন-চতুর্থাংশ হয়তো বা আরো বেশি জুড়েই রয়েছে বাল্যস্মৃতির মধুকোষ। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সমগ্র গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয়েছে শৈশব-স্মৃতির এক অনন্ত প্রবাহ। কত বিচিত্র স্মৃতিচিত্রই না আমরা জীবনস্মৃতিতে পেয়েছি। নর্মাল স্কুলে পাঠকালে 'Full of glee, Singing merrily, merrily, merrily' গানটিকে "কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং"-এ পরিণত করার যে কথা কবি বর্ণনা করেছেন তা' আমাদের হৃদয়-বেলাভূমিকে হাস্যোচ্ছলতায় উদ্বেল করে তোলে। সত্যের নিকট হ'তে শোনা কথাটা নিয়ে পিতৃদেবের সাথে হিমালয় যাত্রার প্রাক্কালে ট্রেনে চড়ার যে একটা নিদারুণ নিষ্ফল আশঙ্কার কথা কবি প্রকাশ করেছেন তা' চিরদিন মনে রাখার মত। পরিণত বয়সে জীবনস্মৃতি লেখার সময় বাড়ীর পাঞ্জাবী চাকর লেছু এবং আতর বিক্রীওয়ালা বিরাটকায় য়িহুদী গাব্রিয়েলকেও কবি ভুলতে পারেন নি। ছোট-খাটো এমনি কত কি জিনিস তাঁ'র কল্পনায় ভিড় করে' এসেছে। "সেই বাড়ীর ধারের বাগান, পুকুর ও বটগাছ দেখিয়াই কতদিন

তাঁহার আনন্দে কাটিয়াছে। মধ্যাহ্ন আকাশের খরদীপ্তি ও তাহার স্তব্ধতার মধ্যে চিলের তীক্ষ্ণকণ্ঠ ও ফেরিওয়ালার করুণ হাঁক উন্মাদ করিয়া দিয়াছে। সেই নারিকেল তরুশ্রেণী, লেবুগাছ ও অন্যান্য দু' একটা তরুবিশিষ্ট বাড়ীর ভিতরের বাগানটিই মানবের আদিম স্বর্ণকাননের মত ছিল, শরতের শিশির স্নাত সোনালী প্রত্যূষে সেইখানেই কত আনন্দে, কত বিস্ময়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছে।" "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ"-এর 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'র পিছনে যে এক সুমহান দৃশ্য বিরাজমান, যে এক অপূর্ব সোনালী প্রভাত তা'র সমুদয় রূপরাশিকে একত্রিত করে' শত বরণের লাবণ্য কবির সম্মুখে উন্মুক্ত করে' দিয়েছিল সেই স্মৃতি কবি কী অদ্ভুত ভাবেই না বর্ণনা করেছেন। ছেলেবেলার সেই সকল স্মৃতি-মন্থর মদির বিহ্বলতা আমাদের সমগ্র অন্তরকে আবেশ-বিধুর করে' তোলে। কিন্তু এই সকল স্মৃতিচারণার মধ্য থেকে কবি শৈশবের সেই 'সুকুমার আমি'র স্বরূপটিকে কি আশ্চর্য সুন্দররূপেই না প্রকাশ করেছেন!

আপন ভোলা স্মৃতিচারণার সাথে আত্মপরিচয় দেওয়া ছাড়াও জীবনস্মৃতির একটি মূল্যবান সম্পদ এর ভাষা। স্মৃতি যত উজ্জ্বল এবং যত মধুরই হোক না কেন উপযুক্ত ভাবে যদি তা'র প্রকাশ না ঘটে তা' হ'লে পাঠকসমাজে তা'র বিশেষ মূল্য থাকে না। জীবন-স্মৃতির স্মৃতিগুলি যেমন সরল সুললিত, প্রকাশভংগীর মহিমায় তেমনি সুন্দর। স্মৃতির সাথে ভাষার ঝংকার যেন অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। বৈচিত্র্যময় অননুকরণীয় গদ্যরীতিতে সমগ্র জীবনস্মৃতিখানি যেন একটি প্রাণমাতানো গল্পের মত একান্ত উপভোগ্য সরস এবং প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে। দূরাগত স্মৃতির সাথে ভাষাও যেন উধাও হ'য়ে গেছে কোন এক মহান্ অতীতে। প্রকাশভংগীর চাতুর্যে এবং শিল্প-বৈচিত্র্যময় লিপিকুশলতায় পাঠক যেন শুনতে পায় অতীত রূপকথার রহস্যভবনের ব্যঞ্জনায়িত ধ্বনি, দূর দূরান্তের স্বপ্নালোক নিবাসী নিবিড় কলগুঞ্জনের পদসঞ্চার। আশুতোষ চৌধুরীর নিকটে

যে গন্ধের হাওয়া পেতেন সে সম্পর্কে কবি বলেছেন, "সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানাফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।"

ঘন নিশীথে শ্রাবণের আকাশ ঘিরে বাদল মেঘমালার বরষণ-মুখর স্মৃতির কথা স্মরণ করে' কবি লিখেছেন, "আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি। ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ছমছম শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জাগাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।"

শরৎ ঋতু কবির স্মৃতিতে যে ভাবে জমা আছে তা এই: "তখন শরৎ ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া আছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়— সেই শিশিরে ঝলমল করা সরস সবুজের উপর সোনাগলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে' দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া পুনঃ পুনঃ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি।" এই ভাষা এই প্রকাশ আমাদের অন্তরে যেন বলপূর্বক একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র জোর করে' এঁকে দিয়ে চলে যায়। স্মৃতি যেন সরস ও জীবন্ত হ'য়ে আমাদের সম্মুখে ধরা দেয়। জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি-সমৃদ্ধ নয় কিন্তু তা'র বলিষ্ঠতা ও সজীবতা লক্ষণীয়। প্রতিটি স্মৃতিই যেন কল্পনা ঐশ্বর্যে এবং বৈচিত্র্যময় প্রাচুর্যে একটি অখণ্ড লিরিকের মত পেলব-মসৃণতায় অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। সামান্য এবং অতি তুচ্ছ স্মৃতিকে অবলম্বন করে' কবি খেয়াল-খুশীর এক চিরসুন্দর মালা গেঁথেছেন। স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ অপরাজেয় এবং সুনিপুণ রূপদক্ষ।

তথাপি জীবনস্মৃতির গদ্যরীতিতে যে দুর্বলতা নেই তা' নয়। মাঝে

মাঝে প্রকাশ-রীতি অস্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে। শ্লেষ-বাগ্-বৈদগ্ধ্য গদ্যরীতিতে এবং বক্রোক্তির শাণিত কষাঘাতে জীবনস্মৃতির অনেকাংশ ম্লান হ'য়ে গেছে। এই সকল স্থানে স্মৃতির মাধুরিমা যে কিছু নষ্ট হয় নি—এমন কথা বলা যায় না।

॥ *তিন* ॥

জীবনস্মৃতিতে ভ্রমণ-বৃত্তান্তেরও কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার জন্য সরস এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। যা' দেখা যায় তা'র সবটা যেমন ভ্রমণ-কাহিনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয় তেমনি আবার অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যা' সাধারণের দৃষ্টিতে তুচ্ছ মাত্র তা'কে আদরে গ্রহণ করে' বর্ণনার বিশালাংশে স্থাপন করতে হয়। এই বর্জন এবং গ্রহণ রীতিই ভ্রমণ-কাহিনীর প্রাণসম্পদ। গ্রন্থের সকল সৌন্দর্য, সকল চারুত্ব, সকল অভিনবত্ব এই রীতি এবং প্রাঞ্জল প্রকাশভংগীর উপর নির্ভরশীল। জীবনস্মৃতিতে এই রীতি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। হিমালয় যাত্রা অংশে আমরা কবি কর্তৃক অঙ্কিত হিমালয়ের যে বিশালরূপের কল্পনা করেছিলুম বলা বাহুল্য সেই বিশালত্বের কোন চিহ্নই এতে নেই, অথচ যা পেয়েছি তা'তেই আমাদের চিরচঞ্চল গতিশীল মন শান্ত হ'য়ে গেছে। সেই শালবৃক্ষের বর্ণনা, সেই ছোট ছোট শিলাখণ্ড, বন্ধুর পথ অতিক্রান্ত ঝরনার সেই খলখল উচ্ছ্বাস সকল বর্ণনার ভিতর এমন একটি 'উচ্ছ্বাসময়-সংযম' আছে, চিত্রসমারোহে যা' আমাদের অন্তরকে একেবারে লুঠ করে' নেয়। নিখুঁত এবং প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় জীবনস্মৃতির কবি যে সিদ্ধহস্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্থর স্মৃতিচারণাই যেন একটি ভ্রমণ—শৈশব থেকে যৌবনের বনে দুর্গম যাত্রা।

স্মৃতি উদ্‌ঘাটন ছাড়াও জীবনস্মৃতির আর একটি দিক আছে। মাঝে মাঝে কবি যে সকল মনীষীর সংস্রবে এসেছিলেন এবং যাঁদের

প্রভাব আজীবন কাল তাঁ'র কবিমানসে অম্লান হ'য়ে ছিল তাঁদের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকণ্ঠবাবু এবং কাদম্বিনী দেবী এই তিনজনের প্রভাব বোধ হয় তাঁ'র কৈশোর জীবনের উপর ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীর। নিস্তব্ধ নিশীথে জেগে ওঠে সুকুমার বালকের সমুদয় আবেগ একত্র করে' যে পরম বিস্ময়ের সাথে কবি পিতার ধ্যানগম্ভীর মৌনমূর্তি দেখেছিলেন ভীতিবিহ্বল মনের বেলাভূমিতে তখন যে জ্যোতির্ময় মূর্তির সুগভীর রেখাঙ্কন হয়েছিল আজীবন ভর সেই ছবিকে কবি কত গানে, কত কবিতায়, কত গল্পে, কত উপন্যাসে, কত নাটকে, কত ভাবেই না বর্ণনা করেছেন। শ্রীকণ্ঠ বাবু এমনি আর একটি লোক যাঁ'র প্রভাব রবীন্দ্র-জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ। এই সদাহাস্যময় মানুষটি কবির অসংখ্য নাটক ও গল্পের দাদাঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং শ্রীকণ্ঠ চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা' বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য: "এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের, ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে—সেই জন্য ইহারা কবির কল্পনাকে কেবল স্পর্শমাত্র করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীরভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মত এই দুইটি চিত্রের পরস্পরের সম্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি স্তব্ধ; একটি আত্মবিকল, অপরটি আত্মসমাহিত; একটি লীলাময়, অপরটি যোগময়; একটি সজন অপরটি নির্জন।"

কাদম্বিনী দেবীর প্রভাব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উৎসমূল। এই একটি মহিলা সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বিপুল করে' তুলেছেন। সেই সুদূর কৈশোরের প্রথম কবিতা উন্মেষের দিন হ'তে এই মহিলাটি আপন বুকের সমুদয় ভালবাসা দিয়ে কবির উৎসমূলকে প্রাণাবেগে ভরিয়ে দিয়েছেন।

পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা ছিলেন এই মহিলা। ভালবাসায়, প্রেমে, স্নেহে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রূপকুমার করে' রেখেছিলেন। তা'ই চব্বিশ বছর বয়সে সেই নব যৌবনের প্রারম্ভে এই মহিলার মৃত্যু-শোক কবির মর্মমূলে এমন গভীর হ'য়ে বেজেছিল। সমগ্র রবীন্দ্রস্মৃতিতে এই মহিলা তা'ই নির্মল শুকতারার মত চিরজ্যোতিষ্মান।

এছাড়াও কবির জীবনে যাঁ'রা অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা'দের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ, রাজেন্দ্রলাল, আশুতোষ চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রধান।

প্রকৃতির মুগ্ধময় রূপের বর্ণনা জীবনস্মৃতির আর একটি দিক। অতীত দিনের প্রতি অন্ধকার গলিপথে পদচারণা করতে করতে যখনই কবির মন হাঁফিয়ে উঠেছে তখনই তিনি প্রকৃতির উদার নির্মল দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। নির্মল প্রভাত, অনাবৃত সন্ধ্যা, নীলাকাশের নিঃসীম বিস্তৃতি এবং সর্বোপরি পথে প্রান্তরের কত রূপ কবিকে কি নিবিড় ভাবেই না আকর্ষণ করেছে। মাঝে মাঝে এই বর্ণনা এমন অন্তরস্পর্শী এবং রূপবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে যে কবিতাকুমারী যেন উর্বশীর মত জীবনস্মৃতির পাতায় পাতায় নৃত্যচপল ভঙ্গীতে অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যের ফেরি করে' বেড়িয়েছে। জীবনস্মৃতি তা'ই কেবল প্রকৃতির উদ্ঘাটন নয়, কেবল আত্মপরিচয়ও নয়—কৈশোর জীবনের চিরচঞ্চল আশা আকাঙ্ক্ষার মোহময় চিত্ররূপ, মন্থর স্মৃতিচারণার চিরসুন্দর কাব্যিক রূপায়ণ।

# ॥ লিপিকা ॥

## ॥ এক ॥

পরমাশ্চর্য, মহাপুরুষ, ব্যতিক্রম, মহামানব, ক্ষণজন্মা, মহাকবি, কবিগুরু ইত্যাদি যতগুলি বাঁধাধরা তৈরী বিশেষণ আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষ ও কবিমানসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্যে প্রয়োগ করি—সে সবের উৎসমূল হ'লো জীবনকাব্যের মহাভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের দ্রুত পটভূমি পরিবর্তন এবং প্রকাশ-ভংগীর লীলাবৈচিত্র্য। সুদীর্ঘ কাব্য-জীবনে কতবারই না তাঁ'র ধ্যান-কল্পনা গতি পরিবর্তন করে' ভিন্নমুখী হয়েছে। কখনো দেখি কবিমানস মর্তপ্রীতির নিটোল রসে সিক্ত, কখনো দেখি তা' নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার অভিসারী; কখনো দেখি কবিমন উড়ে চলেছে আধ্যাত্মিকতার রহস্যঘন স্বপ্নরাজ্যে, আবার কখনো বা দেখি সেই মন গতিবেগের আবর্তে স্পন্দমান। ভাবের ঘরে যেমন এই মননিষ্ঠ দুর্লভ-সুন্দরের চলেছে লীলাখেলা তেমনি তা'র প্রকাশ ঘটেছে বহুবিচিত্র আঙ্গিক সুষমায়। ভাবের সাথে সমতা রেখে প্রকাশভংগীমায় কখনো এসেছে মনোহর ঋজুতা, কখনো বা এসেছে বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দের আন্দোলন; কখনো বা দেখি বিরলদৃষ্ট ছন্দের রূপৈশ্বর্য, কখনো বা দেখি ব্যঞ্জনগর্ভ গদ্যছন্দের অপূর্ব প্রবর্তনা। ভাব এবং প্রকাশভংগীমার এই নিত্য নতুন দিক পরিবর্তন রবীন্দ্র-কাব্যকে এক অপূর্ব সৌন্দর্য এবং বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

ভাব এবং আঙ্গিকের বিবিধ বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ দেখি লিপিকা গ্রন্থে। রূপ এবং অরূপ এখানে এক হ'য়ে মিশেছে। গদ্য এবং কবিতা যেন একই মহা সঙ্গমতীর্থের যাত্রী। সবার মিলনে বেজে উঠেছে এক নিবিড় ঐকতান। কখনো নিপুণতায়

কাহিনী প্রবেশ করেছে কাব্যের রূপলোকে, আর কাব্যনন্দিনী কলাবিলাসীর মত উছলভংগীতে নেচে নেচে চলে গেছে কাহিনীর অন্দরমহলে। গল্প ছুটেছে রূপকথার সীমাহীন দিগন্তে আর রূপকথার আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নেমে এসেছে মর্তের রসলোকে। এমনি করে' সবার দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ঘুচে গিয়ে স্থাপিত হয়েছে এক প্রীতির সম্পর্ক। ভাব' ও আঙ্গিকের বহু বিচিত্র রূপের মাঝে দূরাগত ব্যবধান কী অদ্ভুত ভাবেই না মিলিয়ে গেছে ! লিপিকাগ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এখানেই।

সাহিত্যিক রূপ বিচারের দিক থেকে লিপিকাকে যে ঠিক কোন্ গোত্রে একীভূত করা যায় তা' বলা কঠিন। আমাদের মনে হয় কোন এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে' লিপিকার রচনাগুলিকে বিচার করা যায় না। এ রচনাগুলি এমনি যে, কোন গণ্ডির সীমানায় সীমিত করতে গেলেই এদের সমুদয় সৌন্দর্য ও সম্ভ্রম সহজেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সামান্য আঘাতেই এরা লজ্জাবতী লতার মত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিলুপ্ত করে' ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ে। রচনাগুলি তা'ই গণ্ডির অতীত, সীমাহারা। কোন জাতকুলের পরিচয়ে এদের পরিচয় নেই—এরা জাতকুলের অতীত এক স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতীক।

তবুও একান্ত ভাবে যদি লিপিকার রচনাগুলির গোত্র এবং কুল নির্ণয় করতেই হয় তা' হ'লে রূপ বিচারে এদের মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : ছোটগল্প, নিবন্ধ সাহিত্য, গদ্যকাব্য এবং রূপক রচনা। এই চার শ্রেণীর রচনার প্রত্যেকটির সাক্ষাৎ মেলে লিপিকায়। তবে একমাত্র রূপক রচনা ছাড়া কোন শ্রেণীর রচনা রূপ বিচারের দিক থেকে পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। কোনটা অঙ্কুর, কোনটা কিশলয়, কোনটা বা পাতাঝরা বৃক্ষ—কেবল রূপক রচনাই পত্র সুশোভিত বৃক্ষের মত শ্যাম-শ্রীতে মণ্ডিত হ'য়ে রসের গণ্ডিতে করেছে পদসঞ্চার। নিম্নের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার আলোচনা হ'তে এ কথা প্রমাণিত হ'বে।

॥ দুই ॥

ছোটগল্প অখণ্ড চলমান মানবজীবনের কোন বিশেষ খণ্ডতার মধ্য হ'তে জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ ক্ষণমুহূর্ত হ'তে বেগ নিয়ে সে আপন চকিত দীপ্ত পরিণতির প্রান্তে এগিয়ে যায়। উপন্যাসের মত ছোটগল্প রস-মন্থর নয়—এর রস অমানিশার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চকিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত আপন ঔজ্জ্বল্যে হঠাৎ ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। বিশেষ মুহূর্তে মানবমনের বিশেষ রূপ যেন ছোটগল্পের মধ্য হ'তে কথা কয়ে যায়। বর্ণনা অপেক্ষা মননপ্রধান আলাপচারণায় কল্পনার স্বর্ণমসলিন বয়ন করাই ছোটগল্পের লক্ষ্য। এই মানদণ্ডে বিচার করলে লিপিকার গল্পমূলক রচনাগুলিকে ঠিক পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ছোটগল্পের মধ্যে যে চকিত দীপ্তি থাকে, যে নিটোল অঙ্গসজ্জা এবং ঘটনা পরিবেশনের ঠাসবুননী থাকে এই রচনাগুলির মধ্যে তা'র যথেষ্ট অভাব বিদৃষ্ট হয়। রচনাগুলির বর্ণনা নিটুট নয়—এলায়িত। চকিত দীপ্তিতে পাঠক মনকে উদ্বেল করে' তোলা অপেক্ষা রস মন্থর গতিচারণার মাধ্যমে ক্রমপরিবেশনেই গল্পগুলির মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও লিপিকার কতকগুলি রচনার মধ্যে যে ছোটগল্পের ঝংকার শোনা গিয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে সুয়োরাণীর সাধ, বিদূষক, অস্পষ্ট, পট, নতুন পুতুল, পুনরাবৃত্তি, রথযাত্রা ইত্যাদি প্রধান।

'সুয়োরাণী সাধ'-এ রূপকথার প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও রচনাটির মধ্যে ছোটগল্পের একটি সুন্দর আমেজ আছে। বন্ধনহীন সুখবিভোগের মধ্যে যে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না তা' সুয়োরাণী মনে মনে উপলব্ধি করেছে। শত ব্যথা-বেদনা, শত আঘাত-অভিঘাতের মাঝেও দুয়োরাণী আপন প্রাণৈশ্বর্য, অন্তরের অনন্ত আনন্দ প্লাবনে নির্ঝরের মত বেগবান। দুখের দাহনে তা'র নিখিল অন্তর ব্যাপী

কী বিপুল শাস্তি! যে দুয়োরাণীর প্রতি ঈর্ষায় একদিন সুয়োরাণী তা'কে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মাঝে বনান্তরের পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য করেছিল আজ আত্মপীড়নে সেই সুয়োরাণী একে একে নিজের সমুদয় সুখসম্পদ বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় দুয়োরাণীর সেই বেদনা-বিধুরতার পথেই পা বাড়াল। রচনাটির পরিণতিতে নাটকীয় ভংগীর সাথে ছোটগল্পের একটি সুন্দর সুর ধরা পড়েছে।

ছোটগল্পের সার্থক উদাহরণ 'পুনরাবৃত্তি' রচনাটি। 'রামসীতার বনবাস' খেলতে খেলতে অবশেষে রুচিরা এবং কৌশিকের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠলো—মাঝে রাজার হস্তক্ষেপ। গল্পের পরিণতিতে রাজ অন্তরের যে নিগূঢ় বার্তাটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছল তা' যেন সমগ্র রচনাটিকে গল্পের যাদুস্পর্শে অনবদ্য ও সজীব করে' তুলেছে।

প্রথম চিঠি, নামের খেলা, রথযাত্রা, নতুন পুতুল ইত্যাদি রচনাগুলির মধ্যেও ছোটগল্পের আমেজ মিশে আছে। এদের মধ্যে আবার কতকগুলি রচনা বর্ণনার পারিপাট্যে এবং ঘটনার সন্নিবেশে প্রায় ছোটগল্পের সীমা অতিক্রম করে' গল্পের সার্থক রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। লিপিকার রচনাগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তা'ই সত্যই বলেছেন: "এইগুলি নতুন রীতিতে লেখা গল্পের রেখাচিত্র; মনের ভাবনার নিরাভরণ আল্পনা যেন!" 'নামের খেলা' এই সংক্ষিপ্ত রচনাটিকে আমরা ছোটগল্প ছাড়া অন্য কিছু বলে কল্পনাই করতে পারি নে। 'প্রথম চিঠি'র মধ্যে নব প্রণয়ের আবেগ চিত্র গরিমায় দুর্লভ সুন্দর। সিদ্ধি, রথযাত্রা, পাট ইত্যাদি রচনাগুলিতে কাব্যিক মনোহারিত্ব অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের পলায়নপর মুহূর্তগুলি নিবিড় কলগুঞ্জনে অনবদ্য-সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। তা'ই লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে কবি যে গল্প বলতে চেয়েছেন তা' অনস্বীকার্য।

॥ *তিন* ॥

হাল্‌কা চাল ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে সুকর্ষিত গদ্যরীতির পরিবেশনে যে ভাব ব্যক্ত করা যায় তা'ই নিবন্ধ সাহিত্য। এ জাতীয় রচনার রস মননপ্রধান। কাব্যবিলাসীর কল্পনা-সমৃদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে' লেখকের মন এখানে বিশেষ রূপে সংঘর্ষ-সচেতন হ'য়ে ওঠে। তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে কোন একটি বিশেষ তথ্যের অথবা ভাবের মূল ব্যক্ত করাই এ সব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই অনিবার্য কারণে এ সব রচনার মধ্যে লেখকের মন তথ্য অথবা বস্তুনিষ্ঠায় অভিসারী হয়। বলা বাহুল্য লিপিকার রচনাগুলি যদিও কাব্যধর্মী, যদিও প্রত্যেকটি রচনার মধ্য হ'তে কল্পনা-দ্যুতি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে তথাপি কতকগুলি রচনার মধ্যে নিবন্ধ সাহিত্যের গুণ বর্তমান। প্রাণমন, কর্তার ভূত, আগমনী ইত্যাদি রচনাগুলি এই জাতীয়। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলির মধ্যে নিবন্ধ সাহিত্যের আমেজ থাকলেও এরা খাঁটি নিবন্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। 'মেঘদূত' নিয়ে কবি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'ও 'মেঘদূত'-এর কলকণ্ঠ শুনতে পাই কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত এবং লিপিকার মেঘদূত এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে দুরতিক্রমী ব্যবধান রচিত হয়েছে। কবিতার সুরে উভয় প্রবন্ধের সুর বাঁধা—কিন্তু তবুও প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত একটি মননিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ করুণসুন্দর প্রবন্ধ। কবি পরমাশ্চর্য কল্পনা-বিহারে যে তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন তা' আমাদের চিত্তকে রসপূর করে' তোলে। কল্পনার কাব্যিক ঐশ্বর্য থাকলেও এ প্রবন্ধের বক্তব্য-তথ্য একেবারে কাব্যের রহস্যময়ী নায়িকা হয়ে ওঠে নি। আপন স্বরূপে দেদীপ্যমান। কিন্তু লিপিকার 'মেঘদূতের' মধ্যে তথ্যের স্পর্শ আছে তবে নিবিড়তা নেই। প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত-এ প্রকাশ মহিমায় যে ভাব জমাট বেঁধে উঠেছে 'লিপিকার' 'মেঘদূত'-এ সেই ভাবের

স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও কাব্যের দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে তা' ফেনিল হ'য়ে উঠেছে। তথ্যের জমাটত্ব কল্পনার বেগবান স্রোতে ভেসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। বিরহের অবসানের জন্যে কবির প্রার্থনা এই : "সেই আকাশ-পৃথিবীর বিরহমন্ত্র-গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা' অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হ'য়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির "পরে তুলে দিক দূর-বনান্তের রংটির মতো তা'র নীলাঞ্চল। তা'র কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হ'য়ে উঠুক।"

এই কাব্যিক প্রকাশভংগীতে তথ্য খণ্ড খণ্ড হ'য়ে আপন গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্যকে হারিয়েছে। নিবন্ধ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ যে বস্তুনিষ্ঠা তা' লিপিকার রচনায় বিরল। কিন্তু খাঁটি নিবন্ধ না থাকলেও কয়েকটি রচনা যে 'প্রায় নিবন্ধ' হ'য়ে উঠেছে, নিবন্ধ সাহিত্যের অনেকগুলি গুণ যে সে-সব রচনার মধ্যে বর্তমান তা' কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় 'গল্প' রচনাটি লিপিকার নিবন্ধ মূলক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

## ॥ চার ॥

লিপিকা গদ্যেয় লেখা। পরিবেশনও গদ্য গ্রন্থের মত। তাই লিপিকার রচনাকে গদ্য-কাব্য বলতে প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের মন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। অতি সহজেই মনের গহন হ'তে একটি 'না' উৎসারিত হ'য়ে পথরোধ করে' দাঁড়ায়। কিন্তু এই 'না'-র পিছনে আবাল্য-অর্জিত একটি সংস্কার আছে মাত্র—কোন বিচার নেই। প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করে' লিপিকার সাথে আত্মিক যোগ সংস্থাপনের পর বিচারের কষ্টিপাথরে ফেলে যদি রচনাগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি তা হ'লে এই গ্রন্থের বহু রচনাকে গদ্য-কাব্য বলতে আমাদের মন সহজেই স্বীকৃতি দান করবে। বাস্তবিক লিপিকা

গ্রন্থের পেলব মসৃণ বেলাভূমির উপর দিয়ে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত গদ্যকাব্যের একটি অখণ্ড ধারা আপন আবেগে প্রবাহিত হয়েছে। তা'র গতি অপ্রতিহত, মধুরনাদী এবং বেগবান। সে গতির কুলকুল-ধ্বনির সাথে কাব্য-লক্ষ্মী যেন সকলের অলক্ষ্যে নৃত্যচপল ভংগীতে আপন পায়ের নূপুর বাজিয়ে চলেছে। তাই লিপিকা পাঠকালে আমাদের নিখিল মনপ্রাণ কবিতার অমৃত রসে সিক্ত হ'য়ে ওঠে। কবিতার মাদক রসের আস্বাদনে আমাদের কাব্য পাঠের নেশা দুর্বার হ'য়ে ওঠে। 'মেঘদূতে'র সর্বশেষ অংশে কবি লিখছেন: "যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থরথর করছে, যখন বাদল হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তা'র অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধেভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথ রাত্রে।" কিংবা: "সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে' চলে যাক।" এ অংশকে কবিতা বলতে অস্বীকার করবে কে? গদ্য কবিতার রহস্যলোকে প্রবেশ করে' কী অপূর্ব শ্রী-লাবণ্য ধারণ করেছে!

লিপিকার লেখাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় লিখেছেন—"গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করে-ছিলুম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে, সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরাজীরই মত বাংলায় গদ্য কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি—লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে গদ্যের মত খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তা'র কারণ।"

গদ্যকাব্যের সুস্পষ্ট রেখাঙ্কন যে রচনাগুলির মধ্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে তা'দের মধ্যে পায়ে চলা পথ, মেঘলা দিন, বাঁশি, সন্ধ্যা ও

প্রভাত, প্রশ্ন, একটি চাউনি, প্রথম শোক, একটি দিন ইত্যাদি প্রধান। এই সব রচনাগুলির মধ্যে এক একটি ক্ষণ-অনুভূতি, এক একটি আবেগ-বিহ্বল অনুপল, এক একটি পলায়নপর মুহূর্ত কি অপরূপ ভাবেই না বিধৃত হয়েছে। এই স্বপ্ন-মন্থর অনুভূতিকে নিয়ে কবি কল্পনার কোরক দিয়ে এক দোসরহীন অনন্যসুন্দর মালা গেঁথে তুলেছেন। গদ্য এবং কবিতার রৌদ্র-ছায়ালোকে রচনাগুলি কী অপূর্ব সৌকুমার্য ও সম্ভ্রমমণ্ডিত হয়েছে! 'পায়ে চলা পথ'-এ কবি লিখেছেন: "ওগো পায়ে চলা পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা সে সব গেল কোথায়। বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।"

অন্তরের ধ্যান-কল্পনার, বাসনা-কামনার কী অপূর্ব ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশ! এখানে তার্কিক মনের সমুদয় তর্ক, সমুদয় হিসাবনিকাশ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এ গদ্যকে আমরা কবিতা না বলে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য এবং কবিতার মধ্যে কোনদিন একটি দুরতিক্রমী ব্যবধান রচনা করেন নি, উভয়ের মধ্যে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধকে মানেন নি। গদ্যকে কবিতার রহস্যালোকে এবং কবিতাকে কাহিনীর বাস্তব আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সকল ব্যবধান, সকল সংকোচকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র একাংশে কবি বলেছেন: "এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হ'লো। অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা।

এখানে গদ্য কাব্যের রহস্যঘেরা সরোবরের নীল জলের বুকে ফুটে ওঠা পদ্ম-কোরক। এখানে কবিতার সুকোমল বুকে গদ্যের হয়েছে লাবণ্যবিধুর ভীরু-নম্র পদসঞ্চার।

লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে গদ্য কাব্যের এই অপূর্ব ঝংকার শোনা যায়। অনেকগুলি রচনা কল্পনার মোহজালে রোমাঞ্চ-রঙীন হ'য়ে উঠেছে। বর্ণালীর সুশোভন সঙ্গতিতে প্রতি চরণ বর্ণ গরিমায় দুষ্প্রাপ্যমনোহর। তা'ই লিপিকার কতকগুলি রচনাকে গদ্য-কাব্য বলতে আমাদের কোনই বাধা নেই।

॥ *পাঁচ* ॥

লিপিকার অনেকগুলি রচনার মধ্যে রূপকথার আমেজ আছে—কিন্তু রচনাগুলি ঠিক রূপকথার অনুসারী হ'য়ে কল্পলোকে উধাও হ'য়ে যায় নি। বাস্তব মৃত্তিকায় শিকড় গেড়ে তা'রা 'বাস্তবানুগ-রূপকথায়' পরিণত হয়েছে। 'সুয়োরাণীর সাধ' গল্পটির নামের মধ্যে রূপকথার একটি নিগূঢ় যোগ আছে—অন্ততঃ এই নামটি শুনলেই আমাদের মানসলোকে রূপকথার অন্তহীন জগতের বর্ণ-সমুজ্জ্বল কতকগুলি ছবি হঠাৎ ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু লিপিকায় কবি সুয়োরাণীর সাথে কেবল মাত্র নামের স্পর্শ ছাড়া কোথাও রূপকথার এতটুকু সংযোগ রাখেন নি। এই নামের আড়ালে উদ্ঘাটন করেছেন চিরন্তন সত্যের এক অপূর্ব রূপ। 'পরীর পরিচয়' গল্পটিও এই পর্যায়ের। এই গল্পে পরী আছে এবং রাজপুত্রও আছে, ঝরনারও অভাব নেই—মোটকথা একটি রূপকথায় যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয় তা'দের কোনটিরও অভাব নেই তথাপি গল্পটি রূপকথা নয়। গল্পটিতে স্থান পেয়েছে আবেগ ব্যাকুল অশান্ত মানব-মনের এক চূড়ান্ত পরিণতি। এমনি আরো কতকগুলি রচনার মধ্যে আমরা 'রূপকথা'র ছায়াপাত দেখি—কিন্তু সেগুলি একটিও সঠিক রূপকথার পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

লিপিকায় আর এক শ্রেণীর রচনা স্থান পেয়েছে—যেগুলি রূপকধর্মী। এ পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো ঘোড়া, তোতা-কাহিনী, প্রাণমন, আগমনী, পায়ে চলা পথ, সতের বছর

ইত্যাদি। এ সব প্রত্যেক রচনাতেই কবি রূপকের অন্তরালে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোন কোন রচনায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তত্ত্ব কথা, কোন কোন রচনায় বা প্রকাশ পেয়েছে শাশ্বত সত্যের অনবদ্য রূপ। 'পায়ে চলা পথ' আমাদের পার্থিব জীবনের রূপক, 'তোতা কাহিনী' ইংরাজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তীব্র কশাঘাত। এমনি প্রত্যেকটি রূপক রচনার মধ্যে কবি রূপকের অন্তরালে কোন কোন নিগূঢ় বিষয়ের অবতারণা করেছেন। রূপক রচনা হিসেবে লিপিকার অনেকগুলি রচনা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু কী ছোটগল্প, কী নিবন্ধ সাহিত্য, কী গদ্য কাব্য, কী রূপক রচনা—সবার অন্তরালে কবিমানসের একটি বিশেষ প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। সকল প্রকার রচনার মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে কবিমানসের রূপের ব্যাকুলতা। প্রত্যেকটি রচনা রূপদক্ষ রবীন্দ্র-মানসের রূপ স্পর্শে হ'য়ে উঠেছে তুলনা বিরল অনন্যসুন্দর। এ রূপ কোন মানদণ্ড দিয়ে মাপা যায় না,—এ রূপ একান্তভাবে অনুভবের জিনিস, একান্তভাবে হৃদয়ের সামগ্রী। এ রূপ হৃদয়াবেগে রোমাঞ্চ-রঙীন, সায়াহ্ন-কোমলতায় মলিন-সুন্দর। রূপের এই অপূর্ব প্রবর্তনা আছে বলেই লিপিকার রচনাগুলি পাঠক মনকে এমন ভাবে ভাবোদ্বেল করে' তোলে। ছোটগল্প হিসাবে আমরা মাত্র কয়েকটি রচনাকে স্থান দিতে পারি, নিবন্ধ সাহিত্য হিসেবেও মাত্র কয়েকটি রচনার উল্লেখ আমাদের পক্ষে সম্ভব, গদ্য কাব্য রচনার পর্যায়েও আমরা লিপিকার সকল রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নে—কিন্তু রূপের প্রকাশ হিসেবে প্রত্যেকটি রচনা রূপের চরণে নতশির হয়েছে। সবার মর্মমূল হ'তে রূপ তা'র আপন আভায় প্রকাশমান। রূপ-প্রকাশ হিসেবে লিপিকার প্রত্যেকটি রচনা সার্থক। তাই মনে হয় লিপিকা রূপেরই দোসর—তা'র সমগ্র অন্তর ব্যাপী ধ্বনিত হয়েছে রূপ-ব্যাকুলতার ভাব-কোমল ছন্দিত আন্দোলন।

# ॥ প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

## ॥ এক ॥

বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ একজন নির্জন প্রান্তের নির্বাক অধিবাসী। তাঁ'র রচনাবলী সরব কণ্ঠের দীপ্ত ঘোষণায় বাঙ্ময় নয়—রূপমুগ্ধ শিল্পী মনের লাবণ্য-বিন্যাসে নম্র-মনোহর, প্রতিটি প্রবন্ধের অন্তরাল হ'তে রূপ-তন্ময় লিরিকের সুকোমল সুর আপন আভায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মৌলিক, সৃষ্টিধর্মী। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে প্রতিটি প্রবন্ধ হীরকোজ্জ্বল। কথার পর কথা সাজিয়ে শব্দের পিঠে শব্দ যোজনা করে' অবিরাম ক্লান্তিকর প্রচেষ্টায় তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি—সৃষ্টির আবেগে জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত তাঁ'র প্রবন্ধ আপনি উৎসারিত। সৃষ্টির যে লীলাপ্রবাহ তিনি আপন প্রাণমূলে অনুভব করেছেন তা'ই তাঁ'র প্রবন্ধের মূলীভূত শক্তি। সমকালীন প্রবন্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরীর রচনায় একটি ক্লান্তিকর প্রচেষ্টার পরিচয় জড়িয়ে আছে। তাঁ'র প্রবন্ধাবলীতে বক্তব্য অপেক্ষা বলার রীতিই উচ্চশির হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র সকল প্রচেষ্টা যেন প্রকাশভংগীর চাকচিক্য গঠনের মধ্যে সীমিত। প্রাণ নয় ভংগী, বক্তব্য নয় বলাই প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁ'র অধিকাংশ রচনা বহিরাবরণের চাকচিক্যে নয়ন ধাঁধায়—গহন মনে দোল জাগাতে পারে না। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনা মর্মস্পর্শী। বক্তব্য এবং বলা দুই-ই তাঁ'র রচনায় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত। প্রাণ এবং ভংগী দুই-ই উচ্চ শির। বিষয় এবং রীতি গভীর আলিঙ্গনে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। বলেন্দ্রনাথের রচনায় রূপদ্রষ্টা এবং রূপশিল্পী এক হ'য়ে মিশেছে।

Style is the man বলে ইংরাজীতে যে বহু খ্যাত উক্তিটি প্রচলিত —বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তা' সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বিষয় এবং ভংগীর রাসায়নিক সংমিশ্রণে যে দুর্লভ রীতি গড়ে উঠেছে তা' বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মাত্র উনত্রিশ বছরের ( জন্ম ৬ই নভেম্বর, ১৮৭০ এবং মৃত্যু ২০শে আগস্ট, ১৮৯৯ ) জীবনে স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট স্টাইলের অধিকারী হয়েছিলেন তা' বিস্ময়কর। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "গ্রন্থাবলী"র ভূমিকায় তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন "বয়সের বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ত্বের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষের দিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।" বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথ একজন 'আজন্ম রচনারসিক ( Stylist )'।

চিন্তায়, ভাবনায় এবং প্রকাশের অভিনবত্বে বলেন্দ্রনাথের রচনা প্রায় কবিতার প্রান্তস্পর্শী। এখানেও বলেন্দ্রনাথের রীতি বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। তিনি ভাবের আবেগে কোথাও ভেসে যান নি। আপনার ওপর তাঁ'র কর্তৃত্ব ছিল। তাই কূলপ্লাবী ভাব-বন্যাকে তিনি সুকঠিন তটে আবদ্ধ করে' দূর মোহনার পথে সঞ্চারমান করে' দিয়েছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিন্যাসভংগীর সাথে বলেন্দ্রনাথের রচনা-রীতির একটি স্পষ্ট ভেদ রেখা গড়ে উঠেছে। ভাবের উদ্দাম প্রবাহে এবং কল্পনার দিগন্তহীন বিপুলতায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-বিষয় অনেক স্থলে ফেনিল এবং এলায়িত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা এই অতিব্যাপ্তি দোষ হ'তে মুক্ত। তাঁ'র রচনায় কল্পনা আছে, বেগ আছে কিন্তু সে কল্পনাবেগ কোন ক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তট অতিক্রম করে নি। প্রয়োজনীয় দিগন্তের ঝিলিমিলিতে আবদ্ধ হ'য়ে তা' অপূর্ব রূপলাবণ্যে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বলেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পী কিংবা বিশ্বকবির রচনা-রীতির কোন প্রভাব বলেন্দ্রনাথের ওপর পড়ে নি সে কথা আমরা বলছি না—বরং প্রথম বয়সের রচনা রবি-রাহুগ্রস্ত—তথাপি বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পিতৃব্য অপেক্ষা অধিকতর সংযত-বাক্

শিল্পী। সামঞ্জস্যবোধ এবং সংযম-চিত্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁ'কে দুর্লভ উচ্চাসন দান করেছে।

॥ দুই ॥

বলেন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্য সৃষ্টিকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ক॥ প্রাচীন শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা খ॥ প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা গ॥ প্রাচীন ভাস্কর্য আলোচনা বা ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ ঘ॥ সামাজিক প্রবন্ধ ঙ॥ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ চ॥ আচার আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত আলোচনা হ'তে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মনোভংগীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক॥ প্রাচীন শিল্পালোচনা:

প্রথমেই প্রাচীন শিল্প এবং সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধরাজীর আলোচনা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন "শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনাগুলিই তাঁ'র শ্রেষ্ঠ রচনা।" কিন্তু আমাদের মনে হয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিই প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের শক্তি-সামর্থের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছে। "রস রেখার বর্ণাঢ্যতা, সুচিক্কণ কাব্যধর্মী বাণী-বিন্যাস ও সৌন্দর্য-চেতনা" যেগুলি প্রাবন্ধিক বলেন্দ্র-নাথের মূল বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সেগুলির বন্ধনহীন আনন্দদীপ্ত প্রকাশ। প্রাচীন শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলি যে জন্যে ভাল লাগে তা' হ'লো তাদের অনন্য চিত্র-সম্পদ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে লেখক যেখানেই চিত্ররচনায় মনোনিবেশ করেছেন সেখানেই তাঁ'র লেখা হ'য়ে উঠেছে লিরিক-ধর্মী—সমালোচনা নয়, নতুন সৃষ্টির কাজেই তিনি মেতে উঠেছেন সেখানে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে—যদিও প্রাচীন সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলির রূপ-সৌন্দর্য কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। প্রাচীন চিত্র-শিল্পের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আমরা

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। বিদগ্ধজন বিতর্কের অবকাশ না রেখেই স্বীকার করেছেন যে ইতিপূর্বে এই ধরনের চিত্রালোচনা বাংলা সাহিত্যে হয় নি। রূপমুগ্ধ শিল্পী বলেন্দ্রনাথের হাতেই চিত্র-শিল্পের সর্বপ্রথম সার্থক সমালোচনা। ললিতকলা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ সমালোচনামূলক প্রবন্ধরাজীর মধ্যে কয়েকটি হ'লো হিন্দু দেবদেবীর চিত্র, দিল্লীর চিত্রশালিকা, রং ও ভাব এবং রবিবর্মা। আমাদের দেশে কলাবিদ্যার যে বিশেষ প্রচার, প্রসার এবং সমালোচনা হয় নি সে সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। 'রবিবর্মা'র প্রারম্ভেই তিনি ঘোষণা করেছেন "ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছে, কলাবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের তাহার শতাংশের একাংশও আদর হয় নাই। বিশেষতঃ চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙ্‌লেপা বর্বর অবস্থা হইতে অল্প অগ্রসর হইয়াছে।" "হিন্দু দেবদেবীর চিত্র" প্রবন্ধটি অধিকতর তথ্যবাহী এবং মৌলিক চিন্তার আল্পনায় সমৃদ্ধ। বর্তমানে দেবদেবীর চরিত্রগুলি এমনভাবে অঙ্কিত করা হয় যে তা'তে সৌন্দর্য-সম্ভ্রমবোধ ও পবিত্রতার স্থলে কুৎসিত ও কদর্যতাই বেড়ে চলেছে। তা'ই বলেন্দ্রনাথ বেদনা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন "দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্মচিত্রাবলী এ পর্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্যটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।" বিভিন্ন দেবী মাতৃগণের মূর্তি এমনভাবে অঙ্কিত করা হয় যে বাস্তবের নগ্ন নারীমূর্তিও তাতে লজ্জাবোধ করে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর অঙ্গে যে কয়েকটি বিশেষ রং লেপন করা হয় সে সম্পর্কে লেখকের বিশেষ আপত্তি আছে। তা'র নিজের ভাষাতেই বলি "রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন। এবং সেই বহু পেন্সিল ঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়ে নহে, কিন্তু বাংলার রাধিকাগঞ্জন ধর্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার

করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা অঙ্গারধূমোদগারী কলিযুগে মূর্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও মানব শরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্তি করিতে অক্ষম।" চিত্রের সৌন্দর্য রং-এ নয়—উদার পরিকল্পনায়। তা'ই "যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।" দেবদেবীর চিত্রাঙ্কনের পটভূমিতে যদি কোন উদার পরিকল্পনা না থাকে, সৌন্দর্যের অমরাবতীতে অবগাহন করে' যদি সেগুলি বিকশিত হ'য়ে না ওঠে তা'হলে চিত্র হিসাবে সেগুলি ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্যই চিত্রাবলীর রূপ-লাবণ্যের সূতিকাগার। সুতরাং শিল্পীকে সর্বপ্রথম আপন মনের গহনাগারে সৌন্দর্য-লাবণ্যের মানসী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—লাবণ্যের রূপকাঠিতে যখন অন্তর বিকশিত হ'য়ে উঠবে তখন চিত্রেও সে রূপের প্রতিফলন অনিবার্য। নইলে "মদন ভস্মের চিত্রে মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা"-ই বার হ'বে—আদর্শ চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়। "দিল্লীর চিত্রশালিকা" এই জাতীয় রচনার মধ্যমণি। এই প্রবন্ধটির মধ্যে বলেন্দ্রিয় গদ্যরীতির সকল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্তমান। কারুখচিত শিল্পসুষম রাজকীয় গদ্যরীতি, অতীতাশ্রয়ী রোমান্স-রঙীন চিত্রশিল্প এবং সংগীতমুখর শব্দ যোজনা প্রভৃতির মণিকাঞ্চনযোগে প্রবন্ধটি বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় "দিল্লীর চিত্রশালিকা একটি মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছবিগুলিকে অবলম্বন করে' রোম্যান্টিক বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সৌধে মানসিক অভিসার। বহুকাল পূর্বের লুপ্ত জীবনচর্যার যে কয়েকটি স্থিরচিত্র চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তা'কেই বলেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তাপে বিগলিত করে' জীবন-রস সমৃদ্ধ করেছেন—তরুণ সৌন্দর্য-সাধকের অন্তর্জীবনের লঘুস্পর্শ বর্ণমায়ায় তাই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে।"

খ॥ প্রাচীন সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা :

এর পর সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা—প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের বিশেষ সৃষ্টি। সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে' নিতে পারি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক, বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত এবং বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বৈষ্ণব সাহিত্যের সবিশেষ আলোচনা। এই তিন শ্রেণীর আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের যে পরিমাণ সূক্ষ্ম রসবোধ, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কবিত্ব-পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে—অন্য শ্রেণীদ্বয়ে তা' অনুপস্থিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে বলেন্দ্রনাথের আলোচনাগুলি অনুরাগ-রঞ্জিত এবং আবেগ-দীপ্ত হ'য়ে ওঠার জন্যে দায়ী তাঁ'র মানস-প্রকৃতি। কেবল সাহিত্য নিয়ে নয় প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য, স্মৃতিচিহ্ন, ভাস্কর্যচিত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তিনি যখনই আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন তখন অতীতমুখী এক সুবিপুল রোম্যান্টিক কল্পনার সুখস্পর্শী আনন্দ-বন্যা তাঁ'র সমগ্র চিত্তকে বিধৌত করে' দিয়েছে। তিনি আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে সেই অতীত বিলুপ্ত মরীচিকাময়ী মায়ামৃগীর অনুসরণ করেছেন। নিষ্ঠুর বর্তমানের বুকে বসে অতীতের সেই রূপ-সৌন্দর্যের সেই লীলানিকেতনের দিকে বার বার কল্পমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। যেখানে তাঁ'র কল্পনা স্বর্ণ-মৃগীর অনুসারী সেখানে তাঁ'র রচনা বাদশাহী-বিলাসে উন্মত্ত, চিত্রধর্মিতা এবং সুচিক্কণ চারুকরণে তা' অনন্যসুন্দর আর যেখানে তাঁ'র অতীতাশ্রয়ী মন অপরিতৃপ্তির বেদনায় বিধুর সেখানে তাঁ'র রচনা যেন বিরহী যক্ষের অশ্রুসজল ইতিহাস।

সংস্কৃত সাহিত্য এবং কবি সম্পর্কিত আলোচনাগুলির মধ্যে উত্তর-চরিত, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, কাব্যে প্রকৃতি, মৃচ্ছকটিক, মেঘদূত ইত্যাদি প্রধান। বলেন্দ্রনাথের পূর্বেও সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ও কাব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনাকারীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত আলোচনাগুলিকে দু' শ্রেণীতে গণ্ডিবদ্ধ করা যেতে পারে—এক শ্রেণীর আলোচনা বিচার বিশ্লেষণ এবং বস্তুনিষ্ঠ আশ্রয়ী অন্যশ্রেণীর আলোচনায় প্রধান হ'য়ে উঠেছে লেখকের আত্মনিষ্ঠ ধ্যান ধারণার রূপায়না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রধানতঃ মননশীলতার এলাকাভুক্ত। কাব্যের বিষয় এবং ভংগীর চুলচেরা হিসাবনিকাশ সেখানে বর্তমান, ফলে এঁদের সমালোচিত প্রবন্ধ আবেগ বিরল এবং তথ্যদর্শী। আর রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অন্য জাতের, এ সকল প্রবন্ধ সমালোচনা নয়—নতুন সৃষ্টি, বিচার বিশ্লেষণ নয়—কবিমানসের নিকুঞ্জাভিসার, ফলে এ সকল রচনা আবেগ বিরল না হ'য়ে কল্পনা-সমৃদ্ধ লিরিকের দোসর হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত (প্রাচীন সাহিত্য) এবং বলেন্দ্রনাথের কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা এবং কাব্যে প্রকৃতি তা'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘদূত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের আলোচনাকে অতিক্রম করে' নতুন সৃষ্টির প্রবাহে গতিশীল, নতুন সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি এ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় কালিদাস অবলম্বন মাত্র—এ প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ তাঁ'র নিজস্ব চারণভূমির দূর্বা-কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়েছেন ফলে তাঁ'র কল্পনায় লেগেছে উর্মি-দোল। কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যকে অবলম্বন করে' তিনি ছবির পর ছবি এঁকেছেন—নিজস্ব মানস প্রকৃতি এবং চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে সে ছবিগুলি ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি বিচার বিশ্লেষণ এবং বিতর্কের পটভূমিতে এ সকল রচনার বিশেষ কোন মূল্য নেই—এদের মূল্য রসসৃষ্টির মৌলিকতায়, নিভৃত মনের কবি-সত্তার স্পন্দন-জাগরণে এবং প্রকাশ-ভংগীর আবেগ-গভীর চিত্রধর্মিতায়। রসসৃষ্টির সাথে বলেন্দ্রনাথ মেঘদূত, উত্তরচরিত সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করেছেন অনেক

ক্ষেত্রে তা' নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক তথাপি রাজকীয় গদ্যের অপূর্ব প্রবর্তনায়, স্বপ্নমুগ্ধ রোম্যান্টিক স্মৃতিচারণায় এ সকল প্রবন্ধের একটি বিশেষ মূল্য সর্বজন-স্বীকৃত। "উত্তরচরিত" প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রথীনবাবু মন্তব্য করেছেন "উত্তর-চরিতের ভাষা ও শব্দ-বিন্যাস নিয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি নতুন রসলোক সৃষ্টি করেছেন—প্রবহমান শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে সমালোচক তাঁ'র আবেগ-স্পন্দিত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিতের আলোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক ও বিতর্কমূলক, মাঝে মাঝে অবশ্য রসসৃষ্টির প্রয়াসও আছে—বলেন্দ্রনাথ এখানে জাগ্রত-বুদ্ধি বিশ্লেষণ-নির্ভর সমালোচক নন,—তিনি যেন স্বপ্ন-তন্ময়, আবিষ্টচিত্ত কবি।" এই কবিত্বের প্রকাশেই বলেন্দ্রনাথের এ সকল প্রবন্ধ আবেগস্পন্দিত, কীর্তি-সমুজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি এবং কবিদের নিয়ে অনেকগুলি আলোচনা আমরা প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের নিকট হতে পেয়েছি কিন্তু এই আলোচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য এবং কবিদের আলোচনার মত উন্নত-শিখর নয়—শিখরের তলভূমি বন্ধুর সানুদেশের মত। এই শ্রেণীর অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেযোগ্য রচনা এই : কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, কৃত্তিবাস ও কালিদাস, কেতকী-ক্ষেমানন্দ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য : রামপ্রসাদের গান, বাংলা সাহিত্যের দেবতা, ভারতচন্দ্র রায়, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর। এ সকল রচনা গতানুগতিক— কাব্যের আলোচনায় তিনি কাব্যে বর্ণিত সরস কাহিনীর অনুলিখন করেছেন মাত্র। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিচার বিশ্লেষণের সাথে যে কূলপ্লাবী স্বপ্নাবেগ উৎসারিত হয়েছে তা' ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধের বুকে কোহিনূরের দীপ্তি দান করেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিচার বিশ্লেষণ তো নেই-ই উপরন্তু বলেন্দ্রিয় গদ্যরীতির প্রকাশভংগী, স্বপ্ন-তন্ময়তা এবং ঐশ্বর্যদীপ্ত চিত্রাঙ্কনও অনুপস্থিত। সুতরাং এই শ্রেণীর

প্রবন্ধের সংযোজনায় গ্রন্থের আয়তনই বেড়েছে—রূপ-সৌন্দর্য ম্লান।

এর পর বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা। এই শ্রেণীর আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের মৌলিক গবেষণাধর্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যশোদা, রাধা ইত্যাদি প্রবন্ধের সুর-ঝংকার এবং মন্তব্যগুলি অভিনব—বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের প্রবন্ধ ইতিপূর্বে রচিত হয় নি। যশোদা প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণ-জননী যশোদা সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তা' বাঙালী পাঠকের অজানা। যশোদা এবং উমার তুলনামূলক আলোচনায় বৈষ্ণব এবং শাক্তের মধ্যকার মূল পার্থক্য স্নিগ্ধকোমলতা এবং ভীষণ রূঢ়তার স্বরূপটি সুঅঙ্কিত। আদর্শ মাতা হিসেবে যশোদার কৃতিত্ব কতখানি তা'ও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অন্ধ ভক্তের মত যশোদাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মাতৃত্বের গৌরব দান করেন নি। মায়া-মমতার সাথে তাড়ন-ভর্ৎসনার সম্মিলনে শ্রেষ্ঠ মাতার রূপ বিকশিত কিন্তু যশোদা কৃষ্ণের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ বশঃত স্নেহান্ধ। এবং স্নেহান্ধ মাতা সন্তানের আদর্শ চরিত্র গঠনের অনুপযুক্তা। এইখানেই যশোদা আদর্শ মাতার দুর্লভ সম্মান হ'তে বঞ্চিতা। এর পর লেখক কল্পনায় যশোদার একটি রূপ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সে রূপ বর্ণনার মধ্যেও গবেষণাধর্মী ও স্নিগ্ধ পবিত্র মনের চিন্তাল্পনা বর্তমান। 'সখ্য' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চার প্রকার রসের সঙ্গে সখ্যের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য সুবর্ণিত। এ ছাড়াও সখ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের সমাজ-গঠন এবং মানস-প্রকৃতির বিরোধটুকু সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রবন্ধটি বৈষ্ণব সাহিত্যের দুই খ্যাতকীর্তি মহাজনের তুলনামূলক আলোচনা। আলোচনাটি সারগর্ভ নয়। জয়দেব প্রবন্ধটি এই শ্রেণীর প্রবন্ধা-বলীর মাঝে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। এখানে লেখক জয়দেবের ওপর বহুজন আরোপিত অশ্লীলতার অপবাদ খণ্ডন

করেছেন। তাঁ'র মতে জয়দেব-অঙ্কিত চিত্রগুলি নগ্ন হ'লেও স্বাভাবিক—অশ্লীলতার চূড়ান্ত নয়। জয়দেবের এই চিত্রগুলি সম্পর্কে একস্থানে তিনি বলেছেন "এই সহজ পরিতৃপ্ত সংকীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীর সম্বন্ধীয় উপমাসমৃদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।" বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রবন্ধটির ভাষা অভিনব এবং কাব্যধর্মী—বলেন্দ্রিয় গদ্যরীতির সার্থক পরিচয়বাহী।

গ ॥ ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ :

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র, কোনারক, খণ্ডগিরি, প্রাচীন উড়িষ্যা, বারাণসী ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধের মধ্যমণি। এই শ্রেণীর প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধি-সীমা প্রায় দিগন্ত-বলয় স্পর্শ করেছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বলেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি আবেগ-ব্যাকুল অতীতচারী রোম্যান্টিক কবি-মন ছিল—সে মন সৌন্দর্য-সন্ধানী, অতীতের মায়াভূমিতে তা'র অধিষ্ঠান। কর্কশ-নিষ্ঠুর ইতর বর্তমানের বুকে বসে বলেন্দ্রনাথ বার বার তাঁ'র দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে' দিয়েছেন দূর অতীতের মায়াঘেরা স্বপ্নলোকে। অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হ'য়ে যে সব ভাস্কর্যসৌধ এবং ধ্বংসমুখী মন্দির মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে সেগুলি রূপমুগ্ধ বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে বার বার অতীত সৌন্দর্য গর্বে আচ্ছন্ন করে' দিয়েছে। তাঁ'র সমগ্র মনপ্রাণ সেই অতীত সৌন্দর্য-সাগর-তটে জড়িয়ে অপূর্ব রোম্যান্টিক স্বপ্ন রচনা করেছে—সে স্বপ্ন কখনো আবেগদীপ্ত, কখনো বা বেদনাম্লান। বর্তমানের সাথে অতীতের সর্বদাই একটা দূরত্ব বিরাজমান—এই বিস্ময়মণ্ডিত দূরত্বই স্বপ্ন-রচনার সূতিকাগার। বলেন্দ্রনাথের চিত্ত এই দূরত্বের বর্তমান সীমারেখায় দাঁড়িয়ে অতীতমুখী রোম্যান্টিক স্বপ্নে বিভোর।

ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ রচনায় বলেন্দ্রনাথের আর একটি

বৈশিষ্ট্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করবো। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সাথে বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধের পার্থক্য আকাশপাতালের। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কতকগুলি গণিতিক অঙ্কপাতের মধ্য দিয়ে একটি নীরস ঘটনার বিবৃতি মাত্র—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নীরস ঘটনার অঙ্কপাত নয়—ঐতিহাসিক রোমান্স রসের সংমিশ্রণে লিরিকের প্রান্তসীমা-স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। এ সকল প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ একাধারে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক। ইতিহাস এবং সাহিত্য, ভাস্কর্য এবং ললিতকলা এখানে শ্রীক্ষেত্রের মহাসম্মিলনে মিলিত। প্রাচীন উড়িষ্যা এবং খণ্ডগিরি দু'টি প্রবন্ধেই 'ইতর' বর্তমানের সাথে রূপগর্ভ অতীতের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। প্রাচীন উড়িষ্যা প্রবন্ধে লেখক উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনযাত্রার একটি সৌন্দর্য-রঙীন ছবি কয়েকটি অপরূপ রেখাঙ্কনে চিত্রাপিত করেছেন। এ ছাড়াও প্রাচীন প্রসাধনকলা এবং ধর্মজীবনের একটি সারগর্ভ আলোচনা প্রবন্ধটিতে লাবণ্যশ্রী দান করেছে। অতীত উড়িষ্যার এই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সাথে বর্তমানের দীনহীন উড়িষ্যার আলোচনায় কবি-চিত্ত বেদনা-বিধুর—এবং এই মূক-বেদনা-ম্লান কণ্ঠের করুণ ধ্বনিতেই প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি। খণ্ডগিরিতে প্রধানতঃ স্থান পেয়েছে প্রাচীন উড়িষ্যার মনোরম ধর্মজীবনের অপরূপ রেখাচিত্র, বৌদ্ধ শ্রমনগণ কেমন করে' ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের চাপে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশছাড়া হ'তে বাধ্য হ'লো তা'রই এক মর্মস্পর্শী ইতিহাস। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র এবং বারাণসী মূলতঃ ধর্মালোচনা-সমৃদ্ধ—সকল প্রবন্ধের মত এই উভয় প্রবন্ধ-পৃষ্ঠাও অতীত সৌন্দর্য-বিরহী বলেন্দ্রনাথের সঘন দীর্ঘ-নিশ্বাসে মর্মরিত। কিন্তু কোনারক প্রবন্ধটি বুঝি বেদনার একটি হলুদ-রঙীন আল্পনা। সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে একটি বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠ করুণ লয়ে ইমন আলাপ করেছে। কোনারক সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্যই সর্বাপেক্ষা সার্থক এবং

অভ্রান্ত "বলেন্দ্রনাথের যে ক'টি রচনায় তাঁ'র সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও গদ্য-রীতি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে এই প্রবন্ধটি তা'র অন্যতম। একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় অবলম্বন করে' বলেন্দ্রনাথের মণিমাণিক্য-দীপ্ত ভাষা ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। কোনারকের পরিত্যক্ত পাষাণ-স্তূপে কোন এক বিলুপ্ত-কীর্তির মায়াজাল বিস্তৃত। লেখক সেই মায়াজালের মাঝখানে জড়িয়ে পড়েছেন—কোন এক পুরাতন নির্জন মহিমাতটে তাঁ'র তৃষাতুর দৃষ্টি মৌন ব্যথায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছে।" প্রবন্ধের প্রথম হ'তেই লেখকের কণ্ঠে এই বেদনা-বিহ্বলতা সকরুণ হ'য়ে উঠেছে "কোনারকে এখন কিছুই নাই, ধুধু প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত-জড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিত......। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূর দেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোনারক-মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত।" এখানে লেখক সত্যই যেন প্রাচীন উপকথার সুবিপুল তটভূমির মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং বর্ণদীপ্ত রাজকীয় গদ্যরীতির অপূর্ব প্রবর্তনায় এই মায়াজালের গ্রন্থি-বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠেছে। সত্যই বলেন্দ্রনাথের বাদশাহী গদ্যরীতি এখানে সর্বোচ্চ গ্রামস্পর্শী।

ঘ ॥ সামাজিক প্রবন্ধ :

বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলির বিশেষ রসমূল্য না থাকলেও

এ সকল প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি এবং প্রত্যয়নিষ্ঠ স্বাদেশিকতার অনুরাগ লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধরাজীর মধ্যে যে স্বদেশপ্রীতি বিরাট এবং বিপুল হর্ম্যতল হ'তে কবি আপন প্রাণমূলে অনুভব করেছেন তা' যে কোন কল্পনা-বিলাসী মানুষের খেয়ালখুশীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সামাজিক প্রবন্ধগুলি পড়লেই তা' অনুভব করা যায়। এই স্বদেশপ্রীতি কবির গভীরতম অন্তরপ্রদেশ হ'তে উৎসারিত। স্বদেশের সকল কিছুর প্রতিই বলেন্দ্রনাথের ছিল নিঃসীম নিষ্ঠা—এই নিষ্ঠার দিগন্ত-বলয় কেবল ভাস্কর্য-সুঠাম ভগ্নপ্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরলোকেই দিক হারায় নি—বাঙালীর গৃহাঙ্গন পর্যন্ত তা' বিস্তারিত। সামাজিক এবং সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিকতার মধ্যে বলেন্দ্রনাথ যে শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন সেই সুকোমল-সৌকুমার্য লেখককে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রলুব্ধ করেছে। বাঙালীর সামাজিক জীবনের গৃহে এবং বাহিরে সর্বত্রই একটি অদৃশ্য কল্যাণ হস্ত বিরাজিত—এ হস্ত কা'কেও বিমুখ করে না। শক্তি এবং সামর্থ্য যাই থাক—প্রেম, ভালবাসা, দয়া, মায়া, স্নেহ যেন এ হস্তের অঞ্জলি-সম্পদ, পরের জন্যে এ অঞ্জলি পূর্ণ, এ অঞ্জলি ভিখারীকে দান দেয় না—তা'কে সুনিবিড় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। তা'ই দেখা যায় পূজা-পার্বণে উৎসব-আনন্দে বাঙালীর গৃহে গৃহে প্রীতি-বিনিময়ের আনন্দ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, হৃদয়ের লেনদেনই সেখানে বড় কথা—পূজা-পার্বণ উপলক্ষ, যাগযজ্ঞের সকল বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তরাল হ'তে স্নেহপ্রীতির ফল্গুধারা প্রবহমান। বিভিন্ন সামাজিক এবং পারিবারিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ বার বার আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্পর্কে বলেছেন "বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালিতে, সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে

দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধের এটাই সারকথা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে শুভ উৎসব, নিমন্ত্রণসভা, শ্রীহস্ত, শিব-সুন্দর কল্যাণমূর্তি এবং নিমন্ত্রণসভা বিশেষ খ্যাত। স্বদেশপ্রীতির প্রগাঢ় পরিচয় ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের গুরুত্ব এবং মূল্য অপরিসীম।

৬॥ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ :

এই শ্রেণীর প্রবন্ধকে আমরা বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলেছি। তবে এখানকার বলেন্দ্রনাথ ঠিক প্রাবন্ধিক নন—কবি, সমালোচক নন—শিল্পী। কোন গ্রন্থের বিচার নয়, কোন কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় নয়, কোন ললিতকলার আলোচনা নয়, এমন কি কোন বাহ্য বিষয়ই এখানে স্থান পায় নি—কবির গোপন মনের ধ্যান-চিন্তা অক্ষরের আল্পনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। সকল চিন্তা-ভাবনার উপর বলেন্দ্রনাথের কল্পনা-বিলাসী মনের সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া পড়েছে। সামান্য বিষয় অবলম্বন করে' লেখক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার অলিম্পনে ঊর্ণমাভের মত স্বর্ণ-মসলিন বয়ন করেছেন। ফলে প্রবন্ধগুলি একান্ত ভাবেই ব্যক্তিমানসের রেখাচিত্র হ'য়ে উঠেছে।

বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির কোন কোনটিতে ছোটগল্পের আমেজ আছে আবার কোন কোনটি লিরিকধর্মী। লেখক শিহরণ স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সরল অনাড়ম্বর ভাষায় একেবারে আমাদের গহীন হৃদয় স্পর্শ করেছেন। এই সুখাবেশ-স্নিগ্ধ মৃদু-কম্পন জাগানোর মধ্যেই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সর্বোত্তম সার্থকতা। বলা বাহুল্য এই বিচারের মানদণ্ডে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অনন্যসাধারণ। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনাই যেন কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র।

প্রথমে এই জাতীয় প্রবন্ধের নামগুলি উল্লেখ করে আমরা সংক্ষিপ্ত

আলোচনায় যোগ দেব। বলেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন—তাঁ'র সমুদয় সৃষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই জাতীয় রচনায় সমৃদ্ধ। অশ্রুজল, আশা, উষা ও সন্ধ্যা, একরাত্রি, ক্ষণিক শূন্যতা, গান, গৃহকোণ, গোধূলি ও সন্ধ্যা, চন্দ্রপুরের হাট, জানালার ধারে, গুঞ্জনায়, নীরবে, পুরাতন চিঠি, শরৎ ও বসন্ত, শ্রাবণের বারিধারা, সন্ধ্যা, স্মৃতি ও কবিতা ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী এই জাতীয় অসংখ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি।

অশ্রুজল প্রবন্ধে লেখক যেন মানুষের গহন হৃদয়ের গোপনীয় ও অঘোষণীয় কথাটি ব্যক্ত করে' ফেলেছেন—কল্পনার উত্তাপে বিগলিত হ'য়ে সমগ্র প্রবন্ধটি স্ফটিক-স্বচ্ছ নিটোল মুক্তা হ'য়ে উঠেছে। অশ্রুজল এবং দীর্ঘনিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অশ্রুজলেরই প্রাধান্য দিয়েছেন—কেননা "অশ্রুজল ত আর কিছু নয়, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচজনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা ; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জন।...বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া"। দীর্ঘনিশ্বাস এবং অশ্রুজল সম্পর্কে এমন মন্তব্য ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিহৃদয়ের কথাটিই যেন এখানে অপরূপ ভংগীতে বাক্‌বন্ধ হয়েছে।

ক্ষণিক শূন্যতার মধ্যে কবির কল্পনা রূপের তাজমহল গড়েছে। জীবনের একটি স্তব্ধ মুহূর্ত ক্ষণিক শূন্যতাকে নিয়েও যে এমন মণিমাণিক্যখচিত কল্পনা-সৌধ গড়া যেতে পারে তা' ছিল আমাদের চিন্তারও বাইরে। প্রবন্ধের ক্রমাগ্রসরতার সাথে সাথে আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ নতুন মন্তব্য ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হ'য়ে বার

বার চমৎকৃত হ'য়ে ওঠে। চলার পথে আমরা মাঝে মাঝে এমন এক স্থানে এসে উপনীত হই যেখান হ'তে "পশ্চাৎ কেবল একটা দূর—অতিদূর মাত্র ; সম্মুখও তা'ই—ধুধু কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর।" এই উভয়বিধ দূরত্বের মাঝখানে কোন সমন্বয়-সেতু নেই—কেবল বিরাট এক অন্তহীন শূন্যতা—"সহস্র ঘটনার মিলন-বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া খানিকক্ষণ আমরা অকূল পাথারে ধ্রুবতারা-হীনের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখি"—ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় এই যে একটা উদ্‌ভ্রান্ত অনুভূতি এটাই শূন্যতা। জীবনের মাঝে এই শূন্যতা এসে সকল কিছুতে একটা সংযোগ-সেতু রচনা করে।

স্মৃতি ও কবিতা এই শ্রেণীর প্রবন্ধরাজীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের মূক চিন্তা-ভাবনাগুলি অক্ষরের আলোড়ন-স্পন্দনে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। স্মৃতি ও কবিতার মাঝে যে অদ্বৈত সম্বন্ধ বিরাজমান, সে সম্বন্ধ আমরা বার হ'তে অনুভব করতে পারি না। লেখক কল্পনার সাথে মল্লযুদ্ধ করে' সেই মণিমাণিক্য ছিনিয়ে এনে আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বাস্তব জিনিসকে অবলোকন করার সময় কবি রূপদ্রষ্টা, এই দর্শনে বিশ্ব-নিকেতনের সকল রূপবৈচিত্র্য ও ঘটনাজাল স্মৃতির রোমাঞ্চ-রঙীন খেলাঘরে জমা হয়—এই স্মৃতি-খেলাঘরের সম্পদই কবিতার প্রাণসম্পদ। স্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে লেখক যে মণিমাণিক্য তুলে আনেন কবিতার বুকে বুকে তা'ই ঝলকিত হ'য়ে ওঠে। তীব্র অনুভূতি এবং দৃঢ় সংযম আদর্শ কবিতার মূল্যবান সম্পদ। রূপদ্রষ্টা কবি বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ হ'তে যে অনুভূতি পান স্মৃতির বিরল নিস্তব্ধতায় তা'ই সংযত হয়। বাইরের দুর্নিবার আবেগ এবং কল্পনার ফেনিল অংশ স্মৃতিতে জমাট বেঁধে ওঠে। স্মৃতির খেলাঘর হ'তে এই জমাট ও সার অংশ নিয়েই রূপস্রষ্টা কবি কবিতার মায়াভূমি রচনায় মেতে ওঠেন। স্মৃতির সাথে কবিতার সম্বন্ধ তা'ই অদ্বৈত এবং অবিচ্ছেদ্য। 'চন্দ্রপুরের হাট' এবং 'বনপ্রান্ত' প্রবন্ধ দু'টি পল্লীজীবনের সমস্যাবিরল জীবন-

প্রবাহের রেখাচিত্র। পল্লীর সহজ-স্নিগ্ধ অনাবিল রূপসৌন্দর্য লেখক যেন কল্পনার স্বর্ণমসলিন দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছেন। 'জানালার ধারে' এবং 'পুরাতন চিঠি' রচনা দুটি বলেন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে উষা ও সন্ধ্যা রচনায় বলেন্দ্রনাথের ভাবুকতা এবং কল্পনা-শক্তি উন্নতির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। প্রবন্ধটি একটি নিখাদ মুক্তানিটোল কোহিনূর। এখানে লেখকের গহন মনের মূক চিন্তাগুলি মৃদু স্পন্দনের পাকে পাকে জড়িয়ে অনন্ত অসীমের অভিসারে যাত্রা করেছে।

এ প্রবন্ধে কল্পনার সাথে ভাষার সারল্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উষা ও সন্ধ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "উষা সন্ধ্যার ছোট বোন। সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখে, উষা খায়-দায়, হাসে খেলে। সন্ধ্যা ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটি স্নেহের চুমা খায়। প্রত্যহ উষা আসিবার সময় সন্ধ্যা তাহার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল দিয়া সাজাইয়া দেয়। সন্ধ্যা গোলাপ ফুল, উষা শিউলী ফুল।" এখানে কল্পনা-বিলাসী বলেন্দ্রনাথ রূপকথা মায়াডোরে জড়িয়ে পড়েছেন।

বিবিধ প্রকার রচনার মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক খাওয়া-দাওয়ার কথা আলোচনা করেছেন; আবার কয়েকটি প্রবন্ধ নিছক বর্ণনা-মূলক আবার কোনো কোনো রচনায় দেখি তিনি সাহিত্য স্বরূপের আলোচনায় মেতে উঠেছেন। কিন্তু এ সকল প্রবন্ধের মূল্য অতি নগণ্য। বিচার বিশ্লেষণে যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই তিনি ব্যর্থ। এর জন্য দায়ী তাঁ'র মানস-প্রকৃতি। তিনি সমালোচক নন—শিল্পী, বিচারক নন—কবি। রূপদ্রষ্টা এবং রূপশিল্পী এই দুই অদ্বৈত সত্তায় বলেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ। তাই তাঁ'র রচনায় বিচার বিশ্লেষণের নীরস যুক্তিজালের বুকে শিল্পী-মনের এক অপূর্ব ভাব-প্রবণতা স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে। এখানেই তাঁ'র প্রবন্ধ বিচার বিবেচনার গণ্ডি অতিক্রম করে' সাহিত্যের রসলোকে করেছে পদসঞ্চার।

# ॥ শিশু-সাহিত্য ও নজরুল ॥

## ॥ এক ॥

'সুবোধ ভাল ছেলে। সে যাহা পায় তাহা খায়। সে পিতামাতার কথা শোনে'—এই সেদিন পর্যন্ত এটাই ছিল বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের নমুনা। তথ্য ও তত্ত্বের ভারে শাসিত হ'য়ে এগুলি আর যাই হোক শিশু-সাহিত্যের স্বর্ণ-দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায়নি। প্রয়োজনের ইস্পাত-কঠিন বেড়ি পায়ে পরে এরা শিশুর কল্পনা-ফেনিল মনোরাজ্যে হেঁটে যাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের ছোট্ট সংস্করণ ভেবে বড়দের বই শিশুদের সুকোমল বাহুতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তা'ই দেখি বর্ণপরিচয় সমাপ্তির পরই তা'কে পড়তে হয়েছে—জাড্য, দার্ঢ্য, আঢ্য, কুজ্ঝটিকা। শিশুদের সরল অনাসক্ত জিহ্বাকে তুমড়ে ভেঙেচুরে নষ্ট করার এত বড় আয়োজন বোধ হয় আর কোথাও ছিল না।
কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়—পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও শিশুদের জন্য পৃথক্ আয়োজন-ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। শিশুদের কৌতূহলের উন্মেষ, কল্পনার প্রসারতা অথবা ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য না রেখে তা'দের তাড়াতাড়ি 'মানুষ' এবং 'জ্ঞানী' করার দিকে কর্তৃপক্ষের সর্বশক্তি নিয়োজিত হ'তো। বড়দের সাহিত্য শিশুদের জন্য অন্তঃসারশূন্য এবং কৃত্রিম—এই সহজ সত্যটি সেদিন পর্যন্ত কেউ উপলব্ধি করে নি। তা'ই চাবুকের আঘাতে আঘাতে নিতান্ত করুণভাবে সরলমতি শিশুদের 'জ্ঞানী' হবার মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হ'তো। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন রুশো (১৭১২-১৭৭৮)—মানবতা জাগরণের প্রথম অগ্রদূত। শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টি—Padio-centric attitude—বলতে যা' বোঝায় শিশু-বন্ধু রুশোর হাতেই তা'র প্রথম উন্মেষ। "রুশোর অপ্রতিহত বাঙ্ময়

কণ্ঠস্বর অমিত তেজে সমগ্র ইউরোপের মানুষের অধিকারের দাবি প্রচার করেছিল, কিন্তু তা'র চেয়েও তেজে প্রচার করেছিল শিশুর অধিকারের কথা। মানুষের আদিম পাপ ও মজ্জাগত দুষ্প্রবৃত্তি, মধ্যযুগীয় এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নির্মম শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটলো। পেস্তালৎসী (Pestalozzi)-র পূর্বে, ফ্রোএবেল্ (Froebel)-এর পূর্বে এমিলের লেখক এক নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং তিনি আধুনিক সভ্য জগৎকে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে অকারণ নিষ্ঠুরতা এবং তা'দের আনন্দ-কোলাহলকে স্তব্ধ করে' দেওয়ার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে শেখালেন। দীর্ঘ যুগ ধরে শিশুর জীবনের আনন্দময় প্রভাতকে এ প্রাচীন পদ্ধতি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে' রেখেছিল।"[১] এই দুর্ভেদ্য কৃত্রিম কারাপ্রাচীরকে ভেঙে তা'র ভিতর অনাবিল আলো-হাওয়া প্রবেশ করালেন রুশো। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তাঁ'র স্বভাবসুলভ তেজদীপ্ত গম্ভীর কণ্ঠ বাঙ্ময় হ'য়ে উঠল। তিনি ঘোষণা করলেন, শিশুর জন্যে চাই শিশু-সাহিত্য, শিশু পূর্ণবয়স্ক মানুষের ছোট্ট সংস্করণ নয়। তা'র আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, হৃদয় সব কিছুই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে পৃথক্, স্বতন্ত্র। এই চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই শিশু-সাহিত্য এবং বড়দের সাহিত্যের মাঝে আকাশপাতাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হবে শিশুদেরই কল্পনা এবং অনুভূতি, চিন্তা এবং চপলতা। শিশুদের হৃদয়াবেগ মন্থন করে' যে অমৃত পাওয়া যায় তা'ই হবে শিশু-মনের পুষ্টিকর পানীয়। আদর্শ শিশু-সাহিত্য হিসেবে রুশো বার বার ড্যানিয়েল ডেফোর "রবিনসন ক্রুশো" (Robinson Crusoe—প্রথম প্রকাশ ১৭১৯ খ্রী:)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমগ্র বিশ্বে মানুষ শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে। রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রদীপ্ত ঘোষণায় শিশু-সাহিত্যের উৎসমূল আবিষ্কৃত হয়েছে।

১। F. Macdonald : Roussean.

বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের উন্মেষ আরো পরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তা'র প্রথম আবির্ভাব। সুতরাং বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্য একেবারেই শিশু, সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আলো-হাওয়ার প্রভাবে আমাদের দেশে আদর্শ শিশু-সাহিত্যের প্রথম সার্থক সূত্রপাত। এবং সাহিত্যের এই ধারাটি কবিগুরুর অসীম-বিথারী কল্পনাময়ী জীয়ন-কাঠির স্পর্শে জীবন্ত হ'য়ে সগৌরবে যৌবন-স্বর্গে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু কবিগুরুর এ পথে পদার্পণের পূর্বেও কয়েকজন সার্থকাম পথিকের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে। এখন মোটামুটি আমরা বাংলা শিশু-সাহিত্যের বিকাশধারাটি বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

॥ দুই ॥

মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে শিশুদের উপযোগী কিছু কিছু ছড়া এবং গল্প প্রচলিত ছিল। কাঞ্চনমালা, শীত-বসন্ত, শঙ্খমালা, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী প্রভৃতি বেদনা-করুণ এবং বীরত্ব-বিস্ফারিত গল্পগুলি তুর্কী আক্রমণের বহুপূর্ব থেকেই ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাদা জাতীয় বয়স্থ নিষ্কর্মা গৃহ-পাগল গল্প-প্রিয় মানুষের মাধ্যমে এদেশের ঘরে ঘরে শিশুদের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছে। কল্পনার স্বর্ণালিম্পনে চির-মনোরম রূপকথাগুলিও এইভাবে বহুদিন হ'তে স্বপ্ন-বিভোল শিশুদের মনোরঞ্জন করে' আসছে। কল্পনায় পক্ষীরাজের পিঠে রাজকুমার সেজে অবহেলায় সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে' রাজকন্যার দেশে উড়ে গিয়ে তা'কে উদ্ধার করে' আনতে পারায় শিশুদের সে কী অপরিসীম আনন্দ আর উল্লাস! রূপকথাগুলি হ'লো বাঙালীর খাঁটি জিনিস। প্রাচীন এই রূপকথাগুলিকেই ভিত্তি করে' বর্তমান শতাব্দীতে রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বিকাশোন্মুখ শিশু-মনের কাছে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দের উৎস হ'য়ে আছে। শিশুদের

সবল মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের জন্য রূপকথার এই অনাবিল স্বচ্ছ ঝরণাধারায় স্নানের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। রূপকথার পর ছড়া। ছড়াগুলিও বহু প্রাচীনকাল হ'তে ঠাকুরমা ঠাকুরদার মুখে মুখে লালিত পালিত হ'য়ে আসছে। এগুলিও কল্পনা-প্রবণ শিশুর মনোবীণায় মধুর সুরালাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। ছড়ার অর্থে নয়—ছন্দ-দোলায় ও ধ্বনি-ঝংকারে সম্ভব অসম্ভবের যে অস্পষ্ট রহস্যময় চিত্র শিশু-চিত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে আনন্দ-তন্ময় হ'য়ে বাস্তব সংসার ভুলে থাকার জন্য শিশুর কাছে তা' অপর্যাপ্ত।

শিশু-সাহিত্যের এই আনুপূর্বিকতাটি লক্ষ্য করে' 'বাংলা শিশু-সাহিত্য সুপ্রাচীন' এরূপ মত পোষণ করা ভুল হবে। কেন না শিশু-সাহিত্যের যে ধারাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা' শিশুর মানস-গঠনের জন্য সুন্দরও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়—আদর্শ শিশু-সাহিত্য ত নয়-ই। এইটুকু বলা যায় এগুলি আদর্শ শিশু-সাহিত্যের অযুত সম্ভাবনায় মুখর।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে আদর্শ শিশু-সাহিত্য রচিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে। কিন্তু এগুলি তখন কৌলীন্যের জয়টীকা পরে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের রূপবতী কুলীন কন্যার মত আসরে নেমে রূপ-স্বয়ংবরার পসরা খুলে বসতে পারে নি। শিশু-সাহিত্য তখনো অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে জনগণের নাসিকা-কুঞ্চনের অপেক্ষায় কাল গুনতো। সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ পদচারণায় সাহিত্যের এই অপাঙ্‌ক্তেয় শিশুটি কেবল কৌলীন্য অর্জন করল না—শৈশবত্ব কাটিয়ে যৌবনের অসাধ্য-সৌন্দর্যের অধিকারে কালজয়ী সম্ভাবনায় অনবদ্য হ'য়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক কালে যাঁ'রা শিশু-সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁ'দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়চৌধুরী ইত্যাদি প্রধান। এঁরা সকলেই শিশু-সাহিত্য রচনায়

প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সকল রচনাই শিশুকেন্দ্রিক—একটি দুরন্ত অবোধ শিশু তাঁ'র সমগ্র রচনার মধ্যে সহস্র প্রশ্নধারায় খেলা করে' বেড়িয়েছে। "শকুন্তলা"র মত দুরূহ-কঠিন বিষয়বস্তুকে তিনি ভাষার সারল্যে এবং আন্তরিকতার গুণে একান্তভাবে শিশুর উপযোগী করে' তুলেছেন: "এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তা'তে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল। পাহাড়-পর্বত আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তা'তে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।" এমনি ভাবে কথার পর কথা সাজিয়ে আকস্মিক তিনি এমন এক জায়গায় এসে থেমেছেন যেখানে শিশু-চিত্ত আবেগে-উল্লাসে দুলে উঠেছে। কৌতুক আর কৌতূহলের উদ্দীপনায় নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছে:

"তারপর?

দুঃখের নিশি প্রভাত হ'লো মাধবীর পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখী ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হ'লো?

বনপথে রাজা বরকুঞ্জে এল।

আর কি হ'লো?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা দু'জনে মালা বদল হ'লো।

দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'লো।

তারপর কি হ'লো?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য শিশু-সাহিত্যের মধ্যে "ক্ষীরের পুতুল", "নালক", "বুড়ো আংলা" ইত্যাদি প্রধান। অবশ্য কবিতায়

তিনি শিশুদের উপযোগী কোন পুস্তক রচনা করেন নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার "ঠাকুরমার ঝুলি" এবং "ঠাকুরদাদার ঝুলি"র মাধ্যমে বাংলা শিশু-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। এই গ্রন্থ দু'খানিতে তিনি শিশুকে আনন্দাবেগে দুলিয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের নিকট হ'তে আমরা গদ্যে ও পদ্যেয় প্রথম শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য উপহার পেয়েছি। অবশ্য এ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ দোসরহীন। তিনি অকৃপণ হস্তে যে দান আমাদের দিয়েছেন তা'র তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা সম্পর্কে কেউ কেউ অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁ'রা বলতে চেয়েছেন কবিগুরুর প্রায় কবিতাই ঠিক শিশুদের উপযোগী নয়। শিশুদের কথা বলতে গিয়ে তিনি শিশুদের মানস-ভূমি অতিক্রম করে' গেছেন। বার বার তিনি শিশু-কবিতা রচনার ভিত্তিভূমি ত্যাগ করে' অসীমচারী হয়েছেন। যেমনঃ 'শিশু'র 'জন্মকথা' (খোকা মাকে শুধায় ডেকে) 'খেলা' (নিখিল শোনে আকুল মনে), 'শিশু ভোলানাথে'র 'মনে পড়া' (মাকে আমার পড়ে না মনে) ইত্যাদি।

শিশু-কাব্যে এই শ্রেণীর আরো বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথের আছে। কোন কোন কবিতায় তিনি শিশুকে দেখেছেন বিশ্বজীবনের এক খণ্ডাংশ রূপে, ভাগবৎ-দীপ্তি যেন অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে শিশুর অনাবিল হাসিতে। পার্থিব জীবনে যে সব ঘটনাবলী ও দৃশ্য-মিছিলে শিশু-মনে অসংখ্য প্রশ্ন বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে—সেইখানে কবি পেয়েছেন অনন্ত রহস্যের সন্ধান। সেখানেই তিনি ডুব দিয়েছেন বিপুল অসীমের অনন্ত ছায়াচ্ছন্নতার মাঝে। সুতরাং শিশু-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ শিশুমানস অতিক্রম করে' যে আধ্যাত্মিকতার রহস্যাচ্ছন্ন স্বর্ণ-দিগন্তে পদার্পণ করেছেন এ কথা সত্য। আমার মনে হয় এ জাতের কবিতাগুলিকে শিশু-সাহিত্য না বলাই উচিত। এগুলি শিশু-সাহিত্য হিসেবে নয়—নির্মল কাব্য হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিশু-সাহিত্যের ওপর আরোপিত এই সন্দেহটি পুরাপুরি সত্য নয়। একান্ত শিশুদের উপযোগী তিনি যে বিশুদ্ধ শিশু-কবিতা রচনা করেছেন তা' যে কোন একজন শিশু-সাহিত্যিকের ঈর্ষার বস্তু। "সহজ পাঠে"র 'নদীর ঘাটের কাছে', 'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু', 'রঙ্গ'; "ছড়ার ছবি"র 'দামোদর শেঠ,' 'গোরা বোষ্টম বাবা', 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে', 'নাড়ী টেপা ডাক্তার', 'যোগীনদা'; "শিশু" এবং "শিশু ভোলা-নাথে"র 'তালগাছ', 'বীরপুরুষ', 'রবিবার', 'নদী', 'হাট', 'মুখু,' 'কাগজের নৌকা', 'খোকার বনবাস' ইত্যাদি কবিতা এবং "সে" গ্রন্থের 'গেছো বাবার কাহিনী', 'হাঁচিয়ান্দিনী কুরুক্ষুনা' ইত্যাদি গল্পগুলি পাঠ করলেই আদর্শ শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শক্তি সামর্থ্যের দিগন্ত-বলয় স্পর্শ করা সহজ হবে। এ সব রচনার মধ্যে কবি কোন রূপ-তত্ত্ব বা অধ্যাত্মিকতার মায়াজাল বিস্তার করেন নি—একান্ত শিশু হ'য়ে শিশু-মনের হাসিকান্না ও দ্বন্দ্ব দোলায় নিজের চিন্তাধারাকে দোলায়িত করেছেন। এসব কবিতায় কবি একেবারেই শিশু, কবিতাগুলি একান্ত ভাবেই শিশুকেন্দ্রিক। তা'ই 'রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যকে ঠিক শিশুদের সাহিত্য বলা চলে না'—এরূপ মন্তব্য বোধ হয় ঠিক নয়। তা' ছাড়া রবীন্দ্র-নাথের শিশুকবিতাগুলিতে অনন্তলোকের সুরালাপন হওয়ার প্রধান কারণ তা'র অসীমভেদী কল্পনা-প্রধান Cosmic imagination ) কবিমানস। তাঁর লীলা-চঞ্চল কবিমানসই তাঁ'কে এ দোষে দোষী করেছে। তা' ছাড়া "শিশু" এবং "শিশু ভোলানাথ" ইত্যাদি শিশুকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলির রচনা-অধ্যায়টি কবিগুরুর অধ্যাত্মলোকে বিচরণের অধ্যায়। গীতাঞ্জলি (১৩১৭) গীতিমাল্যের (১৩২১) অব্যবহিত পরেই শিশু ভোলানাথ (১৩২৯) রচিত। শিশু (১৩১০) কাব্যটি ত নৈবেদ্য (১৩০৮) এবং গীতাঞ্জলির মাঝেই রচিত হয়েছে। সুতরাং এ সব কাব্য-রচনার সময় কবি শত চেষ্টা করেও অধ্যাত্মমুখীন ভগবৎ-চিন্তাকে আপন কবিমানসের দিগন্তে

প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র না দিয়ে পারেন নি। সরল নিরলঙ্কার ভাষাতেও শিশু-কাব্য রচনার সময় তা'ই অনিবার্য কারণ বশতঃ গভীর তথ্য ও তত্ত্ব কথা এসে সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ওপর এক অনাবিল সৌন্দর্যজাল বিস্তার করেছে। শিশু তা'ই বহু কবিতায় অধ্যাত্ম-লোকে উন্নীত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকাব্যে রবীন্দ্রনাথের মূল ত্রুটি বোধ হয় এইখানে।

নজরুল ইস্‌লামের শিশু-কবিতায় এমন ত্রুটি বিশেষ নেই। শিশুকে তিনি শিশু হিসেবেই দেখেছেন। তা'ই নজরুল-কাব্যে শিশু অনন্তজীবনের খণ্ডাংশ রূপে প্রকাশিত হয় নি, ভগবৎ-দীপ্তি অথবা ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়েও আপন স্বরূপকে বিঘোষিত করে নি—শিশু শিশু-ই, মায়ের আদরের ধন। শিশুর মাঝে দেখেছেন অনাগত ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। একটি কি দু'টি কবিতায় তিনি শিশুকে কেন্দ্র করে' অনন্তলোকের অরূপ রহস্যো-দ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। যেমন :

পার হ'য়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু-যাদুকর।
কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতায় ভুঁই।…
তোরে হেরি জন্মান্তে কাঁদে ইউসুফ,
তোর হাসি শুনি' বনে বুলবুলি চুপ।…
তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে!
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম,
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।"

॥ শিশু-যাদুকর : পুতুলের বিয়ে ॥

বলা বাহুল্য এ কবিতার রসাস্বাদন শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়—শিশুর বাবা-মাকেও এ কবিতার স্বরূপোদ্‌ঘাটনে বেগ পেতে হয়। তবুও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ কবিতায় নজরুলের কণ্ঠ অনেক

নীচু সুরে বাঁধা। শিশুকে কেন্দ্র করে[২] অসীমালোকের ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ আরো উচ্চগ্রাম হ'তে বেজে উঠেছে।

নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার আর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাগুলিও তাঁ'র অধ্যাত্ম পর্বের ( খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য পর্বের কবিতা ) কবিতাগুলির মত স্নিগ্ধ এবং শান্তভাবে আশ্চর্যরূপে সংহত কিন্তু নজরুলের শিশুকেন্দ্রিক কবিতাগুলি তাঁ'র বিদ্রোহমূলক কবিতাবলীর মত আবেগ-চঞ্চল। এ সব কবিতাতেও তাঁ'র যৌবনধর্মী প্রাণোত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁ'র স্বভাবসুলভ প্রাণাবেগে কবিতাগুলি গতিশীল হ'য়ে উঠেছে। উভয় কবির শিশু-কাব্যে এই পার্থক্য সঞ্চারিত হওয়ার মূলে রয়েছে উভয়ের ভিন্নধর্মী কবিমানস। তা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শিশু-কবিতা রচিত হয়েছে বার্ধক্যের প্রান্ত-সীমানায়। রবীন্দ্রনাথের আবেগ-চঞ্চল অনুভূতিগুলি তখন একান্তভাবে অন্তর্মুখীনতা লাভ করেছে। তা'ই বার্ধক্যের প্রান্তিক সীমানায় দাঁড়িয়ে আপন মনের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি যে কবিতা রচনা করেছেন তা' বুড়ো-শিশুদের উপযোগী হয়েছে। পক্ষান্তরে নজরুল যে সময় এই শিশু-কবিতাগুলি রচনা করেন তখন তাঁ'র কবিমানস যৌবনের প্রলয়োল্কার আবেগে লীলা-চঞ্চল। অন্তর্মুখীনতার প্রশান্ত মোহাঞ্জন স্পর্শ হ'তে এ কবিতাগুলি তা'ই মুক্তিলাভ করেছে। ফলে নজরুলের শিশুকেন্দ্রিক কবিতাবলীর মাঝে সঞ্চারিত হয়েছে যৌবন-চলিষ্ণুতা এবং হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্য। বুড়ো শিশুর মত স্থবির না হ'য়ে শিশু-হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি এবং চঞ্চলতাতেই নজরুলের শিশু-কবিতাগুলি একান্ত-ভাবেই শিশুর চঞ্চলতায় মুখর হ'য়ে উঠেছে। "কেশে আমার

---

২। বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদের তিন মাসের ছোট্ট শিশুকে কেন্দ্র করে' এই "শিশু-যাদুকর" কবিতাটি লেখেন নজরুল ইস্‌লাম। পরে এটি জনাব আবদুল কাদির সম্পাদিত মাসিক "জয়তী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং আরো পরে "পুতুলের বিয়ে"-তে সংকলিত হ'য়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পাক ধরেছে” তবু শিশুদের সাথে মিতালী পাতিয়ে বয়সের পার্থক্য ঘুচিয়ে কবিগুরু নিজেকে শিশুদের সাথে “একবয়সী জেনো” বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু শিশু-সাহিত্য রচনার সময় কবি এই বয়সের পার্থক্য সীমারেখাকে বিলীন করে’ দিতে পারেন নি কিন্তু নজরুল বয়সের সীমারেখা ডিঙিয়ে শিশুর সাথে শিশুর মত হ’য়েই শিশু-কেন্দ্রিক কবিতা রচনা করেছেন। নিজের অনুভূতিকে শিশুর চিন্তাধারার সাথে মিলিয়ে, শিশু-মনের প্রশ্নাবলী নিজের প্রশ্নের সামিল করে’ শিশু এবং নজরুল উভয়ই একই সরলরেখায় কাব্য-দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। শিশু-কাব্য রচনায় নজরুলের সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে এখানেই।

॥ *তিন* ॥

নজরুলের শিশু-কবিতার ব্যাপক আলোচনা এবং বৈশিষ্ট্য বিচারের পূর্বেই একটি কথা স্পষ্ট করে’ স্বীকার করে’ নেওয়া প্রয়োজন ঃ নজরুলের শিশু-সাহিত্য রচনার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। শিশুদের উপযোগী সাহিত্য তিনি খুব বেশি রচনা করেন নি। সম্ভবতঃ “পুতুলের বিয়ে”, “ঝিঙেফুল” এবং “সঞ্চয়ন” এই তিনখানি নাটিকা ও কাব্যগ্রন্থ তিনি শিশুদের সুকোমল হস্তে উপহার দিয়েছেন। সংখ্যায় মাত্র তিনটি এবং এদের আয়তনও বিশাল নয়। তবু এই স্বল্পায়তন তিনখানি শিশু-কাব্য রচনায় কাজী সাহেবের অনন্য-সাধারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথমতঃ শিশুদের জন্য তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা’ একেবারে নিখাদ এবং নিখুঁত। নজরুল-কাব্যের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় অভিযোগ এই জনগণের হাততালির উন্মাদনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সব কবিতা রচনা করেছেন যা’ পরিমার্জনার অভাবে ঠিক কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। সে-সব কবিতায় একটি পঙ্গু ও কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। সংস্কারের অভাবে

কতকগুলি অবিন্যস্ত শব্দ-যোজনায় কবিতার কঙ্কাল রচিত হয়েছে। যে জীয়ন-কাঠির সংস্পর্শে শিথিল প্রযুক্ত শব্দগুলি কাব্যের আত্মার অপূর্ব দ্যুতিতে ঝলকিত হ'য়ে ওঠে বহু কবিতায় কবি সেই জীয়ন-কাঠির সঞ্জীবনী স্পর্শ বুলিয়ে দিতে পারেন নি। কিন্তু শিশু-কবিতাগুলি আশ্চর্য রূপে এই দোষ-দুর্বলতা হ'তে মুক্ত। কবির অন্যান্য বহু কবিতার মত কেবলমাত্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে এই শিশু-কবিতাগুলি একান্ত 'জলো' হ'য়ে ওঠে নি। শব্দ-যোজনায়, ছন্দমাধুর্যে এবং সর্বোপরি প্রাণৈশ্বর্যে শিশু-কবিতাগুলি সুনিবিড় ভাব-জমাট এবং রৌদ্র-পিচ্ছিল নিটোল মুক্তার রূপ ধারণ করেছে। শিশুকেন্দ্রিক কবিতাবলীর মধ্যে এমন একটিও কবিতা নেই যেখানে ছন্দ-দুর্বলতা, ভাব-দৈন্য (যে ত্রুটি নজরুল-কাব্যের বহুস্থানে পরিলক্ষিত হয়) প্রকাশ পেয়েছে। এটি কেবল শিশু-কাব্য রচনায় নয়—নজরুলের অন্যান্য কাব্য-রচনার মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশু-কাব্য রচনায় নজরুলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'লো শিশুর আদর্শ মানস-গঠনোপযোগী চিন্তাধারার পরিবেশনে। বর্তমানে শিশু-সাহিত্যের নামে বাজারে যে সকল পুস্তক রচিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির অধিকাংশই বিকৃত চিন্তাধারা এবং অসুস্থ রুচির পরিচায়ক। সস্তা রোমাঞ্চকর ভাব-বিন্যাস এবং অধম বীরত্বপূর্ণ গোয়েন্দাগিরিতে এ সকল শিশু-সাহিত্যের পৃষ্ঠা পূর্ণ। উত্তেজনাপূর্ণ অখাদ্য কাহিনী বিবৃতিতে শিশুর সুস্থ মানস-গঠনের কবর রচিত হয়। ছন্দপ্রধান ছড়ার মধ্যেও আজকাল আর ছন্দের সুমধুর পদধ্বনি শোনা যায় না। কিন্তু নজরুলের শিশু-কাব্যে এ সকল আবর্জনা নেই। তাঁ'র ছড়াগুলি ছন্দ-মাধুর্যে আশ্চর্য-সুন্দর। অন্যান্য কবিতাবলীতে বিকৃতরুচির পরিচয় নেই—কবিতাগুলির কোমল বক্ষে শিশুর চিন্তাধারা বিকাশের এবং আদর্শ মানসিক বুনিয়াদ-গঠনের রাজসিক আয়োজন আছে।

তৃতীয়তঃ নজরুল শিশু-কাব্য রচনা করেছেন শিশুর মত হ'য়েই। বয়সকে কমিয়ে শিশুর মত হ'য়ে শিশু-মনের শত অলিন্দে তিনি

অনুপ্রবেশ করেছেন। তা'ই দেখি শিশুর অবুঝ প্রশ্নের সাথে তাঁ'র প্রশ্নের কোন পার্থক্য নেই, শিশুর চিন্তাধারার সাথে তাঁ'র স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শিশু-মন নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন বলেই তাঁ'র কাব্য কবিগুরুর শিশু-সাহিত্যের মত বুড়ো-শিশুদের উপযুক্ত না হ'য়ে একান্তভাবে শিশু-প্রাণের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে।

শিশু-কাব্য রচনায় নজরুলের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে এসব কবিতায় শিশু-মনের নিঃসীম সীমানায় অনুপ্রবেশ করে' তিনি শিশু-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি। শিশু-তত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্বের স্পর্শ থাকায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শিশুদের জন্য শুরু হ'য়ে বড়দের উপযোগী হ'য়ে সমাপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু নজরুলের কোন শিশুকেন্দ্রিক কবিতাতে এই দ্বিচারণের ভাব নেই। শিশুদের জন্যে যে কাব্য রচনা করেছেন তা' একান্ত ভাবে শিশুদেরই আবার শিশুদের উপলক্ষ্য করে' বড়দের জন্য যে কাব্য রচনা করেছেন তা' একান্তভাবেই বড়দের। ঝিঙেফুলের 'প্রভাতী' এবং নতুন চাঁদের 'মোবারকবাদ' কবিতা দু'টি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'প্রভাতী' একান্তভাবেই শিশু-মনের সামগ্রী আর শিশুকেন্দ্রিক 'মোবারকবাদ' বড়দের প্রাণসম্পদ।

নজরুলের বিদ্রোহমূলক কবিতার মত তাঁ'র শিশু-কাব্যে একটি বলিষ্ঠ সুরের বাঙ্ময় কণ্ঠ শোনা গিয়েছে। শিশু আদরের ধন—সুতরাং তা'কে শান্ত সুবোধ শিশুটির মত করে' চোখে চোখে নির্ভয় গৃহপ্রাঙ্গণের চারপাশে বেঁধে রাখতে হবে এ মতের পক্ষপাতী কবি নন। শিশুকে স্বাবলম্বী হ'তে হবে—সুতরাং বিপদ-সঙ্কুল ভয়াবহ দুর্গম পথে পাঠিয়ে দিতে তাঁ'র কুণ্ঠা নেই। নজরুলের আহ্বান—ভয়ঙ্করের আহ্বান। এই আহ্বান বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে 'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতায়। শিশু কাব্যে এই বলিষ্ঠ ধারার প্রবর্তনায় নজরুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত।

এবার নজরুলের শিশু-কবিতার শ্রেণী বিভাগ করে' উদ্ধৃতিসহ প্রতি বিভাগের কিছু আলোচনা করলেই শিশু-সাহিত্যের নজরুলের

বৈশিষ্ট ও বলিষ্ঠতার দিগন্ত-বলয় স্পর্শ করতে পারব বলেই আমাদের বিশ্বাস। নজরুলের সমগ্র শিশু-সাহিত্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১। শিশু-নাটিকা
২। ছন্দপ্রধান ছড়া জাতীয় কবিতা
৩। শিশু-মনের বাসনা-কামনা-রঙীন কল্পনা-প্রধান কবিতা
৪। বলিষ্ঠ সুর সমৃদ্ধ শিশু-কবিতা
৫। শিশু-কবিতায় উচ্চ ভাবের প্রবর্তনা

এখন প্রতিটি বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ *চার* ॥

ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী মাত্র দু'খানি নাটিকা বিদ্রোহী কবির হাত দিয়ে পেয়েছি : "ঝিলিমিলি" নাটকের 'ভূতের ভয়' এবং "পুতুলের বিয়ে" (শিশুদের জন্য নাটিকা ও কবিতা) এর 'পুতুলের বিয়ে'। "ঝিলিমিলি" নাটকের অন্তর্গত প্রায় একাঙ্কিকাগুলি সাঙ্কেতিক। সুতরাং বাইরের দিক হ'তে (পাত্র-পাত্রী, অভিনয়) একাঙ্কিকাগুলিতে শিশু-নাট্যের রং মেশান থাকলেও যে ভাববলয়ে এদের অন্তরাত্মা বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে—সেখানে শিশুদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। একমাত্র "পুতুলের বিয়ে" নাটিকাটি আদর্শ শিশুকেন্দ্রিক নাটিকা। এখানে কবি সাঙ্কেতিকতার মধ্য দিয়ে কোন সুউচ্চ শিখরস্পর্শী ভাব-বিন্যাসের প্রচেষ্টা করেন নি। একেবারে শিশু হ'য়ে তিনি একান্তভাবে শিশু-মনের ভাব-চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে শব্দাঙ্কিত করেছেন। এ নাটিকার নায়ক কমলীর চিনে পুতুল ডালিমকুমার আর নায়িকা দু'জন যথাক্রমে বেগমের জাপানী পুতুল আর টলির মেমপুতুল। ডালিমকুমারের সঙ্গে জাপানী পুতুল আর মেমপুতুলের বিয়ের ব্যাপারটি কবি শিশু-মনের কল্পনা-সমৃদ্ধ সুবঙ্কিম ধারাটি

অনুসরণ করে' এমন অদ্ভুতভাবে চিত্রবিচিত্রার মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করেছেন যে তা' শিশু-মনের কল্পনা-উৎসমূল খুলে দেবে। শিশু-মনের কল্পনার দিগন্ত প্রসারিত করা এবং তা'র পরিপুষ্টি-সাধন ছিল কবির লক্ষ্য। বলা বাহুল্য এ নাটিকাটিতে কাজী সাহেব শিশু-মনের উদ্দাম কল্পনার প্রসারণ এবং পরিপুষ্টি-সাধনের দায়িত্ব পূর্ণরূপেই পালন করেছেন।

ছড়া জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে কোন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। দোদুল ছন্দাঙ্কনে টুকরো ছবির বিচিত্র এ্যালবাম সৃষ্টি করাই হ'লো ছড়ার লক্ষ্য। বাস্তব এবং সম্ভাব্যতার সাথে এদের কোন যোগ নেই। ছড়ার কোমল বক্ষে যে বিচিত্র ছবির মিছিল দেখি বাস্তব জগৎ সংসারে তা'দের যোগ নিতান্ত ক্ষীণ। রাজার মেয়ে সেখানে কলমী শাক তুলতে যায়, কোলা ব্যাঙের ভয়ে হস্তী জড়সড় হয় আর 'লাল জুতুয়া' পায়ে খোকাবাবু অবলীলাক্রমে সারা বনের সিংহ ব্যাঘ্রকে কান ধরে ঘরের মধ্যে এনে বন্দী করে। এ ছবিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তা'ই 'হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো' বলেছেন। এই 'হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশান' ছবিগুলিই শিশুর কল্প-জগতের দিগন্ত-বলয়কে বিস্তারিত করে, তার মনন ও মানস-গঠনের সুদৃঢ় বুনিয়াদ রচনা করে। নিম্নের ছড়াটি লক্ষণীয়ঃ

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা' না দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা,
খোকার নাচন দেখে যা।

টিয়া পাখীর নৌকা বাওয়া, বোয়াল মাছের নৌকা নিয়ে যাওয়া কিংবা ভোঁদড় নাচা সবগুলিই উদ্ভট আজগুবি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় তথাপি শিশুর চিত্ত-দ্বারে এদের আবেদন অনস্বীকার্য। 'খোকার বুদ্ধি'তে এক পালোয়ানী খুকুর ছবি এঁকেছেন কবিঃ

সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান ;
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান।

॥ খোকার বুদ্ধি ॥

একটা ফড়িং মারতে পালোয়ান খোকার সাতটা লাঠির প্রয়োজন—তা' হোক, তা'তে শিশুর আনন্দ-যজ্ঞের ভাঁড়ার পূর্ণ হয়। 'খোকার গল্প বলা' কবিতাটি এই জাতীয় কবিতার মধ্যমণি :

এক'দিন এক রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা।
রাণী গেলেন তুলতে কলমী শাক
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক্।
রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘুরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে।

॥ খোকার গল্প বলা : সঞ্চয়ন ॥

রাজার ভাগ্যে পাঁপড়-ভাজা জুটল, রাণী সানন্দে কলমী শাক তোলার ব্রত নিল এবং অবশেষে বিড়াল-বাচ্চাটা হ'লো হাতীর মত—কিন্তু শিশু-পাঠকের কি আনন্দ, তা'র কি অপরিসীর উল্লাস। এ কবিতা শিশু-মনের সুপ্ত কল্পনার ওপর জীয়ন-কাঠির মায়াঞ্জন স্পর্শ বুলিয়ে দেবেই।

শিশুকেন্দ্রিক কল্পনা-সমৃদ্ধ কবিতায় নজরুলের দান অপরিসীম। এ জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি সার্থকতার উচ্চগ্রাম স্পর্শ করেছেন। আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের (Modern Children Psychology) সর্বত্র কল্পনার দ্বারা শিশুর সুপ্ত চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের কথা বলা হয়েছে। নীতিবাক্য বা অযথা পীড়নের দ্বারা শিশুকে জ্ঞানী এবং মানুষ করা যায় না—তা'র ক্রমবর্ধমান চিত্তবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য তা'কে তা'র নিজস্ব চিত্তভূমিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ দিতে হবে। রুশো, হার্বার্ট, ফ্রোএবেল, মন্তেসরী, ডিউই, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ সকলেই একবাক্যে এ কথাই স্বীকার করেছেন। নজরুলের শিশু-কাব্যে শিশুর কল্পনা-মুক্তির মধুভাণ্ড সঞ্চিত হ'য়ে

আছে। এক অপরিসীম আবেগে, উচ্ছ্বাসে, কল্পনায় লীলাখেলায় তিনি শিশুর সমগ্র চিত্তবৃত্তিকে দোদুল্য কম্পমান রেখেছেন। 'খুকী ও কাঠবেড়ালী', 'লিচুচোর', 'ঝিঙেফুল', 'প্রভাতী' ইত্যাদি কবিতা পড়ে নি এমন শিশু-পাঠক বাংলা দেশে বিরলদৃষ্ট। 'খুকী ও কাঠবেড়ালী' কবিতায় প্রাণী-পশুর মধ্যে এক অদ্ভুত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। কাঠবেড়ালীর কাছ থেকে একটি পেয়ারা পাওয়ার জন্য খুকীর সে কি অপরিসীম আগ্রহ, ব্যাকুলতা আর অনুনয়। জামা, ফ্রক আর জুতো সবই সে দিতে চেয়েছে। কিন্তু কোন অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা না করে' কাঠবেড়ালী যখন 'মজুন' পেয়ারায় কামড় দিতে আরম্ভ করেছে তখন খুকুমণির দু'কূলপ্লাবী অভিমান-আক্রোশ শতধারায় ভেঙে পড়েছে। এই কবিতা সম্পর্কে অধ্যাপিকা বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদের মূল্যবান মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়ঃ "দিগম্বর কাঠবেড়ালীর আবরু রক্ষার জন্যে নিজের জামা-কাপড় দিয়ে সাহায্য করতে চাওয়ার মধ্যে খুকীর সহৃদয় সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কথাবার্তার মধ্যে কাঠবেড়ালীকে তা'র খেলার সাথী—অন্য দশটা ছেলেমেয়ের মত মনে করতে খুকীর একটুও বাধছে না কোথাও। সারাদিনের খেলাধূলার মধ্যে অন্য ক্ষুদে বন্ধুদের সঙ্গে যেমন কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে' এ-ও ঠিক তেমনি ক্ষণে ক্ষণে ভাব, আড়ি, করুণা, হিংসা, অভিশাপ, অনুনয়, প্রলোভন ও ভর্ৎসনার বিচিত্রলীলা সে প্রকাশ করে'-যাচ্ছে অনায়াসে। শিশু-মনের বিচিত্র ছবি 'খুকী ও কাঠবেড়ালী' কবিতায় শিশুর একান্ত উপযোগী মনোহর ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের মত ত্বরিত গতিতে শিশু-পাঠকের মনশ্চক্ষুর সামনে দিয়ে ভেসে যায়।"

'লিচুচোর' কবিতাতেও কবি অনুরূপভাবে অপূর্ব মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। লোভের বশবর্তী হ'য়ে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই 'বাবুদের তালপুকুরে' লিচু চুরি করতে গিয়ে হাবুদের ডাল কুত্তার তাড়ায় মালীর পিটনি উপভোগ করে' পাঁচিলের ফোকর

গলে কোনক্রমে জীবন্মৃত অবস্থায় যে শিশু বেরিয়ে এল সে নিশ্চয় আর কোনদিন চুরিতে যাবে না। নিতান্ত একটি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে' কবি শিশুর চুরি করার মনোবৃত্তিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। তা'ই সেই অভিজ্ঞ শিশুকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে 'কি বলিস্ ফের হপ্তা'—সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে' কালবিলম্ব না করেই উত্তর দিয়েছে 'তৌবা নাক খপ্তা'। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব জোর করে' উপদেশের ঢিল ছুঁড়ে কবি শিশু-মনের ফুলবাগিচার গান গাওয়া বুলবুলিকে উড়িয়ে দেননি। শিশু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেই উপদেশ গ্রহণ করেছে। এ কবিতার অনাবিল হাস্যকৌতুক লক্ষ্য করার মত। 'খাঁদু দাদু' কবিতায় এই নির্মল হাস্যরস আরো ঘনতর হয়েছে। তবে এই কবিতার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাগুলি ঠিক শিশুদের উপযোগী হ'য়ে ওঠে নি। অন্যান্য কবিতায় শিশু-মনের সাথে কবি-মনের যে নিঃসীম একীকরণ দেখেছি এ কবিতায় তা'র বড় অভাব। এখানে তিনি শিশু-মনকে অনুসরণ করেছেন—শিশুর ভাবধারার সাথে নিজের চিন্তাকে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। কবিতার ক'টি লাইন উদ্ধৃত করলেই আমাদের মন্তব্যের সত্য-সার ধরা পড়বে :

অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা—নাক ডেঙাডেং ড্যাং।
...দাদু বুঝি চীনাম্যান মা, নাম বুঝি চাংচু?
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু।
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন।
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

॥ খাঁদু দাদু : ঝিঙেফুল ॥

'নামতা পাঠ' এবং 'চিঠি' কবিতায় কবি-মনের সাথে শিশু-মনের লেনদেন অনেকখানি সুনিবিড় ঐকান্তিকতায় শব্দায়িত। ছোট-বেলায় নামতা পাঠে (পড়াশুনায়) ভুল হ'লে গুরুজনদের তাড়ন-

ভর্ৎসনায় শিশু-মনের সুবঙ্কিম চিন্তাধারায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নামতা পাঠ কবিতায় তা' উপভোগ্য ভাষায় বাক্‌বদ্ধ:

আমি যদি বাবা হ'তাম, বাবা হ'তো খোকা,
না হ'লে তা'র নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।
রোজ যদি হ'তো রবিবার
কি মজাটাই হ'তো না আমার
থাকত না আর নামতা পড়া লেখা আঁকা-জোঁকা
আমি যদি বাবা হ'তাম, বাবা হ'তো খোকা।

॥ নামতা পাঠ : পুতুলের বিয়ে ॥

'চিঠি' কবিতায় কবির শিশুসুলভ মনোবৃত্তির সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে:

দিইনি চিঠি আগে
তাইতে কি বোন্ রাগে ?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝতেছি খুব পষ্ট।
তাইতো সন্থ সন্থ
লিখতেছি এই পন্থ।
পেয়েছি তোমার পত্র,
যদিও তিন ছত্র,
যদিও তা'র অক্ষর
হাত-পা যেন যক্ষর
পেটটা কারুর চিপসে
পিঠটা কারুর ঢিপসে।
এক একটা যা বানান।
হ্যাঁ করে' কি জানান।
...মা মাসীমায় পেন্নাম
এখান হ'তেই করলাম।
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই তোরা লস্‌তা
সঙ্গে পন্থ সবিটা
ইতি। তোদের কবিদা।

॥ চিঠি ॥

'প্রভাতী' এবং 'ঝিঙেফুল' কবিতায় কল্পনার উদ্দামতার সাথে ছন্দ-হিন্দোলের মণিকাঞ্চন যুক্ত হওয়ায় কবিতা দু'টি দুষ্প্রাপ্য-লাবণ্যে ঝলকিত। 'প্রভাতী' কবিতায় নবীন অরুণ-সিক্ত প্রভাতের রূপ-সৌন্দর্য শব্দতরঙ্গে বিধৃত হয়েছে তা' শাশ্বতকালীন উষা-লগ্নের স্বর্ণছবি :

রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ
দারোয়ান গায় গান
শোনো ঐ, "রামা হৈ।"
ত্যজি নীড় ক'রে ভীড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।
বুলবুল বুলবুল
শিস্ দেয় পুষ্পে,
এইবার এইবার
খুকুমণি উঠ্‌বে।

॥ প্রভাতী : ঝিঙেফুল ॥

প্রভাতকালে যে চিত্রগুলি ক্রমান্বয়ে ফুটে ওঠে খুকুমণির ঘুম ভাঙাবার ছলে সে চিত্রগুলি সুনিপুণ শিল্পীর মত শব্দের আলিম্পনে অনবদ্য করে' তুলেছেন। ছন্দ-বৈচিত্র্যে, ধ্বনিমাধুর্যে এবং ভাবৈশ্বর্যে 'ঝিঙেফুল' কবিতাটি বাংলা ভাষার প্রথম শ্রেণীর শিশু-কবিতাগুলির শীর্ষস্থানীয়। সত্য কথা বলতে কি বাংলার শিশু-সাহিত্যে 'লিচু-চোর', 'ঝিঙেফুল' ইত্যাদি কবিতাগুলি আজ ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শিশু-মনে ধ্বনি-সমৃদ্ধ কবিতার একটি বিশেষ আবেদন আছে। অর্থোদ্ধার বড় কথা নয়—ধ্বনির বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ এবং সমৃদ্ধ করে' তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। তা'ই একান্ত বিজ্ঞানানুগ পদ্ধতি প্রচলিত বহু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ধ্বনির মনোহারিত্বের জন্য শিক্ষকগণ ছাত্রদের ধ্বনি-

বৈচিত্র্যময় কবিতাগুলি সুকণ্ঠে আবৃত্তি করে' শোনান। সুতরাং অসংখ্য লেখকের শিশু-কবিতারণ্যের মাঝে 'ঝিঙেফুল' কবিতার যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতম স্থান আছে তা' বলাই বাহুল্য। বহুপঠিত কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এই :

ঝিঙেফুল, ঝিঙেফুল
সবুজ পাতার দেশে
ফিরোজিয়া ঝিঙেফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙেফুল ॥
...পউষের বেলা শেষ
পরি জাফ্‌রানী বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোল মশ্‌গুল—
ঝিঙেফুল ॥
...তুমি বল—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথভুল।
ঝিঙেফুল ॥

॥ ঝিঙেফুল : ঝিঙেফুল ॥

॥ *পাঁচ* ॥

শিশু-সাহিত্যে কাজী সাহেবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হ'লো সাহিত্যের এই শাখাতেও তাঁ'র যৌবন-ধর্মের বলিষ্ঠ সুরভংগীর প্রবর্তনায়। শিশু-সাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনার রঙে রঙীন হবে,

বাস্তবতার কোন ছাপই তা'তে থাকবে না—এ হ'তেই পারে না। শিশু-সাহিত্যে শিশুর উদ্ভট অবুঝ কল্পনাকে তিনি যেমন স্থান দিয়েছেন তেমনি কঠোর বাস্তবতাকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। শিশুর ভিতরেই তিনি দেখেছেন অনাগত ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। কল্পনার উচ্ছ্বাস ফেনিল পানীয় পান করিয়ে শিশুকে অবুঝ করে' রাখা আত্মহত্যারই নামান্তর। 'বড় হ'য়ে কি হব' এই বোধ অস্পষ্টভাবে হ'লেও শিশুর সুকোমল মুক্ত প্রাণে জাগ্রত করে' দিতে হবে। শিশু-সাহিত্যে থাকবে শিশুর আত্মবোধ জাগরণ পর্বের এক বিরাট অধ্যায়। কেবল পক্ষীরাজের ডানায় চড়ে অবলীলাক্রমে সাত সাগর তের নদী পার হওয়া নয়, পার হবার জন্য সম্ভাব্য বিপদ-সংকুল আবর্তনাগুলিও তা'কে জানিয়ে দিতে হবে। আর এটা জানাবার দায়িত্ব বড়দের। শিশু-সাহিত্য তা'র মাধ্যম—শিশু-মনে ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্বোধনের স্বর্ণসেতু। নজরুল-জীবন ও সাহিত্য স্বজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রেমের সুউচ্চ রাগিণীতে ঝংকৃত। প্রবন্ধ, কবিতা ও সংগীতের ভেতর দিয়ে তিনি এই সুরের উন্মাদনাকে শতধারায় ব্যক্ত করেছেন। শিশু-সাহিত্যেও সেই দীপক রাগিণীর রেশ পড়েছে। দেশের অনাচার, অত্যাচার, পাপ পঙ্কিলতা ও হিংস্রোন্মত্ততা হ'তে বাঁচিয়ে তা'কে পুণ্যভূমিতে পরিণত করার দায়িত্ব তরুণদের। তা'ই নজরুলের শিশু-সাহিত্য সেই আহ্বান-বাণীতে সুসমৃদ্ধ।

> সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
> সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।
> আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
> আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

এই ভাল মনে ভাল হ'য়ে চলাটা, গৃহকোণে, মাতৃ-অঞ্চলে, শান্তশিষ্ট হ'য়ে থাকাটা কাজী সাহেব কোনদিনই পছন্দ করেন নি। কবির মতে, ভাল ছেলে হ'য়ে কেবলমাত্র গুরুজনের আদেশ

বৈচিত্র্যময় কবিতাগুলি সুকণ্ঠে আবৃত্তি করে' শোনান। সুতরাং অসংখ্য লেখকের শিশু-কবিতারণ্যের মাঝে 'ঝিঙেফুল' কবিতার যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতম স্থান আছে তা' বলাই বাহুল্য। বহুপঠিত কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এই :

ঝিঙেফুল, ঝিঙেফুল
সবুজ পাতার দেশে
ফিরোজিয়া ঝিঙেফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙেফুল॥
…পউষের বেলা শেষ
পরি জাফ্‌রানী বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোল মশ্‌গুল—
ঝিঙেফুল॥
…তুমি বল—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথভুল।
ঝিঙেফুল॥

॥ ঝিঙেফুল : ঝিঙেফুল ॥

॥ পাঁচ ॥

শিশু-সাহিত্যে কাজী সাহেবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হ'লো সাহিত্যের এই শাখাতেও তাঁ'র যৌবন-ধর্মের বলিষ্ঠ সুরভংগীর প্রবর্তনায়। শিশু-সাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনার রঙে রঙীন হবে,

বাস্তবতার কোন ছাপই তা'তে থাকবে না—এ হ'তেই পারে না। শিশু-সাহিত্যে শিশুর উদ্ভট অবুঝ কল্পনাকে তিনি যেমন স্থান দিয়েছেন তেমনি কঠোর বাস্তবতাকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। শিশুর ভিতরেই তিনি দেখেছেন অনাগত ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। কল্পনার উচ্ছ্বাস ফেনিল পানীয় পান করিয়ে শিশুকে অবুঝ করে' রাখা আত্মহত্যারই নামান্তর। 'বড় হ'য়ে কি হব' এই বোধ অস্পষ্টভাবে হ'লেও শিশুর সুকোমল মুক্ত প্রাণে জাগ্রত করে' দিতে হবে। শিশু-সাহিত্যে থাকবে শিশুর আত্মবোধ জাগরণ পর্বের এক বিরাট অধ্যায়। কেবল পক্ষীরাজের ডানায় চড়ে অবলীলাক্রমে সাত সাগর তের নদী পার হওয়া নয়, পার হবার জন্য সম্ভাব্য বিপদ-সংকুল আবর্তনাগুলিও তা'কে জানিয়ে দিতে হবে। আর এটা জানাবার দায়িত্ব বড়দের। শিশু-সাহিত্য তা'র মাধ্যম—শিশু-মনে ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্বোধনের স্বর্ণসেতু। নজরুল-জীবন ও সাহিত্য স্বজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রেমের সুউচ্চ রাগিণীতে ঝংকৃত। প্রবন্ধ, কবিতা ও সংগীতের ভেতর দিয়ে তিনি এই সুরের উন্মাদনাকে শতধারায় ব্যক্ত করেছেন। শিশু-সাহিত্যেও সেই দীপক রাগিণীর রেশ পড়েছে। দেশের অনাচার, অত্যাচার, পাপ পঙ্কিলতা ও হিংস্রোন্মত্ততা হ'তে বাঁচিয়ে তা'কে পুণ্যভূমিতে পরিণত করার দায়িত্ব তরুণদের। তা'ই নজরুলের শিশু-সাহিত্য সেই আহ্বান-বাণীতে সুসমৃদ্ধ।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

এই ভাল মনে ভাল হ'য়ে চলাটা, গৃহকোণে, মাতৃ-অঞ্চলে, শান্তশিষ্ট হ'য়ে থাকাটা কাজী সাহেব কোনদিনই পছন্দ করেন নি। কবির মতে, ভাল ছেলে হ'য়ে কেবলমাত্র গুরুজনের আদেশ

পালনটাই তারুণ্যের ধর্ম হওয়া উচিত নয়—এতে তরুণের চলিষ্ণুতায় ক্লীবত্ব আসে। এই ক্লীবত্বকে দূর করে' 'পুণ্যে-পাপে সুখে-দুঃখে উত্থান-পতনে' তা'দের মানুষ হওয়ার মন্ত্রই নজরুলের শিশু-সাহিত্যের আর এক দিক। 'সাত কোটি সন্তানের মুগ্ধ জননীকে' উদ্দেশ্য করে' তা'র সন্তানদের 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' করে' বিপুল কর্মময় জগতে প্রবেশ করাবার জন্যে কবিগুরুর কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, নজরুল সেই সুরেরই সার্থক উত্তরাধিকারী। তা'ই নজরুলের আহ্বান ভয়ংকরের আহ্বান। সে বাণী বিপদ-সংকুল দুর্গম ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি জমাবার মন্ত্রে আবেগ-চঞ্চল। তরুণদের উদ্দেশ্য করে' তা'ই তিনি গেয়ে উঠেছেন :

> আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত
> গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
> সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
> তাজা জীবন্ত সে নবসৃষ্টি শ্রম মহান্,
> চলমান্ বেগে প্রাণ উছল।
> রে নবযুগের স্রষ্টাদল, জোর কদম চলরে চল ॥
>
> ॥ অগ্রপথিক : জিঞ্জীর ॥

'দেখব এবার জগৎটাকে', 'মায়ামুকুর', 'মোবারকবাদ' ইত্যাদি কবিতায় কবির এই অনল-বাণী স্বর্ণাক্ষরে স্বাক্ষরিত। ভাল ছেলে হ'য়ে বদ্ধ ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকার বাণী নজরুলের নয়। প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত কবি এই ভাবের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন :

> "থাকব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
> কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণীপাকে।
> দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে
> ছুটছে তারা কেমন করে।
> কিসের নেশায় কেমন করে মরছে রে বীর লাখে লাখে
> কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।"
>
> ॥ দেখব এবার জগৎটাকে ॥

এই মরণ-যন্ত্রণাকে বরণ করে' নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার মন্ত্রই হ'লো কবির মন্ত্র, তরুণের বেদবাক্য। তরুণদের উদ্দেশ্য করে' তিনি বার বার বলেছেন :

"তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্।
করুণায় নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।"

॥ অগ্রপথিক : দ্বিতীয় ॥

তরুণদের তুহিন-কাতর নিষ্প্রাণ বদ্ধ জীবনচারণের সম্মুখে নজরুল দেখা দিলেন সূর্য-দীপ্ত বিগলিত প্রাণ-প্রবাহরূপে। এই প্রাণ-প্রবাহ, এই বলিষ্ঠ সুরের প্রবর্তনা বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

'দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতায় তুহিন মেরু পার হ'য়ে অনির্দেশ্য জগতে যাত্রা করা, হাওয়াই চড়ে চন্দ্রলোকে উধাও হওয়া কিংবা 'পাতাল ফুঁড়ে উঠে' জগৎটাকে মুঠোয় পুরে দেখার যে বীর্যবান্ রোম্যান্টিক প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরিত হয়েছে 'সাত ভাই চম্পা' কবিতায় সে প্রতিজ্ঞা অনেক বাস্তববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সাত ভাই চম্পা'র প্রথম ভাইয়ের উক্তি :

আমি হব সকাল বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি।'
সূর্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন"—মা বলবেন রেগে।

তরুণের ধর্মই তো এগিয়ে চলার ধর্ম। বসে থাকার দিন, ঘুমিয়ে থাকার দিন চলে গেছে। সম্মুখে কর্মসংকুল কঠোর বাস্তব—জেগে উঠে সেই সহস্র দুঃসাধ্য কর্মের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তরুণকে। তাই প্রথম ভাই চেয়েছে সূর্য ওঠার আগে নিজে জেগে পাহাড়চূড়ায় উঠে বিশ্ব চরাচরকে জাগাতে। পথে দেখা হবে সূর্যিমামার সঙ্গে। মিষ্টি হেসে মামা যখন খোকনের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে তখন খোকনের উত্তর :

"মামা, কথা কওয়ার সময় নাইক আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার।"
রবির আগে চলব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগবে সাগর, পাহাড়-নদী, ঘুমের ছেলে-মেয়ে।

এই জাগরণ-মন্ত্রেই হয়েছে প্রথম ভাইয়ের দীক্ষা। সাত ভাই চম্পার প্রত্যেকের সংকল্পের মাঝে একটা বিপুল এ্যাডভেঞ্চারের ভাব আছে। প্রথম ভাইয়ের সংকল্পে সেই রোম্যান্টিক এ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শ বিদ্যমান। এ ছাড়াও অত ভোরে ওঠার জন্যে মায়ের মৃদু শাসন এবং 'আলসে মেয়ে' বলে শিশুর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে মা-ছেলের স্নেহসিক্ত মনের সুকোমল অভিব্যক্তিটুকু মধুর হ'য়ে ধরা পড়েছে। এ ছবি শাশ্বতকালীন মাতৃস্নেহের মমতার রসে সিক্ত। চতুর্থ ভাইয়ের সংকল্পের মধ্যে আবিষ্কার স্পৃহা তীব্রতর হ'য়ে উঠেছে :

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর,
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
চারপাশে মোর গাং-চিলেরা করবে এসে ভিড়।
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

আর এক ভাইয়ের সংকল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবতা বোধ—নজরুল কবিমানস সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে'র দিকে তাকিয়ে তা'র সস্নেহ হৃদয়ে সকল মমতাটুকু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। প্রাণহীন এই চির-ব্যথাতুর কঙ্কালে নবীন প্রাণের সজীব স্পর্শ বুলিয়ে দিতেই তা'র আগমন :

আমি হব দিনের সহচর—
বলব, "ওরে, রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর।
খামার ভ'রে রাখব ফসল, গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেবো প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা।

।। সাত ভাই চম্পা ।।

'সাত ভাই চম্পা' কবিতাটি বাংলার শিশু-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।[৩]

কবি আদর্শবাদী। তরুণদের কেন্দ্র করে' তাঁ'র মনের দু'কূলপ্লাবী বাসনা-কামনা উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। শিশুরা ক্ষুদ্র বলে তা'রা অবহেলার নয়, অবজ্ঞারও নয়—শিশুর ক্ষুদ্র বুকেই তিনি শুনেছেন মহামানবের পদধ্বনি। তা'ই শিশুদের চিত্তকে তিনি বিরাট বিপুলের স্বপ্নের মাঝে ইশারায়িত করেছেন :

তোমরা ভাবিছ, আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি—কেহ দেখনি আজিও তোমরা নিজের দেহ।
…তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও,
নিজেরে দেখিলে—দেখিবে, তুমিই বিপুল বিরাট হও।
…দারোগা কেরানী হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,
তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে।

এবং শেষকালে তরুণদের উদ্দেশ্যে কবির সুমহান্ আশাবাদ শতধারায় ভেঙে পড়েছে :

ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডি, এই অজ্ঞান ভোলো'
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।
তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহতো মহীয়ান্
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।

॥ মায়া-মুকুর : সঞ্চয়ন ॥

নানা দিক দিয়ে "নতুন চাঁদের" অন্তর্গত 'মোবারকবাদ' কবিতাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় শিশুদের প্রতি তাঁ'র আশা

---

৩ "সাত ভাই চম্পা'র কবিতা তাঁ'র ত্রিশ বছর আগেকার চট্টগ্রাম সফরের সময় আমাদের বাড়িতে বসে লেখেন। চট্টগ্রামে নানা কবিতা রচনা করতে করতে আমাদের অনুরোধে ছোটদের কবিতা রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে অত হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তাঁ'র দিনগুলি কেটেছিল যে, চম্পা ভাইদের সকলের কথা বলে শেষ করা আর হ'য়ে ওঠে নি তাঁর।" বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদের 'শিশু-সাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। জাগরণ, চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৬ ॥

আকাঙ্ক্ষা সুন্দর রূপে বাক্‌বদ্ধ হয়েছে। কবি প্রবীণ 'কীটে খাওয়া ফুলদল', আরব্ধ কাজ তাঁ'র পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয় নি—নিজেদের ব্যর্থতার কথা তিনি কবিতার প্রথমাংশে বিবৃত করেছেন এবং শেষাংশে তিনি তারুণ্যের বিপুল সম্ভাবনাকে জয়টীকা দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন:

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্-মজ্‌লি.শ
ঝরিবার আগে হেসে চ'লে যাব,—তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মত!
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহ্‌ফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লায়ে মোরা করিনিক বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস!
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ!

শহীদি দর্জ্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলাম, জাবর কেটেছি গোলামখানায় বসি!
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে!
গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জ্জা অনেক উর্ধ্বে, জেনো,
চাপরাসীর ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো!
আল্লার কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু!
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!
আল্লারে ব'ল, "দুনিয়ায় যারা বড়, তার মত কর,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিও না, তুমি শুধু হাত ধর!"
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে ক'রো না কারেও ভয়
দেখিবে—অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ংকর সে নয়!

আল্লারে ভালবাসিলে তিনিও ভালবাসিবেন, দে'খো!
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লারে ধ'রে থেকো!

খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচায় বুলবুল!
গোলামের ফুলদানিতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়!
যে ছেলে-মেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে
তাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদী কহে!
তারাই আনিবে জগতে আবার নূতন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ!
শুধু আর্শের আতরদানিতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই!

সেই মুকুলেরা এস মহফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত।

॥ মোবারকবাদ : নতুন চাঁদ ॥

তরুণদের সম্পর্কে এই বলিষ্ঠ মনোভংগী শিশু-কাব্যে নজরুলের এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁ'র বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীর মত শিশু-কাব্যেও এই নতুনতর দিক প্রবর্তনায় বাংলার শিশু-সাহিত্যে তাঁ'র নাম অনলাক্ষরে স্বাক্ষরিত।

## ॥ কবি নজরুল ॥

### ॥ এক ॥

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের সাড়ম্বর আবির্ভাব কি একেবারে আকস্মিক? সমকালীন দেশকালের রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা বাদ দিলেও সাহিত্যাঙ্গনে কি এর কোন প্রস্তুতি ছিল না? 'বিদ্রোহী'র অসীম ব্যাপ্ত কল্লোলমুখর গর্জন কি তবে একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে? অন্ততঃ সমালোচকের কণ্ঠে আমরা সে কথাই শুনেছি। এমন কি মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত তো সেকালে স্পষ্ট ভাষায় তাঁ'র মুগ্ধ মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন: "আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে নামেন নাই।…নজরুল ইস্‌লাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নতুন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর তা'ই। তাহাতে পালিশ বেশি নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।…কাজী নজরুল ইস্‌লাম নতুন যুগের কবি।"

নজরুলের আবেগদীপ্ত সচকিত উচ্চকণ্ঠ শুনে তাঁ'কে আকস্মিক ভাবা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু দেশকালের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং সমকালীন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির পটভূমিতে বিচার করলে এ মন্তব্যকে একদেশদর্শী মনে হবে।

প্রথমে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার কথাই ধরা যাক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষ তথা নিখিল বিশ্বে বিরাট একটা জিজ্ঞাসার যুগ রূপে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। এ যুগ গণবিপ্লব এবং সমস্যা-সংকটে দ্বন্দ্বমুখর। শত প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে কোটি মানুষের মনে আবর্তিত হয়েছে। তা'ই আধুনিক ইংরেজ সমা-

লোচক এই যুগকে (১৯০০-১৯২০) "Age of Interrogation" আখ্যায় ভূষিত করে' ঔচিত্যবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশের পূর্বেই বিশ্বধ্বংসী প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সে আঘাত প্রচণ্ড বিপর্যয় এনেছে। দ্বন্দ্ব ও সমস্যা-সংকুল জীবনের নব মূল্যায়ন শুরু হয়েছে তখন থেকেই। এই আঘাত ও বিপর্যয়, দ্বন্দ্ব ও সমস্যা কবি একান্ত গভীর ভাবে অনুভব করেছেন; এদের সকল চিহ্ন তাঁ'র জীবনাচরণে সুপরিস্ফুট। কবি নিজেই ছিলেন এই বিশ্বযুদ্ধের একজন সেনানী—কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার। ফলে বিশ্বধ্বংসী মহাসমরের জান্তব রূপ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অকল্যাণকর ফলশ্রুতি তিনি একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম বিশ্ব সমরের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণ মূর্তি মানুষের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত ছিল কিন্তু যুদ্ধের পরমুহূর্ত হ'তেই তা'র নিষ্ঠুর পাশবিক হিংস্রতা দেখে মানব-সমাজ হতবাক্ হ'য়ে গেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার আগ্নেয়াস্ত্র নিখিল বিশ্বে যেন আগুন ধরিয়েছে। কেবল জীবহত্যাই নয়, কেবল লক্ষ যুগের গড়া সভ্যতাকে পদদলিত করাই নয়—মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, নৈতিক মহামারী ও মানবতার অসম্মান প্রভৃতি তো মহাসমরেরই অবদান। এই মহাসমরের দিকে তাকিয়ে মানুষ বুঝল পৃথিবীতে জীবনের মূল্য কমে গেছে—মৃত্যুর আয়োজন অনেক—অনেক গুণ বেড়েছে, ধ্বংসের আয়োজনে বিজ্ঞানের অশুভ বুদ্ধি উন্মত্ত। মহাসমরের দাবাগ্নিতে নিখিল বিশ্ব যখন বহ্নিমান, ভারতের রাজনৈতিক আকাশের কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের বুকেও যেন দাবানলের রক্তিম ছাপ পড়েছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হ'তেই এ আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। তখনও মুসলিম লীগের জন্ম হয় নি—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সলিমউল্লার নেতৃত্বে এর উৎপত্তি। কিন্তু তখনো রাজনৈতিক অধিকার অপেক্ষা ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই লীগের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে বিলম্ব হলো না।

লীগের বলিষ্ঠতম কণ্ঠ হ'তে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের কথা জলদমন্দ্রে বিঘোষিত হ'লো। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এল স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি কিন্তু তখনো আপামর মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উদয় হয় নি। কংগ্রেস যখন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপ্ত ও পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছে—মুসলিম জনগণ তখন প্রায় কিছুটা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে প্রথম মহাসমরের জটিল পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে' নিখিল ভারতে গড়ে উঠল খিলাফৎ আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অপূর্ব অভ্যুদয় ঘটল এবং ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব হ'লো অনল-আখরে স্বাক্ষরিত। মুসলিম জনগণের মনোভাব যখন ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হ'য়ে উঠছিল তখন গান্ধীজীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে নিখিল ভারতবর্ষব্যাপী দেখা দিল অপূর্ব গণবিপ্লব। ব্রিটিশের চণ্ডনীতিতে ইন্ধন জোগাল কুখ্যাত রাউলট আইন। গান্ধীজীর আকুল আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের বন্ধনে এক মোহনায় মিলিত হ'লো। ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলন দেখা দিল মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা হ'য়ে। হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন যুক্ত হ'য়ে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের বুনিয়াদ রচনা করল। এ সবের উপরেও ছিল 'চরম দল' সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ। ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন, যতীন দাস নিখিল ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে একে একে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেলেন। মৃত্যুর করাল গ্রাসের মধ্য থেকেও তাঁ'দের সদর্প প্রত্যয়নিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা গেল—চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার। এইভাবে সমগ্র দেশের আবহাওয়ায় যখন বিদ্রোহের অনলপ্রবাহ প্রধূমিত, যখন দেশের মাটিতে ও মানুষের মনে প্রচণ্ড বিদ্রোহের কল্লোল গান কম্পমান—সেই মহালগ্নের পুণ্য ঊষায় বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে বিদ্রোহী কবি নজরুলের আবির্ভাব। এই বিপ্লববাদ, এই সন্ত্রাসবাদ, স্বাধীনতাকামী জনগণের এই আশা

আকাঙ্ক্ষা, মেহনতী জনগণের এই আকুতি সকল কিছুই নজরুল সাহিত্যে মুক্তির পাখা মেলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজরুল-সাহিত্যের যা' কিছু স্বাতন্ত্র্য, যা' কিছু নতুনতর বৈশিষ্ট্য তা'র বীজ সমকালীন দেশের মাটিতে উপ্ত ছিল।

কেবল দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়—সাহিত্যক্ষেত্রেও একটি বিদ্রোহের সুর ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠেছিল। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে বিদ্রোহ হুংকার প্রধূমিত হ'য়ে উঠেছিল সমকালীন সাহিত্যের পৃষ্ঠায় শোনা গিয়েছে তা'রই বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনি। সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের প্রথম সাড়ম্বর আবির্ভাব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তা'র পূর্বেই বিদ্রোহাত্মক সুরে কবিতা লিখেছেন কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), ছন্দযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৩), দেহবাদী কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), অতুলপ্রসাদ সেন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে নাটকের কথাও বিশেষরূপে স্মরণীয়। এ সময়ে ঐতিহাসিক নাটকের বহ্নি-বীণায় যাঁ'রা পরাধীন জাতির সম্মোহিত ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছেন তা'দের মধ্যে গিরীশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১১ ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৯-১৯২৭), প্রমুখের নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যে দাবানলের স্ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হয়েছিল—বিদ্রোহ-বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনে তা'দের মূল্যও বড় কম ছিল না। এ প্রসঙ্গে বার বার যাঁ'দের নাম মনে পড়ে তাঁ'রা হলেন 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, 'যুগান্তরে'র সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। আর এ সকলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নজরুল-সাহিত্যের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নজরুলের বহু পূর্বেই

কবিতায় মেহনতী জনগণের কথা তথা বলিষ্ঠ সাম্যবাদের আমদানি করেছিলেন। শ্রমিক, মজুর, কৃষক ইত্যাদির গ্লানিকর জীবনযাত্রার জন্য দত্তকবির সহানুভূতি নিঃসীম আবেগে উৎসারিত। তাঁ'র বহু কবিতার মূল সুর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। অরুগ্ন বলিষ্ঠ জীবনবাদ তাঁ'র বহুতর কবিতাকে মহিমান্বিত করেছে। যে যৌবনাবেগ নজরুলের কবিতায় ঝলমলিয়ে উঠেছে তা'র উৎসভূমি সত্যেন্দ্রনাথে। বাংলা কবিতায় ফারসী শব্দের ব্যবহার এবং ইংরাজী রোমান্সের আমদানি যা' নজরুলের বহুতর কবিতাকে সুন্দর করেছে তা'র প্রথম প্রবর্তনা দেখি সত্যেন্দ্রনাথে। নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যে দত্তকবির বেদনাবোধ বিভিন্ন কবিতায় অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠেছে :

> কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?
> কেবা ক্ষুণ্ণ কেবা বিষণ্ণ অন্যায় কারাগারে ?

এ সকল লক্ষ্য করেই নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র যথার্থ উত্তর-সাধক নজরুল। তবে নজরুল কাব্যের সমাজ ও কাল-সচেতনতা অধিকতর ব্যাপক ও দ্যুতিমান। সত্যেন্দ্র-কাব্যে যা' কেবল ইশারা-ইঙ্গিতে ব্যক্ত—নজরুল-কাব্যে তা' নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যকে অতিক্রম করে' জাতির মর্মমূল স্পর্শ করেছে।

দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ এলেন ভিন্ন স্রোতে গা এলিয়ে। ঠিক অলস রসে আবেশ বশে তাঁ'র কবিতা এলায়িত হ'য়ে যায় নি। তাঁ'র কাব্যধারার নতুন সুর, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রদীপ্ত ঘোষণা সমকালীন কাব্য-রীতিতে একটি প্রবল ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হ'য়ে আছে। বঞ্চিত ও সর্বহারার বেদনায় তাঁ'র নিখিল মনপ্রাণ উদ্বেলিত। বেদনার গরল-নির্যাস পান করেই তিনি হয়েছেন দুঃখবাদী কবি। তাঁ'র এ দুঃখবাদের মূল কারণ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব বিদ্রোহ ঘোষণা। নজরুল-কাব্যের মূল সুর—সাধারণ নির্যাতিত অপমানিত মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা—যেন বেশ কিছু পূর্বেই যতীন্দ্র-কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে :

অট্টালিকার উপরে থাকিতে তাহাদের
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষের ভাই !

এ কবিতা পড়লেই মনে হবে এ নজরুলের কণ্ঠ। প্রথম মহাসমর ও ইংরাজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার যুগপৎ আমাদের জাতীয় জীবনে যে ভাঙনের সূচনা করেছিল—যতীন্দ্র-কাব্যে বিভিন্ন ভাবে তা' আত্মপ্রকাশ করেছে।

কাব্যক্ষেত্রে মোহিতলালের সঙ্গেও নজরুলের সুর-সাধনার কিছু কিছু সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যে সংশয় যতীন্দ্রনাথকে পেয়েছিল তাঁ'র সংক্রমণ মোহিতলালেও প্রত্যক্ষ করা গেছে। এবং সে সংশয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে প্রেমের ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথের অমর্ত চেতনা ও দেহাতীত রোম্যান্টিক প্রেম-প্রণয়কে মোহিতলাল কোনদিন স্বীকার করে' নিতে পারেন নি। এবং পারেন নি বলেই তিনি হলেন দেহবাদী কবি। তিনি অমর্ত প্রেম-চেতনায় সদর্প আঘাত হেনে ঘোষণা করলেন: "দেহই অমৃত ঘট, আত্মা শুধু ফেন অভিমান।" এ এক ধরনের বিদ্রোহ-বাণী। লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত দেহকে কেন্দ্র করেই তাঁ'র মানবিক প্রেম আবর্তিত। নজরুলের প্রেমধারণায় দেহই প্রধান। সুতরাং এখানে উভয় কবির কণ্ঠ একই সুরে কম্পমান।

আধুনিক সাহিত্যে যে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী ভাষণ ও সংস্কারমুখীন সত্যকথনের ছাপ পড়েছে—মোহিতলালের কাব্যেই বোধ হয় তা'র সর্বপ্রথম সূচনা। অচিন্ত্যকুমার তা'ই ঠিকই বলেছেন: "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয় যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁ'র কাছে থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা ও সংস্কারসাহিত্য তা' আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁ'র কবিতায়।"

বঙ্গ-সাহিত্যাঙ্গনে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে নাটকে এবং সংবাদপত্রে যে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে উঠেছিল তা'র বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবুও সকল দিক বিবেচনা করে' এ কথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নজরুলের আবির্ভাবের বেশ কিছু পূর্বেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এবং সাহিত্য-কাব্য-সংগীতে একটি স্থির লক্ষ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আমূল পরিবর্তনের পূর্বাভাস সর্বত্রই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। লৌকিক জীবনবোধ, সংস্কারমুখীনতা, প্রচলিত রীতি-নীতি, ক্রমপরিবর্তনশীল দৃষ্টিভংগীর প্রসারতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সে পরিবর্তন-চিহ্ন অনেক ব্যাপক এবং গভীর বলেই মনে হয়েছিল। তা'ই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের সাড়ম্বর আবির্ভাবকে একেবারে ধূমকেতুর মত আকস্মিক বলা যায় না এবং তা' যুক্তিসঙ্গতও নয়। একেবারে মরা গাঙে বান ডাকে নি—গাঙে জোয়ারের স্পন্দন পূর্বেই দেখা দিয়েছিল—সেই জোয়ারের উপর উন্মত্ত কূলপ্লাবী বন্যার মতই নজরুলের আবির্ভাব। এবং সে বন্যার উন্মত্ততায় শোনা গিয়েছে অসীমব্যাপ্ত সমুদ্র-কল্লোল। তা'ই সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ তাঁ'র প্রদীপ্ত সম্ভাবনাময় আবির্ভাবকে একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আবির্ভাব একটা প্রবল ব্যতিক্রম নয়, আকস্মিক তো নয়ই—তিনি যুগমানসের প্রতীক, সমকালীন যুগের মানস-সন্তান।

॥ দুই ॥

তবুও বাংলা সাহিত্যের সুকোমল অভিব্যক্তিতে নজরুলের সাড়ম্বর আবির্ভাব একটা প্রবল ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে। তিনি যে যুগেরই সন্তান এবং যুগ-প্রয়োজনেই উদ্ভূত—এ কথা তাঁ'র চকিত-চমকিত বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ প্রলয়ঙ্কারী কবিতাবলী পাঠ

করতে করতে অতি সতর্ক সমালোচকও ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হবেন। মনে হবে তিনি যুগের সৃষ্টি নন—বরং সমগ্র যুগটাই তাঁকে কেন্দ্র করে' আবর্তিত হয়েছে। এ অসাধ্য সাধিত হয়েছে তাঁর সপ্তগ্রামস্পর্শী প্রচণ্ড সুর-সংযোজনায়। সমকালীন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া, সাহিত্যিক পটভূমিকার কথা ধরে নিলেও "বিদ্রোহী"র সুর-ঝংকারে এমনই একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যা'র ভাবপরিমণ্ডল ও গাম্ভীর্যকে কোনক্রমেই অনায়াসভংগীতে অতিক্রম করা যায় না। সকল সুরকে চাপা দিয়ে, সকল কণ্ঠকে অতিক্রম করে' "বিদ্রোহী"র গর্জন-মাধুর্য কর্ণগোচর হবেই। এবং এ জন্যেই সমকালীন যুগে কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরও বুঝি ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে গিয়েছিল। নজরুল হলেন অত্যন্ত চড়া সুরের কবি। পূর্বের আলোচনা হ'তে আমরা জেনেছি সমকালীন সাহিত্যে একটি বিদ্রোহের সুর ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে মেহনতি জনগণের কথা উচ্চারিত হয়েছে, দেহবাদী মোহিতলাল এবং দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সে মন্তব্য আরো তীক্ষ্ণধার হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে' অসি চালনার মত দুঃসাহস কেউ অর্জন করেন নি। সেই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করলেন নজরুল। তিনি কেবল সরব বিদ্রোহ ঘোষণায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অসি ধারণই করলেন না—স্বয়ং বিধাতা পুরুষের বুকে হাতুড়ি ঠোকা এবং পদাঘাত হানার দুর্জয় শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে উঠলেন। বিদ্রোহের এই মহান্ বিপ্লবাত্মক সুর তখন সমকালীন অন্যান্য কবিদের স্বপ্নেরও বাইরে। এখানেই নিহিত রয়েছে একাধারে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক সুরের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এই চড়া সুরের জন্যই নজরুল তাঁ'র যুগের সর্বাপেক্ষা বহু পঠিত, বহু আলোচিত, বহু নিন্দিত এবং বহু প্রশংসিত কবি।

সাধারণতঃ পাঠক সমাজে নজরুল সম্পর্কে একটি ধারণা এই প্রচলিত আছে যে তিনি কেবল অত্যাচারী শাসক ও শোষক

শ্রেণীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। তাঁ'র বিদ্রোহ মূলতঃ বর্বর ইংরেজ-সরকারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। বহু দিক এবং কৌণিকতা থেকে নজরুলের বিদ্রোহ সূচিত হয়েছে। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির যেখানে যত গোঁজামিল, ভাঙা-জোড়াতালি, অনাচার, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করেছেন, বন্ধনহীন নজরুলের সরব কণ্ঠ সেখানেই গর্জন করে' উঠেছে :

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ্ রহো!

সুতরাং নজরুলের বিদ্রোহ ঘোষণা একমুখী নয়—বহুমুখীন। তবে এইটুকু স্বীকার করে' নেওয়া যেতে পারে যে প্রথম জীবনে কবির কণ্ঠ রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই নিনাদ করে' ফিরেছে। নজরুলের বিদ্রোহ চেতনায় আর একটি জিনিস বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। তাঁ'র বিদ্রোহ ভাঙাচোরা সকল কিছুর মূলে রয়েছে এক অপরিসীম মানবিকতা বোধ। বলা যেতে পারে মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই তাঁ'কে বিদ্রোহী করে' তুলেছিল। উদার মানবিকতার পূজারীই বিদ্রোহী নজরুল। নজরুলের বিদ্রোহ ও মানবিকতার সাধনা তাই সমসূত্রে গ্রথিত। নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সঙ্গেই কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং এই অনুভবের মূলে রয়েছে তাঁ'র অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ এবং অপরিসীম বেদনাবোধ। সুতরাং কবির বিদ্রোহের আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে—বিশ্বজনীন সুস্থ সবল মানবিকতা প্রতিষ্ঠার পূজা। এই সাধনার আশ্চর্য ফসল তাঁ'র "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" কাব্য দু'টি। এই কাব্য দু'টির বিদ্রোহাত্মক সকল কবিতার মধ্যে মুক্ত মানবিকতার সোল্লাস জয়-ঘোষণা অনলাক্ষরে স্বাক্ষরিত। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির'—এ তো নিখিল বিশ্বের পরাজিত মানবাত্মার মুক্তি-মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মন্ত্র মানুষকে মানুষের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্নেয় শপথ।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সম্পর্কে অনেকে এমন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে এ বিদ্রোহ ঘোষণা উদ্দেশ্যহীন খেপামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিদ্রোহের কোন চিরন্তন ফলশ্রুতি নেই—আছে চিৎকার। বলা বাহুল্য এ মন্তব্য ভ্রান্ত। কবির বহু পঠিত "বিদ্রোহী" কবিতায় তাঁর বিদ্রোহাত্মক মনোভংগীর গন্তব্যপথ নির্দেশ রয়েছে :

"আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে পাতালে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

উদ্দেশ্যহীন বিদ্রোহ যে পাগলামির নামান্তর এ কথা নজরুল উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। তাঁ'র বিদ্রোহ কেবল ভাঙার জন্যই নয়—সে ভাঙার পিছনে রয়েছে নতুন গড়ার সংকল্প। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানের এক পত্রোত্তরে ১৩৩৪ সালের পৌষে এক পত্রে নজরুল তাঁ'র বিদ্রোহের স্বরূপ আলোচনা করে' লেখেন, "গড়ে তুলতে হ'লে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করি নে। নতুন করে' গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নতুন করে' গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কার প্রয়াসী হ'য়ে ভাঙতে আসে নি, ওদের কাছে নতুন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্যে। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের— পূর্ণতম স্রষ্টার।"

ভাঙার পিছনে গড়ার মহান্ সংকল্প রয়েছে বলেই নজরুলের বিদ্রোহ

শেলীর Prometheus-এর মহাবিদ্রোহ অপেক্ষাও মহান্। কেননা Prometheus-এর মহাবিদ্রোহ রচনা কেবল বিদ্রোহের জন্য, কেবল ভাঙার জন্য—তা'র পিছনে বশ্যতা স্বীকারের কোনো ইঙ্গিত নেই, গঠনের কোনো সংকল্প নেই। Prometheus-এর বশ্যতাহীন ভাঙার মধ্যে বিদ্রোহের চরম রূপ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তা'র কোনো কল্যাণকর ফলশ্রুতি নেই। কিন্তু নজরুল-বিদ্রোহের ফলশ্রুতির দিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। এ জন্যেই জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে ধূলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে সৌন্দর্যদীপ্ত নতুন তাজমহল রচনার সংকল্প করেছেন : "আমরা গড়িব নতুন করিয়া ধূলায় তাজমহল।" ইংরেজ শাসনে তৎকালীন ভারতবাসীর যে চেহারা দাঁড়িয়েছিল তাঁ'র প্রতিবাদে বিদ্রোহী না হ'য়ে উপায় ছিল না। কেবল ইংরেজ কেন—নিখিল বিশ্বের বুর্জোয়া সমাজ মানুষের ন্যায্য অধিকার হ'তে বঞ্চিত করে' মানুষকে যে ঘৃণ্যরূপে দাঁড় করায় তা'র প্রতিবাদেই চাই 'ধূমকেতুর' বিদ্রোহ। নজরুলের বহু কবিতায় এ বিদ্রোহের ছায়াপাত ঘটেছে :

(আজ) চারিদিক হ'তে ধনিক-বণিক শোষণকারীর জাত
(ও ভাই) জোঁকের মত শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
(মোর) বুকের কাছে মরছে খোকা নাইক' আমায় হাত।
(আজ) সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল্।
(আজ) জাগোরে কৃষাণ, সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়
(এই) ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।

॥ কৃষাণের গান : সর্বহারা ॥

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি' নজরুলের আত্মকাহিনী। এ কবিতায় কবি তাঁ'র জীবনকথা বলে গেছেন। কবিতাটির প্রথমেই একটি তরল পরিহাসের সুর লক্ষ্য করা যায় কিন্তু শেষাংশে যেন ক্রন্দন ফেনিল এক ক্ষুব্ধ প্রাণের আগুন জ্বলে উঠেছে :

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ !

॥ আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা ॥

কবিতাটির শেষের দিকে একটি করুণ ক্রন্দনের সুর কবির কণ্ঠে মিশেছিল—কিন্তু সে কান্না অকস্মাৎ যেন আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠেছে। এই সুর স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য-কৌণিকতা রচিত হয়েছে। "দুই বিঘা জমি" রবীন্দ্রনাথের একটি অতি পরিচিত কবিতা। এ কবিতাটি এক কৃষকের আত্ম-কাহিনী। আত্মকাহিনীর শেষাংশে কৃষক জমিদারের সম্মুখে কেঁদে ফেলেছে—কিন্তু সে কান্না কেবল কান্নাই; তা'তে নীরব অন্তর্দহন ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় নি। কৃষকমনের সকল বিদ্রোহাত্মক মনোভংগী কেবল দু' ফোঁটা চোখের জলে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। এ বিদ্রোহ এক শান্ত শীতল আত্মচেতনায় অবদমিত। কিন্তু নজরুলের কান্না বিসুভিয়াসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত অগ্নিবর্ষী হ'য়ে উঠেছে। তাঁ'র ক্রন্দন শোষিত মজলুম জনগণের নিত্যকালীন প্রতিবাদ হ'য়ে রইলো।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি নজরুলের বিদ্রোহের মাঝে রয়েছে মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ। এক কথায় তাঁ'র বিদ্রোহ মানবিকতার জয়গানে মুখর। 'ফরিয়াদ' কবিতার শেষাংশে উদার মানবিকতার জয়গান ভাবীকালের সুমহান্ উজ্জ্বল স্বপ্ন রচনা করেছেন:

মহা-মানবের মহা-বেদনায় আজি মহা উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত। নারী-পুরুষের অধিকার যে সমান এ কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও কোথাও স্বপ্নের মত মনে হবে। নজরুলের বলিষ্ঠ কণ্ঠ এখানেও গর্জন করে' উঠেছে।

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।

॥ বারাঙ্গনা : সাম্যবাদী ॥

এ তর্কাতীত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক পুরুষকেই নাকখত খেতে হবে।

মুসলমান সমাজে নারীর অধিকার হরণ চৌর্যবৃত্তির সামিল হ'য়ে উঠেছে। পর্দাপ্রথার নামে অবরোধ প্রথায় তা'দের টুঁটি চেপে শ্বাসরোধ করে' হত্যা করার এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে এ সমাজে। নজরুল তাঁ'র বহু কবিতায় এ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই।৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে কবি বলেন, "আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ-প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ীর বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যে ভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে।...ইঁহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইঁহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মারোগগ্রস্তা জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদীরও এই সব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।...ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না—সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে—নারী। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।"

ধর্মের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ভণ্ডামি রয়েছে তা'র বিরুদ্ধে তো নজরুল এক রকম জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আমরা হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মাঝে সংকীর্ণতার গণ্ডি তুলে তাঁকে যে ভাবে সভ্য মানব সমাজের অনুপযুক্ত করে' তুলেছি নজরুলের বিদ্রোহ সেখানে। নজরুলের বিচার-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-পরিশীলিত মন ধর্মের এই সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। তিনি ধর্মের মাঝেও আদর্শ মানবিকতার বিকাশকে দেখতে চেয়েছেন। যে ধর্ম বা যে বিধি-বিধান আদর্শ মানুষ হ'য়ে ওঠার পথরোধ করে নজরুল তা' বরদাস্ত করেন না। তাঁ'র বলিষ্ঠ কণ্ঠ সেখানে গর্জনমুখর হ'য়ে ওঠে: "বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।" "সাম্যবাদী" কাব্যগ্রন্থের 'মানুষ' কবিতায় নজরুলের ধর্মবোধ অত্যুজ্জ্বল ভাবালোকে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। যে ধর্ম, যে মসজিদ, যে মন্দির মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে' তাকে বর্বর করে' তোলে নজরুলের সকল কিছু অভিযোগ তা'র বিরুদ্ধে। এই অপবিত্র আলয়ের ধ্বংসের জন্য তিনি কঠোর-নির্মম মুক্ত-প্রাণ মানুষকে আহ্বান করেছেন:

> কোথা চেঙ্গিস গজ্‌নী মামুদ কোথায় কালাপাহাড়
> ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।
> খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা
> সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা—হাতুড়ি শাবল চালা।
> হায়রে ভজনালয়—
> তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
>
> ।। মানুষ : সাম্যবাদী ।।

হিন্দুদের প্রহসনিক জাত বিচারকে লক্ষ্য করে' কবি যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন, তেমনি, মুসলিমদের ভূয়া ধর্ম-গৌরবকে অবলম্বন করে' লিখেছেন বহুসংখ্যক বিদ্রোহমূলক কবিতা। সকল কবিতা ও গাথার লক্ষ্য ঐ এক—মানুষকে মানুষের

আসনে বসাতে হবে, মানুষকে অসম্মান করে' কোনো ধর্ম বড় হ'তে পারে না—কেন না মানুষের জন্যই ধর্ম এসেছে, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। তা'ই কবি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান্।" ঠিক একই কারণে তিনি সমাজ-নিন্দিত বারাঙ্গনাকে মাতৃ সম্বোধন করে' তা'র ভিতর যে নারীত্ব এবং মাতৃত্ব আছে তা'কেই সম্মান দেখিয়েছেন।

আমার তো মনে হয় নজরুলের বিদ্রোহবাদের মূলে ঐ একটি শক্তিই কাজ করেছে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য সর্বত্রই তিনি নিখিল বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর মানবিকতার আদর্শ প্রকাশকে দেখতে চেয়েছেন—যেখানে তা' পান নি সেখানেই তাঁ'র বিদ্রোহ। তাঁ'র মাঝে ছিল এক প্রচণ্ড অহমিকাবোধ। এবং এজন্যই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছেন : "আমি, আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।" বলা বাহুল্য এ অহমিকাবোধ অহংকার নয়—এর উৎপত্তি তাঁ'র প্রত্যয়োজ্জ্বল বিশ্বজনীন মানবিকতার বোধ থেকেই, যা'র পরিণতি বিদ্রোহে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে' আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করব। নজরুলের বিদ্রোহবাদকে অনেকেই নেতিবাচক বলেছেন। বলা বাহুল্য এ মতবাদ ঠিক নয়। প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেই যে তা' নেতিবাচক হবে এমন মতবাদের পিছনে কোন দর্শন-সমর্থিত যুক্তি নেই। বাংলা সাহিত্যে নেতিবাদের সর্বোত্তম উদাহরণ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। বর্তমান গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নেতিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং এখানে সে আলোচনা বাহুল্য। নজরুলের বিদ্রোহ তো নতুনতর কিছু না, এমন কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করাও তা'র উদ্দেশ্য নয়—ঈশ্বরকে স্বীকার করে' নিয়ে যা' চিরন্তন সত্য তা'রই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই হ'লো নজরুলের বিদ্রোহবাদের ফলশ্রুতি। কয়েক স্থানে নজরুল প্রকাশ্য-রূপে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন বলে মনে হবে—কিন্তু একটু লক্ষ্য

করলেই দেখা যাবে এ অস্বীকারের পিছনে রয়েছে একটি প্রবল অভিমান। দুরন্ত শিশুর মায়ের ওপর যে অভিমান—সেই অভিমান। পক্ষান্তরে বহুস্থানেই দেখা যাবে কবি ভগবানের কাছে পশুশক্তির বিরুদ্ধে সর্বধ্বংসী সংগ্রামের জন্য শক্তি ভিক্ষা করেছেন। সুতরাং নজরুলের বিদ্রোহবাদ আস্তিক্যবোধক। প্রবল ঔচিত্য-বোধ হ'তেই নজরুলের বিদ্রোহের জন্ম। চিরন্তন সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেই তাঁ'র সর্বশক্তি নিয়োজিত। ইতিবাচক কল্যাণবোধই নজরুল-বিদ্রোহের সূতিকাগার।

॥ *তিন* ॥

বাংলা সাহিত্য প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে আশ্চর্যরূপে বলিষ্ঠ। বাংলাদেশের সুকোমল আবহাওয়া, এর ধর্ম, এর দর্শন সকল কিছুই বাঙালী কবিদের প্রেমের কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফসল 'চর্যার' কবিদের হাতেই বুঝি এর প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকারদের সযত্ন লালনে প্রেমকাব্যের শৈশব দেহে এসেছে কৈশোরত্ব এবং প্রায় তা'রই সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কবিকুলের অত্যাশ্চর্য লিপিকুশলতায় দু'কূলপ্লাবী প্রেমের বন্যায় অকস্মাৎ কৈশোরত্ব ছাপিয়ে এ শ্রেণীর কাব্যের সারা দেহ ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে নবযৌবনোদ্গমের প্রবল বেগ। তারপর বহু শতাব্দী ব্যাপী অসংখ্য বৈষ্ণব কবি প্রেমকাব্যের তন্বী দেহে তিল তিল লাবণ্য-সৌকুমার্য দান করে' তা'কে রৌদ্রপিচ্ছিল নিটোল যৌবনা করে' তুলেছেন। এর উপর পড়েছে যৌবন-স্বপ্নের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথের সঞ্জীবন-স্পর্শ। এক রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়েই এই শ্রেণীর কাব্য বিশ্বের সর্বদেশের সর্বকালের প্রেমকাব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার দুর্জয় সাহস অর্জন করেছে। মোটকথা রবীন্দ্রনাথই এই শ্রেণীর কাব্যকে চরম উৎকর্ষতার উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিয়েছেন। বহু শতাব্দী ব্যাপী প্রেমকাব্যের এই বিপুল উৎকর্ষণার মধ্যেও বলিষ্ঠ

যৌবনবাদী কবি নজরুলের প্রেমকবিতার একটি সরব বর্ণাঢ্য চিত্র-গরিমা অতি অসতর্ক পাঠকেরও চোখে পড়বে। নজরুলের প্রেম-কবিতা যৌবনের উজ্জ্বল স্বপ্নে বিভোর, তা'র মৌলপ্রেরণা বন্ধনহীন তারুণ্যের আর রস কূলপ্লাবী উল্লাসের। ফলে এ কবিতার প্রত্যয় নির্ভীক, আস্বাদ নতুনতর। বিদ্রোহাত্মক কবিতার মত নজরুলের প্রেমের কবিতাতেও আছে এক বলিষ্ঠ চেতনাপ্রবাহ। উদ্দাম তারুণ্য আর বন্ধনহীন যৌবনই এ সকল কবিতার গতিপথকে আশ্চর্য সরসতা দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রেমকাব্যের উজ্জ্বল সমারোহের কথা আমরা গর্বভরে উল্লেখ করেছি এবং তা'র উৎসমূল হিসেবে বৈষ্ণবকাব্যের কথা বলেছি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে নিটোল মানবীয় প্রেম সেখানে অনুপস্থিত। ধর্ম এবং বৈষ্ণবীয় দর্শনের চাপে সে প্রেম মূলতঃ কৃষ্ণেন্দ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই সে প্রেমের সঞ্চারণভূমি গড়ে উঠেছে। এ প্রেমের মূল-প্রবাহ প্রসঙ্গতঃ মানবীয় প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও এর গতিবিধি স্বর্গাভিমুখী। তবে বৈষ্ণবকাব্যের যে মূল সুর Romantic melancholy তা' বাংলা সাহিত্যের মানবীয় প্রেমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মঙ্গলকাব্যের সূচনা থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে যে মানবীয় প্রেমের চিত্র পেয়েছি তা' কমবেশি সর্বত্র হয় অতিস্থূল অথবা অশ্লীল। মধুসূদনের কাব্যগাথায় যে মানবীয় প্রেমের চিত্র রয়েছে তা' রাজকীয়। সর্বপ্রথম কিছুটা সার্থক মানবীয় প্রেমের চিত্র পাওয়া গেছে বিহারীলালের কাব্যে। কিন্তু বিহারীলালের প্রেম-ধারণায় 'তাজা প্রেমের' ফল্গু-প্রবাহ নেই—একটি বিরহ-ম্লান বিষণ্ণ সুর প্রথম হ'তেই তাঁ'র কাব্যে ক্রমোচ্চ হ'য়ে উঠেছে। এই 'রোম্যান্টিক মেলানকলি'কে কাটিয়ে উঠে তিনি তাঁ'র প্রেম-ধারণাকে একান্ত মানবীয় করে' তুলতে পারেন নি। প্রিয়-প্রিয়ার মাঝে বিরহের গর্জনমুখর নদীপ্রবাহ—মিলন সেখানে 'দূর অস্ত' :

মাঝেতে উথলে নদী দু'পারে দু'জন—
চক্রবাক্ চক্রবাকী দু'পারে দু'জন!

এই বিরহ-ভাবনার মাঝে বিহারীলালের প্রেম-চিন্তার পূর্ণ পরিণতি। এ প্রেমের মাঝে তবুও হয়তো একটা দৈহিক সম্পর্ক অনুমান করা যেতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এলেন শুচি-শুভ্র রোম্যাণ্টিক মেলানকলির পূর্ণ পরিণতি সঙ্গে নিয়ে। দৈহিক মিলনে তিনি তাঁ'র প্রেম-সৌন্দর্যকে কলুষিত ও ম্লান করতে চান নি। কামনা-বাসনার পদতলে এ প্রেম কোনদিন নতশির হয় নি। রবীন্দ্রনাথ অনাসক্ত যৌবনের পূজারী, তা'ই তাঁ'র প্রেম ভোগবিমুখ। তাঁ'র প্রথমদিকের 'কড়ি ও কোমল'-এর কিছু কবিতায় বিহ্বল যৌবনোত্তাপের স্পর্শ পাওয়া গেলেও অনতিবিলম্বে তিনি এ দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠলেন। তিনি সংশয়হীন জীবনবোধের উপর দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন: 'নিভাও বাসনা-বহ্নি নয়নের জলে।' উর্ধ্বমুখী কমলের মত দৈহিক সম্পর্কের উপরে উঠে তাঁ'র প্রেম এক উর্ধ্বায়ন-দর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছে। কামহীন এ প্রেম বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চার এবং অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠতম লীলা-সহচর হ'য়ে উঠেছে। 'অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হ'তে এ প্রেমের জন্ম, 'কোটি প্রেমিকের মাঝে' তা'র লালন এবং কাল থেকে কালাতীতে, সীমা থেকে অসীমের দিকে তা'র গতি। মিলন-বিরহের তীরভূমি অতিক্রম করে' এ প্রেম বিপুল বিশ্বানুভূতির সঙ্গে এক হ'য়ে মিশেছে। বিহারীলালে যে রোম্যাণ্টিক মেলানকলির সূচনা রবীন্দ্রনাথে তা'র পূর্ণতম পরিণতি। বলাই বাহুল্য এ প্রেম মিলনের সীমাহীন উচ্ছ্বাসে কম্পমান নয়—অশ্রুমুখী শকুন্তলার হৃদয়-বেদনায় অশ্রু-নিটোল। রবীন্দ্রনাথের এ প্রেম-চিন্তায় নভোচারী দর্শন থাকলেও সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে' গেল না। কেবল মিলন নয়, কেবল বিরহ না,—মিলন-বিরহের দ্বৈত সত্তায় যে প্রেমোত্তাপের সৃষ্টি সাধারণ মানুষের চিত্তভূমির লালন ও পুষ্টি তা'তেই হয়েছে। তা' ছাড়াও মহাযুদ্ধের নির্মম অর্থনৈতিক ও

সমাজনৈতিক আঘাতের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রেম নিয়ে বিলাসিতার দিন চলে গেল, প্রেম সম্পর্কে তা'দের স্থূল দৃষ্টিভংগী অধিকতর বাস্তবমুখীন হ'য়ে উঠল। ফলে নৈর্ব্যক্তিক বা অমর্ত্ত প্রেমচেতনার স্থলে দেখা দিল ভোগসর্বস্ব প্রেমের বিকাশ। ফলে আর দেহকে বাদ দিয়ে নয়, অঙ্গই অমৃতঘটের স্থান অধিকার করল। এবং এই তরঙ্গে গা ভাসিয়ে এলেন ভোগবাদী দেহপূজারী মোহিতলাল। ভোগকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করে' নিয়ে তিনি নির্ভীক কণ্ঠে দেহের স্তুতি গাইলেন: "দেহই অমৃতঘট আত্মা শুধু কেন অভিমান।" অবশ্য ভোগবাদী মোহিতলালের পূর্বেই দেহবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হ'লেও এর অঙ্কুর দেখা গিয়েছে গোবিন্দচন্দ্র দাস ও দেবেন সেনের কবিতায়। অবশ্য দেবেন সেন অপেক্ষা গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় অঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠেছে:

> আমি তা'রে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ
> আমি ও নারীর রূপ,
> আমি ও মাংসের স্তূপ
> কামনার কমনীয় কেলি কালিদহ……
> আমি তা'রে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।

এই ভোগসর্বস্ব দেহবাদের সাথে মোহিতলালের প্রেম-চেতনার একটি পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। যখন তিনি লেখেন:

> ত্যাগ নহে ভোগ,—ভোগ তা'রি লাগি যেই জন বলীয়ান,
> নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ!

তখন একটি দেহ-সর্বস্ব আকৃতিই প্রধান হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এরই পাশে যখন শুনি:

> আমার পিরীতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত,
> ভস্মভূষণ কামের কুহকে দেখা দিল স্মরজিৎ!
> ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
> লাখো লাখো যুগ আঁখি জুড়াল না—
> দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সংগীত।
>
> ॥ স্মরগরল : স্মরগরল ॥

তখন এ দেহবাদকে দার্শনিকচাপের গুরুভারে পিষ্ট বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মোহিতলালের দেহবাদ উলঙ্গ যৌনকামনায় নিঃশেষিত নয়—দেহকে অতিক্রম করে' দেহাতীতের ব্যঞ্জনায় সুসমৃদ্ধ। তারুণ্যের উন্মাদনা অপেক্ষা দার্শনিকের ভাবগম্ভীরতা মোহিতলালের কবিতাকে অনেক সংযত করেছে, তা'ই এঁর কবিতার একটা 'মেটাফিজিক্যাল' দিকও আছে। মোহিত-নজরুলের সমসাময়িক কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলিও আবেগনির্ভর নয়। উচ্ছ্বাসহীন হৃদয়বেদনা ও স্মৃতিচারণায় এ সকল কবিতা বিষণ্ণ। রবীন্দ্রনাথের বহুতর প্রেমকবিতার মত যতীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিও স্মৃতি আশ্রয়ী—স্মৃতির চর্বণার জন্যে এ সকল কবিতা যৌবনোত্তাপ হারিয়ে তুহিনকাতর হ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু নজরুলের প্রেমকবিতায় এই কাতরতা বা শিথিলতা নেই। প্রথম যৌবনের তরুণসুলভ উন্মাদনা ও হৃদয়ার্তিক উল্লাসে তাঁ'র কবিতাগুলি অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। জড়তা বা স্থবিরতার এতটুকু চিহ্ন সেখানে নেই। উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে আবেগকম্পিত কবিতাগুলির মূল সুর মানবীয় প্রেম। প্রেমের মধ্যেই নজরুলের প্রেমকবিতা উন্নতশীর্ষ। মানবীয় প্রেমের কোন দর্শন বা আধ্যাত্মচেতনা টেনে এনে তিনি তা'কে স্থবির বা নভোচারী করে' তোলেন নি। তাঁ'র প্রেমের কবিতা প্রেমেরই কবিতা। বিশুদ্ধ মানবীয় রসই তাঁ'র সকল কবিতার মূলীভূত শক্তি। ফলে এ সকল কবিতা রবীন্দ্রসুলভ অমর্তচেতনায় অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ রায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "নজরুলের প্রেমানুভূতির পূর্ণতা প্রেমেই, আর একটি বৃহত্তর ব্যাখ্যায় তিনি প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করতে চান নি। মানবীয় কামনাকে বিচিত্র রেখাঙ্কনে ও লীলা-ভংগীতে সুন্দর করে' ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুলের প্রেমের কবিতায় প্রেমের লীলাবৈচিত্র্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। হৃদয়ের অলক্ষিতে যে রক্তবর্ণ প্রবাল জগৎ গড়ে উঠেছে, তা'র ওপরে পড়েছে মহুয়া-মদির গন্ধখচিত কামনালোকের স্বপ্নছায়া। নজরুলের প্রেমের

কবিতায় 'ভাঁটার টান' নেই, ক্লান্তি ও অবসন্নতা তাঁ'র উচ্ছল যৌবন স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি—একটি প্রবল ও সহজ স্পষ্টতা তাঁ'র কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছে।"

নজরুলের প্রেমের কবিতায় আর একটি জিনিস বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়। নজরুলের পঞ্চ ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেমে স্মৃতিচারণা নেই। রবীন্দ্রনাথ পূরবী, মহুয়াতে বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সায়াম কাব্যগ্রন্থে স্মৃতি আশ্রয়ী প্রেমের যে চর্বণা করেছেন নজরুলের কাব্যে তা' অনুপস্থিত। এ সকল কাব্যে কবিদ্বয় যেন আবেগচঞ্চল প্রথম যৌবনকে অস্বীকার করে' অনাসক্ত দ্বিতীয় যৌবনের পূজা করেছেন। কিন্তু নজরুলের কাব্যে এই দ্বিতীয় যৌবন নেই। দ্বিতীয় যৌবনের ভাঁটার টান নয়—প্রথম যৌবনের লীলাচাপল্য ও ক্লান্তিহীন গতিবেগই তাঁ'র কাব্যে নবযৌবনের স্বপ্নাতুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে। যে বন্ধনহীন তারুণ্য তাঁ'কে বিদ্রোহী করে' তুলেছিল—সেই চিরদুরন্ত, দুর্মদ তারুণ্যই তাঁ'র প্রেমকবিতায় মূলীভূত শক্তি। এরই বলে তিনি বাঁধাধরা চিরায়িত পথ হ'তে কিছুটা বিচ্যুত হ'য়ে অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাণীবন্দনায় বাংলার প্রেমকবিতার ক্ষেত্রকে দূরসঞ্চারী করে' দিতে পেরেছেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যে রোম্যান্টিক মেলানকলির একচ্ছত্র আধিপত্য দেখেছি এবং যা'র জন্যে এই পরিচিত 'গৃহবাস' তাঁ'দের কাছে 'পরবাস' বলে মনে হয়েছে—সেই বিষণ্ণতার চিহ্ন নজরুলের কবিতায় বড় একটা নেই। কোনো কোনো কবিতায় বিষণ্ণ কণ্ঠের ক্ষীণ সুরালাপন শোনা গেলেও তা' একান্ত বিরহের গুঞ্জরন ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এ বিরহ কোনো বৃহত্তর অর্থে প্রযুক্ত হয় নি—নর-নারীর দেহগত প্রেমের মিলনের বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রেমানুভূতিই নজরুল-কাব্যের মৌলি-প্রবাহ। কি বিদ্রোহাত্মক কবিতা, কি গজল গান, কি সংগীত সর্বত্রই নজরুলের প্রেমচেতনার শুভ্রকোমল স্বরূপটি সহজেই চোখে পড়বে। অনেক কবিতা আছে

যেগুলি কোনো দিক দিয়েই প্রেমের কবিতা নয় অথচ উপমা, ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প ইত্যাদির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে কবিতাটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রেমের কবিতার সমগোত্রীয় হ'য়ে উঠেছে। নজরুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বিদ্রোহী" কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কবিতাটি প্রেমের কবিতা নয়—"অগ্নিবীণা"র আগুনে তপ্ত। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বন্ধনহীন উদ্দাম উন্মত্ত দুর্মদ প্রাণপ্রবাহের সাথে তরুণ কবির যৌবনস্বপ্ন মদিরবিহ্বল হ'য়ে উঠেছে। উর্মিমুখর গর্জনশীল বিদ্রোহের বহ্নিগাত্রে স্বর্ণলতিকার মত শেফালি-শুভ্র প্রেমচেতনা জড়িয়ে জড়িয়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে :

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।

এ চিত্র বিদ্রোহের অগ্নিবীণায় যৌবন-স্বপ্নের সুকোমল অভিব্যক্তি। এর পরও বিদ্রোহের তাণ্ডব নর্তনের মাঝে যখন কবিকে বলতে শুনি 'আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি' 'আমি চপল মেয়ের ভালবাসা' 'তা'র কাঁকন-চুড়ির কনকন' তখন মনে হয় তিনি যেন প্রথম যৌবনের উদ্দাম প্রেমস্বপ্নে নেশাতুর হ'য়ে পড়েছেন। নজরুল-কাব্যে এ ধরনের অসংখ্য কবিতা আছে যেগুলি প্রেমের কবিতা না হ'লেও কেবল চিত্রসম্পদে প্রেমের স্বপ্নাবেগে মদির হ'য়ে উঠেছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া' এবং 'চক্রবাক্'। এবং এ গ্রন্থগুলির মধ্যে আবার 'দোলনচাঁপা'র অবদান ও গুরুত্ব সর্বাধিক। 'দোলন-চাঁপা' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা'র বজ্রহুংকারের পরই যেন 'দোলনচাঁপা'র শুভ্র স্নিগ্ধ আবির্ভাব। 'অগ্নিবীণা'য় বিদ্রোহ, 'দোলনচাঁপা'য় প্রেমানুভূতি ; প্রখর রৌদ্রতপ্ত দিবসের শেষে যেন জ্যোৎস্নালোকিত সুকোমল সন্ধ্যার প্রাণোচ্ছল আবির্ভাব। রবীন্দ্র-কাব্যে বার বার যে পটপরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল নজরুল-কাব্যে

ক্ষণিকের জন্য হ'লেও সে পরিবর্তনের সূচনা সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে 'দোলনচাঁপা'য়। তা'ই এ গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এ ছাড়াও গ্রন্থটি নজরুলের যৌবনস্বপ্ন ও প্রেমচেতনার শ্রেষ্ঠতম ফলশ্রুতি।

আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বার বার উল্লেখ করেছি কবির প্রেমচেতনা বিশুদ্ধ মানবীয়। তা'ই কোন নারীকে তিনি দেবীর মর্যাদা দেন নি আবার তা'র অমর্যাদাও করেন নি বরং মানুষ হিসেবে তার যা' পাওনা তাই দিয়েছেন—হয়তো কিছু বেশীই দিয়েছেন :

> চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
> তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে !
> উর্দ্ধে তোমার—তুমি দেবী
> কি হবে মোর সে রূপ সেবি
> চাহি না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
> একটু দুঃখে অভিমানে নয়ন টলমল।
>
> ।। এ মোর অহংকার : চক্রবাক্ ।।

প্রিয়াই কবিকে সুন্দর ও কবি করে' তুলেছেন। প্রিয়ার চোখে প্রিয়ের যে রূপ ধরা পড়ে তা' অন্যত্র বিরল। বাঞ্ছিত জনের এই বিশেষ দৃষ্টিভংগীর দিকে লক্ষ্য রেখেই বুঝি সেক্সপীয়র বলেছেন : Beauty is lover's gift. মানসী সে তো দর্পণ—তা'র বাসনা-লোকে আপনার প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। নজরুলের কাব্যে এর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনেছি :

> তুমি আমায় ভালবাস তা'ই তো আমি কবি।
> আমার এরূপ সে যে তোমার ভালবাসার ছবি ॥
>
> ।। কবি রাণী : ছায়ানট ।।

'পূজারিনী' কবিতাটি নজরুলের প্রেমকাব্যের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে তাঁ'র প্রেম-সম্পর্কীয় চিন্তা-ভাবনা বিধৃত হ'য়ে আছে। বিহারীলালের 'সারদা', রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' এবং শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ানে'র মত নজরুলের 'পূজারিনী' কবিতাটি

বিদ্রোহী কবির প্রেমচেতনার মহাভাষ্য হ'য়ে উঠেছে। কবির আরো কিন্তু কবিতার মত এই মহান্ কবিতাটি ব্যক্তিতন্ত্রতা (Individualism), বস্তুতন্ত্রতা (Realism), স্বভাবতন্ত্রতা (Naturalism) এবং বিশ্বতন্ত্রতার (Humanism) সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এই একটি কবিতায় কবির অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবোধ বিশ্ববিথারী হ'য়ে উঠেছে। 'গৃহের বনিতা'ই এখানে 'বিশ্বের কবিতা'—ক্ষুদ্র হ'তে মহতের উপলব্ধি, সীমা অসীমের দিকে ধাবিত। কবির চিন্তা-ভাবনা কবিতাটির দীর্ঘ বিসর্পিত ছন্দদোলায় অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। নারী সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্য যেমন আছে তেমনি আছে শ্রদ্ধাবোধ। নারীর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে জর্জরিত কবি তিক্ত কণ্ঠে বলেছেন :

> নারী নাহি হ'তে চায় শুধু একা কারো,
> এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
> ইহাদের অতিলোভী মন
> একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
> যাচে বহু জন।
>
> ॥ পূজারিনী : দোলনচাঁপা ॥

এই কবিতাটি সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে এতে কবির প্রেমচেতনার কোনো সুস্পষ্ট পরিণতি নেই, আছে তিক্ত কণ্ঠ পুরুষের কিছু বিচ্ছিন্ন সুন্দর উক্তি। কিন্তু আমার মনে হয় এই উক্তিগুলি লক্ষ্য ক'রে গেলে নজরুল-মানসের সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠবে। এই দীর্ঘ কবিতায় তাঁ'র অভিজ্ঞতালব্ধ মিলন-বিরহের এবং প্রেমচেতনার যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা' তাঁ'র অন্য কবিতায় অনুপস্থিত। জন্ম-জন্মান্তরের সূত্র ধরে কবি প্রেমের (কবি-মানসীর) ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে :

> চিনি তোমা বারে বারে জীবনের অস্ত-ঘাটে মরণ-বেলায়,
> তারপর চেনা শেষে
> তুমি-হারা পরদেশে
> ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায়।
>
> ॥ ঐ ॥

ছলনাময়ী নারী সম্পর্কে আমরা কবির উক্তি উদ্ধৃত করেছি। সেই নারী সম্পর্কে ঐ একই কবিতায় তিনি ভক্তমনের পূজা নিবেদন করেছেন :

যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি, চিনি, চিনি!

। ঐ ॥

কিন্তু প্রগল্‌ভা ছলনাময়ী নারীর ব্যবহারে কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন :

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ,
আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!

॥ ঐ ॥

কবির এই তিক্ত মনোভাবের মূলে রয়েছে নারীর ছলনা আর আপনার অনন্ত প্রেম-পিপাসা :

আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অগস্ত তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম মাগে সিন্ধু আর!
ভগবান! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণাহরা
প্রেম-সিন্ধু অনাদি পাথার!

॥ ঐ ॥

এ তো কেবল কবির উক্তি নয়—যৌবন-বেদনায় বিরহ-কাতর সকল পুরুষেরই উক্তি। ভাবের সামঞ্জস্যের জন্য 'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাটি এই সঙ্গে পঠিতব্য। এ কবিতাটিতেও কবির অনন্ত

যৌবন-পিপাসা রঙে রেখায় বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠেছে। কবির বাসনাক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়ই যেন ঊর্মিমুখর গর্জনশীল সমুদ্র। কবির প্রিয়া নারী, সমুদ্রের প্রিয়া চাঁদ। এই চিন্তাকে কেন্দ্র করে' আপন অশান্ত হৃদয়ের সকল মান অভিমান অভিযোগগুলি সমুদ্রের ওপর অর্পণ করেছেন :

ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ ওকি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ওকি রাগ ? ওকি অনুরাগ ?
॥ সিন্ধু-হিন্দোল ॥

'অ-নামিকা' কবিতাটি কবির মানবীয় প্রেমের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজনা। কবিতাটি সেকালে 'নূতন কামসংহিতা' বিশেষণে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ কবিতায় কবির প্রেম-চেতনা কোনো এক নির্দিষ্ট নারীতে সীমাবদ্ধ নয়—'একটি প্রেমের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমের স্মৃতি সেখানে মিশেছে। শুধু উদগ্র কামনাই নয়, এক অশরীরী বাসনার ভীরু লাবণ্যও যেন কবিতাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।' "প্রাচীন সাহিত্যে"র 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কবিগুরু যে স্বকীয় চিন্তার অবতারণা করেছেন আলোচ্য কবিতাটির সাথে তা'র ভাবসমধর্মিতা বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। স্বকীয় চিন্তা-ভাবনায় তপ্ত কবিতাটির কয়েকটি স্মরণীয় পংক্তি এই :

উদ্বেলিত বুক মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা উদগ্র-কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে না-পাওয়ার করি আরাধনা।
যা' কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা' কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি !—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে !
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে প্রকাশ গোপন।
॥ অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল ॥

প্রিয়ার কাছে বিদ্রোহী কবির আত্মসমর্পণের ভংগীটি বড় সুন্দর। 'দোলনচাঁপা'র অনেকগুলি কবিতায় এই নিবেদনের স্বরূপ ধরা পড়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার অল্প কিছুকাল পরে লেখা কবিতা 'বিজয়িনী' অথচ ভাবাদর্শের দিক থেকে উভয় কবিতায় কি দুস্তর ব্যবধান :

হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার মানা-হার পরাই তোমার কেশে।

॥ বিজয়িনী : দোলনচাঁপা ॥

'সমর্পণ' কবিতায় এই আত্মনিবেদনের পর্বটি অধিকতর মনোরম :

প্রিয়! এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগল ভালো,
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো সেই নয়নের জলে।
আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
শুধু তুমি মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥

॥ সমর্পণ : দোলনচাঁপা ॥

কিন্তু এই আত্মসমর্পণের মধ্যে যে মিলনের সুর রয়েছে সে সুরই আবার কোনো কোনো কবিতায় বিরহ-বেদনায় তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কবির এই মিলন আবেশ যখন নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ভেঙে পড়ে তখন তিনি যেন অভিশাপোন্মত্ত হ'য়ে ওঠেন। এবং সে অভিশাপ ছলনাময়ী নারীর নিজের হাতেরই গড়া। 'অভিশাপ' কবিতাটির মধ্যে কবির বিরহ-কাতর মনের অনবদ্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে :

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে!…
আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছোঁয়া রাত্রি,
থাকবে সবাই—থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রী!…
ঋতুর পরে ফিরবে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু!
চাইবে কেঁদে নীল নভো গায়
আমার মতন চোখ ভরে চায়
যে তারা, তায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

॥ অভিশাপ : দোলন-চাঁপা ॥

এ কবিতাটিতে একটি অভিমানক্ষুব্ধ প্রেমিকের কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ রোম্যান্টিকতার আবেশে স্বপ্নঘন হ'য়ে উঠেছে। ভালভাবে আস্বাদন করলে কবিতাটির মধ্যে সকল হতাশ রোম্যান্টিক প্রেমিকের হৃদয়ার্তির বিষণ্ণ গুঞ্জরন শোনা যাবে। নিম্নের স্তবকটি উত্তমরূপে আস্বাদন করুন :

আবার যেদিন শিউলি ফুলে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে ফুল—গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন—
কাঁদবে কুটির অঙ্গন!
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে, উঠবে কাঁদি!
বুকের মালা করবে জ্বালা
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

॥ ঐ ॥

কম-বেশি সকল কবি-সাহিত্যিকই রোম্যান্টিক কিন্তু এই রোম্যান্টিকতায় তর-তমের পার্থক্য আছে। নজরুলের ক্ষেত্রে এই রোম্যান্টিক উদ্দাম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। রোম্যান্টিকতাকে

বাদ দিয়ে নজরুলের কল্পনা করা চলে না। উদার নীলিমার সাথে চাঁদের যে সম্পর্ক অথবা যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তরঙ্গের সাথে নদীর—রোম্যান্টিকতার সাথে নজরুলের সম্পর্ক তা'ই।

নজরুলের কবিতা যেন রোম্যান্টিকতার স্নিগ্ধ জলাশয়ে ফুটে উঠা সুকোমল ভীরু কোরক। প্রেমের কবিতাতেও এই রোম্যান্টিকতা অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে উদ্দাম রোম্যান্টিকতায় ভর করে' কবি অসীমলোকে উধাও হ'তে চেয়েছেন, Eternal verities বা অনন্ত রূপদর্শনের অভিসারে কবি বহুস্থানেই সার্থক হ'তে পেরেছেন :

ওগো বাদলের পরী।
যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী!
ওগো ও কাজল মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে!

॥ বর্ষা-বিদায় : চক্রবাক্ ॥

ওগো ও কর্ণফুলী!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
'সাম্পান'-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে!
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী?

॥ কর্ণফুলী : চক্রবাক্ ॥

ঘোমটা পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা।...
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা॥

॥ সন্ধ্যাতারা : ছায়ানট ॥

মোর প্রিয়া হবে, এসো রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল।
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস সারির দুলানো মালিকা
বিজলী-জরীন ফিতায় বাঁধিব
মেঘ রং এলোচুল ॥
॥ বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড ॥

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে
খুশীর রঙে করবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যবে গরব ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।
॥ এ মোর অহংকার : চক্রবাক ॥

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে একথা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে নজরুলের প্রেমের কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনা একটি বড় অংশ গ্রহণ করেছে। উদ্দাম রোম্যান্টিকতা আর প্রকৃতির বিশাল পটভূমি এই উভয়ই তাঁ'র কবিতাকে মহিমান্বিত করে' তুলেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে একটি বড় অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায় এবং তা' এই যে এ সকল কবিতায় কবি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ ও ঘোষণাতৎপর। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে নজরুল অত্যন্ত চড়া সুরের কবি, যেটি তিনি উপলব্ধি করেন সেটির সোল্লাস জয়-ঘোষণা তাঁ'র প্রাণধর্ম। কিন্তু এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি উচ্ছ্বাসহীন এবং সংযত। উপলব্ধির নিবিড়তায় সেগুলি মেঘপুঞ্জের বুকে প্রতিফলিত শেষ

দিনালোকটুকুর স্থায় মনোরম বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠেছে। এ সকল কবিতায় সংযম এবং প্রকৃতি চিত্রণ উভয় জিনিসই লক্ষণীয় :

বর্ষা ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের-বনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি আমার চাতকী!

।। চোখের চাতক ।।

পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয় পদ্মা নিয়ে যা যারে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে।…
ও পদ্মারে ঢেউ-এ তো ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ কালো
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস তারে দিয়া সে পদ্ম তার পায়
বলিস্ কেন বুকে আমার দেয়ালী জ্বালিয়ে—
নেমে গেল চির অন্ধকারে।।

।। বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড ।।

আমার গহীন জলের নদী
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি।…
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই, ভাঙলে কেন মন
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি।।

।। চোখের চাতক ।।

তুমি এমন ক'রে গো বারে বারে জল-ছলছল-চোখে চেয়ো না
জল-ছলছল-চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না॥
॥ দোলনচাঁপা ॥

পিয়াল বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই
বলতে, 'আমি ওমনি চাই!'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ
হিজল শাখায় ডাকত পাখী—"বউ গো কথা কউ!"

নজরুল কাব্যধারার পূর্ণ পরিণতি পাওয়া গেল না—অকালে তাঁ'র কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে। শেষদিকে তিনি ভক্তিবাদ ও অধ্যাত্ম চেতনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং বিদ্রোহবাদ বিদায় নিয়েছিল। প্রেমের কবিতাতেও উদ্দাম দেহকামনা শান্ত হ'য়ে উঠেছিল, বৈশাখী দিনের তপ্ত উন্মাদনা শ্রাবণের শান্ত বারিধারায় স্বপ্নঘন হ'য়ে উঠেছে—নিম্নের কবিতা দু'টি লক্ষ্য করলে এই নতুনতর সুরালাপন শোনা যাবে:

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে না'চে নটবর
ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম।

অথবা:

আজ চোখের জ.ল প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
এমনি কাটে আসছে-জনম তোমায় ভালবেসে।
এমনি আদর, এমনি হেলা,
মান অভিমান এমনি খেলা
এমনি ব্যথায় বিদায় বেলা
এমনি চুমু হেসে,
যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।
॥ শেষ প্রার্থনা : দোলনচাঁপা

নজরুলের প্রেমচেতনার পূর্ণ পরিণতি পাওয়া না গেলেও এ কথা অনুমান করা যায় এক অনির্দেশ্য অসীমের দিকে তাঁ'র কবিতা বাঁক নিচ্ছিল। কিন্তু নিয়তি কি নিষ্ঠুর!

নজরুল সম্পর্কে সার কথা এই যে বিদ্রোহ সত্তা ও প্রেমচেতনা এই উভয়বিধ আপাত বিরোধী গুণের সমন্বয়ে তাঁ'র কবিমানস পূর্ণ। একদিকে আছে সিংহনাদ, অন্যদিকে কুহুতান ; 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী', 'আর হাতে রণতূর্য'। কঠোর-কোমলের আশ্চর্য সমন্বয়ে নজরুল বাংলা সাহিত্যের আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

## ॥ কয়েকটি ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ ॥

### ॥ এক ॥

প্রবন্ধ দুই জাতের। এক শ্রেণীর প্রবন্ধ বিষয়মুখীন—তথ্য ও তত্ত্বই সেখানে বড় কথা আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যা আত্মকেন্দ্রিক—কবিমানসের নিভৃত আলাপ-চারণায় যা'র কোমল বক্ষ লাবণ্য-শ্রীতে ঝলকিত। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ সকল প্রবন্ধের গতি একমুখ নিয়ন্ত্রী। প্রাণ এবং ভংগী কোনটাই এখানে প্রাধান্য লাভ করে নি—একটি নীরস বিষয়কে তথ্য ও তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধের লক্ষ্য। সুতরাং এই সকল প্রবন্ধের সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধাবলীতে প্রধান হ'য়ে উঠেছে রসমণ্ডিত সাহিত্যিক আমেজ। এ সকল প্রবন্ধের ঐতিহাসিক, দার্শনিক মূল্য থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সে মূল্য নিতান্ত গৌণ, নেপথ্যলোক হ'তে মূল প্রবন্ধের যাত্রাপথে তা' কিঞ্চিৎ আলোক দান করছে মাত্র, আসলে মূল প্রবন্ধটি গড়ে ওঠে লেখকের ব্যক্তিমানসের খেয়ালখুশীর নম্র-মধুর আল্পনায়, সকল বিষয় এবং বস্তুকে পিছনে ফেলে, সকল তথ্য ও তত্ত্বকে অতিক্রম করে' সাহিত্যের রসলোকে পদসঞ্চারের মধ্যেই তা'র পরিসমাপ্তি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধই রসরচনার (Literary Essay) অন্তর্গত। সাহিত্য-আমেজ এবং রসধ্বনিই এখানে প্রধান।

সুপ্রাচীন কাল হ'তে বাংলা সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভিতর দিয়ে আপনার বিকাশধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, গদ্য সম্প্রতিকালের সৃষ্টি, অধিকতর সম্প্রতিকালের সৃষ্টি এই রসরচনা। উনিশ শতকের

শেষপাদে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই আমরা সর্বপ্রথম এই ধরনের সৃষ্টির সাথে পরিচিত হয়েছি। ইতিপূর্বে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তা' কৈশোর হ'তে যৌবনাভিসারী। এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ খ্যাত-কীর্তি গদ্য-শিল্পীগণও সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত কিন্তু রসরচনার সাথে তখনো আমাদের কোনো পরিচয় ঘটে নি। অবশেষে এই অভাব দূর হ'লো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতেই। অবশ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের রচনাগুলিতে কাজের কথাই বেশি কিন্তু শেষ বয়সের রচনা "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থটি "বাজে কথা"য় রসমণ্ডিত। গ্রন্থখানিতে কল্পনা-মূলক স্বাধীন চিন্তাধারার সাথে সাহিত্যরসের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। 'পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা যদি জয়লাভ করতো তা' হ'লে স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের রূপ কেমন হ'তো, তা'রই একটি গৌরবোজ্জ্বল চিত্র সরল সুললিত ভাষায় 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের' পৃষ্ঠায় রেখাঙ্কিত। আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি গ্রন্থাবলীতেও সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মন এবং প্রাণ বিধৃত। পরাজিত বাঙালী ইংরাজ-সাহচর্যে কী ভাবে উপকৃত হ'তে পারে, কোন্ শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লে নারী গৃহলক্ষ্মী হ'তে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁ'র প্রবন্ধের বিষয়। এই চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধাবলীতেও সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় সুপরিস্ফুট। এঁ'র প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কথোপকথন রীতির সংযোজনা। এই রীতিতে অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত হওয়ায় লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একটি সরল সহজ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে।

রসরচনার ধারাবাহিকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁ'র রচনারীতি সাধু ও কথ্যভাষার সংমিশ্রণে গঠিত—এই মিশ্র প্রয়োগে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়েছে কিন্তু রসসৃষ্টিতে তা' ফলদায়ী। কালীপ্রসন্নের রচনার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গরসের

প্রবর্তনা। অবশ্য এই ব্যঙ্গরস একেবারে গ্রাম্য রসিকতার পর্যায়ে নেমে না এলেও রচনায় এই রসের বাড়াবাড়ি পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে। রসরচনায় ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়েরও সামান্য কৃতিত্ব আছে। অসংখ্য ছোট প্রহসন ও নক্‌সা রচনার মধ্যে তাঁ'র সে কৃতিত্ব বিধৃত।

এর পর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মত রসরচনার ক্ষীণ ধারায় আপন অফুরন্ত প্রাণাবেগ মিশিয়ে তা'কে সাবলীল এবং উদ্দাম করে' দূর মোহনার পথে সঞ্চারিত করে' দিয়েছেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই আমরা সর্বপ্রথম সার্থক এবং সৌন্দর্য-সুষম রসরচনা পেলাম। 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই দুই অম্লান সৃষ্টিতে তিনি অমর হ'য়ে আছেন। এই দুই খ্যাত গ্রন্থে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ আছে যেগুলির বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। তবুও সেই ক্ষীণ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে' লেখক কল্পনার এমন স্বর্ণজাল বিস্তার করেছেন যা' সমগ্র প্রবন্ধটিকে দুষ্প্রাপ্য-মনোহর করে' তুলেছে। এ সকল প্রবন্ধে বিষয়বস্তু একটি ক্ষীণ অবলম্বন মাত্র—আসল উদ্দেশ্য কল্পনার সৌন্দর্য-সৌধে লেখকের মানসাভিসার। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অহিফেনসেবী কমলাকান্ত নেশার ঘোরে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এমন হালকাভাবে কথাবার্তা শুরু করেছেন যা' একান্ত-ভাবে হাস্যকর—এই হাস্যরস পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ তিনি জীবনদর্শনের এমন এক গভীর তত্ত্বকথার মধ্যে এসে থেমেছেন যেখানে আমাদের সমুদয় জাগ্রতবুদ্ধি ও বিবেচনা স্তম্ভিত এবং মূক হ'য়ে যায়। যে কমলাকান্তের প্রতি উপহাস প্রকাশ করে' একসময় আমরা হেসে উঠেছিলুম—সেই হাসিই ফিরে এসে আমাদের সর্বাঙ্গে কালিমা লেপন করে। লোকরহস্য এবং কমলাকান্তের দপ্তরে যে রচনারীতি গ্রহণ করা হয়েছে ইংরাজীতে তা'কে familiar Essay বলা চলে। এ সমস্ত রচনায় পাঠক এবং লেখকের মাঝখানের দূরত্ব

অবলুপ্ত হয়—গভীর আন্তরিকতায় উভয়ে এক হ'য়ে মেশে। পাঠকের হৃদয়ের কোমল ভাবটা এ সকল রচনায় প্রতিবিম্বিত। হাস্যরস পরিবেশনে এবং লেখক পাঠকের মাঝে এই অদ্বৈত সম্পর্ক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা অপূর্ব—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও এই ধরনের রচনা বিরলদৃষ্ট।

রসরচনার ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যানহীন ভ্রমণ-কাহিনীও যে কাব্য-উপন্যাসের মত অনবদ্য হ'তে পারে "পালামৌ" তা'র সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পালামৌ-এ কোন গভীর রসসিক্ত আখ্যানভাগ না থাকলেও পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যে সরল মন্তব্য করেছেন তা' এই গ্রন্থখানিকে রসরচনার অপূর্ব গৌরব দান করেছে। গভীর হৃদয়োল্লাস এবং রসানুভূতিই যে সঞ্জীববাবুর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে নির্মল ও গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আপাততুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে অনুবীক্ষণিক লক্ষ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের মত গভীর রসবোধ ও সহানুভূতি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন বাঙালী সাহিত্যিকের লেখায় পাই নাই।" নীরস পাষাণের বুক হ'তে রস শোষণ করে' অশ্বত্থ বৃক্ষ বেঁচে আছে বলে সঞ্জীববাবু যে মন্তব্য করেছেন তা' তাঁ'র নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনিও পাঠকের নীরস প্রাণে রসের অফুরন্ত ধারা সঞ্চারিত করে' দিতে সমর্থ হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী সময়ে অসংখ্য প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু রসরচনাকার হিসেবে তেমন কেউ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি—বিশেষ করে' বঙ্কিমের রচনারীতি এবং প্রতিভার পাশে তাঁ'দের বৈশিষ্ট্য যেন ম্লান তবুও রসরচনার ধারা যাঁ'রা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তাঁ'দের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং জগদীশ বসুর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের রচনারীতি আবেগবহুল কথ্যভাষার উপর

প্রতিষ্ঠিত। সাধু এবং চলতি ভাষার মধ্যে যে বিরোধ চলছিল স্বামীজির রচনায় তা' অনেকখানি মীমাংসার পথে অগ্রসর। হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছ্বাসের সাথে রচনার ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি মিশ্রিত হ'য়ে যে আবেগ-কম্পিত ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা' সহজে হৃদয়ে রেখাপাত করে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী এই আবেগ-আলোড়নের স্তর অতিক্রম করেই রসরচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় কাজের কথাই বেশি—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জটিল তত্ত্বগুলিই তাঁ'র প্রবন্ধের বিষয়। সুতরাং বিষয়-বিবেচনায় এঁর প্রবন্ধে বস্তু, তথ্য, তত্ত্ব উচ্চ হয়েছে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কোন কোন ক্ষেত্রে যে তা' হয় নি তা'ও বলা চলে না, তথাপি আন্তরিকতার গুণে রচনায় যে হৃদয়স্পর্শ লেগেছে তা'তেই তাঁ'র প্রবন্ধ রসরচনার এলাকায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রশ্নোত্তরের ছলে জটিল বিষয়ের অবতারণা, কথোপকথনের ভংগীতে গম্ভীর কথাকে সরল করা, হাস্যরসের পরিবেশনে সকল জটিল তর্কজালকে ছিন্ন করার পদ্ধতি রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় অভিনব দীপ্তি দান করেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশ গুপ্ত এঁদের রচনায় যদি কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তা' গভীর আন্তরিকতা—নইলে এঁদের রচনা গুরুগম্ভীর, রসরচনার নম্রকোমল পথ অপেক্ষা মননশীল প্রবন্ধের দৃঢ়-কঠিন পথে এসব রচনার যাতায়াত বেশি।

এর পর বাংলা সাহিত্যে রসরচনার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ—রসরচনাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই জাতের যে প্রতিভা কেবল শিখর-শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে না—শিখরের আড়ালে অন্যান্য প্রতিভাকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে' দেয়। রসরচনাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ শিল্পী হওয়া তো দূরের কথা তাঁ'র প্রতিভার প্রান্তভূমি স্পর্শ করার মত যোগ্যতা আজ পর্যন্ত কেউই অর্জন করেন নি। তাঁ'র রচনার বিষয় এবং প্রকাশ, প্রাণ এবং ভংগী রাধাকৃষ্ণের মত অদ্বৈত সম্পর্কযুক্ত। বিষয়বস্তুর গরিমা এবং

লিপিচাতুর্যের অপূর্ব দীপ্তি এই উভয়বিধ মণিকাঞ্চনযোগে তাঁর রচনা দুষ্প্রাপ্য-মনোহর। এ ছাড়াও অমূর্ত ভাব কল্পনা এবং বিষয়কে তিনি যে অফুরন্ত উপমা-অলংকার সহযোগে প্রকাশ করেছেন তা'র তুলনা বাংলা সাহিত্যে কেবল বিরলদৃষ্ট নয়—অনুপস্থিত। রসরচনাকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কৃতিত্ব এখানেই। এই উপমা-অলংকারের জন্যেই তাঁ'র রচনাগুলি অতি সহজেই আমাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম স্থানটি দখল করে' নেয়। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলাধারার মত স্নিগ্ধ হাস্যরসিকতা তাঁ'র রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিদ্রূপ বা শ্লেষপ্রয়োগে হাস্যরস সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে নেই বলেই চলে—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এবং হৃদয়ের সুগভীর প্রশান্তিতে এ হাস্যরস মনোরম এবং প্রাণস্পর্শী। বস্তুতঃপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রসরচনাগুলি লিরিক কবিতার সমধর্মী। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে তিনি স্বয়ং কবিতার পর্যায়ে ফেলেছেন। "বিবিধ প্রবন্ধে" 'বাজে কথা'র মধ্য দিয়ে কবি যে কথাগুলি বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রবন্ধগুলি সেই পর্যায়ের অন্তর্গত। বর্ণনাভংগী এবং লিপিচাতুর্যে তাঁ'র প্রায় রচনা কোহিনূরের অপূর্ব বর্ণ-সম্ভারে ঝলকিত। রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন—কিন্তু প্রত্যেক রচনাতেই বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে' প্রধান হ'য়ে উঠেছে সাহিত্যরসের ফল্গুপ্রবাহ। কালান্তর, শিক্ষা, মানুষের ধর্ম, বিশ্বরহস্য ইত্যাদি প্রবন্ধ পুস্তকগুলি আমাদের মন্তব্যের সার্থক প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বাংলা রসরচনার ধারায় অপূর্ব সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবন্ধলেখকের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁ'র রচনায় একটি রূপমুগ্ধ স্বপ্নতন্ময় মনের পরিচয় বর্তমান। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধাবলীতে বলেন্দ্রনাথের যে সুনিপুণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও রাজকীয় গদ্যরচনার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে

তা' রবীন্দ্র-রচনারীতি অনুসারী। রাজকীয় চিত্রধর্মী গদ্যরচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করেছেন। আন্তরিকতার গুণে এ সকল রচনায় পাঠকের সাথে লেখকের অভিনব যোগ সাধিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীতে আমরা আর এক শ্রেণীর রচনার সন্ধান পাই—যেগুলিকে ব্যক্তিগত রচনা বলা যেতে পারে। এই সকল রচনায় বলেন্দ্রনাথ অধিকতর ব্যক্তিগত। লেখকের ভাল লাগা, মন্দ লাগা সকল কিছুই পাঠকের সম্মুখে উন্মুক্ত। এ সমস্ত রচনার মধ্যে কীট্‌সীয় সৌন্দর্য-সম্ভার ও লিরিকের সুকোমল পদধ্বনি শোনা যায়।

রসরচনার আর একজন শক্তিমান লেখক প্রমথ চৌধুরী। তাঁ'র রচনা বুদ্ধিধর্মী এবং মননশীলতার এলাকাভুক্ত। বক্তব্য অপেক্ষা বলার রীতিই প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একান্ত নির্ভেজাল কথ্যভাষার ওপর তাঁ'র এই মননধর্মী রচনারীতি গড়ে উঠেছে। 'বীরবলের হালখাতা'য় আপাত বিরোধী বর্ণনা, শ্লেষ, হাস্যরস এবং বুদ্ধির চাকচিক্য বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে হিউমার বা করুণ-হাস্যরস পেয়েছি প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে তা' অনুপস্থিত—কিন্তু Wit বা বাক্‌চাতুর্যের মোহজাল বিস্তার করে' তিনি যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা' অনবদ্য। এঁ'র রচনাভংগী অত্যন্ত কলাকৌশলময়, তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে তিনি যা' উপস্থিত করেছেন তা' বুদ্ধির পথ বেয়েই হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং তখনই পাঠকের সাথে লেখকের একটি অদ্বৈত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে লিরিকধর্মী রচনার পরিচয় পেয়েছি প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে তা' নেই। বর্তমান কালের প্রাবন্ধিকগণের মধ্যেও এই ধরনের রচনার অভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে—একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম। সে যাই হোক 'সবুজপত্র প্রকাশের পর থেকে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষার রসরচনা

প্রমথ চৌধুরীর প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। আধুনিক যুগের প্রধান রচনাকারদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশিষ্য।'

॥ দুই ॥

গীতিকবিতা কবির মর্মনির্যাস। কবির নিভৃত মনের বাসনা-কামনার, ব্যথা-বেদনার আলোড়ন-স্পন্দনই গীতিকবিতার প্রাণসম্পদ। কোন উপাখ্যান রচনা নয়, কোন সুবিপুল ভাব কল্পনা নয়,—একটিমাত্র ভাব গীতিকবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে মুক্তা-নিটোল হ'য়ে লিরিকের সুকোমল সুরে প্রকাশ পায়। মানুষের গহনতম হৃদয়ের সুনিবিড় রসানুভূতিগুলি ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলকিত হ'য়ে ওঠে, সুতরাং গীতিকবিতা মানুষের মনের কথা, অন্তরের বাণী। মহাকাব্যের সাথে গীতিকবিতার একটি প্রধান পার্থক্য এই মহাকাব্যের কবি আপন কাব্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যে আকাশপাতাল, স্বর্গমর্ত্য, বিশ্বনিখিল মথিত করে' বেড়ান—এ কাব্যের প্রেরণা আসে বহির্বিশ্ব থেকে, সুতরাং এ কাব্য বস্তুমুখীন—Objective। আর গীতিকাব্যের কবি আপন কাব্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যে কল্পনার বহির্মুখী বেগকে দমন করে' ছুটিয়ে দেন হৃদয়লোকে—অন্তরের অসীম রহস্যানুভূতি হ'তেই আসে এ কাব্যের প্রেরণা। সুতরাং এ কাব্য ব্যক্তি-হৃদয়ের আত্মলীন অভিব্যক্তি—Subjective।

গীতিকবিতার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। শব্দের পিঠে শব্দ যোজনা করে' কষ্ট কল্পনায় যে কবিতা রচিত হয় তা'তে গীতিকবিতার সৌকুমার্য ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। ভাবের আবেগে জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত এ কাব্য আপনি উৎসারিত। কোন বন্ধন নয়, কোন দর্শন নয়, কোন ধর্মতত্ত্ব নয়—গীতিকবিতা এ সকলের ঊর্ধ্বে

বন্ধনহীন এক অনবদ্য শৈল্পিক প্রকাশ। মনের লীলাখেলাই এখানে বড় কথা—রসের মায়ালোকেই এ সব কবিতার যাতায়াত।

উপরে গীতিকবিতার যে সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে আমরা পরিচিত হলাম সে মানদণ্ডে বিচার করলে দেখতে পাব উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গীতিকবিতা রচিত হয় নি—যদিও বিভিন্ন কবির কাব্যে সমধর্মী অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের জন্ম-লগ্নে যে কাব্য রচিত হয়েছে সেই ধর্মোপদেশের রক্তচক্ষু শাসিত চর্যপদেও মাঝে মাঝে গীতিকবিতার ঝংকার শোনা গিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ৪নং পদের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

জোইনি তঁই বিণু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি ॥

[ যোগিনী তোমায় ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারবো না, তোমার মুখ চুম্বন করে' কমলরস পান করবো। ]

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি পদের বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে' চর্যাপদ যে গীতিধর্মী তা' বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ বলাই যায়—এ মন্তব্য ধোপে টেঁকে না। চর্যাপদের গীতিধর্মিতা একমুখ নিয়ন্ত্রী, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সুকঠোর নিয়ন্ত্রণে গীতিকবিতার সুর খান খান হ'য়ে ভেঙে গেছে। তা' ছাড়া এখানে গুহ্য সাধন-সংকেত প্রকাশের জন্যে গীতিকবিতা প্রযুক্ত হওয়ায় তা'র সকল বৈচিত্র্য ম্লান হ'য়ে গেছে। এর থেকে বরং অপভ্রংশে রচিত কবিতাবলীতে গীতি-স্পন্দন ঢের বেশি সুস্পষ্ট। প্রাকৃত পৈঙ্গল থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

নব মঞ্জরি সজ্জিত চুঅঅ গাছে।
পরিফুল্লিঅ কেসু নআ বনে আছে ॥
জই এত্থি দিগন্তর জাহিই কন্তা।
কিঅ বম্মহ ণত্থি কি ণত্থি বসন্তা ॥

[ আমের গাছে নতুন বোল ধরেছে,'বনে নতুন-ফোটা পলাশ ফুল আছে। এমন সময় যদি প্রিয়জন বিদেশে যায় তবে কি ভাবব ভালোবাসার দেবতা নেই, না বসন্ত নেই ? ]

এখানে গীতিকবিতাসুলভ ভাবাবেগ সুন্দর রূপে বাক্‌বদ্ধ হয়েছে কিন্তু এমন কবিতা নিতান্ত দুর্লভ।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিভিন্ন আখ্যান কাব্যের মাঝে মাঝেও গীতি-কবিতার সুকোমল অভিব্যক্তি দেখা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে ফুল্লরা কর্তৃক দেবীর নিকট আপন দারিদ্র্য বর্ণনায় কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যথাবেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। "ময়নামতীর গান"-এ গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্ভাবনায় বিচলিত বধূগণের হৃদয়ার্তিতে যে বেদনা ফুটে উঠেছে তা' একান্তভাবে গীতিকাব্যের সামগ্রী। এ ছাড়া বাংলার বিভিন্ন লোকগাথাগুলির মধ্যে গ্রাম্য ভাষায় বিভিন্ন আখ্যানে নায়ক-নায়িকার যে সুতীব্র হৃদয়ভেদী হাহাকার এবং সুনিবিড় প্রেম-মিলন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আদর্শ গীতিকবিতা হিসাবে তা'দের মূল্য অপরিসীম। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত "মৈমনসিংহ গীতিকা"র 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কমলা' ইত্যাদি পালাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গীতি-কবিতার সকল উপাদান বর্তমান।

এর পর বৈষ্ণব-পদাবলীর কথা—গীতিকাব্য হিসাবে যা'দের অবদান প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীকে গীতিকাব্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা বিপদের কথা। আমরা পূর্বেই বলেছি গীতিকবিতা একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তি-হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশে সমুজ্জ্বল কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে ব্যক্তি-হৃদয় অপেক্ষা গোষ্ঠীচেতনা এবং ধর্মীয় অনুশাসনই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এ কাব্যের যাত্রাপথ বাঁধা, চারণভূমি সীমিত। সীমার বাইরে গেলেই কুলত্যাগী হ'তে হয়। রাধাকৃষ্ণই এ কাব্যের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং এই বন্ধন-পীড়িত সীমিত পথে পদচারণায় গীতিকাব্য হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলীর মান বার বার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু এই সকল বন্ধন ও নিয়ম-নীতির

মাঝখানে থেকেও যে বৈষ্ণবকাব্যে গীতিকবিতার সুরঝংকার এসেছে সে কথা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। বিশ্বকবির জিজ্ঞাসার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দিলে পদাবলীকে প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য বলতে আমাদের কোনই বাধা থাকে না। বৈষ্ণবকাব্যকে গীতিকাব্য বলার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হ'লো এই যে এ কাব্য কবির ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা প্রকাশের কাব্য নয়—রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের কাব্য, প্রাত্যহিক মানবজীবনের সাথে তা'র বড় একটা যোগ নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন :

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?...
> ...সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
> বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?...

বস্তুতঃ বৈষ্ণবকাব্য পরোক্ষভাবে মানবজীবনেরই কাব্য। মানুষের মিলন-বিরহ, কামনা-বাসনা রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমানের অন্তরালেই সুপ্ত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে' কবি যে কথা বলেছেন বস্তুতঃ পক্ষে তা' কবির নিজেরই কথা, আপন আত্মার উপলব্ধি। এবার নিম্নে কয়েকজন বৈষ্ণবকবির গীতিমুখর পদের উল্লেখ করা হ'লো। প্রথমেই চণ্ডীদাসের পদ—বিরহ-বিধুর রাধার ম্লান-মূর্তি বর্ণনা

> সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন তারা।
> বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমতি যোগিনী পারা॥

এর পর জ্ঞানদাসের পদ :

> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
> হিয়ার-পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
> পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

অন্যত্র :

বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া দিব ॥

বস্তুতঃ এ সব কবিতার গীতিধ্বনি সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয় আরোপ করা চলে না। কবির হৃদয়বেদনা মূক অক্ষরের বুকে বুকে করুণ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের কাব্য হ'তে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু স্বল্পেই আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধ।

বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" ও মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার সুরঝংকার শোনা গিয়েছে। এখানে দু'টি পদের উল্লেখ করা হ'লো :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ [২]
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।...

অন্যত্র :

বড়ায়ি গো—কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোএঁ নারী বড় অভাগিনী ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদের রচনায় গীতিকবিতার আর এক অভিনব অভিব্যক্তি দেখা যায়। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কাব্য রচিত হ'লেও অপরিসীম আন্তরিকতার গুণে তাঁ'র কবিতা গীতিকাব্যের রসলোকে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। আগমনী-বিজয়ার সংগীতগুলি যেন ভক্তকবির অশ্রুজলে সিক্ত। ভক্ত-হৃদয়ের আকূতি মাতা-পুত্রের মান অভিমানের ভিতর দিয়ে যে রূপে প্রকাশিত হয়েছে তা'র সবটুকুই কবি-হৃদয়ে সঞ্চিত বাৎসল্যরসেরই প্রকাশ। 'মা হওয়া কী মুখের কথা—যে না জানে সন্তানের ব্যথা' কিংবা 'আমায়

দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই মা শঙ্করী' ইত্যাদি সংগীতগুলিতে কবি-হৃদয়ের অনন্ত কামনা-বাসনা যেন শতধারায় ভেঙে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে আধুনিক কালের কোন কোন যাত্রা-ওয়ালা, পাঁচালীকার এবং কবিওয়ালার রচনায়—বিরল-দর্শন হ'লেও—কিছু কিছু গীতিকাব্যের আমেজ পাওয়া যায়। রাম বসুর একটি পদ:

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হ'ল না ॥…

শ্রীধর কথকের আর একটি পদ:

ভালবাসি ব'লে ভালবাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে ॥…

এ সকল পদে যে হৃদয়ার্তি এবং আন্তরিকতা মিশে আছে তা' এগুলিকে দুর্লভ সৌন্দর্য দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ মহাকাব্য রচনার যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু আবার এই যুগেই বাংলায় যথার্থ গীতিকাব্য-রচনার সূত্রপাত। মহাকবি মধুসূদনের কথাই ধরা যাক। 'মেঘনাদবধে' তাঁ'র অসুর বলধারী নায়ক সর্বদাই বীরবিক্রমে গদা ঘুরিয়ে ফিরেছেন, আপন সুখ-দুখের অন্তরালে মন লুকিয়ে একবারও কেঁদে ওঠেন নি এমন কথা জোর করে' বলবে কে? বীরবাহুর মৃত্যুতে (প্রথম সর্গ) এবং মেঘনাদের পতনে (নবম সর্গ) রাবণের অতলান্ত বিরহ-ক্রন্দন এবং সীতার পঞ্চবটী প্রবাসের সকরুণ বর্ণনা (চতুর্থ সর্গ) যে কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের অনন্ত অসীম হাহাকারেরই রূপায়ণ। গীতিকাব্য হিসাবে এঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'রও একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যে শ্রীরাধার সুতীব্র ব্যথা হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বলা বাহুল্য মধুসূদনের রাধা অপ্রাকৃত নয়—প্রাকৃত,

সুতরাং তাঁ'র হৃদয়াকুলতা ও তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা যৌবন-বিহ্বল সাধারণ যুবতীরই মত। কিন্তু কবি মধুসূদনের ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাগুলি শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্ত লাভ করেছে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র সনেটগুচ্ছের মধ্যে। আত্মবিলাপ সম্পর্কিত কবিতাগুলি এই জাতীয় কবিতার মধ্যমণি। আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় (আত্মবিলাপ), যেও না রজনী আজি লয়ে তারাদলে (বিজয়া দশমী), হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন (বঙ্গভাষা) ইত্যাদি কবিতাগুলিতে ব্যক্তি মধুসূদনের স্বরূপ একেবারে উন্মুক্ত হ'য়ে উঠেছে। মহাকাব্যের বিরাট বিপুল ঊর্মি-মুখর মহাসাগরের কূল ত্যাগ করে' কবি এ কাব্যে চলে এসেছেন আপন হৃদয়লোকে, কথা কয়েছেন মনে মনে—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রের পরিচয় মহাকাব্যের রচয়িতা হিসাবে—কিন্তু আমাদের মনে হয় মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র যথার্থ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তাঁ'র সিদ্ধির ক্ষেত্র রচিত হয়েছে গীতিকবিতায়। তাঁ'র কবিতাবলীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—প্রকৃতি বিষয়ক, জাতীয় ভাবোদ্দীপক, তত্ত্বমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা তিনি লিখেছেন কিন্তু সকল কবিতার উপর কবি-হৃদয়ের একটি গীতিমুখর আবেগ বিশেষরূপে লক্ষণীয়। 'অশোক তরু' কবিতাটি নৈরাশ্য ও বেদনার সুরে ঝংকৃত। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতায় পদ্ম-মৃণাল গৌণ আসলে ঐ বস্তুটিকে কেন্দ্র করে' কবি আপন ধ্যান-চিন্তায় মেতে উঠেছেন। 'হতাশার আক্ষেপ' কবিতাটি হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার একটি।

নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যগুলিও একান্তরূপে গীতিকাব্যমুখীন। সর্বত্রই একটি হৃদয়াবেগ, একটি অসীম আকূতি ক্রমবর্ধমান হ'য়ে মহাকাব্যের বিষয়মুখীন গতিপথকে খণ্ডিত করেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মধ্যেও কোথাও কোথাও গীতিকবিতার

আমেজ মিশে আছে। তাঁ'র 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি কবিতাবলীতে যে অভিনব হৃদয়-স্পর্শ মিশেছে তা এই কবিতাগুলিকে একান্তভাবেই গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক গীতিকাব্যের রচয়িতা হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। এঁর কাব্যেই আমরা সর্বপ্রথম মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির কল্পনা-রঙীন ঐশ্বর্যদীপ্ত প্রকাশ দেখেছি। তাঁর কাব্যেই যেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি-হৃদয়ের বাসনা-কামনাগুলি নম্র-মনোহর হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলিতে' সর্বপ্রথম আমরা এক অপরূপ রূপের সন্ধান পেয়েছি। ইতিপূর্বে আমরা যে সকল কবির কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের কল্পনা প্রধানতঃ বহির্বিশ্বাভিসারী, সময় সময় তাঁ'রা ফিরে এসেছেন আপনার অন্তরে কিন্তু এই সর্বপ্রথম আমরা এমন একজন কবির সাক্ষাৎ পেলাম যিনি আমরণ আপন অন্তর-দেউলের ছায়ালোকে পূজারতি দিয়েছেন, সংগীত রচনা করেছেন নির্জনে—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাঁ'র প্রত্যেকটি কবিতা লিরিকের সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। রূপমুগ্ধ কবি রহস্যময় প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেছেন :

> কহে সে রূপের কথা,
> বসন্তের তরুলতা ;
> সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন-ফুল ;
> শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলুঢুল।

অন্যত্র :

> পূর্ণিমা প্রমোদ আলো
> নয়নে লেগেছে ভালো ;
> মাঝে উথলে নদী দুপারে দুজন—
> চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে দুজন।

এসব কবিতায় রোম্যান্টিক কবির স্বপ্ন-তন্ময়তাই প্রধান হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এবং কামিনী রায়ের নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের কবিতাতেও গীতিকাব্যের সুন্দর আমেজ আছে। তাঁ'র 'সন্ধ্যা' নামক কবিতাটির কিছু অংশ :

দূরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি'ফুল তনুখানি।
তরল গুণ্ঠন আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে,
সরমে উছলি পড়ে কত প্রেমবাণী ॥

কবি-হৃদয়ের একটি মুক্তা-নিটোল আকৃতি এখানে সুন্দর রূপে বাক্‌বদ্ধ হয়েছে। কামিনী রায়ের কবিতাতেও একটি সুকোমল রোম্যান্টিক সুর লক্ষণীয়। তাঁ'র একটি কবিতার অংশ :

দু'খানি সুগোল বাহু দু'খানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর;
রূপ আদি কাছে টানে, গুণে বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে যেন হাতছানি দিয়া।

এ কবিতার ছন্দ সাধারণ, ভাষা মোলায়েম কিন্তু এই অনাড়ম্বর ভাষা ও ছন্দের ভিতর দিয়া কবির সমগ্র হৃদয়টি যেন উন্মুক্ত হ'য়ে উঠেছে।

এর পর রবীন্দ্রনাথ—কল্পস্বপ্নের প্রথম রাজপুত্র, গীতিকাব্যের যাদুকর। এঁর হাতেই বাংলা গীতকাব্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। ইতিপূর্বে আমরা গীতিকবিতার রচয়িতা হিসাবে যে সকল কবির নাম করেছি তাঁ'দের প্রত্যেকের রচনায় কিছু কিছু দোষ-দুর্বলতা বর্তমান। মধুসূদনের মধ্যে সংস্কৃতানুগ শব্দাড়ম্বর এবং মহাকাব্যসুলভ উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎকট প্রয়োগ থাকায় গীতিকবিতা হিসাবে তা'র সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বিহারীলালের মধ্যে

গীতিকবিতার আবেগ উচ্ছ্বাস এবং সকল উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রকাশভংগীর দুর্বলতা হেতু গীতিকবিতার সম্ভ্রম ও সৌকুমার্য লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভোরের স্বপ্নঘেরা সুনীল আকাশের শুভ্র শুকতারা, সকল কালিমা সকল ম্লানতা হ'তে মুক্ত—সৌন্দর্য-সৌধের লীলা-নিকেতন। রবীন্দ্রনাথের আগমনে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যেন যুগান্তর এলো—শোনা গেল দূরাগত অসীম সমুদ্রের উদাত্ত জলকল্লোল। ঘর বা'র একাকার হ'য়ে গেল, অসীম সসীমের সকল ব্যবধান লুপ্ত হ'লো, সুদূর আকাশ গৃহের আঙিনায় ধরা দিল। যা' কিছু বিস্ময়কর, যা' কিছু রহস্যময় রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য কৌতূহলে তুলির আলপনায় তুলে ধরেছেন আমাদের বিস্ময়-নির্বাক্ দৃষ্টির সম্মুখে। "প্রভাত-সংগীত" হ'তে যেন নবীন বাংলা গীতিকবিতার সুপ্রভাত হ'লো। ভোরের ছায়ালোকে সেই যে কোন শুভমুহূর্তে বৃক্ষান্তরাল হ'তে সূর্য ওঠার দৃশ্যে কবির হৃদয় খুলে গেল—সেই হ'তে তিনি হৃদয়েরই গান গেয়েছেন। অন্তরের অন্তরালে মন লুকিয়ে সুখে দুখে কেঁদেছেন—সেই অশ্রুই তাঁ'র কাব্যে স্বর্ণ-শতদলে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। প্রভাত-সংগীতের পর 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', নৈবেদ্য', 'খেয়া', গীতাঞ্জলি' ইত্যাদি যত কাব্যই লিখেছেন তা'র প্রত্যেকটি গীতি-কাব্যের দুষ্প্রাপ্য সৌন্দর্যে অম্লান। কেবল ভাবে নয়—ভাষায়, শব্দ-ঝংকারে, ছন্দ-সুষমায় এ সকল কাব্যে মহিমাদীপ্ত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে বাংলা কাব্যে তা' বিরল-দৃষ্ট। রবীন্দ্রকাব্য হ'তে গীতি-কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া গোষ্পদে অসীম আকাশের প্রতিবিম্বন দেখান সমান কথা, ধৃষ্টতা মাত্র—রবীন্দ্রনাথের সারাটা জীবন যেন গীতিকবিতার সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে। তাঁ'র গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোথাও আপন হৃদয়ের স্পর্শ হারান নি, যে সকল কবিতায় তিনি এ-লোকের কথা ছেড়ে নিছক সে-লোকের কথা বলেছেন সেখানেও তাঁ'র কবিতাগুলি হৃদয়-স্পর্শে অনন্যসুন্দর।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাত-কীর্তি হয়েছেন তাঁ'দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার জনপ্রিয়তায় নজরুল ইসলাম তুলনারহিত। সংগীত-রচয়িতা হিসাবে সংখ্যার দিক হ'তে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। অবশ্য ভাবসম্পদে রবীন্দ্র-সংগীত অধিকতর ঐশ্বর্যশালী। ঝংকারমুখর শব্দযোজনায় এবং ছন্দের দোদুল দোলায় এঁরা কাব্যের মধ্যে যেন আপন খেয়ালখুশীর মালা গেঁথেছেন। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা কাব্য অত্যাশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের গীতিকাব্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার দুর্জয় শক্তি তা'র আছে।

## ॥ *তিন* ॥

### ক ॥ প্রাথমিক অবস্থা : উপন্যাসের সূত্রপাত ॥

কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়—বিশ্বের সকল সাহিত্যেই, উপন্যাস আধুনিক কালের সামগ্রী। ইংরেজী সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাস মাত্র আড়াইশো বছর পূর্বে রচিত। পূর্বে যে সামাজিক পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশে উপন্যাসের জন্ম সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ উপন্যাস গণতন্ত্রেরই দান। প্রাচীন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনের সর্বত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য সূচিত হ'লো, সমাজের সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করে' ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি দুর্বার গতি চলমান জীবন-প্রবাহের সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নয়—সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও দেখা দিল আত্মমর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব জাগরণের তীব্র স্পৃহা। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই সুতীব্র

স্পৃহা এবং আকুলতা হ'তেই উপন্যাসের জন্ম। মানুষের আত্ম-বিকাশের এই আন্দোলনই উপন্যাসের সূতিকাগার।

প্রাচীন যুগে যে সামাজিক পরিবেশ ছিল সেখানে মানুষ হিসাবে আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন পথ ছিল না। সে যুগ ছিল ধর্ম-শাসিত যুগ। ধর্মই সেখানে উচ্চশির হ'য়ে মানুষের আত্মবিকাশের সকল পথ রুদ্ধ করে' দিয়েছে। তাই প্রাচীন যুগে যে কাব্য রচিত হয়েছে তা'তে দেখি দেবদেবীর কথা, অপ্রকৃত নায়ক-নায়িকার আকাশ-বিহারী চিত্র অথবা অতিমানবের উদ্ভট লীলাখেলা। কিন্তু কালের ক্রমাগ্রগতির সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশ-পরিবর্তনের জন্যে এই অতিমানবদের অতি লীলাখেলার পথ সংকীর্ণ হ'য়ে এল। এতদিন কর্মক্লান্ত যে মানুষ ছিল যবনিকার অন্তরালে এবার তা'রা বেরিয়ে এল প্রেক্ষাগৃহের আলোকোজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সম্মুখে—জীবন-নাট্যের নায়ক হ'লো তা'রাই। শুরু হ'লো আত্মবিকাশোন্মুখ সংগ্রামশীল মানুষের জীবন-কথা রচনার সূত্রপাত—উপন্যাসের।

বাংলায় উপন্যাস সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিত্ব জাগরণের এই স্পৃহা ছাড়াও প্রধান প্রেরণা এসেছে ইংরাজী উপন্যাস হ'তে। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সাহিত্যে যে নতুন সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল উপন্যাস তা'দের অন্যতম। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনায় পাশ্চাত্ত্য নভেলের প্রভাব যে বিশেষ রূপে ক্রিয়াশীল তা' সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কিন্তু নভেলের প্রেরণায় এবং আদর্শে আমাদের ভাষায় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হওয়ার পূর্বেও উপন্যাস রচনার এক বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃত গ্রন্থের সাথে বাঙালীর পরিচয় বহু পূর্বের। সংস্কৃতের কয়েকটি আখ্যায়িকা গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের বীজ সুস্পষ্ট। কথাসরিৎসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কাদম্বরী ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলির কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া

যায়। গল্পরস পিপাসু পাঠক সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রথম দিকে এই সংস্কৃত আখ্যায়িকা কাব্যের অনুবাদ শুরু হয়। তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত বানভট্টের 'কাদম্বরী' এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মধ্যযুগে বাংলায় যে সব আখ্যায়িকা কাব্য রচিত হয়েছিল তা'দের কোন কোনটার মধ্যে উপন্যাসের বীজ বর্তমান। মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে আমরা যে চরিত্রগুলির সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি তা'দের মধ্যে আত্মবিকাশের একটি প্রবল স্পৃহা বর্তমান। এই গ্রন্থের 'স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তব-চিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল-ঘটনা সন্নিবেশে ও সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পেয়ে থাকি।' বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই বস্তুতান্ত্রিক কথা সাহিত্যের অগ্রদূত।

এ ছাড়াও আমাদের দেশে প্রচলিত লৌকিক গল্প এবং রূপকথার মধ্যেও সংগ্রামশীল মানুষের পরিচয় এবং উপন্যাসের আমেজ আছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে আমরা যে গীতিকাগুলির সাথে পরিচয় লাভ করি সেগুলি উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি হ'তে জন্মলাভ করেছে। কি চরিত্রচিত্রণে, কি ঘটনা সন্নিবেশে, কি নাটকীয়তা সৃষ্টিতে, কি সংগ্রামশীল মানুষের বেদনা চিত্রণে সর্বত্রই উপন্যাসের মৌলিক লক্ষণগুলি আপন স্বরূপে বিকাশমান। বস্তুতঃ এ আখ্যায়িকাগুলির বুকেই শোনা গিয়েছে উপন্যাসের আগমনী।

সংস্কৃত আখ্যায়িকার অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় যে উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল ইংরাজী নভেল অনুবাদের মাধ্যমে তা' আরো দ্রুততর এবং গতিসম্পন্ন হ'লো। এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ-

যোগ্য গ্রন্থ তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত জনসনের 'রাসেলাস'।

অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে বাংলায় কে সর্বপ্রথম উপন্যাস রচনা করেন সে বিষয়ে তর্কের অবধি নেই। এ বিষয়ের আলোচনায় এগিয়ে এসে অনেকেই অনেক কথা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সাধারণের বিশ্বাস প্যারীচাঁদ মিত্র-ই বাংলায় উপন্যাস রচনার আদি পুরুষ। কোন কোন সমালোচক এই দুর্লভ সম্মান দিতে চেয়েছেন "নববাবু-বিলাস"-এর লেখক প্রমথনাথ শর্মাকে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮২৩ খ্রীঃ। এর পূর্বেও প্রকাশিত হয় "বাবু" —১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। "বাবু" এবং "নব-বাবু-বিলাস" একজাতীয় গ্রন্থ। বস্তুতঃপক্ষে 'নববাবু-বিলাস' 'বাবু'-রই পল্লবিত সংস্করণ। এই উভয় গ্রন্থেই 'বাবুজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।' কিন্তু তবুও এই উভয় গ্রন্থের কোনটিকেই উপন্যাস বলা যায় না। কেননা উভয় গ্রন্থের কাহিনী অংশ নিতান্ত দুর্বল। তা' ছাড়া চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়েও কোন উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় নেই। উভয় গ্রন্থে বাবু চরিত্রের যে চিত্রণ দেখি—বহু বছর পূর্বে রচিত মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী, ফুল্লরা এবং ভারত-চন্দ্রের হীরা মালিনী ইত্যাদির চরিত্রচিত্রণে তদপেক্ষা বলিষ্ঠ শিল্প-বোধের পরিচয় রয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়—কথোপ-কথনের ভাষা। 'নববাবু-বিলাসে'র মত ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের মধ্যেও গদ্য এবং পদ্য ব্যবহৃত হওয়ায় উপন্যাস হিসাবে এর গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সংলাপের জন্যে যে ভাষার প্রয়োজন উইলিয়াম কেরী সর্বপ্রথম তা'র নমুনা প্রকাশ করেন 'কথোপকথন' গ্রন্থে। কিন্তু 'কথোপকথনে'র সংলাপ উপন্যাসোচিত হ'লেও গ্রন্থটি উপন্যাস হয় নি—কেন না এতে কোন গল্পাংশ নেই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন ধরনের আখ্যায়িকা প্রচুর পরিমাণে লিখিত হয়েছিল। গোপীমোহন ঘোষের "বিজয় বল্লভ"

( ১৮৬৩ খ্রীঃ ) এই জাতীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম। "বিজয় বল্লভ" রচনায় লেখক ইংরাজী নভেলের আদর্শ গ্রহণ করলেও গ্রন্থটি উপন্যাস হয় নি—উপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটির মস্ত বড় দুর্বলতা এর ভাষা। বিদ্যাসাগরীয় সংস্কৃতানুগ ভাষা গ্রন্থ-খানির উপন্যাস হ'য়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর পর প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" ( ১৮৫৭ খ্রীঃ ) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" ( ১৮৬২ খ্রীঃ ) গ্রন্থ দু'খানির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" যদিও "আলালের ঘরের দুলালে"র পরে রচিত তথাপি গ্রন্থখানি "আলালের ঘরের দুলাল" অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের। হুতোম প্যাঁচার নক্শা সম্পর্কে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" ঠিক উপন্যাস নহে—নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্যের নতুন জোয়ারে নাগরিক জীবনযাত্রায় সে সমস্ত উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচি বিচারের দৃষ্টান্ত, স্ফূর্তি-ইয়ার্কির নতুন নতুন প্রকরণ উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র-শ্লেষপূর্ণ কশাঘাত করিয়া নিজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগচঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্রচিত্রণেরই ইহাতে অভাব।"

বস্তুতঃপক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" থেকেই বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত। অবশ্য এই শ্রেণীর রচনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা এবং চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিকে এঁর রচনাকে উপন্যাস-আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। এদিক দিয়ে "আলালের ঘরের দুলাল" অনেকখানি ত্রুটিশূন্য।

কোন গ্রন্থ উপন্যাস হ'লো কিনা তা'র জন্যে আমাদের চারটি বিষয়ের ওপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখতে হবে। উপন্যাসের প্রধান চারটি অঙ্গ এই : ক ॥ গল্পাংশ খ ॥ চরিত্রচিত্রণ গ ॥ পরিবেশ বর্ণনা এবং ঘ ॥ সংলাপ। এই মানদণ্ডে আমরা "আলালের ঘরের দুলাল"কে বিচার করে' দেখব গ্রন্থখানিকে আদর্শ উপন্যাস বলা যায় কিনা।

প্রথমতঃ গল্পাংশ। অধিকাংশ সমালোচক "আলালের ঘরের দুলাল"কে বাংলার প্রথম উপন্যাসের দুর্লভ মর্যাদা দান করলেও একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে গ্রন্থখানির গল্পাংশ নিতান্ত দুর্বল। কাহিনীর ধারাবাহিকতা সর্বত্রই ক্ষুণ্ণ এবং খণ্ডিত হয়েছে। এমন কি এতে যে কোন মূল কাহিনী আছে তা গ্রন্থ পাঠের পরও কল্পনা করতে বাধে। প্রতিটি উপন্যাসে থাকে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী—যে কাহিনীকে অবলম্বন করে' পল্লবিত হ'য়ে ওঠে সমগ্র উপন্যাস, বিকশিত হ'য়ে ওঠে চরিত্রাবলী। কিন্তু দুঃখের বিষয় "আলালের ঘরের দুলাল"-এ তেমন কোন ভাব-সংহত কেন্দ্রীয় কাহিনী নেই—আছে কতকগুলি বাস্তব ঘটনার শিথিল সমাবেশ। কিন্তু বাস্তব চিত্রাঙ্কনে উপন্যাস হয় না—আদর্শ উপন্যাসের জন্যে এই বাস্তব চিত্রাবলীকে এমন ভাবে ঘটনা পরম্পরায় সজ্জিত করতে হবে যা'দের ঘনসন্নিবিষ্ট সমাবেশে জীবনের এক একটি মহত্তর ও জটিলতর দিক আপন মহিমায় পাঠকের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। প্যারীচাঁদ মিত্র সে গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বিচিত্র বর্ণদীপ্ত পুষ্প চয়ন করেছেন কিন্তু সেগুলিকে অলংকার-সুষম ভংগীমায় গেঁথে দিতে পারেন নি। উত্তম মালাকারের যোগ্যতা হ'তে তিনি ছিলেন বঞ্চিত।

এর পর চরিত্রচিত্রণ। কিন্তু এখানেও প্যারীচাঁদ মিত্রের দুর্বলতা এবং কৃতিত্ব যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে। Type চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক যুগে তা' নিতান্ত দুর্লভ। 'ঠকচাচা' এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রাবলীর

মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি, উহার মধ্যে কূটকৌশল ও স্তোক-বাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হয়েছে যে, পরবর্তী উন্নতশ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এরূপ সজীব চরিত্র মেলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা আনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সংগীত-প্রিয়তায়, কেহ বা কোন বিশেষ বাক্যভংগীর পুনরাবৃত্তিতে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।' এমনি কতকগুলি পার্শ্ব Type চরিত্র সৃষ্টিতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও মূল চরিত্রাঙ্কনে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষত্ব মোটেই প্রকাশিত হয় নি। সেখানে তাঁর চরিত্রাঙ্কন প্রতিভার দৈন্য বিশেষরূপে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। নারী-চরিত্রগুলি তো নিতান্ত দুর্বলা। স্ত্রী-চরিত্রগুলি যে রক্ত-মাংসের একথা মনেই হয় না। তারা নির্জীব পুতুল মাত্র—কেবল সংলাপগুলি তা'দের মুখ দিয়ে স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণের ভিতর দিয়ে উপন্যাসের অন্তর্বিপ্লব পাঠকের গহন মনে গভীর রেখাপাত করে কিন্তু "আলালের ঘরের দুলাল"-এ চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তেমন কোন অন্তর্বিপ্লবের প্রকাশ ঘটে নি। এ উপন্যাসে যা' কিছু সংঘাত এসেছে তা' একান্তভাবে বাইরের জিনিস—অন্তর্জগতের নয়। মতিলালের অনুতাপ, অনুশোচনা এবং সংশোধন একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনার চাপে সম্ভব হয়েছে—এই সংশোধন অন্তরের প্রেরণায় বা পরিবর্তনে হয় নি। অন্তরের অনুশোচনা-দাহনে জ্বলে-পুড়ে নিখাদ করে' চরিত্র গঠনের জন্যে যে উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার প্রয়োজন তা' প্যারীচাঁদ মিত্রের ছিল না।

পরিশেষে পরিবেশ বর্ণনা এবং সংলাপ। উপন্যাসের এই দুই অঙ্গচিত্রণে প্যারীচাঁদ মিত্র আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। 'আলাল'-এর পরিবেশ চিত্রণের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবু-বিলাস' এবং 'হুতোমে'র সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে কেবল হালকা

স্ফূর্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয় বর্ণিত হইয়াছে। "আলালে'র পরিবেশ আরও পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানা-মুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-শাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তি-জীবনের গতিছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র।" 'আলালে'ই বোধ হয় আমরা সর্বপ্রথম যুগপৎ কলকাতীয় পরিবেশ এবং গ্রামীণ-জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র পেলাম। পরিবেশ বর্ণনা কুশলতায় উভয় চিত্রই অনন্যসুন্দর হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার যে সংস্কৃতানুগ আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন প্যারীচাঁদ মিত্র নিপুণকুশলতায় সে ভাষা ত্যাগ করে' আটপৌরে কথ্যভাষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এবং এই সংলাপ চরিত্র বিকাশের বিশেষ উপযোগী হয়েছে। 'আলালে' যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা' কেবল উপন্যাসের সংলাপেই নতুনত্ব এনেছে তা' নয়—কথ্যভাষার সাহিত্যে ক্রমপ্রবেশাধিকারের ইতিহাসেও তা'র একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভাষার বিবর্তনধারায় "আলালের ঘরের দুলাল" তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপরের আলোচনা হ'তে আমরা বুঝতে পারছি 'আলাল'কে যে অধিকাংশ সমালোচক বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস বলেছেন সে মত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। গ্রন্থের গল্পাংশ দুর্বল এবং শিথিল গ্রথিত, চরিত্রচিত্রণ অস্পষ্ট এবং মৌলিকতাহীন, সর্বোপরি উপন্যাসে প্রাণ যে প্রণয়-রস তা' এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। কতকগুলি বাস্তবানুগ ঘটনা ও চিত্রের সমাবেশে গ্রন্থখানি সরব হ'য়ে উঠেছে মাত্র। সুতরাং গ্রন্থখানিকে উপন্যাস বলা চলে না, সার্থক উপন্যাস তো নয়-ই। সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করে' 'আলাল'কে চিত্রোপন্যাস বলাই সঙ্গত।

এ গ্রন্থে উপন্যাসসুলভ যে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে তা' সুশ্রাব্য নয়, কিছু পরিমাণে অস্পষ্টও—এই স্বরই তান-লয়ের বিচিত্র সমাবেশে অপূর্ব সংগীত-মূর্ছনায় বেজে উঠেছে বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা ও শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিম হ'তেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রস্তাবনা।

'আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়াও প্যারীচাঁদ মিত্র ও 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকতা' নামে আরো কয়েক-খানি গ্রন্থ লিখেছিলেন—কিন্তু সেগুলিও ঠিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বাংলা উপন্যাস রচনায় দু'টি ধারার সাক্ষাৎ পাই। একটি ধারায় রচিত হয়েছে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস, অন্য ধারায় রচিত হয়েছে বাস্তবতা-প্রধান সামাজিক উপন্যাস। নিম্নে বিভিন্ন সামাজিক উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'লো। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায় আমরা যোগ দেব পরবর্তী অধ্যায়ে।

খ ॥ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং সামাজিক উপন্যাস ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা উপন্যাসের যে ক্ষীণধারা উপলবন্ধুর পথ পেরিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করে' আসছিল সেই ক্ষীণধারাই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-সাগরের মধ্যে পড়ে যৌবনের বিপুল জলোচ্ছ্বাসে গর্জনমুখর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই হয়েছে বাংলা উপন্যাসের নব যৌবন-সঞ্চার। শক্তি এবং সৌন্দর্যে, লাবণ্য এবং সুষমায় বাংলা উপন্যাস নম্র-মনোহর হ'য়ে উঠেছে। যে সকল গুণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের এই অভিনব সৌন্দর্য-সম্ভার-প্রাপ্তি ঘটেছে ভাষা, গঠন-রীতি, নাটকীয়তা, বর্ণনা-শক্তি, চরিত্র-সৃষ্টি, প্রণয়-রস ইত্যাদি তা'দের মধ্যে অন্যতম। ভাষা ॥ গদ্যরীতির উন্নতি না হ'লে উপন্যাসের অগ্রগতি সম্ভব নয়। প্রাক্‌বঙ্কিম যুগের ভাষা বাংলা উপন্যাসের কিংবা ছোট গল্পের উপযোগী ছিল না। "বিজয়বল্লভ" এবং "অঙ্গুরীয়

বিনিময়” এই কারণেই ব্যর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস “দুর্গেশ-নন্দিনী”ও ভাষার দিক দিয়ে নিতান্ত দুর্বল। “দুর্গেশনন্দিনী”তে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ভাষাই যদি বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে প্রযুক্ত হ'তো তা' হ'লে উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হতেন। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে “দুর্গেশনন্দিনী”র ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। স্বল্পকালের মধ্যেই বঙ্কিম মহৎ উপন্যাসের উপযোগী ভাষা গড়ে তুললেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি লঘু এবং গুরু উভয় প্রকার ভাষাই ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে তাঁ'র সংলাপ শব্দালংকারে পরিণত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা'র কারণ সাহিত্য সম্পর্কে ভ্রান্ত আদর্শ।

গঠন-রীতি ॥ উপন্যাসের প্রধান অংশগুলির মধ্যে একটি হ'লো তা'র বলিষ্ঠ কাঠামো। এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র যে সৃজনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা' বিস্ময়কর এবং অভিনব। বর্তমানকাল পর্যন্ত গঠন-রীতিতে বঙ্কিমের সমকক্ষ শিল্পী বাংলা ভাষায় নিতান্ত দুর্লভ। একটি কাহিনী ও ঘটনাকে তিনি এমন ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন—পাঠক-চিত্ত সহজেই তা'তে আকৃষ্ট হয়। বঙ্কিমের যে কোন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। এমন কি তাঁ'র প্রথম উপন্যাস “দুর্গেশনন্দিনী”তে আর যত প্রকারের দুর্বলতাই থাক না কেন—ঘটনাবিন্যাসে তা' ত্রুটিশূন্য। বঙ্কিমের কঠোর সমালোচক সে যুগের পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থের গল্পরসের মনোহারিত্বের কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

নাটকীয়তা ॥ বলিষ্ঠ কাহিনী বলিষ্ঠতর হ'য়ে উঠেছে ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে। নাটকীয় বিন্যাসভংগীতে কাহিনী যেন বিদ্যুৎ-ইশারায় দুর্নিবার গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে। বঙ্কিমের প্রতিটি উপন্যাস নাটকীয়তার বিসর্পিল গতিতে সমুজ্জ্বল। ঘটনার শিথিল-বিন্যাস নয়, কাহিনীর এলায়িত শ্লথ গতি নয়—নাটকীয় উত্থান-পতনই বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রাণ। বঙ্কিমের হাতেই সর্বপ্রথম এলো উপন্যাসের কাহিনীতে নাটকীয় আবেগ।

বর্ণনা-শক্তি ॥ বর্ণনা-শক্তি সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির আর একটি প্রধান গুণ। বঙ্কিমের বর্ণনা এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় বিভিন্ন উপন্যাসের বহু অংশে ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে "দুর্গেশনন্দিনী"তে যুদ্ধজয়ের বর্ণনা, বীরেন্দ্রসিংহের বিচার, কত্‌লু-খাঁর হত্যা ইত্যাদি। কেবল গুরুগম্ভীর নয় সরল জীবন্ত এবং বাস্তব-বর্ণনাতেও বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন। "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা, গঙ্গাতীরের এবং ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা বিশেষ রূপে উপভোগ্য। বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কবি। কবিত্ব-শক্তির সঞ্জীবন-স্পর্শে তা'র বর্ণনাগুলি একান্তভাবে সজীব এবং আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে—দুর্বোধ্যতা বা বিরক্তি উৎপাদনের কোন চিহ্নই তাঁ'র উপন্যাসে নেই। সর্বত্র একটি সরল এবং সাবলীল গতিভংগী লক্ষণীয়। সময় সময় মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণন-গুলি একটি অখণ্ড লিরিক কবিতার সুকোমল সুরে বেজে উঠেছে।

চরিত্র সৃষ্টি ॥ উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র সৃষ্টি। চরিত্রাবলীকে জীবন্ত করে' তুলতে পারলে উপন্যাসের অন্যান্য উপাদানেরও সার্থকতা। এই চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধকাম-শিল্পী। তাঁ'র তুলির আলপনায় অধিকাংশ চরিত্র গহন মনের আবেগ স্পন্দনে কম্পমান হ'য়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা এমন কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র পেয়েছি বাংলা সাহিত্যে যেগুলি চিরকাল অমর হ'য়ে থাকবে। কপালকুণ্ডলা, রোহিণী, মনোরমা, শৈবালিনী, সূর্যমুখী, আয়েশা ইত্যাদি চরিত্রাবলীতে আমরা যে উন্নত-শীর্ষ শিল্পীমানসের পরিচয় পেয়েছি তা' পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাঙ্কন-শিল্প-প্রতিভার সাথে প্রতিযোগিতা করার স্পর্ধা রাখে। নারী-চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ মনোভংগী বিশেষরূপে লক্ষণীয়। 'নারী-চরিত্রে ভোগ ও ত্যাগ, প্রেম ও বৈরাগ্যের যে দ্বন্দ্ব চরিত্রকে রহস্যময় করে' তোলে—সেই রহস্য উত্তরোত্তর বঙ্কিমের কবিমানসে ঘনিয়ে উঠেছে। নারী যেন বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মন্ত্র-দেবতা।'

প্রণয়-রস॥ উপন্যাসের একমাত্র প্রধান আকর্ষণ যে প্রণয়-রস এ কথা সকল মনীষী-সমালোচক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। বাংলা উপন্যাসে সেই প্রণয়-রস সৃষ্টির আদি পুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই এই প্রণয়-রসের জন্ম এবং নবযৌবন-সঞ্চার ঘটেছে। এই প্রণয়-রসে তা'র পুরুষ এবং বিশেষ করে' নারীচরিত্রাবলী অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। লালসা, ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং সার্থক প্রেমের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকা এবং উপনায়ক বা উপনায়িকাত্রয়কে দিয়ে যে ত্রিভংগীম প্রেম-ত্রিভুজ রচনা করেছেন তা'তে এই প্রণয়-রসের অভিনব বিকাশ ঘটেছে। প্রেমের বিসর্পিল পথে পদচারণা করেছিলেন বলেই সৃষ্টিচরিত্রতে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সার্থক হ'তে পেরেছেন।

পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন তা'র মূলে উপন্যাসের উল্লিখিত আঙ্গিকগুলি বর্তমান। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা এবং রজনী এই চারখানি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম দু'খানা যে কোন আধুনিক উপন্যাসিকের যে কোন উপন্যাসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য আধুনিক কালের বাস্তব সমস্যা-প্রধান উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন নি। আধুনিক উপন্যাসে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের উপন্যাসে তা' নেই—কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কাহিনী যতই কল্পনাপ্রধান হোক না কেন তা'তে স্নেহ-প্রেম, ঘৃণা-প্রতিহিংসা মানব-হৃদয়ের প্রবল বৃত্তিগুলি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তা' ছাড়া বিবাহ-সংস্কার গণ্ডির বাইরে নরনারীর মধ্যে যে প্রেম তা' বিষবৃক্ষের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণীয়—কৃষ্ণকান্তের উইলের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন সেটাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রাণপ্রবাহ। বস্তুতঃপক্ষে বাস্তব সমস্যাপ্রধান কাহিনী না হ'লেও অন্যান্য সকল দিক দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক উপন্যাসের জনক।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস সামগ্রিক এবং সার্থকভাবে সামাজিক উপন্যাস নয়। তবুও গোরা, নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে ইত্যাদির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পাত্র-পাত্রীর ঠিক বাস্তবের নয়—তবুও তাঁ'দের মধ্যে প্রণয়-রসের আবেগ-স্পন্দিত স্ফূর্তি বিশেষরূপে লক্ষণীয়। মনো-বিশ্লেষণের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ সার্থকতর। উভয় ঔপন্যাসিকের মধ্যে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাত্র-পাত্রী ( রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরাহ ) অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রী ( উচ্চশিক্ষিত ধনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ) অধিকতর বাস্তবের। শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রী অধিকতর সাধারণ স্তরের এবং সংগ্রামশীল বাস্তবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায় বাংলা সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের ক্রমপরিবর্তনের স্বরূপটি সুন্দররূপে ধরা পড়েছে: "দেবদেবী ছাড়িয়া রাজা-বাদশাহদিগের উপর ভর করিয়াছিলাম,—আর একটু নামিয়া ধরিয়াছিলাম উজীর-ওমরাহের দল—তারপর ধরিয়াছিলাম জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূঁঞাশ্রেণীর মানুষ,—তারপরে অবলম্বন করিলাম রাজধানীর অন্তর্গত তিনতলা বাড়িতে বাস এমন সব জাঁদরেল জাঁদরেল জীব ; কিন্তু আজ দেখিতে পাইতেছি, তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর ত্রিকোণাবর্ত প্রেমের বিলাস হইতে, তাহাদের শৌখীন সুখ-দুঃখের ইতিহাস হইতে ঘুটেওয়ালীদের লিমিটেড্ কোম্পানিটির ইতিহাসটিই বা ছোট কিসে? 'বাদশাহজাদী প্রেম জানে না—' কি জানে, সে কথা অনিশ্চিত, কিন্তু যে কাবুলিওয়ালাটির ময়লা ঢিলা জামার নীচে বুকের কাছে ছিল তাহার সুদূর পার্বত্যগৃহ-নিবাসিনী কন্যাটির হাতের ছাপ সে নিশ্চয়ই প্রেম জানে; 'মহেশে'র বিরহে 'আমিনা'র হাত ধরিয়া ভিটামাটি ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া অজানা পথে নিরুদ্দিষ্ট হইল যে দীনদুঃখী গফুর মিঞা সে নিশ্চয়ই প্রেম জানে।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব-সংসারের এই নিম্নস্তরের মানুষগুলি ভিড় জমিয়েছে। তা' ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলি যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাংলা উপন্যাসের অন্যত্র তা দুর্লভ। সামাজিক সমস্যাগুলির দিকেই শরৎচন্দ্র-দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। তিনি গভীরভাবে এই সমস্যা ও কুসংস্কারগুলি প্রত্যক্ষ করছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে হেনেছেন বজ্রকুঠার। পণ্ডিত-মশায়, মেজদিদি, বামুনের মেয়ে, দত্তা, চরিত্রহীন, দেবদাস, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে যে সমস্যা, যে সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টির যে অপূর্ব শিল্প-কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে তা' বাঙালী পাঠক-মাত্রকেই বিস্ময়ে নির্বাক করে দেয়। উপন্যাসের সংলাপ এবং ভাষা সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র অত্যাশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা যে সরল, সহজ, মসৃণ সুষমা-মহান্ ভাষা প্রত্যক্ষ করি আজ পর্যন্ত তা' অন্য কোথাও দেখা যায় নি। এ ভাষা, এ সংলাপ শরৎচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব—তাঁ'র শিল্প-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, শৈলজানন্দ, বনফুল, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। অতি আধুনিক কালের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, গোলাম কুদ্দুস, অশোক গুহ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম স্মরণযোগ্য। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা উপন্যাস ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে।

### গ ॥ বাংলার ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ও ক্রমবিকাশ ॥

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব-লগ্নটি সংশয়মণ্ডিত। অনেকে মনে করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত "অঙ্গুরীয় বিনিময়" (আনুঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ) গ্রন্থটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত।

এসম্পর্কে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংশয়মুক্ত হ'তে পারেন নি। যা' হোক বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে সামাজিক উপন্যাস অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশি পরিমাণে রচিত হয়েছিল। অবশ্য তা'দের মধ্যে সার্থক প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস ছিল না বলেই চলে। উপন্যাসগুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস না হ'য়ে 'সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণে' কিম্ভুতকিমাকার হ'য়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনার পূর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। "প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা ঘটনাবৈচিত্র ও বর্ণ-সম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে; অন্যদিকে আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি, উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।" বলা বাহুল্য প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঔপন্যাসিক মনোভংগী কোনটির পরিচয় মেলে নি। এর জন্যে প্রধান অন্তরায় ছিল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব। সুলিখিত ঐতিহাসিক উপাদান সম্বলিত কোন পুস্তক তখন ছিল না বললেই চলে। ফলে লেখকগণ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে গিয়ে ইতিহাসের অমর্যাদা করেছেন, কল্পনায় অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কতক-গুলি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসের উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যে ওয়াল্টার্স স্কট যে শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন—উপকরণের অনটনের জন্যে আমাদের সাহিত্যে তা' সম্ভব হয় নি। প্রথম যুগের কয়েকটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থানের (কাশ্মীর, বিক্রমপুর ইত্যাদি) নামেরই উল্লেখ আছে মাত্র—আসলে ইতিহাসের সাথে মূল কাহিনীর কোন সংযোগ-সূত্র নেই। বিনোদবিহারী গোস্বামীর 'পূর্ণশশী'—১৮৭৫ খ্রীঃ, ললিতমোহন ঘোষের 'অচলবাসিনী'—১৮৭৫ খ্রীঃ, হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী'—১৮৭৬ খ্রীঃ, কেদারনাথ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রকেতু'—১৮৭৭ খ্রীঃ, রাখালদাস গাঙ্গুলীব 'পাষাণময়ী' —১৮৭৯ খ্রীঃ, আনন্দচরণ মিত্রের 'রাজকুমারী'—১৮৮০ খ্রীঃ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অন্যতম। এবং এদের কোনটিই সার্থক উপন্যাস নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস, দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমের উপন্যাস এবং তৃতীয় শ্রেণীতে প্রাথমিক যুগে রচিত সমুদয় উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করতে চাই কেন না একমাত্র 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাসের কাহিনী ঐতিহাসিকতা বিশুদ্ধ নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সর্বাপেক্ষা বড় বাধা উপকরণের অনটন। বঙ্কিমচন্দ্র উপকরণের এই অভাব পূরণ করেছেন আপনার কল্পনার দ্বারা। আর কল্পনায় ভর করলেই ঘটনার ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। এই কল্পনা প্রবণতার জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'য়ে উঠতে পারে নি। অধিকাংশ সময় তিনি ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাকে উপেক্ষা করে' প্রেম-বিহ্বল নায়ক-নায়িকার চরিত্রচিত্রণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে এই ব্যস্ততা নিতান্ত ক্ষতিকর হ'য়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন : "মৃণালিনীতে

ঐতিহাসিক অংশ অতিশয় ক্ষীণ ও আনুমানিক বলিয়া মনে হয়। …দেবীচৌধুরাণীতে দার্শনিক তত্ত্বপ্রিয়তা ইতিহাসকে অভিভূত করিয়াছে। ইহা মূলতঃ পারিবারিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নহে। সীতারামও মূলতঃ চরিত্র-বিশ্লেষণের উপন্যাস; সীতারামের নৈতিক পদস্খলনের চিত্রটি ফুটাইয়া তোলাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য, ইতিহাস ইহার অপ্রধান অংশ মাত্র।…সেইরূপ চন্দ্রশেখরেও যে ঐতিহাসিক অংশটুকু আছে তাহাও আখ্যায়িকার মূল বস্তু নহে।” দুর্গেশনন্দিনীতেও ঐতিহাসিক অংশ অল্প, কেবল নায়ক ঐতিহাসিক পুরুষ। তবে দুর্গেশনন্দিনীতে লক্ষণীয় বিষয় হ'লো কল্পনা এবং অতিরঞ্জনের দ্বারা এর ঐতিহাসিকতা যতটুকু আছে—ক্ষুণ্ণ হয় নি। একমাত্র ‘রাজসিংহ’ই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের ঘটনাটি ঐতিহাসিক। চরিত্রাবলীও কল্পনার অবাঞ্ছিত প্রবেশে সমাচ্ছন্ন নয়। তথাপি ইতিহাসের বিশাল এবং সংগ্রামশীল ঘটনাসমূহের সাথে সাধারণ জীবনের সংযোগসূত্রের যে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসে তা' নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দোষ-দুর্বলতাগুলি রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে নেই। কল্পনা-শক্তিতে রমেশচন্দ্র বঙ্কিম অপেক্ষা দৈন্য—কল্পনার এই দীনতা তাঁ'র পক্ষে মঙ্গল ফলপ্রসূ হয়েছে। কল্পনার এই অনটনের জন্যে রমেশচন্দ্র হয়তো জীবন-সমস্যার গভীর গহনে প্রবেশ করতে পারেন নি কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনায় পবিত্রতা রক্ষিত হয়েছে। “রমেশচন্দ্র কল্পনার আতিশয্য বা আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে চাহেন নাই—পরন্তু যথাসাধ্য সত্যচিত্রণেরই প্রয়াসী হইয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ-বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যত দূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।”

‘বঙ্গ-বিজেতা’ (১৮৭৩ খ্রীঃ) লেখকের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে অপরিণত হাতের চিহ্ন ছাড়াও বহু দোষ-দুর্বলতা

প্রকট হ'য়ে উঠেছে, চরিত্রচিত্রণের দুর্বলতার তো কথাই নাই তথাপি ঘটনার ঐতিহাসিকতা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ' ( ১৮৭৬ খ্রীঃ ) লেখকের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির একটি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ অত্যন্ত অল্প তথাপি ঘটনার বিকৃতি কোথায় ঘটে নি। চরিত্র সৃষ্টিতে এ উপন্যাসে লেখক আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮ খ্রীঃ) এবং 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯ খ্রীঃ) কেবল রমেশচন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়—বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। এ গ্রন্থ দু'টিতে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রবলী সন্নিবেশিত হয়েছে তেমনি বর্ণনাভংগী এবং ইতিহাসের বিপুলবেগ আমাদিগকে আবেগে স্পন্দিত করে।

এর পর যাঁ'রা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তাঁ'দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রাখালদাসের কৃতিত্ব সমধিক। বর্তমান কালে এই সমস্যাবহুল জীবনে ও অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে আর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে না। অবশ্য প্রমথনাথ বিশী মহাশয় "কেরী সাহেবের মুন্সী" রচনা করে' যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন কিন্তু এ গ্রন্থে ইতিহাসরস কতখানি রক্ষিত হয়েছে সে বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখন পুরাতন ঘটনার রোমন্থন অপেক্ষা সমস্যাকীর্ণ জীবন-চিত্রায়নের দিকেই বাংলার ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নিবদ্ধ।

# ॥ কাব্যালোক ॥

## ॥ এক ॥

সাহিত্য-স্বরূপ ও তত্ত্বালোচনায় আমাদিগকে সহসা বহুতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। এদের দর্শন যত সুলভ, বলা বাহুল্য সমাধান তত সহজ নয়। স্মরণাতীত কালে কোন শুভক্ষণে এক হৃদয়বান চিন্তাশীল মানব-মনের গহনাগারে চকিত-ইশারায় এদের জন্ম, তারপর চিন্তা-প্রবাহের খাত পেরিয়ে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে বহু হৃদয়ে বহু মনে বহু ভাবে এরা লালিত-পালিত হয়েছে —কিন্তু এই লালন-পালনে সমস্যা-গ্রন্থি শিথিল না হ'য়ে অধিকতর জটিল আকার ধারণ করেছে—মুক্তিলীলা ক্রমান্বয়ে সুদূর পরাহত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্যমান বিষয় নাট্যরস এবং কাব্যরসকে কেন্দ্র করেও অনুরূপ জটিলতর পরিস্থিতির সৃষ্টি।* এই উভয় রসকে কেন্দ্র করে' যে জিজ্ঞাসাগুলি দানা বেঁধে উঠেছে সেগুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারেঃ নাট্যরস এবং কাব্যরস কী? কাব্য নাট্যগুণ সম্পন্ন কিনা? উভয় রসের মধ্যে কোন্ রস শ্রেষ্ঠ? ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব বিভিন্ন দলের বাদানুবাদের মসীযুদ্ধ-জটিলতা পরিত্যাগ করে' আমাদের আলোচনায় উভয় দলের সত্য-সার গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

নাট্যরস-সম্পর্কিত আলোচনা যে কত প্রাচীন তা' আজ নিশ্চিত করে' বলার কোন উপায় নেই—তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভরতমুনির গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি পাশ্চাত্ত্য মনীষী আরিস্টটলের ন্যায় মনে করতেন নাটক কাব্য অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট। ভরতমুনি কাব্য এবং নাটক উভয়কেই কাব্য বলেছেন। কাব্য হ'লো শ্রব্য এবং নাটক হ'লো একই কালে শ্রব্য এবং দৃশ্য। তাঁ'র মতে শ্রব্য-কাব্য

বা মহাকাব্য অপেক্ষা শ্রব্য ও দৃশ্য-কাব্য বা নাটক অনেক বেশি শক্তিশালী, পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মনে নাট্যরসের প্রভাব সুদূর-প্রসারী। কেননা কাব্য কেবল পাঠ্য—পাঠককে পাঠ করে' তবে তা'র থেকে রস গ্রহণ করতে হয় কিন্তু নাটক অভিনীত হয়। ফলে তা'র অন্তর্নিহিত ভাবধারা স্পষ্ট হ'য়ে দর্শককে বিস্ময়-বিমণ্ডিত করে' দেয়। কাব্যের রসধারা অস্পষ্ট। নাটকের রসধারা স্পষ্ট। একটি সুপ্ত অপরটি জাগ্রত।

আনন্দবর্ধন কিন্তু নাটককে কাব্যের উপরে স্থান দেন নি—তিনি নাটক এবং কাব্যকে এক সমভূমিতে দাঁড় করিয়ে উভয়কে সমান বলেছেন। রস সম্পর্কে তাঁ'র কাছে কাব্য ও নাটক উভয়ে সমান। রসই কাব্য এবং নাটক উভয়েরই প্রাণ।

এর পর ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট ইত্যাদি লেখকগণ কাব্য এবং নাটককে এক বলে স্বীকার করলেও রসকেই কাব্যের প্রাণ বলেন নি। তাঁদের কারো মতে রস কাব্যের অলংকার আবার কারো মতে একটি গুণ মাত্র।

কাব্য এবং নাটক যে এক এবং উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য নেই—এই মত একাদশ শতাব্দীর লেখক অভিনব গুপ্তের মধ্যে সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যাবলী যেমন দর্শকের সম্মুখে স্পষ্টালোকে উদ্ভাসিত হয় তেমনি কাব্য পাঠের সময়ও পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে কাব্যে বর্ণিত দৃশ্যাবলী মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। সুতরাং কাব্য এবং নাটকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই অভিনব গুপ্ত ঘোষণা করলেন: "কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব। কাব্যং চ নাট্যমেব।" অর্থাৎ "কাব্য প্রধানতঃ দশরূপক বা নাটকসমূহের স্বভাব-সম্পন্ন। কাব্য বস্তুতঃ নাট্যই।"

তবে এখানে বিশেষরূপে লক্ষণীয় বিষয় এই অভিনব গুপ্ত কাব্য বলতে কেবলমাত্র মহাকাব্য বা আখ্যানমূলক কাব্যকেই বুঝেছেন কোন গীতিকাব্য বা নিসর্গ কাব্যকে বোঝেন নি। মহাকাব্য

বা আখ্যানমূলক কাব্য মূলতঃ অসংখ্য ঘটনার বাস্তবালেখ্য। মহাকাব্য ঘটনামুখর এবং ঘটনা-প্রবাহে তা' গতিশীল—একটির পর একটি ঘটনা সমগ্র মহাকাব্যের কাহিনীকে দ্রুত সঞ্চারমান রাখে। নাটকও মুখ্যতঃ ঘটনা-কেন্দ্রিক—ঘটনার উত্থান-পতনেই নাটকের বক্ষ আবেগে কম্পমান। সুতরাং মহাকাব্য বা আখ্যান-কাব্যের সাথে নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান—উভয়েই ঘটনা-মুখর। সুতরাং আখ্যানমূলক নাট্যধর্মী কাব্য এবং নাটকের প্রাণ যে রস এবং উহারা যে একই ধর্মানুসারী সে বিষয়ে বড় একটা মতভেদ নেই। কিন্তু গীতিকাব্য বা নিসর্গকাব্য নাট্যগুণসম্পন্ন নয়—এখানেই কাব্য এবং নাটক দুই স্বতন্ত্রধারায় বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে, এবং এখানেই রচিত হয়েছে উভয়ের মাঝে দুরতিক্রমী ব্যবধান।

গীতিকাব্য কবির আত্মলীন অভিব্যক্তি, নাটক কবির বস্তুলীন প্রকাশ। একটি অন্তর্মুখী, অপরটি বহির্মুখী। একটি ঘটনাবিহীন, কবি-মনের রূপালপনা অপরটি ঘটনা-কল্প কবি-মনের সরব ঘোষণা। সুতরাং উভয়ে এক হ'তে পারে না। ফলে সমস্ত কাব্য নাট্যধর্মী নয়। শ্রদ্ধেয় সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় তিনটি যুক্তি নির্দেশ করে' 'কাব্যং চ নাট্যমেব' এই মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত করেছেন।

১॥ শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রথম যুক্তি অনুযায়ী কাব্য যতই নাট্যগুণ সম্পন্ন হোক না কেন উভয়ের আস্বাদন সমান নয়। কেননা নাটকে লেখক কেবলমাত্র পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় থাকে যেগুলি সহৃদয় পাঠক-মনের অনুভূতি ছাড়া পাত্র-পাত্রীর মুখনিসৃত বাণীতে প্রকাশিত হ'তে পারে না। নাটকের প্রকাশধর্মিতা এখানেই পরাজিত এবং সীমিত। কবিকে কিন্তু এই বাঁধনের পীড়নে পীড়িত হ'তে হয় না। যে বিষয়গুলি পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হ'লো না সে বিষয়গুলি কবি স্বয়ং কাব্যের মধ্যে

গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে' প্রকাশ করে' দেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষরূপে স্মরণ-যোগ্য: "যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না; কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাট্যকারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অনমুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধহৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি হ'তে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কাব্য ও নাটক এক নয়। নাটকের যে গুণ তা' তো কাব্যে আছে উপরন্তু কাব্যের আছে একটি নিজস্ব গুণ যা নাটকে অনুপস্থিত। যা নাটকে বা পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রকাশিত হ'লো না তা' কবি প্রকাশ করলেন স্বয়ং—আপনার মনের মাধুরী দিয়ে। হাতে তাঁ'র মুরজ মুরলী—সে অমিয় তানে পাঠক-শ্রোতা বিভোর—তন্ময়। নাটকের এই মোহিনী শক্তি কোথায়?

২ ॥ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্তের দ্বিতীয় যুক্তিও বিশেষ মূল্যবান। তাঁ'র মতে নাটক অপেক্ষা কাব্যের আস্বাদনে পাঠক-চিত্ত অধিকতর আনন্দ-উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। নাটকের আস্বাদ পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের উপর নির্ভর করে বলে তা' স্পষ্ট বলিষ্ঠ কিন্তু স্থূল। একান্তভাবে পরিদৃশ্যমান বলেই পাত্র-পাত্রীর অভি-নয়াদি আমাদের চিত্তের গহন দ্বারে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কাব্যপাঠের সময় পাঠকের মন হ'য়ে ওঠে ক্রম-অন্তরমুখীন। কাব্যে বর্ণিত সকল বিষয় পাঠককে

আস্বাদন করতে হয় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাই কাব্যের সকল বিষয় পাঠকের বিপুল-বিস্তারী বাসনালোকে অপূর্ব আলোড়ন-আন্দোলন, রোমাঞ্চ-শিহরণ জাগ্রত করে। কাব্যরস প্রধানতঃ পাঠকের কল্পনা এবং ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করে বলেই সে রস সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাধর্মী, অধিকতর সৌন্দর্য-সুষম। নাট্যরস যেখানে কেবলমাত্র 'সুন্দর' কাব্যরস-প্রবাহ সেখানে সুন্দরের তটভূমি বিদীর্ণ করে' 'মনোহরে'র বিপুল মোহনা স্পর্শ করে।

৩॥ কাব্য যে নাট্যগুণসম্পন্ন নয় সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্তের তৃতীয় মন্তব্যটি অধিকতর মূল্যবান। তিনি বলেছেন "নাটকে যে সকল রস থাকিতে পারে, মহাকাব্যে বা আখ্যানমূলক কাব্যে তাহা থাকিতে পারেই, গীতিকাব্যেও থাকিতে পারে। কিন্তু অবক্তব্য অংশের প্রকাশ হেতু কাব্যে এমন কতকগুলি রস থাকিতে পারে ও আছে, খাঁটি নাট্যকাব্যে যাহাদের থাকা সম্ভব নয়।"

আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র রসকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—অভিনেয় রস ও অভিধ্যেয় রস। যে রসের অভিনয় করা চলে তাই অভিনেয় রস নাট্যরস। বীরের কার্যাবলীতে বীররস প্রকাশমান, সুতরাং বীররস অভিনেয় কিন্তু অনেক রস আছে যা' অভিনয়ে প্রকাশ করা যায় না, বিশেষরূপে চিন্তা করে' আস্বাদন করতে হয়, পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা যে রস গ্রহন মনে জাগ্রত হয় তাই অভিধ্যেয় রস। শান্ত, বাৎসল্য, ভক্তি ইত্যাদি রসগুলিকে অভিনয়ের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করা কখনই সম্ভব নয়। এরা কোন ঘটনার আবর্তে প্রকাশিত হয় না—এরা অভিনয়ের অতীত। সুতরাং এ রসগুলি অভিধ্যেয় রস। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার রসও এই অভিধ্যেয় রসের অন্তর্গত। কেননা গীতিকবিতার অন্তরপ্লাবী রসকে তো কোন ঘটনার আবর্তে ফেলে, অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা চলে না। গীতিকাব্যের রসকে অভিনয়ে প্রকাশিত করা চলে না—কিন্তু তা'রা তো প্রকাশিত হয়। অভিনয়ের মাধ্যমে যখনই রসের প্রকাশ স্তব্ধ হ'য়ে যায় তখনই কবি আসেন অগ্রসর হ'য়ে—অলংকার,

উপমা ইত্যাদির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অতলান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশ হ'তে সুকৌশলে তুলে আনেন অযুত মণি-মাণিক্য, বিকশিত করে' দেন সৌন্দর্য-পদ্মের সুষমা-সম্ভার। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতা :

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।

"হৃদয়ের নাচ' কে দেখাবে অভিনয় করে? 'শতবরণের ভাব-উচ্ছ্বাস'কেই বা কে প্রকাশ করবে? এ কেবল কবির 'জীয়ন-কাঠি'র স্পর্শেই সম্ভব—অন্যত্র নয়।

বৈষ্ণবপদাবলী হ'তে বিদ্যাপতির আর একটি কবিতা :

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহে ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥...

এখানে মানব-চিত্তের স্থায়ী ভাবটি করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনিতে জীবন্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে শ্রীরাধা আলম্বন-বিভাব, অনুভাব কিংবা সঞ্চারী ভাব নেই, আছে প্রবল উদ্দীপন বিভাব। নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালা, বর্ষণোন্মুখ শাওন-রাত্রি, মাহে ভাদরের নির্জন বর্ষণমুখর নিশীথে শ্রীরাধার অন্তরের তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলন-মিথুন দাদুরির আনন্দ-সিক্ত মত্ততা এবং সর্বোপরি অবিরল বর্ষণ-সিক্ত নিশীথের সুকোমল পরিবেশ—এই সকল উদ্দীপন-বিভাব শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত বেদনা-ব্যাকুল শৃঙ্গার রসকে অভিনব আলোকে

সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। এই অভিনব পরিবেশেই শ্রীরাধার ক্লান্ত-কণ্ঠের ব্যাকুল আর্তি : 'এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর।' কাব্যের বিভিন্ন উপাদানজাত শ্রীরাধার বিরহ-ম্লান মনের এই যে আনন্দ-ঘন, বেদনা-বিধুর প্রকাশ—নাটকে এর সম্ভাবনা কোথায়? অন্ততঃ সেখানে এই অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত হ'তে বাধ্য। আমরা পূর্বেই বলেছি এই কবিতায় অনুভব নেই, সঞ্চারী ভাবও বিরল-প্রায় তথাপি রস স্ফুরণের দিক দিয়ে তো এ কবিতা তুলনারহিত। সুতরাং এ কবিতার রসকে বিকলাঙ্গ বলবে কে? এ তো চরম পূর্ণতারই প্রতীক।

সুতরাং সকল দিক দিয়ে বিচার করলে 'কাব্যং চ নাট্যমেব' এই মন্তব্য একান্ত দুর্বল হ'য়ে পড়ে। বস্তুতঃ নাট্যরস এবং কাব্যরস এক ও অভিন্ন নয়। নাট্যরসের সকল গুণ কাব্যরসে বর্তমান কিন্তু কাব্যরসে যা' আছে নাট্যরসে তা' নেই। নাট্যরসের বাইরে কাব্যরস আছে—সেই রসই অভিধ্যেয় রস। "ইহা উপাদান-বিচারে কখনও বা পূর্ণাঙ্গ, কখনও বা বিকলাঙ্গ, কিন্তু রসের স্বরূপ-বিচারে সর্বদাই সমান ও সম্পূর্ণ।"

## ॥ দুই ॥

ক ॥ স্থায়ীভাব : মানব-চিত্তকে ঘিরে কয়েকটি ভাব স্বতন্ত্র এবং স্থায়ীরূপে বর্তমান—এই ভাবগুলিকে স্থায়ীভাব বলে। কোন বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে' রাখার প্রয়োজন এদের নেই এবং এরা স্ফুলিঙ্গের মত চকিতে ঝলকিত হ'য়েই মিলিয়ে যায় না। মানবের আদিমতম প্রবৃত্তির সাথে এদের সুনিবিড় যোগ বর্তমান। গ্লানি সাময়িক ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে' আবার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়—কিন্তু রতি? রতি তো এমন ভাবে কখনো মিলিয়ে

যায় না। মানবের আদিতম সত্তার সাথে তা'র যোগ অবিচ্ছেদ্য। তাই রতি স্থায়ীভাব। পণ্ডিতগণ ন'টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ করেছেন —রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, এবং কাম। 'শকুন্তলা' নাটকের স্থায়ীভাব রতি।

খ ॥ বিভাব : স্থায়ীভাবগুলি যে মানব-চিত্তে স্থায়ীরূপে বিরাজমান সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই স্থায়ীভাবগুলি সর্বদা জাগ্রত থাকে না—বিশেষ কারণে তা'রা সুপ্ত অবস্থা হ'তে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। যে কারণে বা যা'র দ্বারা এই সুপ্ত স্থায়ীভাব জাগ্রত হ'য়ে ওঠে তা'কে বলে বিভাব। বিভাব দুই প্রকার : ১ ॥ আলম্বন বিভাব ২ ॥ উদ্দীপন বিভাব।

১ ॥ আলম্বন বিভাব : যে বস্তু অবলম্বন করে' রস উৎপন্ন হয় তা'কে আলম্বন বিভাব বলে। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। কেননা শকুন্তলা নাটকের স্থায়ীভাব যে রতি—দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে কেন্দ্র করেই তা'র জন্ম, লালন, পালন এবং বিকাশ।

২ ॥ উদ্দীপন বিভাব : যে বস্তু রসকে উদ্দীপ্ত করে তা'ই উদ্দীপন বিভাবের অন্তর্গত। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বহুবিচিত্র বেশভূষা এবং মালিনী-তীর পুষ্পোদ্যান, কোকিল-কূজন, জ্যোৎস্না-লোকিত রজনী ইত্যাদি সকলেই নাটকের কেন্দ্রীয় রস শৃঙ্গারকে (ভাবঃরতি) উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করেছে। সুতরাং এগুলিই উক্ত নাটকের উদ্দীপন বিভাব।

গ ॥ অনুভাব : যা' আলম্বন বিভাব অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদিগের কার্য, যে কার্য্যাবলী দিয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ভাব-প্রবাহকে উপলব্ধি বা অনুভব করা যায়—তাই অনুভাব। শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার ছল করে' পদতল হ'তে কুশ-কণ্টক উন্মোচনের চেষ্টা, দীর্ঘনিশ্বাস, কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা শকুন্তলার হৃদয় যেন আমাদের নিকট উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠে। সুতরাং কটাক্ষ ইত্যাদি কার্যগুলিই এ নাটকের অনুভাব।

ঘ॥ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব: যে ভাবসমূহ স্থায়ী ভাবরাজীর পরিপোষক তা'কে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে। এদের কোন স্থায়ী রূপ নেই—মুহূর্তে উদয় মুহূর্তে বিলয়। এরা সকল সময়েই আত্মদান করে' মূল ভাবের পরিপোষণ করে। শকুন্তলা নাটকে চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, স্মৃতি, হর্ষ ইত্যাদি সকলই সঞ্চারী ভাব। কেননা এই চিন্তা, হর্ষ এদের কোন স্থায়ী রূপ নেই—অথচ এরা সকল সময় মূল রতিকেই পরিপোষণ ও পরিবর্ধন করে। এরা সকল সময় মূল ভাবের অভিমুখে বিচরণ বা সঞ্চরণ করে বলেই এদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলা হয়।

ঙ॥ বিভানা ব্যাপার: যে ব্যাপার দ্বারা পাঠক-চিত্তে লৌকিক জগতের নায়ক-নায়িকা-স্থিত রতি ইত্যাদি স্থায়ী ভাবগুলি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে রসে পরিণত হয় তা'কে বিভানা ব্যাপার বলে। বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের সাহায্যেই বিভানা ব্যাপার সুসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা নাটকে আলম্বন বিভাবের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ( নায়ক-নায়িকা ), উদ্দীপন বিভাবের পরিবেশ ( জ্যোৎস্না, কুসুম-কানন, কোকিল-কূজন ইত্যাদি ) এবং অনুভাবের কার্য্যাদি ( কটাক্ষ, দীর্ঘনিশ্বাস ইত্যাদি ) সকলে মিলে মূল ভাবরতিকে শৃঙ্গার রসে পরিণত করেছে। সুতরাং এই বিভাব ( আলম্বন, উদ্দীপন ) এবং অনুভাবের সাহায্যেই বিভানা ব্যাপার—অর্থাৎ লৌকিক ভাবকে অলৌকিক রসে পরিণত করা—সুসম্পূর্ণ।

চ॥ সাধারণীকরণ: আমাদের আপন আপন সদাজাগ্রত ব্যক্তিত্ব-বিসর্জিত হ'য়ে যখন নাট্যকাব্য-চিত্রিত চরিত্র ভাবের সাথে আমাদের মনের একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা'কেই সাধারণীকরণ বলে। একটি উদাহরণে বিষয়টির আপাত-জটিলতা দূর হবে। প্রেক্ষাগৃহে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্যে নানা জাতীয় দর্শকের আগমন হয়। কেউ উকিল, কেউ অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার, কেউ কবি, আবার কেউ বা শোকাতুর, কেউ বা বিরহ-কাতর। পেশাতে যেমন সকলে ভিন্ন তেমনি মানসিক অবস্থাতেও এক নয়। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহের

মধ্যে সকলেই আপন আপন ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন—একটি পৃথক্ ব্যক্তিসত্তা সকলকে পৃথক্ ক'রে রেখেছে। হঠাৎ আলো নিভে গেল—যবনিকা উত্তোলনের সংকেত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এই অবস্থাতে সকলের দৃষ্টিই যবনিকার দিকে নিবদ্ধ, কেবল নিবদ্ধ নয় সকলেই আপন ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে গিয়ে আকুল আগ্রহে নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্যে অপেক্ষ্যমান। এখানে সকলেই পেশাগত পার্থক্য ভুলে, মানসিক বিভিন্নতা বিস্মৃত হ'য়ে—একটি সর্বসাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন—এর নামই সাধারণীকরণ। কাব্য পাঠের সময়ও আমরা আমাদের পৃথক্ ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে চরিত্রাদির ব্যথা-বেদনায় অশ্রুবিসর্জন করি, তা'দের আনন্দ-উপভোগে নিজদিগকে ধন্য মনে করি। এখানেও আমরা সাধারণীকরণের মধ্যে এক হ'য়ে যাই।

ছ॥ অঙ্গীরস: একটি কাব্যে বা নাটকে একাধিক রস থাকতে পারে—তা'দের মধ্যে একটি রস প্রধান বা মুখ্য হ'য়ে সকল রসকে আচ্ছন্ন করে' দেয়—এই মুখ্য রসটিই অঙ্গীরস। 'ওথেলো' নাটকের অঙ্গীরস করুণ।

জ॥ দীপ্তিকাব্য ও দ্রুতিকাব্য: নিখিল বিশ্বের বাইরের বস্তুর সাথে আমাদের গহন মনের দু'টি সম্পর্ক আছে—একটি বোধময় অপরটি ভাবময়, একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অপরটি হৃদয়ধর্মী। একটিকে বুদ্ধি দিয়ে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি অপরটি অনুভাবের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কাব্যেরও দু'টি রূপ—একটি দীপ্তিকাব্য অপরটি দ্রুতিকাব্য। দীপ্তিকাব্য তা'কেই বলব, যে কাব্যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত, হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্য অপেক্ষা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে বহুল পরিমাণে বর্তমান। 'দীপ্'+করণ বাচ্যে 'ক্তি'=দীপ্তি। আর দ্রুতিকাব্য সেই ধরনের কাব্য যেখানে ভাব-সঞ্চার এবং রসনিষ্পত্তির জন্য হৃদয় বিগলিত অথবা বিদ্রুত হ'য়ে যায়। 'দ্রব'+করণ বাচ্যে 'ক্তি'=দ্রুতি।

ঝ॥ বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ: সুন্দরী রমণীগণের দেহ এবং লাবণ্যের মত শব্দেরও দু'টি অর্থ আছে। একটি হ'লো বাচ্যার্থ এবং অপরটি

হ'লো ব্যঙ্গার্থ। শব্দের শব্দগত বা বাচ্যগত অর্থ অর্থাৎ আভিধানিক অর্থই হ'লো বাচ্যার্থ এবং যে অর্থ বাচ্যের অতীত, আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে' এবং নতুন অর্থের সৃষ্টি করে তাই ব্যঙ্গার্থ। লাবণ্য যেমন দেহ হ'তে অবিচ্ছিন্ন নয় আবার একও নয় তেমনি ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থ হ'তে বিভিন্ন নয় আবার একও নয়। বাচ্যকে অবলম্বন করেই তা'র জন্ম তবুও সে বাচ্যাতীত।

॥ *তিন* ॥

ভাবসমূহকে স্থায়ী এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারীরূপে বিভাগ করার স্বার্থকতা কী এ প্রশ্ন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে। ভরতমুনি তাঁ'র নাট্যশাস্ত্রে সর্বপ্রথম ভাবের এ দু'টি বিভাগ করেছেন। বলা বাহুল্য এই বিভাগ প্রাচীন আচার্যগণের গভীর বিশ্লেষণাত্মক অন্তরদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

কয়েকটি ভাব আছে যা'রা কেবল মানবের নয়, নিখিল প্রাণী জগতের অন্তরদেশ দিয়ে নীরব ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। রতি, ক্রোধ, ভয়, শোক এই ভাবগুলি মানব-পশু ইত্যাদি প্রাণী মাত্রেরই সকলের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত। আবার হাসি, উৎসাহ, জুগুপ্সা এবং বিস্ময় এই ভাবগুলি প্রধানতঃ মানব-চিত্তস্পর্শী। গাভীর মধ্যে ভয় আছে, ক্রোধ আছে। যখন সে লেজ গুটিয়ে পালায় তখন তা'র মধ্যে ভয় প্রধান, আর ক্ষুদ্র শিং দু'টিকে সবেগে আন্দোলিত করে, যখন তেড়ে আসে তখন সে ক্রোধকেই প্রকাশ করে। কিন্তু ভয় বা ক্রোধ থাকলে গাভীর মধ্যে হর্ষ নেই—হম্বা রবের বদলে যদি সে কোনদিন খিলখিল করে' হাসতে হাসতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতো তা' হ'লে সেটা পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় হ'তো। যা' হোক রতি, হাস ইত্যাদি এই ভাবগুলি কেবলমাত্র মানবের

মনলোকেই বিরাজমান। অনাদি অতীতে মানব-মনে যেমন এগুলি প্রবল ছিল তেমনি অনাগত ভবিষ্যতেও এগুলি মানব-চিত্তকে আলোড়ন-বিক্ষুব্ধ করবে। এরা চিরস্থায়ী। বিভাব, অনুভাব ইত্যাদি ভাবগুলি এদের আশ্রয়ে পুষ্ট হ'য়ে অনুবর্তন করে। এদের বিনাশ নেই, মানব-চিত্ত হ'তে নির্বাসন নেই—স্বতন্ত্রভাবে মানস-লোকে এদের শাশ্বত এবং চিরন্তনী অধিষ্ঠান। এইজন্যই এরা স্থায়ীভাব। এই স্থায়ীভাব অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই মানব-জগতে চিরন্তন সাহিত্য হ'য়ে উঠে। স্থায়ীভাব হ'তেই স্থায়ী সাহিত্য। স্থায়ী-ভাব অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেছিলেন বলেই ভার্জিল, হোমার, সেক্সপীয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, হাফেজ, শাদী অমর—এঁদের কাব্য নিত্যকালের মানব-সমাজের চরম পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ভরতমুনি কেবল 'ব্যভিচারী' কথাটি উল্লেখ করেছেন—'সঞ্চারী' শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। যা' হোক তাঁ'র ব্যাখ্যায় ব্যভিচারী ভাবের স্বরূপ ইত্যাদি বিশেষ রূপে ব্যাখ্যাত হয় নি। পরবর্তী কালের আচার্যগণ, বিশ্বনাথ ইত্যাদির ব্যাখ্যায় আমরা বিশদ ব্যাখ্যাসহ সঞ্চারী কথাটিও পাই। রতি ইত্যাদি স্থায়ীভাবগুলি যেন বিশাল সমুদ্র আর ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবগুলি যেন তা'র উপরিভাগের লীলা-চঞ্চল তরঙ্গ। এই তরঙ্গমালা একবার উদ্দাম হ'য়ে উচ্চশির হচ্ছে আবার পরক্ষণে অতল তলে মিলিয়ে যাচ্ছে। এদের কোন স্বতন্ত্র স্থায়ী অস্তিত্ব নেই—এরা কাব্যে সর্বদাই কোন না কোন স্থায়ীভাবের অধীন হ'য়ে প্রকাশ পায়। স্থায়ীভাবের পরিপুষ্টি সাধনই এদের লক্ষ্য। স্থায়ীভাবের আলোচনায় আমরা দেখেছি স্থায়ীভাব অবলম্বনে স্থায়ী কাব্য রচনা সম্ভব—কিন্তু সঞ্চারী ভাব নিয়ে অনুরূপ কাব্য রচনা সম্ভব নয়। হর্ষ একটি সঞ্চারী ভাব—কিন্তু কেবল 'হর্ষ'কে নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এই সঞ্চারী ভাবকে অবলম্বন করে' অনেক 'কমিক' বা 'ফার্স' জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে কিন্তু একটু গভীর করে' দেখলেই

বোঝা যাবে এই সকল গ্রন্থের মূলে সর্বদাই কোন না কোন স্থায়ী-ভাব বর্তমান। সেই স্থায়ীভাবকে কেন্দ্র করেই 'হর্ষ' ইত্যাদি সঞ্চারী ভাবগুলি আলোড়িত হয়েছে মাত্র। ঠিক একই কারণে নিদ্রাকে নিয়ে কোন 'নিদ্রা-সংহার কাব্য' রচিত হয় নি
ভাবকে স্থায়ী এবং সঞ্চারী রূপে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানেই। যদিও উভয়েই ভাব তবুও একটি আসল অপরটি নকল। উভয়ের মাঝে এইভাবে বিভেদের সীমারেখা টানায় আসলটি গ্রহণ করার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হয়েছে। অমৃত এবং জল উভয়ই পানীয়—তবুও একটি পান করে' মানুষ বাঁচে, অপরটি পান করে' মানুষ হয় চিরঞ্জীবী।

॥ *চার* ॥

রস অনুভূতির জিনিস, হৃদয়-মনে আস্বাদের জিনিস—তবুও বলা হয়েছে রস অভিব্যক্ত হয়—প্রকাশিত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে মন্তব্যটি আপাতবিরোধী। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মন্তব্যটি হ'তে আমরা সমন্বয়ধর্মী সত্য-সার গ্রহণ করতে পারবো।
রস নিষ্পত্তি হয় এই কথাটি আমরা প্রথম পেয়েছি ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে। রস সম্বন্ধে তাঁ'র বহু-খ্যাত উক্তিটি এই :

নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে
তত্র বিভাবানুভাব-ব্যভিচারী-সংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ।

॥ নাট্যশাস্ত্রঃ ৬।৩৪ ॥

ভরতমুনির উক্তির সর্বশেষ শব্দ দু'টি 'রস-নিষ্পত্তিঃ' এই মন্তব্যের সূতিকাগার। এই 'নিষ্পত্তি' শব্দটিকে নিয়েই যত বাদানুবাদ। আচার্যগণ শব্দটির অর্থ যথাক্রমে উৎপত্তি, অনুমতি, ভক্তি ও

অভিব্যক্তি বলে ধরেছেন। ভরতমুনি ব্যবহৃত এই মন্তব্যটিকে গ্রহণ করে' মর্মভট্টও বলেছেন রস নিষ্পত্তির কথা। এ বিষয়ে বিভিন্ন আচার্যগণের বিজ্ঞ উক্তির জটিলতা যতদূর সম্ভব পরিহার করে' আমরা বিষয়টিকে জটিলতামুক্ত করতে চেষ্টা করবো।

রস মানসিক অবস্থার স্ফুরণ। তাই জ্ঞানের উৎপত্তির উপাদানের মত রসেরও দু'রকম উপাদান আছে—বাহ্যিক এবং মানসিক। রস সৃষ্টিতে বাহ্যিক উপাদান কিন্তু বাইরে থেকে আসে না—আসে কবি-সৃষ্ট কাব্য-জগৎ থেকে। আর মানসিক উপাদান আসে গহন মনে সুপ্ত ভাবরাজী বা ইমোশনগুলি হ'তে। বস্তুতঃ এই ভাব বা ইমোশনই হ'লো মানসিক উপাদান। আলংকারিকের মতে কাব্যের ঐ বাহ্যিক উপাদান এবং মানসিক উপাদানের সঙ্গে যখন রাসায়নিক সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখনই সৃষ্টি হয় রসের। 'শোক' একটি মানসিক উপাদান বা 'ভাব'। কিন্তু কেবলমাত্র এই শোকই কাব্য হ'য়ে উঠতে পারে না। যদি তা' হ'তো তা' হ'লে পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনই কাব্য হ'য়ে উঠতো। কবি যখন প্রতিভা বলে এই লৌকিক শোক এবং তা'র কারণকে অলৌকিক কাব্যের মাধ্যমে সুনিপুণ সন্নিবেশে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন তখন আমাদের সমগ্র চিত্ত অদ্ভুত বিস্ময়ে বিমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জাগে চরম বিস্ময়। এই বিস্ময় এতই আনন্দময় এবং দুর্নিবার যে সে সুখ-ব্যঞ্জনগর্ভ ধারায় আমাদের সমগ্র দেহমন স্নাত হ'য়ে ওঠে। আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দুঃখাদি বিস্মৃত হ'য়ে সেই আনন্দ সুধাকে আকণ্ঠ পান করি। এই আনন্দই হচ্ছে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই আনন্দের আর এক নাম দিয়েছেন 'অলৌকিক চমৎকার।' বাস্তব জীবনে দুঃখ আছে আবার সুখও আছে কিন্তু সে সুখ-দুঃখের আস্বাদ এই ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর নয়। এই লৌকিক সুখ-দুঃখকে কবি আপন 'জারক রসে জরিয়ে' আপনার প্রচণ্ড হৃদয় উত্তাপে গলিয়ে কাব্য-জগতে সর্বসাধারণের অন্তরপ্লাবী

আনন্দের উৎস করে' তোলেন। এই আনন্দ-প্লাবনে আমাদের চিত্তের চার পাশে প্রাত্যহিক সংসারের গড়া প্রাচীর ভেঙে পড়ে, চিৎসত্তা আপন স্বরূপে আপনার অন্তরে রসের আস্বাদ উপলব্ধি করে। দু'কূল ভাঙা জোয়ার প্লাবনে রস তো তখনই প্রকাশিত হয়—অভিব্যক্তি লাভ করে। শাস্ত্রকারের কণ্ঠে তাইতো শুনি:
"রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেবরসঃ।"
আমাদের আলোচনার বিস্তৃত বপুকে সংযত করে' বলা যায়: সাধারণ অবস্থায় রসের প্রকাশ সম্ভব নয়। মানসিক উপাদান পাঠক-চিত্তে সুপ্ত আর বাহ্যিক উপাদান কাব্যের পৃষ্ঠায় নির্বাক্। পাঠকালে এই উভয়ের সংমিশ্রণে প্রকাশিত হয় রস—কাব্যপাঠের আনন্দ থেকে উৎপন্ন অনুকূল পরিবেশেই পাঠক গ্রহণ করে সে রসের মর্ম-নির্যাস। রস অভিব্যক্ত হয় বলার চরম সার্থকতা এখানে নিহিত।

## ॥ পাঁচ ॥

রস অভিব্যক্ত হয়—এই মন্তব্যের মূলেই রস যে অলৌকিক এই বিষয়ের সার নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা সূত্রাকারে রসকে কেন অলৌকিক বলা হয় সে বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করব।
বাহ্যিক এবং মানসিক এই দুই উপাদানের রাসায়নিক সংযোগেই রসের সৃষ্টি। বাহ্যিক উপাদান পাই কবির সৃষ্ট কাব্য-জগৎ থেকে। এই বাহ্যিক উপাদান অবশ্য কবি গ্রহণ করেছেন বাস্তব-জগৎ থেকেই। কিন্তু কাব্য পাঠকালে পাঠক সেটি গ্রহণ করে' কাব্য-জগৎ থেকে—বাস্তব-জগৎ থেকে নয়। আর মানসিক উপাদান আসে মন থেকে—মনের ভাব বা ইমোশনগুলিই হ'লো মানসিক উপাদান। বাহ্যিক উপাদান আসে কাব্য-জগৎ থেকে

কিন্তু মানসিক উপাদান আসে লৌকিক জগৎ থেকে। লৌকিক জগতেই মানসিক উপাদানের অস্তিত্ব। ‘শোক’ একটি মানসিক উপাদান বা ‘ভাব’। কিন্তু এই শোক আসে লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণ থেকে—যেমন কোন বিধবার পুত্র মারা গেছে। এই মৃত্যুটা বিধবার কাছে পরম শোকের। কিন্তু এই ‘শোক’ বিধবার কাছে ‘রস’ নয়—কেননা বিধবার কাছে শোকটি রসের হ’লে নিশ্চয় সে আনন্দ পেত। রস আনন্দ দেয়। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ পায় কোন্ বিধবা? আবার এই শোকের কারণ এবং কার্যাবলীও কাব্য নয়। তা’ই যদি হ’তো বিধবার প্রলাপ এবং শোকবাক্যগুলিই তা’ হ’লে সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য হ’য়ে উঠতো। কবি যখন এই লৌকিক শোক এবং তা’র কারণাদিকে কাব্যে রূপায়িত করেন তখনই তা’ সীমিত লৌকিক গণ্ডি ছাড়িয়ে অলৌকিক রসের জগতে প্রবেশ করে। শোক হ’য়ে ওঠে করুণ রস। এবং এই করুণ রস তখন আর দুঃখের বস্তু থাকে না—পরম আনন্দের সামগ্রী হ’য়ে ওঠে। “রসের মানসিক উপাদান যে ‘ভাব’ তা’ দুঃখময় হ’লেও তা’র পরিণাম যে ‘রস’ তা’ নিত্য আনন্দের হেতু।” কবির কণ্ঠে তাইতো শুনি Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. সুতরাং লৌকিক জগতের ভাব যখন কাব্যের মধ্যে রস রূপে আত্মপ্রকাশ করে—তখন আর তা’ লৌকিক থাকে না, লৌকিকতার আবরণ ছিন্ন করে’ অলৌকিক হ’য়ে ওঠে। রসের জগৎ, কাব্যের জগৎ তাই মায়ার জগৎ, অলৌকিক জগৎ।

‘তোমার পুত্র জন্মেছে’ এই কথাগুলি যদি কোন পিতার কাছে বলা যায় তা’ হ’লে তাঁ’র বদনমণ্ডলে উল্লাস, আনন্দ এবং হাসির রেখা ফুটে উঠবেই। কিন্তু এই হর্ষ, আনন্দ লৌকিক ভাবমাত্র—‘রস’ নয়। সেজন্যে এ বাক্যটিও কাব্য নয়। এ বাক্যের আবেদন একান্ত লৌকিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—লৌকিকতার দিগন্ত ছিন্ন করে’ অলৌকিক রসলোকে প্রবেশ করতে পারে নি। কোন

বাক্য তখনই কাব্য হ'য়ে উঠবে যখন তা' অলৌকিক রসময়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। কেননা কাব্যের আত্মা রস—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। 'কাব্য হচ্ছে বাক্য, রস যা'র আত্মা' এই রসরূপ আত্মাটুকু না থাকলে বাক্য কখনই কাব্য হ'য়ে উঠতে পারে না।

॥ ছয় ॥

লৌকিক ভাবাদি অলৌকিক না হ'লে, বস্তুজগৎ রস জগতে পরিণত না হ'লে কাব্য হবে না এ একরকম প্রায় সর্বজনসম্মত। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই : কবি কোন প্রতিভাবলে এই অলৌকিক রস জগতের সৃষ্টি করেন, তাঁ'র সেই বিশেষ অবলম্বনটি কী? আলংকারিকেরা উত্তর দিয়েছেন কবির সেই অবলম্বন তিনটি—বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী। এ তিনটি অবলম্বনের স্বরূপ এবং সংজ্ঞা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

লৌকিক জগতে যা' রতি ইত্যাদির উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে তা'ই বিভাব। আলম্বন (রাধাকৃষ্ণ) এবং উদ্দীপন (বংশীধ্বনি, বেশ-ভূষা) বিভাবসমূহ সর্বদাই এই লৌকিক ভাবগুলিকে (রতি ইত্যাদি) জাগ্রত করে। রতি ইত্যাদি লৌকিক ভাবগুলি জাগ্রত না হলে রসস্ফুরণ সম্ভব নয়। সুতরাং রস নিষ্পত্তির ভূমিকায় বিভাবের অংশ হ'লো রতি-আদি ভাবের উদ্বোধন করা।

'মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হ'লে যে সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা' বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকে অনুভাব।' রাধিকার দীর্ঘনিঃশ্বাস, কটাক্ষ ইত্যাদি অনুভাবের অন্তর্গত। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই অনুভাবও বিভাবের মত লৌকিক পর্যায়ের অন্তর্গত। তবে বিভাব দ্বারা

উদ্বোধিত রতি-আদি ভাব অনুভাব দ্বারা গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং রস নিষ্পত্তিতে অনুভাবের প্রধান কাজ মানসিক ভাবগুলিকে গাঢ়ত্ব প্রদান করা।

অভিনবগুপ্ত বিভাব এবং অনুভাবকে বলেছেন—'সকল হৃদয়ে সমবাদী।' বিভাব এবং অনুভাবের মধ্যে এমনই একটি জিনিস আছে যা কাব্যে অঙ্কিত চরিত্র বা ভাবগুলিকে সকল পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব এবং সম্বন্ধের সৃষ্টি করে' দেয় এবং সেইজন্যেই "কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোন ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভাব এবং অনুভাব উভয়ে মিলিত হ'য়ে লৌকিক ভাবরাশিকে অলৌকিকতার দিকে নিয়ে যায়—কিন্তু সম্পূর্ণ অলৌকিক হ'য়ে উঠতে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রমও নজরে পড়ে—কিন্তু তা' বিরল। একটি উদাহরণে কথাটি পরিষ্কার হবে।

'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'—এই বাক্যটির মধ্যে বিভাব (রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ—উদ্দীপন বিভাব) আছে, স্থায়ীভাবও (ভালবাসা) আছে তথাপি বাক্যটি রসাত্মক নয়। কেন? এ প্রসঙ্গে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রথম কারণ—বাক্যটিতে স্থায়ীভাবের উল্লেখমাত্র আছে, উহার বহুলরূপে উপলব্ধি বা প্রকাশ হয় নি। দ্বিতীয় কারণ—বাক্যটিতে ব্যভিচারী ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ হয় নি।

উদ্দীপন বিভাবাদিসহ স্থায়ীভাব যদি বিবিধ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ না করে তা' হলে ভাব কখনই অলৌকিক রসরূপ লাভ করতে পারে না। চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, হর্ষ, আবেগ, কম্পন ইত্যাদিগুলি সঞ্চারী ভাবের অন্তর্গত। বৈষ্ণব কাব্যে আমরা এই সঞ্চারী ভাবরাজীর অদ্ভুত প্রয়োগ দেখি। পূর্বোক্ত বাক্য 'রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে'—এ ভালবাসা মুখের কথা।

কিন্তু সেই ভালবাসাই অন্তরের হ'য়ে অপূর্ব রসরূপ লাভ করেছে বৈষ্ণব কাব্যে। একটু বিশ্লেষণ করলেই তা' বোঝা যাবে। শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের বাঁশী শুনে বা চিত্র দেখে, অথবা কদম্বতলে তাঁ'র রূপ নিরীক্ষণ করে' তাঁ'কে ভালবেসেছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে রাধিকার চিত্তে রতিভাবের উদয় হয়েছে। এখন সে কেবলই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে, সে চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে মেঘের পানে চেয়ে থাকে, একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ অবলোকন করে। কৃষ্ণকে রাধিকা পায় না, চিত্ত বিষাদে ভরে যায়, সে চঞ্চল হ'য়ে একবার ঘরে আসে আবার বার বাইরে যাতায়াত করে। একদিন রাধা শ্রাবণ-রজনীতে স্বপ্নের ঘোরে শ্রীকৃষ্ণের সাদর স্পর্শ পেয়ে নিজকে কৃতার্থ মনে করে এবং তার চিত্ত হর্ষে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। তারপর রাধিকার অভিসার। লজ্জায় তা'র পা সরে না, শেষে সখীর স্কন্ধে ভর করে' চলতে থাকে, কৃষ্ণ কী ভাবে তাঁ'কে গ্রহণ করবেন ভেবে শঙ্কায় তা'র বক্ষ কম্পমান হ'য়ে ওঠে। এমন সময় রাধিকা শোনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ খেলা করে। চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে শ্রীরাধার ঈর্ষা এবং শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্ত হ'য়ে ভূমিতে পতন ইত্যাদি।'

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে রাধার অন্তর-সাগরে ভাব-তরঙ্গের কী গভীর উত্থান-পতন। চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ, স্বপ্নাবস্থা, লজ্জা, শঙ্কা, ঈর্ষা, মোহ এমনি অসংখ্য সঞ্চারী ভাব শ্রীরাধার অন্তরের মূলাভাব রতির চারপাশে সতত সঞ্চারমান। এই সঞ্চারী ভাবগুলির উদয়-বিলয়, উত্থান-আত্মদানের ভিতর দিয়ে নিত্যনতুন রূপে মূলভাব রতিরই পুষ্টিসাধন করেছে। এই 'রতি' সঞ্চারী ভাবের এতগুলি স্তর অতিক্রমণের পর আর লৌকিক 'রতি' নেই—হ'য়ে উঠেছে অলৌকিক জগতের মধুর 'শৃঙ্গার' রস, কাব্যের আত্মা। বিভাব, অনুভাব লৌকিক ভাবগুলিকে পুষ্টিসাধন করে' সমগ্র ভাব-প্রবাহকে অলৌকিকতার পথে নিয়ে যায় কিন্তু অলৌকিক করে' তুলতে পারে না। 'ভাব' অলৌকিক হ'য়ে ওঠে সঞ্চারী ভাবের ঐন্দ্রজালিক

স্পর্শে। "এই সঞ্চারী কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও চলতি হয়েছিল যে সঞ্চারী দিয়ে পরিপুষ্ট না হ'লে রসের রসত্বই হয় না।"
কবিরাজ বিশ্বনাথের ঘোষণায় সত্য-সার সুন্দররূপে বিধৃত হয়েছে :

বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা
রসতামেতি রত্যাদি :
স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্ ॥

চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, ( কাব্যের ) বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে রূপান্তর প্রাপ্ত হ'য়ে রসে পরিণত হয়।'

## ॥ সাত ॥

কাব্য কী? কাব্যের আত্মা কী? শব্দ না অর্থ? বস্তু না ধ্বনি? কোন্ গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়? কাব্যত্ব কোথায়? সেই স্মরণাতীত কাল হ'তে আজ পর্যন্ত এমনি কত শত জিজ্ঞাসা ক্রমবর্ধমান হ'য়ে উঠেছে। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা যে হয়নি তা' নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উত্তরও এসেছে।
আত্মা যা'ই হোক্ কাব্যের শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদসমূহ। সুতরাং কাব্যদর্শনে যাঁ'রা দেহাত্মবাদী তাঁদের কণ্ঠ হ'তে শোনা গেল বাক্যই কাব্য। শব্দ ও অর্থ ছাড়া ছাড়া কাব্যের কোন স্বতন্ত্র আত্মা নেই। "বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হ'য়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার।" শব্দকে অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকারে সাজিয়ে যেমন সুন্দর করা যায় অর্থকেও তেমনি উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি নানা অলংকারে সাজিয়ে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে সে এই

অলংকারের জন্যে। শব্দ ও অর্থের আস্বাদনই কাব্যের আস্বাদন। সেজন্যই আলংকারিকেরা ঘোষণা করলেন: 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।' কিন্তু বিশ্বে নিন্দুক ও ছিদ্রান্বেষীদের অভাব নেই। অলংকারবাদীদের বিরূপ সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বললেন, অলংকৃত বাক্য মাত্রই কাব্য নয়। তাঁ'রা 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' এই সংজ্ঞার অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দু'রকম দোষই দেখালেন। কোন কোন বাক্যে অলংকার, উপমা ইত্যাদি সকল থাকা সত্ত্বেও তা' কাব্য হ'য়ে ওঠে না আবার এমন অনেক কাব্য আছে যা'তে অলংকার নেই অথচ তা' শ্রেষ্ঠ কাব্য ব'লে বিবেচিত।

বিপক্ষদল অলংকারবাদীদের মতামত উড়িয়ে দিয়ে একটু ব্যাপক ভাবে কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন। তাঁ'দের মত কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি—Style। এই রীতি হ'লো কাব্য-রচনার বিশিষ্টভংগী। এই রীতি বা ষ্টাইলের গুণেই বাক্য কাব্য হ'য়ে ওঠে। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কাব্য এই রীতির গুণেই মানব-মনে স্থায়ী রেখাঙ্কণ করতে সমর্থ হয়েছে। অলংকার হ'লো এই রীতির আনুষঙ্গিক একটি বস্তু মাত্র। অলংকার যদি রীতির দ্বারা যথাস্থানে প্রযুক্ত না হয় তা' হ'লে অলংকার অর্থহীন। বাস্তব জগৎ হ'তে উপমা নেওয়া যেতে পারে। অলংকার পরলে রমণীদেহ সৌন্দর্য-সুষম হ'য়ে ওঠে কিন্তু পায়ের মলকে গলায় ধারণ করলে কদর্যই বাড়বে—সৌন্দর্য নয়। কেননা এখানে অলংকার যথাস্থানে প্রযুক্ত হয় নি। কাব্যের রীতি অনন্ত অলংকারসমূহকে কাব্য-ষোড়শীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাস্থানে বিন্যাস করে' তা'কে লাবণ্য-সুঠাম করে' তোলে। সুতরাং কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।'

কিন্তু আবার নিন্দুকের দল এগিয়ে আসেন। রীতিবাদের বহুল ত্রুটি দেখিয়ে তাঁ'রা বলেন নির্দোষ ভাবে অঙ্গে অলংকার পরিয়ে দিলেই কাব্যে সৌন্দর্য আসে না—শরীরেও নয়, কাব্যে তো নয়ই। তবে কাব্যের সৌন্দর্য আসে কোথা হ'তে?

আলংকারিকেরা 'ধ্বন্যালোক' থেকে সেই বহুখ্যাত লাইন দু'টি তুলে বলেন, "রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা' শব্দ, অর্থ, রচনাভংগী, এ সবের অতিরিক্ত আরও কিছু।" এখানে যে অতিরিক্ত বস্তুর কথা বলা হয়েছে—এই অতিরিক্ত বস্তুই কাব্যের আত্মা।

এই অতিরিক্ত বস্তুটি কী?

এর উত্তরে আলংকারিকদের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছে। একদল বস্তুবাদী, অপরদল ধ্বনিবাদী।

বস্তুবাদী: আলংকারিকদের মধ্যে যাঁ'রা বস্তুবাদী তাঁ'রা বলেন কাব্যের মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তুটির কথা বলা হয়েছে এই বস্তুটি হ'লো কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য—বস্তু বা ভাব। পর পর শব্দের সংযোজনায় কাব্যের সৃষ্টি—এবং এই শব্দ দ্বারা গঠিত কাব্য প্রকাশ করে কোন বস্তু বা ভাবকে। অনেক বস্তু আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে—চন্দ্র, কোকিল, ফুল ইত্যাদি— আবার অনেক ভাব আছে যেগুলি আমাদের চিত্তমূলে সহজেই আন্দোলনের সৃষ্টি করে—প্রেম, বীর্য, মহত্ত্ব ইত্যাদি। কবিদের কাজ আপন বাণী-বন্দনায় এই বস্তু এবং ভাবসমূহকে যথাযথ প্রকাশ করা। সুতরাং বস্তুবাদীদের মতে "ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে আর ধর্মান্তর নেই।"

ধ্বনিবাদ: ধ্বনিবাদিগণ ভিন্ন মত পোষণ করলেও ভাব, বস্তু, রীতি এবং অলংকারকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁ'দের মতেও পৃথিবীর বহুখ্যাত কবিগণের কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি এবং অলংকারের সুসংহত লাবণ্যদীপ্ত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এসব স্বীকার করে'• নিয়েও তাঁ'রা আর একটি গভীর কথা বলেছেন এবং এই মন্তব্য থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধ্বনিবাদের। তাঁ'রা বলেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে বাচ্যাতীতকে

প্রকাশ করা। শব্দ এবং তাঁ'র আভিধানিক অর্থ দিয়ে যেটুকু প্রকাশিত হয় তা' একান্ত ভাবে সীমিত। তা' কাব্যের আসল বস্তু নয়। তা' কাব্যের দেহ হ'তে পারে—প্রাণ নয়। প্রাণ হ'লো বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যে অর্থ সংগীত-রেশের মত অনুরণিত হ'য়ে ওঠে সেই অর্থ—সেই বাচ্যাতীত অনুরণন।

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেই ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায় ছিন্নদল।
।। শাজাহান : বলাকা ।।

এই কবিতার মধ্যে মন্ত্র-গুঞ্জরণ, কুঞ্জবন, মালঞ্চ, চঞ্চল অঞ্চল, বিদায়-গোধূলি ইত্যাদি শব্দগুলি যদি কেবল লৌকিক জগতের বস্তুরাশির মধ্যে সীমিত থাকতো, এদের আভিধানিক অর্থই যদি প্রধান হ'য়ে উঠতো তা' হ'লে বাক্যসমষ্টি হয়তো পাগলের প্রলাপে পরিণত হ'তো। কিন্তু এ মন্ত্র-গুঞ্জরণ তো কেবল মন্ত্র-পাঠের শব্দ নয়, এ কুঞ্জবন তো কেবল বকুল-কবরীর ক্ষেত্র নয়—প্রেমের গুঞ্জনে এ মন্ত্রগুঞ্জন আত্মলীন হয়েছে, প্রেমের সুরভিতেই এ কুঞ্জবনের সকল কলিই আত্মহারা। 'বিদায় গোধূলি' শব্দটির মধ্যেও সায়াহ্নে কোমল প্রেমের এক মহান্ অভিব্যক্তি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। চির-সৌন্দর্য পূজারী শাজাহান, বিশ্ব-লাবণ্যের প্রাণকেন্দ্র মোঘল-তন্বী মমতাজ বেগম—রূপ ধরে এ কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের নিখিল চিত্তভূমি অধিকার করে। সুতরাং এ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবরাশি বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে দূর দিগন্তে সম্প্রসারিত। বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে এই যে নতুন অর্থ—আলংকারিকেরা এর নাম দিয়েছেন ধ্বনি। "কাব্যের বাচ্যার্থ একটি মাত্র, তাহা যখন বাধিত

না হইয়া নিজ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্তে একই সময়ে তার একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি।... আঘাতের পর মুখ্য ঘণ্টানাদ থামিলেও যেমন একটি অনুরণন চলিতে থাকে ঠিক তেমনি চিত্তে বাচ্যার্থ প্রবেশ করিবার পর, তাহারই প্রসঙ্গক্রমে নূতন অর্থের সূক্ষ্ম স্পন্দন উঠিতে থাকে।" অনুরূপ সিদ্ধান্ত পাই প্রখ্যাত মনীষী ব্র্যাড্‌লের কথায়—"The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all." যে ব্যাপার দ্বারা এই ধ্বনি প্রতীয়মান হয় তা'কে বলে দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার। আর যে শক্তির বলে এই ধ্বনি আসে তাকে বলে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনাশক্তি—Power of suggestion.

আনন্দবর্ধন এই ধ্বনিবাদকে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধ্বনিবাদকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে শব্দ এবং তা'র অর্থ নির্ণয়ের পদ্ধতি হ'তে আলোচনা করতে হয়। শব্দের দু'টি শক্তি আছে—একটি অভিধা শক্তি এবং অপরটি লক্ষণা শক্তি। শব্দের দ্বিবিধ শক্তির জন্যে লব্ধ অর্থও দ্বিবিধ। অভিধা শক্তির দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় সে অর্থকে বলে অভিধেয় অর্থ বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ এবং লক্ষণা শক্তি দ্বারা লব্ধ অর্থকে বলা হয় লক্ষণার্থ, লাক্ষণিক অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থ। পুরুষ বলতে পুরুষ লোক এবং সিংহ বলতে সিংহকে বোঝায়—এই হ'লো শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু যখন বলা হয় পুরুষসিংহ তখন পুরুষ তার পৌরুষত্ব হারিয়ে, সিংহ তার সিংহত্ব হারিয়ে নতুন বীর্যবান অর্থে প্রকাশিত হয়—এই অর্থই প্রতীয়মান অর্থ। এখন প্রশ্ন—শব্দের এই দু'টি অর্থের মধ্যে কোন্‌টি কাব্যে অধিকতর উপযুক্ত। ধ্বনিবাদিগণ নিঃসন্দেহে বলিবেন প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনার্থই হ'লো কাব্যের পক্ষে পরম উপযোগী। কেননা কাব্যের উদ্দেশ্য সুন্দরকে প্রকাশ করা, ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় অজানা লাবণ্যকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা। ব্যঙ্গার্থ দিয়েই কাব্যের এই

কাজটি বিশেষরূপে সুসম্পন্ন হয়। এখন আবার প্রশ্ন হ'তে পারে বাচ্যার্থ দিয়ে কি এই সুন্দরের প্রকাশ সম্ভব হয়? উত্তরে বলা চলে বাচ্যের যখন অর্থবাহনের শক্তি রয়েছে তখন সুন্দরের প্রকাশ বাচ্যার্থকে দিয়েও সম্ভব—কিন্তু সে প্রকাশ একান্তভাবে সীমিত। কেননা বাচ্য-বাচক শক্তিদ্বারা আমরা লৌকিক সুখ-দুঃখ যা'কে প্রত্যক্ষ করি তা'কেই প্রকাশ করি—কিন্তু তা' একটি সংকীর্ণ অর্থকে প্রকাশিত করে মাত্র। কিন্তু ব্যঞ্জনা বাচ্যের অতীত। তা'কে বিশেষ কোন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এই জাতীয় শক্তির দ্বারাই লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের প্রবেশ ঘটতে পারে। বাচ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ। একটি পরিচিত, সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই তা'র আনাগোনা। কিন্তু ব্যঞ্জনা শুধু একটি দীপ্তি, সে শুধু প্রকাশ করে এবং এই বন্ধনমুক্ত প্রকাশের শক্তি অসীম—ব্যঞ্জনা এখানেই দিগন্তহারা অসীমের প্রতীক। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশই তা'র লক্ষ্য। এই ব্যঞ্জনাই ধ্বনি—ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ।

তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই বাচ্যার্থ হ'তেই এই ব্যাঙ্গার্থের বা ব্যঞ্জনার্থের উৎপত্তি। রমণীর লাবণ্য তা'র অঙ্গসৌষ্ঠবের অতিরিক্ত—তবুও লাবণ্য অঙ্গসৌষ্ঠব দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সেইরূপ যে অর্থ ব্যঞ্জনার সাহায্যে ধ্বনিত হয় তা'র জন্ম বাচ্যার্থের গর্ভেই। আনন্দবর্ধন এই ব্যঞ্জনাকেই বলেছেন 'বাচ্যার্থপূর্বিকা'। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, আলোকপ্রার্থী যেমন দীপশিখায় যত্নবান হন তেমনি ব্যঙ্গার্থ লাভ করতে হ'লে একান্তভাবে প্রয়োজন বাচ্যার্থের। কেননা ব্যঙ্গার্থ লাভের উপায় বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হ'তে ব্যঞ্জনার বিকাশ। শব্দ, অর্থ, নিজেদের গৌণ করে যেখানে অর্থান্তরকে প্রকাশিত করে, ব্যঞ্জনার সূতিকাগার সেখানেই। বিভাব, অনুভাব, অলংকার দ্বারা বিভাসিত হ'য়ে এই ব্যঞ্জনা অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে। বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গার্থকে অন্তরে গোপন রেখে অব্যক্ত মহিমায় বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছে, ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি বাচ্যার্থের আশ্রয়ে অভিনব সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ যেন:

ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনাকে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ছুটিয়া ফিরে যেতে চায় সুরে।

ধ্বনিবাদীরা এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—বস্তু-ধ্বনি, অলংকার-ধ্বনি এবং রস-ধ্বনি। তবে এই তিনটি বিভাগ খুব স্পষ্ট নয়—দুরতিক্রমী তো নয়ই। বস্তু-ধ্বনিতে যখন ধ্বনি থাকে তখন কেবল বস্তু প্রকাশিত হয় না—বস্তুকে অতিক্রম করে, আরো কিছু প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বস্তু-ধ্বনি কিংবা অলংকার-ধ্বনি দিয়ে কেবলমাত্র বস্তু কিংবা অলংকারকে প্রকাশ করে না—প্রকাশ করে রসের। আর রস-ধ্বনিতে তো রস আছেই। সুতরাং কাব্যের সকল ধ্বনিই শেষ পর্যন্ত কমবেশি রসবাহী।
অজানাকে নিয়েই আমাদের সাহিত্য। এ কেবল ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায়ই কতকটা সম্ভবপর। সংগীতে হোক, কথায় হোক, নৃত্যে হোক বা চিত্রে হোক প্রকাশ কিন্তু মুখ্যতঃ সংকেতে ও ইঙ্গিতে। কথার মধ্যে সংগীতের সুর বা চিত্রের রূপ কতকটা ফুটে ওঠে বলেই কথার বা সাহিত্যের শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি কিন্তু সে শক্তি তো ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনারই শক্তি। আমাদের লেখা মাত্রই ইঙ্গিত, কথা মাত্রই ইঙ্গিত। ইঙ্গিতই তো ধ্বনি, সৃষ্টিই তাই ধ্বনিময়। মহাকবিদের কাব্য এই ধ্বনির বাঙ্ময়-প্রকাশ।

## ॥ আট ॥

নিখিল বিশ্বের অসংখ্য বস্তুপুঞ্জের সাথে আমাদের অন্তঃকরণের দু'টি সম্পর্ক আছে। একটি জ্ঞানময়, অপরটি ভাবময়। প্রথমটি বোধ-ময়, দ্বিতীয়টি আবেগময়। ইংরাজীতে এই সম্পর্ক দু'টিকে বলা

হয়েছে Knowing এবং Feeling. Knowing বা জানা ক্রিয়াতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবলভাবে কাজ করে। কার্যকরণের সম্বন্ধ নির্ণয় সেখানে প্রধান কথা। Feeling বা ভাবাস্বাদন ক্রিয়াতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে হৃদয়—হৃদয়বৃত্তি সেখানে অত্যন্ত সজাগ। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে কার্যকরণ সম্বন্ধ নির্ণয় এখানে প্রধান নয়—অন্ধ আবেগে সকল কিছু অনুভব এবং বিশ্বাস করাই ভাবময় সত্তার প্রধান কাজ।

কাব্যাস্বাদের সময়ও আমাদের চিত্তের এই দুইটি বৃত্তির যে কোন একটি প্রধান হ'য়ে ওঠে। অবশ্য কাব্যাস্বাদের মূল যে আনন্দ উভয় বৃত্তিতে তা' লভ্য। শব্দার্থের মিলন দ্বারা অন্তর্জগতে এক বিশেষ আলোড়নের ফলে সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায়। এই আলোড়ন দুই রকমে সম্ভব। কাব্যের বস্তুপুঞ্জ দুই রূপে আমাদের চিত্তপুরে প্রবিষ্ট হয়—অর্থ রূপে এবং ভাব রূপে। আমাদের চিত্তবৃত্তিরও দুই রূপ—একটি হৃদয়ধর্মী অপরটি বুদ্ধিধর্মী। বাইরের বস্তুপুঞ্জ অর্থ রূপে প্রবেশ করে চিত্তের বুদ্ধি অংশে আর ভাব রূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় হৃদয়লোকে। সুতরাং বুদ্ধি বা বোধবৃত্তি হ'তে জন্মায় অর্থ এবং ভাব বা হৃদয়বৃত্তি হ'তে জন্মায় ভাব। অর্থ বুদ্ধিস্থিত এবং ভাব হৃদয়স্থিত। অর্থবোধের আনন্দ ঘটায় চিত্তের জ্ঞানময় উপলব্ধি আর ভাব-সঞ্জাত রসাস্বাদনের আনন্দ চিত্তকে বিগলিত করে। সুতরাং :

১॥ দীপ্তিকাব্য তাঁকেই বলব, যে কাব্য বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত, হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্য অপেক্ষা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে বেশি পরিমাণে বর্তমান। 'দীপ্‌' + করণ বাচ্যে 'ক্তি' = দীপ্তি।

২॥ আর দ্রুতিকাব্য সেই ধরনের কাব্য যেখানে ভাব-সঞ্চার এবং রস-নিষ্পত্তির জন্য হৃদয় বিগলিত অথবা বিদ্রুত হ'য়ে যায়। 'দ্রব' + করণ বাচ্যে 'ক্তি' = দ্রুতি।

এখন একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে, উভয় কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে।

দীপ্তিকাব্য॥ চিত্তে বুদ্ধির স্ফুরণ অর্থোপলব্ধির ভিতর দিয়েই ঘটে। কাব্য যখন বোধবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করতে চায় তখন তা'র অর্থ ধর্মই আমাদের নিকট প্রধান আকর্ষণীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। কবি যে কথাটি প্রকাশ করতে চান, সে কথাটি তিনি বিভাব, অনুভাব দ্বারা আচ্ছাদিত করেই আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় করেই তিনি কাব্যের আনন্দ বিতরণ করতে চান। আর বস্তুপুঞ্জের ভিতর হ'তে ধ্বনিত অর্থ উপলব্ধি করে, পাঠক-চিত্তে সৃষ্টি হয় রম্যবোধের। এই রম্যবোধ হ'তেই জন্মায় আনন্দ। আনন্দ-প্রবাহের উন্মাদধারায় পাঠক-চিত্তবেলা উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। এই অর্থ জটিল দার্শনিক তত্ত্ব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কাব্যের এমন কতকগুলি গুণ থাকে যা দার্শনিক তত্ত্বের নীরস মরুভূমিতে প্রবাহিত করে রসের ফল্গুপ্রবাহ। দার্শনিক তত্ত্ব শুষ্ক কিন্তু সেই শুষ্ক তত্ত্বই কাব্যে রূপায়িত হ'লে সরস এবং সজীব হ'য়ে ওঠে। মহাজীবনের বেগধর্মিতা নিয়ে বার্গস যাই লিখুন না কেন তাঁ'র রচনা অনেকটা শুষ্ক বুদ্ধির মননধর্মী প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ যখন নির্জন ঝিলাম নদীর তীরে সন্ধ্যার মায়াঘন-রহস্য-নিবিড় পরিবেশ হ'তে উপলব্ধি করে' বলাকার সারিবদ্ধ বেগবান প্রবাহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন তখন তা' হ'য়ে উঠলো রূপাল্পনা-সুষক কাব্য। সেই তত্ত্ব তখন আর কেবল নীরস দার্শনিকতার গণ্ডিতে পাণ্ডুর-ম্লান হ'য়ে রইলো না—রূপরস ভরা কাব্যের জগতে এসে হ'য়ে উঠলো সজীব ও প্রাণবন্ত। দার্শনিক তত্ত্বে পুরোপুরি আত্মোপলব্ধি ঘটে না—কিন্তু কবি আপন প্রতিভাবলে আত্মোপলব্ধির পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর করে' চিত্তকে ভগ্নাবরণ করতে পারেন। রহস্যময় জীবনের জটিল তত্ত্বগুলি দার্শনিকের জিজ্ঞাসা—কবিরও তাই। কিন্তু এই জিজ্ঞাসাই দার্শনিকের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু কবির উদ্দেশ্য আনন্দ সৃষ্টি করা। দার্শনিক এই সমস্যা সম্পর্কে আপন ধ্যানলব্ধ চরম কথা বলে দেন কিন্তু কবি কখনো চরম কথা বলতে পারেন না। কবি সৃষ্টি করেন

রমণীর অর্থ বা রম্যার্থ। এই রম্যার্থ হ'তে জাগে রম্যবোধ এবং রম্যবোধ থেকে আনন্দ। রস থেকেও আনন্দ জাগে কিন্তু রম্যবোধ আর রস এক নয়। বুদ্ধিস্থিত অর্থ থেকে জাগে রম্যবোধ কিন্তু হৃদয়স্থিত ভাব থেকে জাগে রস। রম্যবোধ দীপ্তিকাব্যের সামগ্রী আর রস দ্রুতিকাব্যে প্রাণময় সত্তা।

দীপ্তিকাব্য আবার দ্বিবিধ—১॥ গৌরব-কাব্য বা গৌরবোক্তি ২॥ বক্রবাক্য বা বক্রোক্তি। যে বাক্যের মধ্যে অর্থগৌরব প্রধান তা' গৌরবোক্তি কাব্যের অন্তর্গত আর যে কাব্যের মধ্যে বক্রতা বা বাক্-বৈদগ্ধপূর্ণ ভংগীই প্রধান তা' বক্রকাব্য। অর্থ এবং অলংকার-ভেদ অনুযায়ী বক্রোক্তি আবার দু'প্রকারের হ'তে পারে—অর্থ-বক্রোক্তি এবং অলংকার-বক্রোক্তি। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে দীপ্তিকাব্যের যে সমস্ত ভাগ করা হ'লো এ সমস্তই বুদ্ধিপ্রধান। বুদ্ধিদীপ্ত অর্থ ও অলংকার এ সকল কাব্যের প্রধান অবলম্বন।

দ্রুতিকাব্য॥ বস্তুজগৎ হ'তে ভাব (অর্থ নয়) চিত্তের হৃদয়াংশে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। এবং এই আলোড়নের 'ভাব' বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী দ্বারা পুষ্ট হ'য়ে অতিশয়তা প্রাপ্ত হ'লে রসে পরিণত হয়। 'রস'-এর আলোচনায় 'ভাব' বিভাবাদি দ্বারা কেমন, করে' 'রসে' পরিণত হয় সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। লৌকিক জগতের প্রেমাদি ভাবই কাব্যজগতে রতি-আদি ভাবরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাব প্রকাশিত হ'লেই চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয় না। এই লৌকিক ভাব যখন কবির রচনায় অলৌকিকতা প্রাপ্ত হয় তখন তা' পরিণত হয় রসে এবং এই রস-প্রবাহই চিত্তকে বিগলিত করে' সৃষ্টি করে আনন্দের।

এখন স্বাভাবিক ভাবে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—কিসের গুণে দীপ্তিকাব্য মনকে বিগলিত করে আর কোন্ গুণেই বা দ্রুতিকাব্য চিত্তকে বিগলিত করে' দেয়। উত্তরে বলা চলে দীপ্তিকাব্য বুদ্ধি বা মননপ্রধান। বুদ্ধি দীপ্তি বেশি থাকায় এ কাব্য চিত্তকে

বিগলিত না করে' বুদ্ধির বা মনের দ্বারে আঘাত হানে। আর দ্রুতিকাব্য ভাবপ্রধান—রস তা'র প্রাণ। রসের অফুরন্ত প্রবাহের জন্যেই তা' চিরসিক্ত, চিরসুন্দর—এবং এইজন্যেই সে চিত্তকে বিগলিত করে।

দ্রুতিকাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—১॥ ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি ২॥ রসকাব্য বা রসোক্তি ৩॥ স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি।

১॥ ভাবকাব্য: যেখানে শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রধান আসন গ্রহণ করে, কিন্তু কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না—এমন কাব্যকে বলা হয় ভাবকাব্য।

২॥ রসকাব্য: শব্দার্থের অবলম্বনে যে কাব্যে ভাব রসে পরিণত হয় তা' রসকাব্য। বলা বাহুল্য এ কাব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩॥ স্বভাবকাব্য: যে কাব্যে বস্তু নিজ স্বভাবধর্মে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, বস্তুর ভাবধর্মই যেখানে প্রধান এমন কাব্যকে বলা হয় স্বভাবকাব্য।

## ॥ নয় ॥

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা হ'তে আমরা দ্রুতি এবং দীপ্তি-কাব্যের যে পরিচয় পেয়েছি তা'তে উভয় শ্রেণীর কাব্যকে পরস্পর-বিরোধী বলেই মনে হয়। একটি অর্থপ্রধান, অপরটি ভাবপ্রধান। একটি বুদ্ধিদীপ্ত, অপরটি হৃদয়ধর্মী। একটি রম্যবোধে উদ্দীপ্ত অপরটি রসবোধে সিক্ত। সবটাই সত্য কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অর্থ এবং ভাব পরস্পরের সাথে সম্পর্ক-ছিন্ন, বুদ্ধি এবং হৃদয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, রম্যবোধ এবং রস পরস্পর বিরোধী। উভয় প্রকার কাব্যের উৎসমূল এক, বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ হ'তে উভয়ের উৎপত্তি। আবার উভয়ের পরিণতিও আনন্দে। সুতরাং উৎস এবং পরিণতি যে কাব্যদ্বয়ের এক তা'রা পরস্পর-বিরোধী হ'য়ে

ওঠে কী করে'? বস্তুতঃ ভাব এবং অর্থ সম্পর্কযুক্ত, রস এবং রম্যবোধ চিত্তকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। আদিম জৈবধর্মের সাথে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় মনুষ্যত্বের সৃষ্টি। এইজন্য হৃদয়বেগ মানুষের চিত্তে কখনো আদিম রূপে থাকতে পারে না, অসংখ্য জটিল বৃত্তির সাথে যুক্ত হ'য়ে তা' একপ্রকার দুর্জ্ঞেয় হ'য়ে উঠেছে। স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তির সংমিশ্রণটাই বেশি। তা' ছাড়াও দ্রুতিকাব্যের প্রধান উপকরণ যে অন্ধ আবেগ—তা' অন্ধ নয়, অন্ততঃ অন্ধরূপে কাব্যে প্রকাশ পায় না। এই আবেগকে কাব্যে প্রকাশ করতে গেলেই কবিকে ভাব-সংহতি এবং অর্থ-সংহতি সম্পর্ক সচেতন হ'তে হয়—এবং সেখানে অন্ধ আবেগ নয় বুদ্ধি ধর্ম প্রধান হ'য়ে ওঠে। দ্রুতিকাব্যেও সেজন্য আসে দীপ্তিকাব্যের অলংকার এবং বক্রোক্তি ইত্যাদি। এখানে দ্রুতিকাব্য অনেকখানি দীপ্তি-কাব্যের সমধর্মী। আবার রম্যবোধও অনেক ক্ষেত্রে রসকে আশ্রয় করেই বেড়ে ওঠে। আমরা পূর্বেই বলেছি দীপ্তিকাব্য জীবন-রহস্যের জটিলতম সত্তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ। জীবনের গভীর রহস্য যে কাব্যের মূল উৎস সেখানে বিস্ময়-রস আসতে বাধ্য। 'বলাকা' কাব্য পড়ে এইজন্যেই আমরা বিস্ময়-বিমণ্ডিত হ'য় উঠি, বিস্ময়-রস আমাদের সমগ্র মনপ্রাণকে দুলিয়ে দেয়। এখানে দীপ্তিকাব্য বিস্ময় রসসিক্ত হ'য়ে দ্রুতিকাব্যের সীমাস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। দ্রুতিকাব্যে এই বিস্ময়-রস গৌণ হ'তে পারে কিন্তু তবুও তা' বর্তমান এবং সেখানে সে বুদ্ধিবৃত্তির কাজ না করে' হৃদয়বৃত্তির কাজই করে।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্রুতিকাব্য রসপ্রধান এবং তা' হৃদয়কে বিগলিত করে—এ কথাই আমরা বলেছি। কিন্তু এমন কতকগুলি রস আছে যেগুলি চিত্তকে বিগলিত না করে' বুদ্ধিপ্রধান কাব্যের মত তা'কে উদ্দীপ্ত করে' তোলে। করুণ এবং শৃঙ্গারাদি রস চিত্তকে বিগলিত করে সত্য কিন্তু বীর রস চিত্তকে বিগলিত করা অপেক্ষা উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে' তোলে বেশি। সোজা কথায় দ্রুতিকাব্যের মধ্যেও দীপ্তি-

কাব্যের গুণ বর্তমান এবং দীপ্তিকাব্যের গুণও ক্রতিকাব্যের মধ্যে লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে। রম্যবোধ-প্রধান কাব্য হ'লেও হৃদয় তা'তে কিছু সাড়া না দিলে তা' শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের মত চিরদিন রসবোদ্ধা পাঠক কর্তৃক উপেক্ষিত হ'তো। এ দৃষ্টিতে দেখলে ক্রতি এবং দীপ্তি কাব্যের সু-উচ্চ ব্যবধান সীমারেখা অনেকখানি নিম্ন হ'য়ে পড়ে, হয়তো বা অবলুপ্তই হয়।

॥ দশ ॥

কাব্য কী? কাব্যত্ব কোথায়—এই প্রশ্ন সামনে রেখে প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ নানাভাবে এর সমাধানের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ভরতমুনি হ'তে রসগঙ্গাধর পর্যন্ত একদল পণ্ডিত রস ও ধ্বনির উপর বৈশিষ্ট্য আরোপ করে' কাব্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। আবার অনেকে কাব্যের উপাদান অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের ব্যাপক আলোচনায় কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ের পথে অগ্রসর হয়েছেন। শেষোক্ত সমালোচকদের বলা হয় আলংকারিক।
যা' হোক প্রাচীন আলংকারিকেরা শব্দ ও অর্থের আলোচনায় জোর দিয়েছেন শব্দার্থের বাহ্যিক সম্বন্ধের ওপর। ভামহ হ'তে আরম্ভ করে' একাদশ শতাব্দীতে কুন্তকের সমসাময়িক ভোজরাজ পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধের যে সূত্রটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল তা' ছিল একান্তভাবেই ব্যাকরণগত। শব্দ বাচক এবং অর্থ বাচ্য। এই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধের ব্যাকরণগত গণ্ডি অতিক্রম করে' এদের অন্তর্নিহিত ভাবময় সূক্ষ্ম এবং সুকুমার কাব্যসম্বন্ধটি তাঁ'দের বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় নি।
'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'—ভামহের এই বহুখ্যাত উক্তিটি মম্মট, রুদ্রট, বিদ্যাধর ইত্যাদি পণ্ডিতগণের মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল—

কিন্তু তাঁ'রা কেউই উক্তিটির বহিরঙ্গ ছাড়া অন্তরঙ্গে আলোকপাত করতে সমর্থ হন নি। অন্তরঙ্গের দিকে সর্বপ্রথম আলোকপাত করার আভাস ফুটে উঠেছে সুপণ্ডিত ভোজরাজ্যের আলোচনাতে। প্রাচীনধারার অনুসরণে শব্দ ও অর্থের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ ছাড়াও অলংকারগত সম্বন্ধকে মেনে নিয়েছেন। শব্দ ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হ'লে মাধুর্য বজায় থাকে তা' তিনি বারটি সম্বন্ধের মধ্যেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁ'র দৃষ্টি শব্দ অর্থের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অপেক্ষা বহিরঙ্গ সম্পর্কের দিকে নিবদ্ধ ছিল বেশি।

ভোজরাজের সমসাময়িক কুন্তকই সর্বপ্রথম নতুন দৃষ্টিভংগীতে শব্দ ও অর্থের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেন। ইতিপূর্বে শব্দ ও অর্থের বহিরঙ্গগত এবং অলংকারগত যে সূত্র নির্ণীত হয়েছে তা' নির্ভুল—কিন্তু এই নির্ভুল সূত্র ছাড়াও শব্দ ও অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক-নির্ণয়ে যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটির বড় অভাব ছিল তা' পূরণ করলেন কুন্তক। কাব্যের প্রধান কথা আনন্দ-সৃষ্টি করা। শব্দ ও অর্থের কোন রহস্যময় সম্মিলনের ফলে রসিক-চিত্ত আনন্দে প্লাবিত হ'য়ে যায় 'বক্রোক্তি-জীবিত' নামক কাব্য-গ্রন্থে সেটাই কুন্তক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কুন্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এখানে যে তিনি তাঁ'র আলোচনার পুরোভাগে আনন্দ সঞ্চারকে রেখে শব্দার্থের মিলনজাত কাব্যজগৎ বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

কুন্তকের প্রধান সূত্রগুলি এবং তাঁ'র অর্থ প্রথমে উদ্ধৃত করে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হবো:

১ ॥ শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনী।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি ॥

'সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদজনক

বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হ'লে কাব্য হ'য়ে থাকে।'

২॥ সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্।

'সাহিত্য হচ্ছে সহিত দু'টির ভাব।'

৩॥ সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥

'সাহিত্য হ'লো শব্দার্থ-যুগলের এক অলৌকিক বিন্যাসভংগী, যা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হ'য়ে মনোহারী হয় এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয়।'

শব্দ এবং অর্থের মিলন হবে অতিরিক্ততা বর্জিত এবং তা' হ'লেই বাক্য মনোহারী এবং শোভাশালিতা প্রাপ্ত হবে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ মিলন ব্যাকরণ বা অলংকার শাস্ত্রের নির্ধারিত মিলন নয়। এ মিলন হ'লো নিয়ম-নীতির গণ্ডির অতীত। তবে নির্দিষ্ট করে' বলতে গেলে এইটুকু বলা চলে এ মিলন হ'লো বাহুল্যশূন্য মিলন। শব্দ এবং অর্থ সমানভাবে মিলিত হবে—কোনটিও কোনটিকে ছাড়িয়ে যাবে না। কবিওয়ালাগণের রচনায় অনুপ্রাসের এবং যমকের অতিঘটা অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় তা' কবিতা হয় নি। বাহুল্যবর্জিত হ'য়ে ঠিক যেমনটি ভাবে মিলিত হ'লে বাক্য মনোহারী এবং শোভাশালী হ'য়ে ওঠে ঠিক তেমনটি মিলনের কথা কুন্তক বলেছেন।

ভোজরাজ বারটি সম্বন্ধের উল্লেখে শব্দার্থের মিলন সম্বন্ধকে যতটা না সীমাবদ্ধ করতে পেরেছেন কুন্তক বাহুল্যহীনতার কথা বলে তা'র চেয়ে প্রকাশ করেছেন অনেক বেশি। বাইরের দিক থেকে অভিধা, বিবক্ষা প্রত্যেকটি গুণের বিচার না করে' শব্দ ও অর্থের নিজস্ব ধর্মের ভিতরে যে বিশেষ গুণগুলি অন্তর্লীন হ'য়ে আছে "পরস্পর

স্পর্ধিত রমণীয়” ইত্যাদি কথার দ্বারা তা'দের সম্বন্ধের সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনাও সুন্দররূপে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। এজন্য কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে কুন্তকের দান অনেক উপরে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-আলোচনায় কুন্তক আর একটি গভীর কথা বলেছেন। তাঁ'র মতে শব্দ-অর্থের মাঝেই নিহিত থাকে আহ্লাদ—আনন্দের বীজ।

শব্দার্থযুগলের নিবিড় গভীর মিলন-স্পন্দনে কাব্যত্বের গভীরতা স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। শব্দার্থের সম্বন্ধের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি দুই সুহৃদের উপমা দিয়েছেন। দুই সুহৃদ্ যেমন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত অথচ কেউ কারো তুলনায় নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়, তেমনি শব্দ ও অর্থজাত গুণ ও অলংকারের সমান শোভাবৃদ্ধিতে শব্দার্থের কাব্য-সৌন্দর্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সুহৃদ্‌যুগলের মত শব্দার্থ শত্রুভাবাপন্ন নয়—মিত্রতার সুগভীর মমতায় আবদ্ধ।

কুন্তক কিন্তু এখানেই থামেন নি। তিনি অধিকতর অগ্রসর হ'য়ে বলেছেন শব্দ ও অর্থের কেবল কাব্যবিকাশ হ'লেই চলবে না—লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাব্যপ্রবাহের অখণ্ড সুরের তালভঙ্গ না হয়। অর্থের মৃতকল্পত্ব ঘুচিয়ে প্রাণ দিতে পারে সমুচিত শব্দ আবরে শব্দের ব্যাধি বিতাড়ণ করে' বাক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে সমুচিত অর্থ—ভাল কথা কিন্তু যদি মূল সুরের তালভঙ্গ হ'য়ে যায় তা' হ'লে এই মিলনের কোন অর্থ হয় না। সঙ্গীত যেমন একটি সুরলোকের মাধ্যমে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে, শব্দ ও অর্থ তেমনি কবি-প্রতিভার বলে কাব্যের ঘনসংবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন জগৎকে রসপুষ্ট করে' তোলে। সুতরাং ভাবের বিচ্যুতি এবং রসপুষ্টিতে ব্যাঘাত না ঘটতে পারে এমন ভাবে শব্দার্থ চয়ন করাই কবির কাজ।

এখানেও কুন্তকের ব্যাখ্যা শেষ হয় নি। এর উপরে তিনি এক উদার যুক্তির ক্ষেত্রে কাব্যের সকল উপাদানকে একত্রিত করেছেন। কেবল শব্দ-অর্থ নয়, কাব্যের মধ্যে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন অর্থাৎ বৈদর্ভী প্রভৃতি মার্গ, মাধুর্যাদি গুণ, অলংকার-বিন্যাস,

বক্রতা-বিন্যাস, বিচিত্র-বৃত্তি ও ঔচিত্য, বিবিধ রস প্রত্যেকেরই শুধু শব্দ এবং অর্থের সঙ্গে নয়—পরস্পরের সঙ্গে স্বার্থক সংযোগের প্রয়োজন। এইভাবে সকলের সাথে সকলের ঐকান্তিক মিলন সুসম্পন্ন হ'লে, লেনদেন সমাপ্ত হ'লে, অঙ্গে সুষমা এবং চিত্তে সুসামঞ্জস্য স্থাপিত হ'লে কাব্যের মধ্যে 'অদ্ভুতামোদচমৎকার' পরিবেশ আপনি সৃষ্ট হয়।

কুন্তকের মতের ত্রুটি ॥ যে উদার পটভূমিতে কুন্তক আপন মত ব্যক্ত করেছেন তা'র বিরুদ্ধে যে কোন কথা বলা যায় এমনটি আমরা সাধারণে কল্পনাও করি নে। কুন্তকের আলোচনা প্রাচীনযুগে তো অভিনব বটেই—বর্তমান যুগেও এঁর আলোচনার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু তা' হ'লে কী হবে—নিন্দুক পিছনেই। দু'দিক থেকে আলোচনা করে' কুন্তকের ব্যাখ্যার ত্রুটি ধরা পড়লো। প্রথমতঃ শব্দের সঙ্গীত ধর্মের কথা যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমন অর্থের চিত্রধর্মের কথা উল্লেখ করেন নি। শব্দ ও অর্থের বাহুল্যবর্জিত মিলনের কথা তিনি বার বার বলেছেন তথাপি তাঁ'র আলোচনায় মনে হয় অর্থকে গৌণ করে' শব্দকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ শব্দ ও অর্থের মিলন-সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যে তিনি যে সুহৃদ্‌যুগলের উপমা দিয়েছেন তা' ভুল না হ'লেও ত্রুটীপূর্ণ। এখানে কালিদাসের পার্বতী-পরমেশ্বর বা প্রেমিক-প্রেমিকার উপমাটি দিলে সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত এবং মনোহর হ'য়ে উঠতো। শব্দ ও অর্থের মিলন যেখানে অপূর্ব সেখানেও শব্দ ও অর্থ একাত্মা বা একদেহী নয়—সেখানেও উভয়ের মাঝে জাতিভেদ আছে। শব্দ শ্রবণের পর তবে অর্থের উদয় হয়—শব্দ-অর্থ একাত্মা হয় না কখনোই। উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। দুই সুহৃদের উপমার মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে যেখানে 'জাতিভেদ' আছে সেখানে—দুই সুহৃদের 'জাতিভেদহীন' উপমা সঙ্গত নয়। সুহৃদ্‌যুগলের উপমা অর্থের সাথে অর্থের, বাক্যের সাথে বাক্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে পার্বতী-

পরমেশ্বরের উপমা সর্বাপেক্ষা সুসংগত। কেননা শব্দ ও অর্থের মত পার্বতী ও পরমেশ্বরের মধ্যে জাতিভেদ আছে—অথচ উভয়ে বিচ্ছিন্ন নন, একে অপরের শক্তিদাতা, পরিপূরক।

॥ এগার ॥

প্রাচীন ভারতে আচার্যগণ-আলোচিত কাব্যলক্ষণ নিরূপণের দু'টি ধারার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। ভরতমুনি হ'তে শুরু করে' আনন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ ইত্যাদি ধ্বনিবাদী এবং রসবাদিগণ সকলেই রসস্ফুরণ হ'তেই আনন্দ উপলব্ধির কথা বলেছেন। রসবাদের পাশাপাশি ধ্বনিবাদও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, অন্ততঃ নবম শতাব্দীর আনন্দবর্ধন অবধি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসবাদের করালগ্রাসে ধ্বনিবাদকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় আর একদল পণ্ডিত কাব্য-স্বরূপের বিচার করেছেন রসনিষ্পত্তির দিক থেকে নয়—শব্দ ও অর্থের সম্মিলনের দিক থেকে। কুন্তক এই দলের মধ্যে পুরোধা। আনন্দবর্ধনের পর দু'টি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে—এলেন অভিনব গুপ্ত। কুন্তক অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক। অভিনব গুপ্তের হাতে রসবাদের ঘটে চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। রসবাদের এই প্রবল তরঙ্গের মধ্যে কুন্তকের আবির্ভাব একান্ত দুঃসাহসিক বললেও অনুচিত হয় না। যে সময় আলংকারিকদের কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছে বলে সকলেই মনে করেছিলেন সে সময় কুন্তকের আবির্ভাবে সকলেই বিস্মিত হলেন। তিনি এক নতুন দৃষ্টিভংগীতে কাব্যের আঙ্গিক-সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

কাব্যের প্রকরণ বিচারে কুন্তকের ঘোষণা: "বক্রোক্তিঃ কাব্য জীবিতম্"—বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। এই বক্রোক্তি কী? শব্দার্থচয়ন এবং বিন্যাসের ভংগীকেই তিনি বলেছেন বক্রতা আর

বৈদগ্ধপূর্ণ ভংগীসহকারে ভনিতি অর্থাৎ উক্তির নামই বক্রোক্তি— "বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধভংগী 'ভনিতিরুচ্যতে।" এই সংজ্ঞা হ'তে আমরা বক্র উক্তির দু'টি লক্ষণ প্রাপ্ত হই—একটি বৈদগ্ধময়ত্ব এবং অপরটি ভংগীময়ত্ব। একটি হ'লো কবি-কর্মকৌশল বা সুনিপুণ কবি-কর্ম, যা' দ্বারা বুঝা যায় কবি-প্রতিভার পরিকল্পনা-শক্তি। দ্বিতীয়টি হ'লো লক্ষণভংগী যা' দ্বারা উক্তির বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করা যায়। নিপুণ কবি-কর্মের সাথে যুক্ত হবে উক্তির মনোহারিত্ব, চারুত্ব-সৌন্দর্য। বৈদগ্ধের উপরেই কুন্তকের পক্ষপাতিত্ব বিশেষ রকমের। রস অথবা ধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নি। যেখানে করেছেন বক্রোক্তির সাথে এক করে' রস ও ধ্বনির আলোচনা করেছেন। বলেছেন বক্রতার সাথে একাত্ম বা সম্পর্কযুক্ত না হ'লে অলংকার রস বা ধ্বনি কোনটিরও চরমোৎকর্ষ লাভ সম্ভব নয়। কাব্যের কোন বিষয়বস্তুই সরলভাবে সোজাসুজি বলা যায় না। কবির মনোজগৎ থেকে যখন কাব্য-জগতের উৎপত্তি তখন বস্তুর স্বাভাবিকত্ব বলে কিছু নেই। প্রতি বস্তুই কবির স্বভাবে সমাচ্ছন্ন। এখানে কুন্তক স্পষ্টরূপেই স্বভাবোক্তিকে অস্বীকার করেছেন। ধ্বনিকে বলেছেন বক্রোক্তির একটি রূপমাত্র। বস্তুতঃ কুন্তকের বক্রোক্তিবাদে কাব্যের আঙ্গিক আলোচনার সকল বিষয়ই কিছু না কিছু বিধৃত হয়েছে—সকল কিছুরই এ এক বিশাল রূপ। সেজন্যে বক্রোক্তিবাদ কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে এক বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদার অধিকারী।

## ॥ রবীন্দ্রনাথের কালান্তর ॥

বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কালান্তরের সামগ্রী করে' তুলেছে। সাহিত্যের কোন বিভাগে তাঁ'র বলিষ্ঠ পদসঞ্চার ঘটেছে এ প্রশ্ন না করে' বরং কোন প্রাঙ্গণে তাঁ'র পদচিহ্ন পড়ে নি সে প্রশ্ন করাই সঙ্গত। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ বিধাতার আশীর্বাদ। সাহিত্য-সৃষ্টির সকল কিছুর অদ্ভুত মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। সুদীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন, মৌলিক চিন্তা করেছেন সারা জীবন, বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরের সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন গতিপথ সে চিন্তায় স্বর্ণোজ্জ্বল, আর সব থেকে বড় কথা চিন্তা কেবল মূক না থেকে বর্ণের নীরব আলিম্পনে মুখর হ'য়ে উঠেছে। মনীষীসুলভ চিন্তা বর্ণের বিশাল কারাগারে মহোত্তম রাজবন্দী। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা না করে' কেবল প্রবন্ধের কথাই ধরা যাক। কত বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করেই না তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। শিল্প, সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি সকল বিভাগেই তাঁ'র কীর্তিসমুজ্জ্বল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে কবিগুরুর চিন্তা ব্যাপক এবং এসকল বিষয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন কিন্তু রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁ'র স্বকীয় মৌলিক চিন্তা অনবদ্য হ'লেও এ বিষয়ে খুব বেশি কিছু লেখেন নি। এ বিষয়ে আমরা মাত্র একখানি পুস্তকই পেয়েছি— "কালান্তর"। এ পুস্তকে যে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে কবিগুরু তা' প্রায় ত্রিশ বছর (১৩২১ থেকে ১৩৪৮ সাল) ধরে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ পরিস্থিতির মুখে লিখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বসমরের প্রারম্ভিক ঊষালগ্ন পর্যন্ত "কালান্তর" রচনার কালপরিধি বিস্তৃত। এই কালবেষ্টনীর দিকে লক্ষ্য করলেই

বোঝা যাবে যে সময় নিখিল ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-সমুদ্র সহস্র কঠিনতম ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্বেলিত সেই চরম মুহূর্তে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত। সুতরাং সমকালীন ঘটনাবলীই এ প্রবন্ধাবলীর সূতিকাগার। প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন ঘটনার ছায়াপাত ঘটলেও রবীন্দ্রসুলভ অসীমচারী চিন্তা-ভাবনা অনুপস্থিত নয়। সমকালীন কঠিনতম জটিল সমস্যাগুলি তিনি ধরেছেন এবং প্রায় প্রবন্ধে তা'দের সমাধানেও নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ সকল সমাধানের মধ্যে একটি বিশ্বজনীন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তালোকের বৈশিষ্ট্য তাই। তাঁ'র কবিমানস কোনোদিন কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডি ও সীমিত এলাকার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে নি—সর্বদাই তা' অসীমাভিসারী। তাঁ'র কল্পনা-পক্ষীরাজের পাখা দু'টি নভঃলোকের আহ্বানে আলোড়িত। তা'ই এ সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর চিন্তা-ভাবনার দর্পণে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সঙ্কটতম কালের দেশের আবর্তন-বিবর্তনের রূপটি ধরা পড়ার সাথে সাথে একটি বিশ্বজনীন আদর্শবাদও প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রায় প্রবন্ধে যে চিন্তা-চেতনার রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে তা' কমবেশি সকল কালে সকল দেশেই প্রযোজ্য। মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সাথে বিশ্বজনীনতা মিশে গ্রন্থখানিকে এক বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

সঠিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ-পুস্তক বলতে আমরা যা' বুঝি "কালান্তর" বোধ হয় ঠিক সে জাতের গ্রন্থ নয়। রাজনীতির নীরস কুটিল পথ-পরিক্রমায় এর সব রস ব্যয়িত হয় নি। এ গ্রন্থের মৌল পটভূমি দু'টি—কবি এবং তাঁ'র সমসাময়িক দেশকাল আর রাজনীতি এই মৌল-প্রবাহের একটি প্রধান প্রবল তরঙ্গ মাত্র। এই মৌল তরঙ্গভঙ্গে ভাসমান না হ'য়ে কবি জটিলতম প্রাচীন অতীত হ'তে বেগ নিয়ে সংঘর্ষমুখর বর্তমানের উপর দিয়ে অনাগত স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনায় নিমগ্ন। তাঁ'র বলিষ্ঠ চিন্তার মণি-দর্পণে এই তিনকাল সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। আর

এই গ্রন্থনার ফলশ্রুতি বিশ্বজনীন মানবতার মহামিলন। "কালান্তর" আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে—সেটি হ'লো ঐতিহাসিকতাবোধ। এতে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তা'র সবগুলির চিন্তা-ভাবনা এক নয়। এক তো নয়ই বরং সময় সময় পরস্পরবিরোধী মনে হয়েছে। ইংরেজ এবং ইউরোপ সম্পর্কে তাঁ'র মতামতগুলি অনুসরণ করলে তিন-চারটি বিভাগ চোখে পড়বে—কখনো তিনি তাঁ'দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কখনো তাঁ'দের ব্যবহারে বেদনা-ম্লান; কখনো তাঁ'র চিন্তা-ভাবনাগুলি শ্বেতকায়দের কেন্দ্র করে' মুখর হ'য়ে উঠেছে, কখনো তা' ঘৃণায় নির্বাক্; কখনো দেখা গেছে ইংরেজ সভ্যতার প্রতি তাঁ'র মোহের অন্ত নেই আবার কখনো চলেছে সেই মোহভঙ্গের পালা। এমনি করে' "কালান্তরে"র বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনাগুলি দ্বৈত-বৈপরীত্যে স্ববিরোধী হ'য়ে উঠেছে। তা'ই প্রতিটি চিন্তার পৃথক্ বিচারে কবির প্রতি অবিচার হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে প্রয়োজন অখণ্ড দৃষ্টির—সকল চিন্তা-ভাবনার উত্তাপে যে মণির সৃষ্টি হয়েছে তা'রই যথার্থ বিচারে উদ্ঘাটিত হবে কবির সত্য দৃষ্টি-ভংগীর স্বরূপ। কবির কথায়ঃ "যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা' আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন—তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁ'র নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হ'য়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন। তা'র কারণ, বাছাই করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।...বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা' প্রকাশ

করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে' দেখলে তা'র সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ দীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তা'র রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সঙ্গত। ...রাষ্ট্রনীতির মত বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তা'রা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।...সেইটাকে বিচার করে' দেখা চাই। বস্তুতঃ সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে' তবে তাকে পাই।" (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত)।

'ঐতিহাসিকবোধ' এবং 'সমগ্র দৃষ্টি' এই উভয়ের সমন্বয়ে "কালান্তরে"র প্রবন্ধগুলি বিচার করলে যে জিনিসটি সর্বপ্রথমেই উপলব্ধি করা যাবে সেটি হ'লো লাঞ্ছিত ও অপমানিত মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কবির আন্তরিক আকূতি। জাতিধর্ম-স্থান-কালপাত্র নির্বিশেষে যেখানেই তিনি মানুষের অপমান লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তাঁ'র সহানুভূতিশীল অন্তর বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে —কালান্তরের বহু প্রবন্ধেই সে বিক্ষুব্ধতার পরিচয়-চিহ্ন ছড়ানো। কিন্তু কবির চিন্তা-চেতনা কেবল বিক্ষুব্ধতার তরঙ্গ তুলেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি—তা'র প্রতিকার বিধানে গর্জনমুখর হ'য়ে উঠেছে। এখানেই তিনি বিশ্বমানবতার পূজারী। আর এখানেই তিনি টলষ্টয়, গ্যয়টে, রমাঁরলাঁ, হাফিজ প্রমুখ বিশ্বখ্যাত মনীষীদের চিন্তাজগতের অধিবাসী।

কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের মন্তব্যের সত্য-সার উপলব্ধি করা যাবে। প্রথমেই 'কালান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা ধরা যাক। এখানে তিনি তিনটি কালের কথা মানবিকতা উন্মেষের পটভূমিতে বিচার করেছেন। প্রথম কালটি 'চণ্ডীমণ্ডপের

যুগ' রূপে চিহ্নিত। সে সময় অতি সংকীর্ণ ও পরিচিত এলাকায় আমরা বাস করতাম। এলাকা পরিচিত কিন্তু চিত্তভূমির উন্নততর লালনের কোনো আয়োজন সেখানে ছিল না—চিত্ত জলাশয়ের জল গিয়েছিল শুকিয়ে। এযুগে কোনো মানসিক উৎকর্ষতা নেই। এর পরের যুগটি 'মুসলমান আমল' রূপে চিহ্নিত। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে এসে রাজ্যজয় করে, যাতায়াতের পরিধি বিস্তৃত করল, কালান্তর ঘটল, কিন্তু জ্ঞানের পরিধির কোনো আয়তনবৃদ্ধি হ'লো না। "বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তা'রা ঘরে এসে ঘর দখল করে' বসল, বন্ধ করে' দিলে বাহিরের দিকের দরজা।" ফলে জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি না হওয়ায় কবি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। এর পরে এল ইংরেজ। "নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে।" তা'রা মুসলমানদের চেয়ে অনেক দূরে রইল বটে কিন্তু 'জ্ঞানের বিশ্বরূপে'র দ্বারকে দিল উদ্‌ঘাটিত করে'। নিষ্ঠুর আচার ও কুসংস্কারের মধ্যে আমাদের যে মন মরণোন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল উদার শিক্ষার শান্ত শীতল হাওয়ায় তা' আবার সজীব হ'য়ে উঠল। ইংরেজ আমাদের শেখাল ন্যায়-নির্ভীকতা, তা'র সাহিত্যে পেলাম মানবিকতার বিজয় ঘোষণা, তা'র বিজ্ঞান এল মানুষের মঙ্গলের প্রতীক রূপে—মোটকথা তা'র সকল কিছুর আয়োজন মানুষের উন্নতির জন্যই। ইংরেজ এসে যে কালান্তরের সৃষ্টি করল তা'র মঙ্গলের দিকটা বড় হ'লেও অমঙ্গলের দিকটাও নিতান্ত ছোট নয়। কেবল নিষ্ঠুর দানবীয় শাসন এবং শোষণ ছাড়া ভারতের উপকার ইংরেজ বড় একটা করে নি। "আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডার, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধনোৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই।" এ তো গেল ভারতবর্ষের কথা। বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবি

বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে গেলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার মশাল এখন আর আলো দেখায় না—আগুন লাগায়। কোরিয়া ও চীনের যুদ্ধ, আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের উন্মত্ত বর্বরতা, জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কবি তাই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন: "একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে ইউরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তা'র একটা সঙ্কোচ ছিল; আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সংকোচকেই।...একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা ইউরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা আজ দেখছি ইউরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হ'য়ে উঠছে।" ইংরেজসভ্যতার সাথে পরিচিত হ'য়ে আমরা তা'র হিংস্ররূপের সন্ধান পেলাম, তা'র জান্তব বর্বরতা প্রকাশের স্বরূপটিও দেখলাম তথাপি আশার কথা এই যে শত অত্যাচার অনাচারের মাঝেও আজ আমরা আমাদের অধিকারের কথা স্বোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি, অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনেছি—তা'র প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও জন্মেছে। ইউরোপীয় বর্বর সভ্যতার মাঝে মানুষের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহসটিই আমাদের সব থেকে বড় লাভ। ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ—কাল হ'তে কালান্তরের মধ্যে কবি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগরণের মাধ্যমে মানবিকতার সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার কথাই সগর্বে ঘোষণা করেছেন।

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূলভাবও এই—অপরাজিত মানবাত্মার বিজয় ঘোষণাতেই কবি উচ্চকণ্ঠ। ইংরাজদের কল্যাণবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রতি কবি শ্রদ্ধাশীল—মানবতার মহাজাগরণের সবটুকু প্রত্যশা তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার মাঝে করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তিনি পোষণ করে' আসছিলেন মনে মনে। তাঁ'র ভরসা ছিল যে ইংরেজ মানবতার পূজারী তা'রা কোনোদিন একটি দেশ ও জাতকে এভাবে অপমানিত করতে পারে না। কিন্তু কবির সে প্রত্যাশা নৈশস্বপ্নে বিলীন হ'য়ে গেল। তিনি দেখলেন ইংরেজদের বর্বরতা,—শিক্ষা-দীক্ষা তো দূরের কথা, ভারত-

বাসীর অন্নবস্ত্রের সংস্থানটুকুও করতে তা'রা নারাজ। ঔষধ-পথ্য এসব তো স্বপ্নবিলাস মাত্র। Law এবং Order, শাসন এবং শোষণের মাধ্যমে তাদের বর্বর জান্তবরূপ প্রকাশ পেল। রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি অধিকার করেছে কিন্তু সে তা'দের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করে নি—উন্মুক্ত রেখেছে। কিন্তু ইংরেজ সে পথটুকুও খোলা রাখে নি—সংকীর্ণ গবাক্ষপথে এতটুকুও জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে না। মঙ্গলের বাণী নয়—যুদ্ধের দামামা মানুষের চেতনাকে বধির করে' তুলছে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মন্ত্রশিষ্য জাপান উত্তরাধিকারসূত্রে এই রক্তলোলুপতাই পেয়েছে—উত্তর-চীন আক্রমণে তা'র প্রমাণ নিহিত। ফলে যে ইউরোপীয় সভ্যতার মাঝে কবি কল্যাণের বাণী শুনেছিলেন মরণাস্ত্র-সজ্জিত সে সভ্যতাই মানবতার চরম লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে 'সভ্যতার সংকট' সৃষ্টি করেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সভ্যতা এসব তো আর কিছুই নয়—মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক। কিন্তু যে জ্ঞানবিজ্ঞান এর পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়ায়, যে বিজ্ঞান কেবল শক্তিরূপ দেখায়—মুক্তিরূপ দেখাতে পারে না, সে প্রতিমুহূর্তে সঙ্কটই গড়ে তোলে। নিখিল বিশ্বের সভ্যতা আজ মহাসঙ্কটের অগ্নিপরীক্ষায় দণ্ডায়মান। এই চরম বিপদের দিনে কে শোনাবে আশার বাণী, কা'র কণ্ঠে ধ্বনিত হবে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নতুন মন্ত্র, অগ্নি-সেতুর উপর দাঁড়িয়ে কে করাবে সভ্যতার মুক্তিস্নান? যে সভ্যতার মাঝে দর্প-অহঙ্কার কালাপাহাড়ী মনোভাবে অটল, অহংবোধ আত্মগর্ব যে সভ্যতায় উচ্চশির—সেখানে মুক্তি খোঁজা বৃথা। নিরহংকার অধ্যাত্মপন্থী প্রাচ্য ভূমিখণ্ডের দিকে তাকিয়ে তা'ই কবি বলেছেন: "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা ক'রে থাকবে, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। ...আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা

অতিক্রম করে' অগ্রসর হবে তা'র মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।...এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীও ক্ষমতা ও মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তা'রই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ;...

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে।"...

দীর্ঘ আশি বছরের জীবন-পরিধিতে নিখিল বিশ্বের বহুতর উদয়-বিলয় চিহ্নিত হ'য়ে আছে। এই সকল ভাঙাগড়ার মাঝে কবি মানবাত্মার মহামুক্তির সন্ধান করে' ফিরেছেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জয়গানে একদিন ফ্রান্সের বুকে যে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয়েছিল—তা'রই মহোত্তম উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ। "কালান্তরে"র কমবেশি সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের চিত্ত-চেতনায় রেনেসাঁসের আবেদন-স্পন্দন পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। সত্যসন্ধী মহান্ শিল্পীর এই বিশ্বজনীন চেতনাই অপরাজিত মানুষের বিজয় অভিযানে সঞ্জীবনী সুধা। 'সভ্যতার সঙ্কটে' মানবতন্ত্রী ভাবুক শিল্পী শত ঝঞ্ঝা-অতিক্রান্ত মানবসভ্যতার বিজয় অভিযানের কথাই ব্যক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য কবির রসদৃষ্টিতে 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সঙ্কটে' যে সমস্যাগুলি ধরা পড়েছে তা' নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদের চোখে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না।

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধের মধ্যে মানুষের কর্মচঞ্চলতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিচার-বিবেচনায় আমাদের মাঝে আসে সংযম আর অবিবেচনায় সৃষ্টি হয় দুর্মদ শক্তি-সাহসের। আদর্শ কর্মীর জন্যে এ দুটোরই প্রয়োজন। বিবেচনায় তা'র কর্মে দেখা দেবে কল্যাণধর্মিতা আর অবিবেচনায় সে এগিয়ে যাবে নতুনতর আবিষ্কারের দিকে। পৃথিবীর যা মহৎ-মহান্ আবিষ্কার তা'র ষোল আনাই অবিবেচনা-প্রসূত। আবার পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ দর্শন

ও সাহিত্য তা' চিন্তাশীল মানুষের বিবেকী মনের দান। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আদর্শ জাতি গঠনের জন্য বিবেচনা ও অবিবেচনা উভয় কর্মশক্তির প্রয়োজন। কর্মচাঞ্চল্য ও গতিবেগই মানুষকে সৃষ্টজীবের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করেছে। "পৃথিবীতে বারো আনা জল, চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিত। কারণ, জলই পৃথিবীতে গতি-সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে।" কবির আক্ষেপ আমাদের ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এই বিবেচনা ও অবিবেচনা কোনটিই ক্রিয়াশীল নয়। তাঁ'র শেষ কথা: "চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক। কিন্তু, অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না—এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রং-এর ফুলও ফোটে। সে ঘাস, সে ফুল সুন্দর, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।"

'লোকহিত' একটি অতি মূল্যবান সুচিন্তিত প্রবন্ধ। সমকালীন ঘটনাবলীতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কবি এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। এ প্রবন্ধেও কবির একটি বিশ্বজনীন চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'লোকহিত'-এর মূল ভাব সংক্ষেপে এই: মানুষ লোকহিত করতে চায় কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই 'হিত' করার মাঝে আছে 'আত্মাভিমানের মদ'। মানুষ নির্ভেজাল প্রশংসার রোদ পোয়াতে ভালবাসে—এই প্রশংসা সুদেমূলে আদায়ের জন্যে পরিহিতব্রত গ্রহণ করে, যা'র মূলে থাকে আত্মতৃপ্তি। কিন্তু এ লোকহিত কেবল মানুষকে ঋণে আবদ্ধ করে' ছোট করে না, মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে। সুতরাং এ জাতীয় লোকহিত নিন্দনীয়। লোকহিতের জন্য প্রথমেই করণীয় হ'লো এই

আত্মাভিমান ত্যাগ করা, তা'র পরের করণীয় বিষয়টি হ'লো সাধারণ মানুষের অন্তরে নিজেদের 'মানুষ' বলে জানার ও বোঝবার শক্তি দান করা—অর্থাৎ তা'দের শিক্ষিত করে' তোলা। শিক্ষিত বলতে কবি কোনো ডিগ্রী ধারণের কথা বলেন নি—বলেছেন লোকশিক্ষার কথা—নিজেকে চেনা ও জানার জন্যে যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষার কথা। বাইরে থেকে সাহায্য করে' মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা কোনো দিনই সম্ভব নয়—আপন শক্তিতে জাগ্রত হ'য়ে যেদিন তা'রা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে নিজেরাই এগিয়ে আসবে সেদিন হবে সত্যিকারের কল্যাণ। ইউরোপ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সেখানে লোকসমাজ শিক্ষিত বলেই নিজেদের দাবি ও অধিকার তা'রা নিজেরাই আদায় করে। বা'র হ'তে কোনো আরোপিত শক্তির দ্বারা এটা হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমজীবীরা আপন শক্তিতে বলীয়ান হ'লে বণিক্‌সমাজ জবাবদিহির দায়ে পড়বেই। সুতরাং কবির মতে লোকহিতের জন্যে 'আত্মাভিমানের মদে'র তাড়নায় কিছু দান করাটা প্রায় অর্থহীন—লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করাই হবে আদর্শ লোকহিত। রবীন্দ্র দর্শনই তা'ই। তিনি বহুস্থানেই মানুষকে উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে আপন শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কথা বলেছেন। মানুষের অপরাধ মানুষ নিজে জানুক, তা'র দুর্বলতা সে বুঝুক, তা'র অন্যায় আচরণ সে নিজে উপলব্ধি করুক—তবেই তা'র অন্তরে জাগ্রত হবে কল্যাণবোধ, মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা, তখনই সে হবে সত্যিকার মানুষ। বিশ্বপ্রভুর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাও তা'ই 'উত্থান-পতনে—মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।' সমালোচক তা'ই যথার্থই বলেছেন: "Tagore emphasises again and again that man must grow to his full height by inculcating moral powers within." বলা বাহুল্য এ বোধ সর্বজনীন, এ চিন্তা বিশ্বানুভূতিরই পরিচায়ক।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধেরও মূল সুর একই। সেখানেও

উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে আত্মোপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'মাথার উপরে কর্তা থাকবেন এবং আমরা তাঁ'র ইচ্ছা-আদেশ মত কাজ করব'—এ মনোভাব আত্মবিসর্জনের সামিল। ভুল তা'রই হয় যে করে—সুতরাং ভুলের ভয়ে জড়ত্ব গ্রহণ করা মহাপাপ। আজ আত্মোপলব্ধির এই মহেন্দ্রক্ষণে চাই কাজ, চাই চঞ্চলতা। বৃহত্তর জগতের সাথে পরিচয়পথে ভুলক্রটির মধ্য দিয়ে হোক সত্যোপলব্ধি। 'ছোটো ও বড়ো', 'স্বাধিকার প্রমত্ত' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যেও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 'সমস্যা', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শক্তিপূজা', 'চরকা' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই ভাব স্বর্ণাক্ষরে স্বাক্ষরিত। গান্ধীজী পরিচালিত অহিংসা আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাঁ'র নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেবল আবেদন-নিবেদনের' ভিতর দিয়ে অহিংসাত্মক নীতির অনুসরণ করলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হবে না। নতশিরে আবেদন-নিবেদনে আত্মশক্তির অবমাননা হয়। অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তির জন্য চাই উচ্চশির বলিষ্ঠ মনোভাব, কর্মচঞ্চলতা। তবেই আমরা স্বাধীনতার স্বর্ণোজ্জ্বল পথে এগিয়ে যেতে পারব।

আর একটি বড় সমস্যার উল্লেখ রয়েছে 'কালান্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধে—সমস্যাটি হ'লো হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত। 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট,' 'লোকহিত,' 'হিন্দু-মুসলিম' ( একটি চিঠি ও একটি প্রবন্ধ ) শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কবি ভারতবর্ষের বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বী দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে পাশাপাশি বসবাস করলেও উভয়ের মধ্যে মিলন সাধিত হয় নি। এই বিরোধের প্রধান কারণ হ'লো হিন্দু আচারে কঠিন আর মুসলমান-ধর্মে নির্মম। সামাজিকতায় হিন্দুদের গড়ে উঠেছে দুস্তর পাপ, আচার এমনই যে "একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে" ( লোকহিত ) হয় আর মুসলমান আচারে উদার কিন্তু তা'র ধর্মে অন্য কারো প্রবেশাধিকার

নেই। উভয়ই গোঁড়ামি, অন্যায়, পাপ। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের আর একটি কারণ হচ্ছে যে হিন্দুরা শিক্ষার দর্পে অশিক্ষিত মুসলমানদের হেয় জ্ঞান করে। অশিক্ষিত মুসলমানরা কেবল সংখ্যায় বেড়েছে আর হিন্দুরা ঘৃণায় তা'দের দূরে সরিয়েছে। কখনো কাছে টানার প্রয়োজন অনুভব করে নি। প্রয়োজনের দিনে যখন তা'দের কাছে টানার দরকার হ'লো—তা'রা এল না। "বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় (প্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন) আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের, সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই" (লোকহিত)। প্রথম হ'তেই যদি ভদ্রশ্রেণীর হিন্দুসমাজ অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান সমাজকে হৃদয়ের আকর্ষণে কাছে টানত তা' হ'লে এ ব্যবধান এত দুস্তর ও মর্মভেদী হ'তো না। এই দুস্তর ব্যবধান আর মর্মভেদী সমস্যা এর সমাধান কোথায়? "হিন্দু-মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধে ও পত্রে কবি এর উত্তর দিয়েছেন। বিশ্ব-ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে উন্নতিলাভ করেছে সে-সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ প্রথমেই বিদ্রোহ করেছেন ধর্মের বিরুদ্ধে। ধর্মতন্ত্রের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র বড় হ'তে পারে নি—কোনো না কোনো ধর্মের নামে অধর্ম প্রবল হ'য়ে ওঠে। ধর্ম যেখানে উলঙ্গ সংহার-মূর্তি ধারণ করে, সর্বাঙ্গীন উন্নতি সেখানে কোনদিনই সম্ভব নয়। ধর্ম উচ্চশির হ'লেও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান দুরতিক্রমী হ'তে বাধ্য। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম চাই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মকে নীচে ফেলে মানবধর্মকে উপরে স্থান দিতে হবে। তারপর চাই উদার শিক্ষানীতি—ভারতবর্ষে সেই শিক্ষারই প্রচলন করতে হবে যে শিক্ষার আলোকে হিন্দু-মুসলিমও তা'দের হৃদয়ের বহুযুগ সঞ্চিত গোঁড়ামির অন্ধতাকে দূর করতে পারবে। তা'রা বুঝতে পারবে ধর্মের নামে তা'রা এতদিন অধর্মকেই বড় করে' এসেছে, আচারের নামে অনাচারকেই সম্বল করেছে। শিক্ষার স্বর্ণালোকেই হোক তা'দের সত্যোপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের বিস্তারিত

আলোচনা হয়েছে—কিন্তু 'কালান্তর' সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। কিন্তু এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে রবীন্দ্র-সমালোচনার নামে রবীন্দ্রপূজা হয়েছে—আদর্শ সত্যনিষ্ঠ সমালোচনা হয় নি। 'রবীন্দ্রনাথ সুতরাং শিরোমণি' এ মনোভাবের হত্যা প্রয়োজন নইলে কবির কথাতেই বলা যেতে পারে সত্যোপলব্ধি সম্ভব নয়। কেবল প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে রবীন্দ্র-সমালোচনায় কিছুটা নির্ভীক হ'তে দেখেছি। 'কালান্তরে'র অনেক প্রবন্ধের মতামতের সাথে বিরোধ বাধা স্বাভাবিক। লোকহিত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। মানি তাঁ'র এ আলোচনা মূলোৎপাটনের কাজ করেছে কিন্তু নিমজ্জমান একটি লোককে ডাঙায় ওঠার সাহায্য না করে' যদি বলা যায় 'তুমি ডুবছ কেন—সেটা প্রথমে বোঝ'—তা' হ'লে? আগে চাই লোকটিকে ডাঙায় তোলা। তারপর অন্য কথা। তিনি 'আত্মাভিমানের মদ'-এর কথা বলেছেন —কিন্তু এই মদের আয়োজন না থাকলে তো পৃথিবীর সকল উন্নতিমূলক কাজকর্ম আবিষ্কার স্তব্ধ হ'য়ে যেতো। 'বিবেচনা ও অবিবেনা' প্রবন্ধে প্রকারান্তরে তিনি তো এ মদকেই স্বীকার করে' নিয়েছেন। তা' হ'লে? সব থেকে বড় আপত্তি উঠতে পারে কালান্তরের ভংগী সম্পর্কে। যে ভংগী কবি কালান্তরের মত গুরুগম্ভীর বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে লিখেছেন তা' মোটেই প্রশংসনীয় নয়। কমবেশি সকল প্রবন্ধকেই তিনি বৃথা এলায়িত, পল্লবিত করেছেন। 'লোকহিত', 'শিক্ষার মিলন,' 'বাতায়নিকের পত্র' ইত্যাদি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ কিন্তু সেই ছোট্ট বিষয়কে অবলম্বন করে' প্রবন্ধের আয়তন নির্মমভাবে দীর্ঘ করা অর্থহীন। অধিকাংশ সময়ে পুনরুক্তির দোষে আস্বাদনে বিরক্তি জন্মায়। 'সংক্ষেপে প্রকাশ করা যদি Art হয়'—কালান্তরের প্রায় সকল প্রবন্ধ সে হিসেবে ব্যর্থ। উত্তেজনার মরশুম পার হ'য়ে আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে। আজ আর রবীন্দ্রপূজা নয়—রবীন্দ্র-সমালোচনা চাই। এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

# • বিস্তারিত সূচীপত্র

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক :



রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী :



বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ :



দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ :



বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :



ছিন্নপত্র :

কাব্যালোক :



রবীন্দ্রনাথের কালান্তর :

## ● গ্রন্থ-তালিকা


অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্য-জিজ্ঞাসা

কাজী আবদুল ওদুদ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড), বাংলার জাগরণ, শাশ্বতবঙ্গ

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, আধুনিক বাংলা কবিতা ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চর্যাপদ বৌদ্ধগান ও দোহা

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্য ( প্রথম খণ্ড )

ডক্টর সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড); বাংলা সাহিত্যে গদ্য

জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য বিচিত্রা

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস

মদনমোহন কুমার—বাংলা সাহিত্যের আলোচনা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ

আজহারউদ্দীন খান—বাংলা সাহিত্যে নজরুল

মুজফ্‌ফর আহমদ—নজরুল প্রসঙ্গে

বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদ—নজরুলকে যেমন দেখেছি


———

আব্দুল আজীজ আল্-আমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ "পদক্ষেপে"র বিস্তারিত সূচীপত্র নিম্নে দেওয়া হ'লো॥ গ্রন্থটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ওপর তথ্যনিষ্ঠ ও মননশীল আলোচনায় সমৃদ্ধ।

## ● সূচীপত্র

বিদ্যাপতি :

এক ।। সাধারণ আলোচনা। দুই ।। বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি। তিন। কলাকুশলী বিদ্যাপতি। চার ।। পূর্বরাগ। পাঁচ ।। বিদ্যাপতির কাব্যে সুর পরিবর্তন ও অভিসার। ছয়। বিরহ। সাত ।। ভাব-সম্মিলন ও প্রার্থনা।

গোবিন্দদাস কবিরাজ :

এক ।। গোবিন্দদাস কবিরাজের কবিমানস। দুই ।। গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ। তিন ।। রূপানুরাগের পদ। চার ।। রাসের পদ। পাঁচ ।। অভিসার। ছয় ।। গোবিন্দদাসের কাব্যে প্রেমের চারুত্ব।

জ্ঞানদাস :

এক ।। জ্ঞানদাসের কবি-বৈশিষ্ট্য। দুই ।। পূর্বরাগ। তিন ।। মিলন ও আক্ষেপানুরাগ। চার ।। বংশীধ্বনি পাঁচ ।। বিরহ।

মহাজন চতুষ্টয় :

এক ।। মহাজন চতুষ্টয়ের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা।

মঙ্গলকাব্য :

এক ।। সূচনা ও নামকরণ। দুই ।। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ ও উৎসভূমি। তিন ।। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। চার ।। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য। পাঁচ ।। মঙ্গলকাব্যের যুগ-বিভাগ এবং পতনের কারণ। ছয় ।। নারায়ণ দেবের চাঁদ-চরিত্র। সাত ।। চণ্ডীমঙ্গলের সামাজিকতা। আট ।। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র। নয় ।। জাতীয় কাব্য হিসেবে মঙ্গলকাব্যের অবদান।

মৈমনসিংহ-গীতিকা :

এক ।। গীতিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট। দুই ।। মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা। তিন ।। গীতি ও গীতিকা। চার ।। বৈষ্ণব-সাহিত্য ও মৈমনসিংহ-গীতিকা। পাঁচ ।। মৈমনসিংহ-গীতিকা ও বাংলা উপন্যাস। ছয় ।। মৈমনসিংহ-গীতিকা : বাংলা-মাটির সম্পদ। ক ।। ভাষার অকৃত্রিমতা। খ ।। বাংলা মৃত্তিকাজাত উপমা। গ ।। মাটির চিত্র। সাত ।। মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী-চরিত্র। আট ।। একটি সার্থক গীতিকার পরিচয়।

---